সমগ্র রচনাবলী

প্রথম খণ্ড

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, পি, কে, সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬

প্রকাশক :
৭৫তম শ্রীসত্যানন্দ জন্মজয়ন্তী সমিতি
শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন
২, পি, কে, সাহা লেন
কলিকাতা-৩৬ (ফোন : ৫৬-২৭৭৩)

মাঘী কৃষ্ণাদ্বিতীয়া, ১৩৭৭

মুদ্রাকর :
শ্রীপ্রদীপকুমার হাজরা

৪০, শিবনারায়ণ দাস লেন
কলিকাতা-৭০০০০৬

মূল্য : ১২০·০০ (সমগ্র রচনাবলী)

প্রকাশকের নিবেদন

যুগপুরুষের বাণীই যুগবাণী। যুগপুরুষ ঠাকুর সত্যানন্দদেবের অনুপম রচনাসম্ভার সেই বাণীর ধারক ও বাহক। সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও সঙ্গীত জগত আজ সত্যানন্দদেবের অমর সৃষ্টির দিব্য আলোকে উদ্ভাসিত। বাংলা, ইংরাজী, হিন্দী প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় তাঁর সৃজনশীল লেখনী ধারায় নিঃসৃত হয়েছে। শত শত দিব্য রচনা।

সে সব অমূল্য সম্পদ একত্রে সুলভে সহজে জনসাধারণের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যই ৭৫তম শ্রীসত্যানন্দ জন্মজয়ন্তী স্মরণ অর্ঘ্যস্বরূপ সত্যানন্দদেবের সমগ্র রচনাবলী প্রকাশের আমাদের এই দীন প্রয়াস।

শ্রীসত্যানন্দার্পণম্
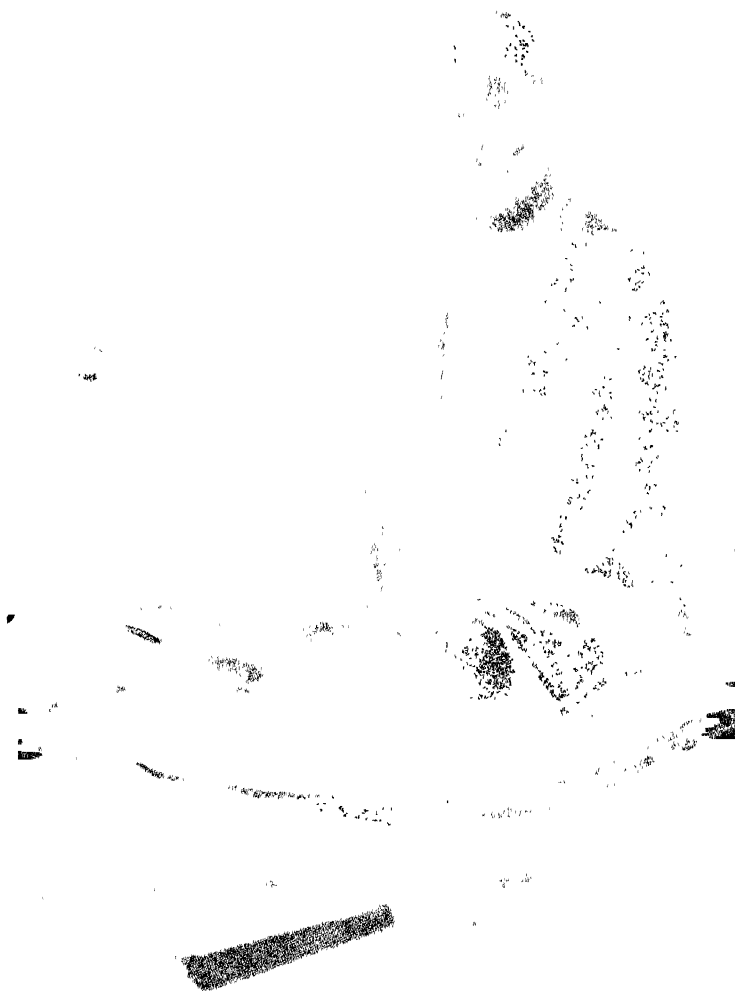
শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

স্বামী নির্বেদানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ

"অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জ্বলং সিন্ধুপাত্রং
সুরতরুবর শাখা লেখনী পত্রমুর্ব্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্ব্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥"

শিব-মহিম্ন স্তোত্রে শিবমহিমা সম্বন্ধে বলা হয়েছে এই শ্লোকে। সত্যানন্দ শিবের জীবনবেদও কোনও সীমিত বুদ্ধি বিশিষ্ট মানুষের কি সাধ্য আছে লেখনী-মুখে ধরা, বিশেষ কয়েকটি মাত্র পাতায়! কোনও মহাপুরুষের জীবনবেদ শুদ্ধ মাত্র ইতিহাস নয়। ঘটনার পর ঘটনা প্রবাহ— ঘটনা পারম্পর্যের বাস্তব ধারাবাহিক সুবিন্যাস এ নয়, এর মধ্যে আছে অনুভূতি রাজ্যের একটা বিশেষ স্থান। বাস্তব সত্যতা ছাড়াও এর মধ্যে থাকবে দার্শনিক সত্যতা, তাত্ত্বিক সত্যতা, অনুভূতিভিত্তিক সত্যতা ও হার্দিক সত্যতা।

সিউড়ী হরিয়েটগঞ্জ ওয়ার্ড বর্তমান শ্রীরামকৃষ্ণ পল্লীর একটি অতি নগণ্য কুখ্যাত গলির মধ্যে স্বপনপুরীর রহস্য ঘেরা একটি পাকা দোতলা বাড়ী—গত চৌদ্দ বৎসর ধরে যার জানলা দরজার অর্গল সর্ব সময়ের জন্য বদ্ধ। শুদ্ধ মাত্র সন্ধ্যার অন্ধকার যখন একটু ঘন হয়ে আসতো, তখন দেখা যেত অ্যালুমিনিয়মের জল-পাত্র হাতে একটি মর্মর-শুভ্র কৃশতনু জ্যোতিঘন তপোমূর্তি, সেই বাড়ী হতে নীরবে বেরিয়ে এসে রাস্তার কল হ'তে জল ভ'রে ত্রস্তে ও নীরবে ফিরে গিয়ে বাড়ীর অর্গল বদ্ধ ক'রে দিতেন। পল্লীর লোকে বলতো, বাড়ীর মালিক কলকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার রায় সাহেব মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মেজ ছেলে

এম. এ. পাশ। ঐ বাড়ীতে গত পনের বছর ধরে নিঃসঙ্গ অবস্থায় কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত আছেন—উদ্দেশ্য ভগবৎ-লাভ।

যুগে যুগে বিশিষ্ট মহাপুরুষ, আধিকারিক পুরুষ বা অবতার কল্প পুরুষের জন্ম-পূর্ব ইতিহাস যেমন থাকে কিছুটা রহস্যাবৃত, ঠাকুর সত্যানন্দের জন্ম পূর্বের ইতিহাসও ছিল তেমনি অলৌকিক ও রহস্যগহীন।

মাতা কাশীশ্বরীর পর পর দুটি গর্ভস্থ সন্তান নষ্ট হওয়ার পর বীরভূমের সিদ্ধ সাধক বিলায়েত আলি তাঁকে নির্দেশ দেন—"মা, আমি দেখছি তোমার গর্ভে এক মহাপুরুষ আসবেন, তবে তোমাকে মা তার জন্য মহাশ্মশানে অমাবস্যা রজনীর তৃতীয় যামে যেমনটি বলে দেব, তেমনি ভাবের প্রক্রিয়া করতে হবে একাকিনী নিঃসঙ্গ অবস্থায়—পারবে তো মা?" ষোড়শ বর্ষীয়া জননী কাশীশ্বরী নির্ভীক নিষ্কম্প স্বরে উত্তর দিলেন—"পারবো বাবা, আপনি আশীর্বাদ করুন!" তাই হলো, পরবর্তী অমাবস্যায়, ঘোর অন্ধকারে, রজনীর তৃতীয় যামে কাশীশ্বরী দেবী সিদ্ধ সাধকের নির্দেশ মত শ্মশানেই স্নান করে, যথাযথ প্রক্রিয়াগুলি সাধন করে, বহুদূরে অপেক্ষমাণ সাধুর নিকট প্রত্যাবর্তন করলেন ও তাঁর আশীর্বাদ লাভ করলেন। ক্রমে প্রথম পুত্র সত্যসাধনের জন্মের এক বৎসর পর হতেই জননী কাশীশ্বরী স্বয়ং, পিতা মহেন্দ্রনাথ ও পিতামহী কুমুদকামিনী বহু প্রকারের অলৌকিক দর্শনে ধন্যা হলেন। গভীর রাত্রে মাতা কাশীশ্বরী শুয়ে আছেন, হঠাৎ এক ঝলক আলোর রাশি এসে কাশীশ্বরীর দেহের উপর পড়লো। কাশীশ্বরী বেশ ভয় পেয়ে গেছেন ও চীৎকার করে ডেকেছেন কুমুদকামিনী দেবীকে। কুমুদকামিনী কোনও দুষ্ট লোকের কাজ ভেবে, কোথা থেকে সেই আলো আসছে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখেন—পূজা প্রকোষ্ঠে স্থিত গৃহ-দেবতা দধিবামন শিলার গাত্র হতে সেই আলো নির্গত হচ্ছে। কুমুদকামিনী কোনও দৈবী আবির্ভাবের কথা চিন্তা করে পুলকিত হলেন ও সে কথা কারও নিকট প্রকাশ করলেন না।

কুমুদকামিনী আরও একদিন দর্শন করেন উঁচু করে চূড়া বাঁধা চুল, চারটি দেব শিশু বধূ কাশীশ্বরীকে বেষ্টন করে নৃত্য করছেন। মহেন্দ্রনাথ দর্শন করেন গোপাল-ক্রোড়ে জননী দুর্গাদেবীকে আর স্বয়ং কাশীশ্বরী দেবী প্রায়ই দেখতেন স্বপ্নে নূপুর পায়ে একটি পরম রমণীয় শিশু ঘরের ভিতর ঘুরে বেড়াচ্ছে। কখন দেখতেন রাশিকৃত গোলাপ ফুল পড়ে আছে শয্যার উপরে, যার সুগন্ধে সমস্ত ঘর আমোদিত হচ্ছে।

এই ভাবে এল বাংলা ১৩০৮ সালের পুণ্য মাঘী কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথি— যে দিন রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর জননী কাশীশ্বরী দেবীর কোলে এলেন ফোটা পদ্মের রূপ নিয়ে রূপময় দেবতা আমাদের ঠাকুর। শিশু জন্মের পর কিন্তু কাঁদলো না, একেবারে ধ্যানস্থ। অনেক পরে শিশু যখন কেঁদে উঠলো, তখন বাড়ীতে উঠলো আনন্দের রোল। কিন্তু নিবিড় ধ্যানে সমাধিস্থ যোগী পুরুষটির তখন ধরার ধূলার স্পর্শে কি অবস্থা হয়েছিল কে জানে!

দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমান শশিকলার মত শিশু বৃদ্ধি পেতে লাগলেন এবং হাস্যে লাস্যে কলকোলাহলে ও দুরন্তপনায় ভরে রাখলেন গৃহ। তারপরও কাশীশ্বরী দেবীর আরও দুটি সন্তান ও দুটি কন্যার জন্ম হয়েছিল। কিন্তু সর্ব প্রকারে অদ্বিতীয় হয়েছিলেন দ্বিতীয় সন্তান, পিতামাতা যাঁর নাম দিয়েছিলেন সত্যব্রত। পিতা মহেন্দ্রনাথের সত্যাশ্রয়ীতার পরিচয় ও প্রমাণ স্বরূপ সন্তানগুলির যথাক্রমে নাম সত্যসাধন, সত্যব্রত, সত্যকিঙ্কর, সত্যনিরঞ্জন, সত্যবতী ও সত্যশীলা।

বালক সত্যব্রত খেলাধূলা দুরন্তপনার মধ্যেও মাঝে মাঝে হয়ে পড়তেন কেমন যেন আনমনা। কখনও কখনও একটা অজানা আচ্ছন্ন ভাব তাঁকে যেন পেয়ে বসতো, তিনি তখন সেটি অজীর্ণ ও অম্লজনিত কোনও দৈহিক ব্যাধি মনে করতেন। পরবর্তীকালে যখন সমাধি অবস্থা তাঁর নিকট অতি সহজ ও যে কোনও আধ্যাত্মিক উদ্দীপনার ক্ষেত্রে ঘটতে লাগলো, তখন তিনি আমাদের বলেছিলেন যে, তাঁর বাল্যের ঐ আচ্ছন্ন ভাবটাও সমাধিরই অবস্থা ব্যতীত অন্য কিছু ছিল না। ধীরে

ধীরে তিনি স্কুলের পাঠ শেষ করে কলকাতা হিন্দু স্কুল হতে ১৯২০ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন ও বিদ্যাসাগর কলেজ হ'তে মাধ্যমিক ও স্কটিশ চার্চ কলেজ হতে বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। ছাত্রাবস্থায় কলেজে পড়ার সময় থেকেই দেখা যেত তিনি যেন একটু নিঃসঙ্গ অবস্থার প্রতি প্রীতি-সম্পন্ন এবং তাঁর ঐ নিঃসঙ্গ ভাব দেখে সহপাঠীদের কেউ ভাবতো তাঁকে অহঙ্কারী, কেউ ভাবতো দাম্ভিক, কেউ বা ভাবতো সাধারণ যুবক শ্রেণীর মাঝে একটি মহা ব্যতিক্রম বিশেষ।

দার্শনিক ভাবাপন্ন হয়েও দর্শন পাঠে জীবনে আর্থিক উন্নতির সম্ভাবনা অত্যল্প বলে, তাঁকে পিতা ও আত্মীয়স্বজনের সুপরামর্শ মত কমার্স বিষয়ে, যে বিষয়টা মাত্র দু এক বৎসর আগে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম, এ, ক্লাসের পাঠ্য তালিকা ভুক্ত হয়েছে, ভর্তি হ'তে হলো। ঐ সময়ে আধ্যাত্মিক ক্ষুধার প্রাবল্য খুব বেশী হওয়ায়, তাঁর বেশভূষায় মালিন্য প্রকট হ'য়ে উঠলো। রূপ লাবণ্য গোপন মানসে দীর্ঘ অবিন্যস্ত রুক্ষ কেশ শ্মশ্রু গুম্ফ ও শিখা সমন্বিত হ'য়ে ক্লাসে যাতায়াত সুরু করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বামী অভেদানন্দ দু'তিন বৎসর মাত্র হ'লো, দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর আমেরিকায় বেদান্ত ধর্ম প্রচার ক'রে শ্রীশ্রীঠাকুরেরই নির্দেশে ভারতে ফিরে এসেছেন এবং আধ্যাত্মিক পথের পথিক বহু-তত্ত্বান্বেষীকে দীক্ষা দান করছেন। অগ্রজ সত্যসাধনও ইংরেজীর ১৯২৪ সালে তাঁর কাছে দীক্ষাগ্রহণ ক'রে তাঁর কৃপা লাভে ধন্য হ'য়েছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর হ'তেই যুবক সত্যব্রতের মনে ধর্মতৃষ্ণা ও ধর্মাচরণস্পৃহা প্রবল হ'য়ে থাকলেও দীক্ষা লাভের পর তিনি ঠিক ক'রে নিয়েছেন তাঁর পথ। কঠোরতা আর কৃচ্ছ্রতা সুরু হ'লো তীব্রভাবে। একাকী নিঃসঙ্গ ভাবে কাটাতে আরম্ভ করেছেন একটা নির্জন ঘরে। সেখানে প্রবেশ নিষেধ ছিল বাড়ীর সকলের, একমাত্র মাতা কাশীশ্বরী ছাড়া। এ্যাসিসট্যাণ্ট পুলিশ কমিশনারের বাড়ী—বাড়ীতে গাড়ী থাকা সত্ত্বেও ইউনিভার্সিটি কলেজে যান সাইকেলে চড়ে। পরনে বেশ একটা মোটা খদ্দরের ধুতি, একটা আধময়লা খদ্দরের কোট—তার

হু'তিনটা বোতাম খোলা, পায়ে ভায়েদের পরিত্যক্ত ছেঁড়া স্যাণ্ডাল, এলোমেলো রুক্ষ অবিন্যস্ত চুল দাড়ি গোঁফ টিকিতে শোভমান একটি পূর্ণাঙ্গ ব্রহ্মচারী। সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে রাখতেন একটা সেলুলয়েডের খেলনার এরোপ্লেন। সাইকেলে চলার সময় সেটার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ ক'রে তীব্রভাবে ইষ্টমন্ত্র জপ নিষণ্ণ হ'য়ে রাস্তা চলতেন। ফলে কত সময় ঘটিয়েছেন accident, ধাক্কা খেয়ে প'ড়ে গেছেন গাড়ীর নীচে এবং প্রতিবারই মা ভরতারিণী রক্ষা করেছেন তাঁর আদরের সন্তানকে। ক্লাসে Lecture চলছে; ধ্যান তন্ময় হ'য়ে ঠাকুর দেখছেন সর্বদিকে তাঁর ইষ্ট—সহপাঠীরা হ'য়ে গেছেন সব ইষ্ট, অধ্যাপক হ'য়ে গেছেন ইষ্ট, খাতায় নোট নিতে নিতে সব স্থির নিশ্চল। সমস্ত দিন কলেজে থাকতেন, শুচিতা রক্ষার জন্য প্রয়োজন হ'লেও শৌচাগার কোনও কারণেই ব্যবহার করতেন না। প্রবল তৃষ্ণা পেলেও এমন কি গ্রীষ্মকালেও বাইরে জল গ্রহণটুকু পর্যন্ত করতেন না। কলেজ হ'তে আবার ফিরতেন সাইকেলে এবং বাড়ী ফিরে শৌচাদি ও স্নান সেরে রাত্রের আহার স্বরূপ কিছু চীনাবাদাম ও দুধ গ্রহণ করার পর খুব সামান্য একটু বিশ্রাম ক'রে বসতেন ধ্যানে—সে ধ্যান যে কতক্ষণ চলতো তার স্থিরতা ছিল না। গভীর রাত্রে ধ্যান ভাঙ্গলে ভোরের দিকে একটু বিশ্রাম ক'রে নিতেন। এই ভাবে কেটে গেল পাঠ্যাবস্থা। ১৯২৬ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভ ক'রে বেরিয়ে এলেন।

এর পরই সুরু হ'ল কন্যাগ্রস্ত পিতাদের আনাগোনা, উদ্দেশ্য ঐ সুন্দর রূপময় বিদ্বান যুবকটিকে জামাতারূপে গ্রহণ করা। একটি ক্ষেত্রে পিতা মহেন্দ্রনাথ কথাও দিয়ে দিলেন কন্যার পিতাকে। কিন্তু যুবক সত্যব্রত তখন তাঁর নির্দিষ্ট জীবনের পথ বিষয়ে অবিচল ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ। কাজেই অভিভাবকদের উপরোধ, অনুরোধ, আদেশ কিছুই কার্যকরী হ'লো না।

আবার ঠিক সেই সময়েই ঘটলো, আর একটি ঘটনা যাতে সমস্ত কিছুই হ'য়ে গেল বানচাল। শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ সত্যব্রতের ত্যাগ তপস্যা কৃচ্ছ্রতা ও অধ্যাত্ম পথে তাঁর প্রভূত

উন্নতির কথা জেনে তাঁকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দিয়ে দার্জিলিং আশ্রমের ভার দিয়ে পাঠাতে চাইলেন। বেদান্ত মঠস্থিত সাধুদের সে বিষয়ে ঘোর আপত্তি, কারণ সত্যব্রতের পিতা ক'লকাতা পুলিশের ডেপুটী কমিশনার এবং পুত্রের সন্ন্যাস গ্রহণে তাঁর পূর্ণ আক্রোশ পড়বে মঠের ওপর। আবার এদিকে তাঁদের নয়নের মণি-স্বরূপ পুত্র সন্ন্যাস নিয়ে তাঁদের ছেড়ে চলে যাবেন শুনে পিতামাতা ঠাকুমা ভাই-বোনেরা সকলে অস্থির হ'য়ে উঠলেন। পিতামাতা ঠাকুমার অতি আদরের ব্রত, ভাই বোনেদের ও বাড়ীর অন্যান্য সকলের মেজদা তাদের সকলকে ছেড়ে যাবেন, এযে অসহনীয়—চিন্তার অতীত। স্বামীপাদ এলেন মহেন্দ্রনাথের নিকট, উদ্দেশ্য সত্যব্রতকে সন্ন্যাস-দীক্ষা দেওয়ার কথা জানাতে। বাড়ীতে তখন নিদারুণ শোকের আবহাওয়া—পিতা মহেন্দ্রনাথ, মাতা কাশীশ্বরী ও ঠাকুমা কুমুদকামিনী আকুল কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন স্বামীপাদের চরণতলে—যেন স্বামীপাদ তাঁদের চোখের মণি হৃদয়ের দুলাল বুকের পাঁজর ব্রতকে তাঁদের চোখের সম্মুখ হ'তে নিয়ে না যান। সে থাক, যেভাবে সে থাকতে চায় সেই ভাবেই সে বাড়ীতে থাক, তার পথে কেউ কোনও দিন বাধার সৃষ্টি ক'রবে না। সাধু ছেলে তাদের সাধু হয়েই থাকবে আজীবন। পূর্ণ বেদান্তবাদী স্বামীপাদের মনও ঘুরে গেল তাঁদের সকলের বুকভাঙ্গা কাতর কান্নায় এবং ভাবগম্ভীর কণ্ঠে তিনি সন্তান সত্যব্রতকে বল্লেন—"বাইরে যেতে তোকে হবে না, এইখানে থেকেই তোর সব হবে।" স্বামীপাদের এই অকুণ্ঠ আশীর্বাদ পেয়ে ধন্য হলেন সত্যব্রত এবং নম্রনত শিরে প্রণাম করলেন শ্রীগুরুর চরণতলে। তখনই ঠিক হয়ে গেলো সত্যব্রত একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকবেন তাঁদের সিউড়িস্থ নবনির্মিত বাড়ীটিতে। কেবলমাত্র রাত্রে রক্ষক হিসাবে নীচের তলায় সদর দরজার কাছে মুচিরাম নামে একটি ধীবর সন্তান, বাড়ীটি শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সেই ভাবেই থাকতো। পিতৃসত্য পালন কল্লে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র চৌদ্দ বৎসরের জন্য বনগমন করেছিলেন। তরুণ তপস্বী সত্যব্রত পিতার আকুল আবেদনে সাড়া দিয়ে দীর্ঘ চতুর্দশ বৎসর ধরে আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে

দিবস ও রাত্রির ব্যবধান ঘুচিয়ে মৃত্যুপণ সাধনায় রত হলেন, উদ্দেশ্য নির্বিকল্পত্ব লাভ করে দেহের বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া।

সাধারণ ভাবে আধ্যাত্মিক রাজ্যে তপস্যার স্থান খুব উচ্চে হলেও যাঁরা আধিকারিক পুরুষ অথবা নিত্যসিদ্ধের থাক, যাঁদের উত্তর কালে আচার্যের পদ বা জগৎগুরুর আসন অলঙ্কৃত করতে হবে, তাঁদের ক্ষেত্রেও লোক শিক্ষার জন্য সাধনা তথা সাধন-পথে, উগ্র তপস্যার প্রয়োজন। ঐ সময় হতেই বিশ্রাম দীর্ঘকালের জন্য নিল সম্পূর্ণ বিশ্রাম। ধ্যানাবস্থায় কখনও কখনও কাটতে লাগলো প্রায় বাইশ ঘণ্টা। মাত্র দুই ঘণ্টা থাকতো দৈহিক প্রয়োজন মেটাবার জন্য। একটানা দ্বাদশ বৎসর যাবৎ নিদ্রার সঙ্গে তাঁর একপ্রকার কোন সম্পর্ক ছিল না। আহারও ছিল নামমাত্র। লবণ, কটু, কষায়, মিষ্ট যে কোন প্রকারের রস হতে জিহ্বাকে বঞ্চিত করলেন চিরকালের জন্য। সব প্রকারে স্বাদ বর্জিত হলেও ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ গ্রহণ করে তাতে আমরা পেয়েছি অমৃতের স্বাদ। আহার ও নিদ্রা যে আদৌ জীবদেহ ধারণের জন্য প্রয়োজন তা যেন ভুলে গিয়েছিলেন সাধক সত্যব্রত। পরবর্তী কালেও বাইশ ঘণ্টা ধ্যান করা আমরাও দেখেছি দিনের পর দিন, নিজেদের অভিজ্ঞতায়। অনুযোগ করলে বলতেন, ধ্যান তাঁর recreation এবং তার দ্বারা তাঁর পরিশ্রান্তি কোন সময়েই আসে না। অভ্যাসকে জীবনে এত সহজ করে নিয়েছিলেন যে, সেগুলি তাঁর স্বভাবে পর্যবসিত হয়ে গিয়েছিল এবং পরিণত বয়সেও সেগুলি সমভাবেই ছিল। বলতেন—"এমনি প্রয়োজন না হলেও এগুলি আজ প্রয়োজন তোমাদের জন্য। আমি যা করে গেলাম, তাতে তোমাদের আর এতটা করতে হবে না। আমার ত্যাগ তপস্যার মধ্যে যদি কোনও ফাঁক ও ফাঁকি না থাকে, তোমাদের তপস্যা আপনা হতেই হবে। তার জন্য তীব্র প্রচেষ্টার কোনও প্রয়োজন হবে না।" যুগে যুগে সেই একই কথা। ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবও বলেছিলেন তাঁর ভক্ত ও সন্তানদের— "আমি ষোলটাং করেছি তোরা একটাং কর।"

লব্ধকাম সাধনসিদ্ধ সত্যব্রত বেরিয়ে এলেন তাঁর নির্জন সাধন

প্রকোষ্ঠ হ'তে। ভক্তকুল সুযোগ পেলো তাঁর পূত সঙ্গ লাভের ও কৃপাশীষে ধন্য হবার।

১৯৩৯ সালেই শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দজী রামকৃষ্ণলোকে মহাপ্রয়াণ করলেন। তারই পূর্বদিন মা ভবতারিণীর নির্দেশ পেলেন সত্যব্রত—তাঁকে কলকাতায় যেতে হবে। সেখানে পৌঁছেই শুনলেন তাঁর মহান্ গুরুর তিরোধানের কথা এবং কাশীপুর মহাশ্মশানে তাঁর মরদেহ শ্রীরামকৃষ্ণ চরণতলে রেখে তিনি ফিরে এলেন সিউড়ী।

১৯৩৯ সাল হ'তেই বাড়ীর দ্বার অর্গল মুক্ত হ'য়েছে। পল্লীর কৌতূহলী ছেলের দল, যারা পূর্ব থেকেই ইচ্ছা পোষণ করতো কোনও না কোনও ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে ধন্য হ'তে এবং যারা সব সময়েই বাড়ীর আনাচে কানাচে ঘুরতো, তাদের দলই প্রথম নির্বাধ প্রবেশাধিকার পেল। তারা কখনও আসতো হালু স্যারের মেজদাকে খেলা দেখাতে, তাদের খেলার কথা শোনাতে বা খেলায় জয়ের জন্য সাধুদার কাছে পুষ্প গ্রহণ করতে।

নিত্য সন্ন্যাসী সত্যব্রতর আনুষ্ঠানিক ভাবে সন্ন্যাসের কোনও প্রয়োজন না থাকলেও, মা ভবতারিণী স্বয়ং তাঁকে গৈরিক বস্ত্রদানে ও সত্যানন্দ এই সন্ন্যাস নামে ধন্য করেছেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যে এ এক অভিনব ঘটনা।

ক্রমে সেখানে ধর্মপিপাসু বহু ভক্তের যাতায়াত সুরু হ'ল। কেন্দ্র—শঙ্খ তুষার ধবল দ্যুতিময় সেই দিব্যপুরুষটি—যাঁর দুর্বার আকর্ষণ ও রূপে রূপময় জ্যোতি সে সময়ে জাগিয়েছিল অনেকের মনেই যুগপৎ সম্ভ্রম ও বিভ্রম। আমার নিজের মনেরও হ'য়েছিল ঐ একই অবস্থা, যখন আমি তাঁকে সিউড়ী আশ্রমে প্রথম দর্শন করি। ১৯৪০ সালের কোনও এক অপরাহ্ণে গেছি আশ্রম। খড়মের শব্দ হ'তেই তাকিয়ে দেখি, ওপরের সিঁড়ি বেয়ে নামছেন গৈরিক-মণ্ডিত দেহ এক পুরুষ—বাম হাতে একটা পাটকরা মৃগচর্ম। হঠাৎ যেন চোখে লাগলো বিদ্যুতের একটা ঝলক—

মুহূর্তের মধ্যে মনে খেলে গেল—কে ইনি? কোনও শরীরী দেবতা অথবা কোনও অতনু জমাট বাঁধা জ্যোতির রাশি? পরক্ষণেই অন্ধকার—দাঁড়িয়ে আছি যেন সম্বিৎহারা। সম্বিৎ ফিরলো যখন দেখলাম উপস্থিত সকলে ভূলুণ্ঠিত প্রণামে ধন্য হচ্ছে। আমিও প্রণাম করলাম, লাভ ক'রলাম কৃপাদৃষ্টি ও স্পর্শ আশীর্বাদ।

আজ তিনি আর সাধুদা বা মেজদা নন, যে নামে ডাকতো তাঁকে পরিচিত অপরিচিত অনেকে—আজ তিনি ঠাকুর, শুধু তোমার আমার নয়, অগ্রজ অনুজ আত্মীয়স্বজন, বৃদ্ধ যুবা বালক স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষের ঠাকুর, তত্ত্ব পিপাসুর নিকট আচার্য, অধ্যাত্ম পথ-সন্ধানীর গুরু, মুমুক্ষুর মুক্তি-পথের দিশারী, প্রেমে ও ভালবাসায় স্বচ্ছ উদার অনন্ত আকাশের মত সর্বাশ্রয়। নগণ্য কুখ্যাত পল্লীর সেই বাড়ীটিই আজ সর্বভাবে সুবিখ্যাত এবং বহুর কাছে মহাতীর্থ স্বরূপ।

১৯৪০এর সুরু হ'তেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বান্বেষীর দল ভিড় করেছেন আশ্রমে। বলা বাহুল্য, পূর্ব কথিত বাড়ীটিই বাড়ীর মালিক রায় সাহেব মহেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় তাঁর ধর্মবিৎ পুত্রের ইচ্ছানুযায়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম নামে আখ্যা দিয়েছেন।

ঠাকুরের কাছে একদিকে যেমন ধর্ম-পিপাসুর দল আস্‌তে সুরু ক'রেছেন, তেমনি আস্‌তো ছোট্ট ছোট্ট বালক বালিকার দল ঠাকুরের সঙ্গলাভের জন্য তথা তাঁর সঙ্গে খেলার জন্য।

ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের কথায় আমরা পাই—পরমহংস বালক স্বভাব—তাঁরা তাই তাঁদের মধ্যে বালক ভাবের আরোপ করার জন্য কতকগুলি ছোট ছোট বালক তাঁদের কাছে রাখেন, কিন্তু ঠাকুর সত্যানন্দের কোনও দিন চেষ্টা করে কোনও বালককে কাছে রাখতে হয়নি, বালক-বালিকার দল সর্ব সময়ে চিরশিশু বালকবন্ধু বালস্বভাব এই ঠাকুরটির কাছে ভিড় ক'রতো। প্রতি অপরাহ্নে আশ্রম প্রাঙ্গণে ব'সতো শিশুর মেলা, শিশুর রাজা সত্যানন্দকে মধ্যমণি ক'রে তাদের কলকোলাহলে আশ্রম মুখরিত। আবার খেলাশেষে ঠাকুর যখন বসতেন ধর্মতত্ত্বের আলোচনায় ভক্ত সঙ্গে,

তখনও বালখিল্যের দল ঠাকুরের সামনে প্রথম সারিতে বসে কিছুই না বুঝলেও স্থির হ'য়ে তাঁর শ্রীমুখের পানে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে থাকতো। পরবর্তীকালে এই সব বালক-বালিকাদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ঠাকুরের তীব্র আকর্ষণে সংসার ত্যাগ ক'রে আশ্রমেই র'য়ে গেল, যাদের মধ্যে অনেকেই আজ আশ্রমের বয়স্ক সন্ন্যাসী-সন্ন্যাসিনী রূপে আশ্রমের স্তম্ভস্বরূপ হ'য়ে রয়েছেন।

একেবারে প্রথম দিকে যাঁরা এসেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শ্রীফটিক ভাণ্ডারী, অমূল্যরতন দাস, পঞ্চানন ভাণ্ডারী, পরেশ, বসন্ত, হারু, প্রমথ, নারায়ণ, গোসাঁই, সন্ন্যাসী, সনৎ, পার্বতী, প্রণব, সুরথ, ভোলানাথ, প্রভাকর, লছমী মাড়োয়ারী, শ্রীশ নন্দী প্রভৃতি। এঁদের প্রায় সকলেই পরবর্তীকালে তাঁর দীক্ষিত সন্তান শ্রেণীভুক্ত হ'য়েছেন এবং কেউ কেউ বা একেবারে সংসার-ধর্ম পরিহার ক'রে ত্যাগব্রত নিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রে আশ্রমের সেবায় ব্রতী হ'য়েছেন। তার মধ্যে প্রভাকর ঘোষের নাম—যাঁর সন্ন্যাস নাম স্বামী বিবিদিষানন্দ—বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। আশ্রমের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁকেই নিযুক্ত করেন শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশচন্দ্র নন্দী হ'ন সেক্রেটারী। প্রথম ব্রহ্মচারী হিসাবে গৃহীত হ'ন আনন্দ ও সেবানন্দ এবং তাঁরাই তখন আশ্রমে বাস ক'রে আশ্রমের তথা শ্রীশ্রীঠাকুরের পরিচর্যা করতেন। সকাল সন্ধ্যা বহু ভক্তের আগমনে আশ্রম মুখরিত থাকতো—যাদের মধ্যে অনেকেই দীক্ষা গ্রহণ ও পরে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস নিয়ে আশ্রমের কলেবর বৃদ্ধি করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রীঠাকুরের প্রথম দীক্ষা প্রাপ্তা কন্যা ভক্তিপুরী, আজ সঙ্ঘে ভাল মা নামে যাঁর পরিচয়। ইনি পূর্বাশ্রমে ছিলেন শ্রীঠাকুরের বড় ভ্রাতৃজায়া।

সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম তখন সবে দুই তিন বৎসরের একটি শিশু প্রতিষ্ঠান মাত্র। কিন্তু তৎসত্ত্বেও ধর্মবেত্তা মহাপুরুষ হিসাবে তার প্রতিষ্ঠাতার খ্যাতি দেশবিদেশে ছড়িয়ে পড়ার ফলে বহু সাধু সন্ন্যাসী, পণ্ডিত, শাস্ত্রবিৎ আসতে আরম্ভ করেছেন আশ্রমে এবং তাঁর মধুর বাক্যালাপে,

শাস্ত্রালোচনায় ও উপদেশাদিতে তৃপ্ত হ'য়েছেন। ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যেই আশ্রমে সাধু ব্রহ্মচারীর সংখ্যা বেশ কিছু বেড়েছে। প্রভাকর ও অর্পণা মা তাঁদের ছুটি সন্তানকে নিয়ে আশ্রমেই বসবাস সুরু করেছেন এবং তারই অল্পকালের মধ্যে অর্চনা মা বাড়ী ছেড়ে আশ্রমে এসেছেন ১৯৪৩ সালের প্রারম্ভেই। তারই কয়েক মাস পূর্বে ঠাকুর তাঁকে ব্রহ্মচর্য দান ক'রেছেন গোপনে। শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্তানদলের মধ্যে প্রভাকরকে যেমন শ্রীশ্রীঠাকুর সর্বপ্রথম সন্ন্যাসী করেছেন, মায়েদের মধ্যেও ১৯৪৪ সালের জুলাই মাসে অর্চনা মাকে ঠাকুর প্রথম সন্ন্যাসের দীক্ষাদানে অর্চনাপুরী নামে অভিহিত ক'রে ধন্যা করেছেন। মায়েরা আরও কেউ কেউ, মনু মা, উষা মা প্রভৃতি, এসেছেন আশ্রমে ১৯৪৩ সালেই এবং অনেকেই ১৯৪৪।৪৫ সালেই সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিতা হ'য়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণপন্থী মায়েদের মধ্যে ব্যাপক সন্ন্যাসদান শ্রীশ্রীঠাকুরই প্রবর্তন ক'রলেন সর্বপ্রথম। একাদশটি কুমারী কন্যা ব্যতীত সংসার ত্যাগ ক'রে আসা বহু সংখ্যক মাকে সন্ন্যাস-ব্রতে দীক্ষিত ক'রেছেন শ্রীশ্রীঠাকুর। যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণদেব একাদশটি অল্প বয়স্ক সন্তানকে নিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ দিকপাল হিসাবে এবং স্বহস্তে তাদের গৈরিক বস্ত্র দান করেছিলেন, যাঁরা ভারতবর্ষ তথা ইউরোপ আমেরিকায় হিন্দুধর্মের বিজয় বৈজয়ন্তী উড্ডীন ক'রে সর্বধর্মমত ও পথের সত্যতা প্রমাণ ও প্রচার ক'রে এসেছিলেন।

ঠাকুর সত্যানন্দদেব বেছে নিয়েছিলেন একাদশটি কুমারীকে ও তাঁদের গৈরিক দান ক'রেছিলেন এবং যাঁদের প্রত্যেকেই সঙ্ঘে এক একটি বিশিষ্ট অধিকার নিয়ে নির্দিষ্ট বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন ক'রেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কৃপায়। দীর্ঘ ত্রিশ বৎসর যাবৎ তাঁদের ত্যাগ তপস্যা স্বাধ্যায় শিক্ষা-দীক্ষা সব কিছুই স্বহস্তে গ্রহণ ক'রে তাদের সর্বপ্রকারে উপযুক্ত ক'রে তুলেছিলেন। এই দিকটি শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রবর্তিত একটি বিশেষ দিক ব'লে তাঁদের সন্ন্যাস নামগুলি উল্লেখ না ক'রে পারলাম না। এঁদের নাম যথাক্রমে সুমনাপুরী, শরণাপুরী, অর্চনাপুরী,

সাধনাপুরী, মহামায়াপুরী, গীতাপুরী, আরাধনাপুরী, উদ্বোধনাপুরী, যোগদাপুরী, অনামাপুরী ও যুথিকাপুরী। এই সব সন্ন্যাসিনী কন্যকাদের অনেককেই আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে তাঁদের অন্তর্নিহিত সুপ্ত সাহিত্য ও কাব্য-প্রতিভাটিকেও পরিপূর্ণরূপে বিকশিত করার জন্য ঠাকুর দিয়েছেন বিশেষ প্রেরণা। তারই ফলে তাঁর মানসকন্যা রূপে গৃহীতা সন্ন্যাসিনী অর্চনাপুরী মাতার হাত দিয়ে রচিত হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য (৩য় খণ্ড), শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা কথা ও কাহিনী (২য় খণ্ড) শ্রীরামকৃষ্ণ গীতা, জননী সারদেশ্বরী, সারদাতত্ত্ব, সমন্বয়ী দর্শন, বহু কবিতা, গান, প্রবন্ধ, প্রায় ৪৮টি দিব্য নাটিকা ইত্যাদি গ্রন্থাবলী। সন্ন্যাসিনী শরণাপুরী মাতা লিখেছেন বীর সন্ন্যাসী, ভক্তমাল, সারদা চম্পু, ঠাকুরের জীবনবেদ অবলম্বনে করুণাবতার ও গান কবিতা প্রভৃতি। সন্ন্যাসিনী সাধনাপুরী মাতা সঙ্কলন করেছেন ৩ খণ্ডে গীতার বাণী এবং কয়েক খণ্ডে শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত মহাবাণী শ্রবণ-মঙ্গলম্। অন্যান্য সন্ন্যাসী এবং সন্ন্যাসিনীদের দ্বারাও বিভিন্ন ভাষায় রচিত হয়েছে বহু দিব্য সাহিত্য ও কাব্য। এ ছাড়া মায়েদের মধ্যে সন্ন্যাসিনী সুমনাপুরী, অর্চনাপুরী, গীতাপুরী প্রভৃতি কাকেও কাকেও তাঁর নরলীলায় অবস্থান কালেই অপরকে দীক্ষা-ব্রহ্মচর্যাদি দানের অধিকারও দিয়েছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের অমেয় ভাগবতী করুণাধারার বর্ষণে তপঃক্লিষ্ট পাহাড়ের বুকে বিকশিত হ'লো ব্রহ্মকমলদল।

শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাবাণী—"দয়া কিরে সেবা সেবা সেবা—শিবজ্ঞানে জীবসেবা"—যার মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ পেয়েছিলেন সেবা বিষয়ে একটি মহান ইঙ্গিত এবং যার ফলে বিশ্বজোড়া রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্ভব।

তখন সিউড়ী শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের বয়স মাত্র দুই তিন বৎসর। সেই সময় এলো বাংলায় ১৩৫০-এর মন্বন্তর—যার ভয়াবহতা ও বীভৎসতা ঐতিহাসিক ছিয়াত্তরের মন্বন্তরকেও যেন নিষ্প্রভ করে দিল। বৃটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় মহানগরী কলকাতার বুকেও নেমেছে দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া—যার চিত্র স্মরণে জাগে ভয়ার্তের শিহরণ—আর বেরিয়ে আসে অন্তর্চ্ছেদী মর্মন্তুদ একটি দীর্ঘশ্বাস মানুষের অসহায়তার নিদর্শন স্বরূপ।

জীবদরদী মানবপ্রেমিক সত্যানন্দের অন্তরও দুর্ভিক্ষপীড়িত বাংলার মানুষের এই নিদারুণ সঙ্কটে কেঁদে উঠেছিল দুঃখে বেদনায়।

ঐ সময়ের মধ্যেই মূল আশ্রম ব্যতীত গড়ে উঠেছে বেশ কয়েকটি শাখা আশ্রম, তাদের প্রত্যেকটির দরজা সদা উন্মুক্ত থাকতো দুর্ভিক্ষ পীড়িতদের জন্য। প্রতিটি শাখা আশ্রমে ও মূল আশ্রমে দৈনিক গড়ে ১৫০।২০০ প্রার্থী প্রসাদ পেতে লাগলো। সবে গ'ড়ে ওঠা আশ্রম হলেও চতুর্দিক হতে সাহায্য আসতে লাগলো প্রচুর—আমেরিকান ফ্রেণ্ডস্ সার্ভিস্ প্রায় দুই লক্ষাধিক টাকার ঔষধ, ভিটামিন, গুঁড়া দুধ, গ্লাক্সো, ভিটামিল্ক, ফ্রক, সার্ট ইত্যাদি আর্তত্রাণের জন্য তুলে দিয়েছিলেন আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে। সরকারের তরফ হতেও প্রচুর চাল, ধুতি ও শাড়ী এসে গেল, ভক্তেরাও এগিয়ে এলেন তাঁদের যথাসাধ্য দানের সম্ভার নিয়ে। ঠাকুর সত্যানন্দের ব্রহ্মচারী ও সাধু সন্তানদল দেবদূতের মত গ্রাম হতে গ্রামান্তরে বাড়ী বাড়ী গিয়ে অন্নহীন, ব্যাধি-পীড়িত জনগণকে অন্ন, ঔষধ, পথ্যাদি ও মৌখিক আশ্বাস-বাণী দিয়ে ফিরতে লাগলেন—শিবজ্ঞানে জীবসেবার এক অপূর্ব নিদর্শন। সিউড়ী প্রভৃতি আশ্রমে আজও চলে আসছে এই দীন-নারায়ণের নিত্য সেবা। কিছুক্ষণ নাম করে প্রসাদ পাওয়ার রীতি। প্রতিটি শাখা আশ্রমেও প্রচলিত আছে এই রীতি আজও।

পিতা মহেন্দ্রনাথের বহু কালের বাসনা ছিল, তাঁর পৈতৃক ভিটায় মহামায়ার পূজা হয়। আজ পিতৃপিতামহের বহু পুণ্যফলে ভিটাটি আশ্রমে পরিণত হয়েছে। তাই পুত্রকে বল্লেন—"বাবা, এইবার মায়ের পূজা এলে আমার দীর্ঘদিনের বাসনাটি পূর্ণ কর।" আশ্রমের প্রায় প্রথম থেকেই সুরু হলো মহাপূজা এবং ১৯৪১ সাল থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত মহাসমারোহে প্রতি বৎসর প্রতিমা গড়িয়ে মার পূজা হয়ে চললো। ১৯৪৯ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর নির্দেশ দিলেন—শ্রীশ্রীমাতা সারদা দেবীরই প্রতিকৃতিতে এবার থেকে শ্রীশ্রীদুর্গা পূজা হবে। এ বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁর সন্তান গৌরীশঙ্কর চৌধুরীকে (মিনু কবিরাজ) আদেশ দেন, দুর্গাপূজার সমস্ত মন্ত্র শ্রীশ্রীসারদা-দুর্গা পূজার মন্ত্র হিসাবে রূপান্তরিত করে নিতে।

গৌরীশঙ্কর কর্তৃক পূজা মন্ত্রগুলি সেই ভাবে রূপান্তরিত হয় এবং গৌরীশঙ্কর ১৯৪১ সাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনো পূজক, কখনো তন্ত্রধারক হয়ে পূজার কার্য সম্পন্ন করছেন। এই পূজার কাজে তাঁর সহযোগিতা করেন ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তানদের মধ্যে দুজন। ১৯৫৩ পর্যন্ত শ্রীশ্রীমার একটি বৃহৎ তৈল চিত্রে পূজা চলার পর ১৯৫৪ সাল থেকে শ্রীশ্রীমার একটি মৃণ্ময়ী মূর্তি, যেটি নির্মিত হয়েছিল শ্রীশ্রীমার শতবার্ষিকী উৎসবে অনুষ্ঠিত সারদা মেলার মণ্ডপে পূজার জন্য, সেই মূর্তিটিতে শারদীয় সারদোৎসব আরম্ভ হলো এবং ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ঐ ভাবেই মহাপূজা সম্পাদিত হতে লাগলো। ১৯৫৮ সালে শ্রীশ্রীঠাকুর দুর্গোৎসবে সিউড়ী যাবার নির্দেশ না পাওয়ায় উপরোক্ত মূর্তিটাই সিউড়ী হতে আনীত হলো বরানগর আশ্রমে এবং পূজার সময় মাকে দশভুজা মূর্তিতে পরিণত করে মহাসমারোহে মহামায়ার মহাপূজা সম্পাদিত হলো—যা আজ পর্যন্ত ঐ ভাবেই চলে আসছে।

শ্রীশ্রীজগন্মাতা সারদাদেবীর জন্মশত বার্ষিকী পালনের বৎসর হ'তেই বৃহদাকারে একটি কৃষ্টিমূলক মেলার অনুষ্ঠান সুরু হ'লো সিউড়ীতে, যেটি প্রায় সতের বৎসর ধরে বীরভূম তথা পার্শ্ববর্তী বহু জেলাবাসীকে সপ্তাহ-ব্যাপী বিপুল আনন্দ দান ক'রে বাধা পেল ১৯৭১ সালে রাজনৈতিক আন্দোলনের কালিমাময় পরিস্থিতিতে।

আশ্রমে প্রতিষ্ঠিত ও পূজিত বিগ্রহগুলির প্রত্যেকটির পিছনে আছে এক একটি দিব্য ইতিহাস। গৃহদেবতা দধিবামন, মা ভদ্রকালী ও শ্রীশ্রীগণেশ কোনও না কোনও সন্ন্যাসী বা সাধুপুরুষের মাধ্যমে গৃহে এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মের কিছুকাল পূর্বে। শ্রীশ্রীগোপাল এসেছেন শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। একটি পরিচিতা মহিলার কুমারী কন্যা ক্ষীরোদার পূজিত ছিলেন এই গোপাল। বিবাহের কথা হওয়ায় ক্ষীরোদা এক রকম স্বেচ্ছায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার মা মূর্তিটি এনে ঠাকুরের ঠাকুমার হাতে দেয়। ছোট একটি পিত্তল মূর্তি। খুব ছোট্ট হ'লেও গোপালের শ্রীশ্রীঠাকুর, মায়েদের ও ভক্তদের সঙ্গে

লীলা কিন্তু বিরাট ও বৈচিত্র্যময়। তাঁর অভিমান আদর আব্দার দুষ্টামি সবই অভিনব। যত কিছু অভিযোগ তাঁর ছিল শ্রীশ্রীঠাকুরেরই কাছে। কত ভাবে কত ছন্দে কবিতায় গানে গোপালের কীর্তি কাহিনী শ্রীশ্রীঠাকুর রচনা ক'রে গোপালকে শুনিয়ে তাঁর মুখে তৃপ্তির হাসিটুকু দেখে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। রাধারাণীর একটি অষ্টধাতুর মূর্তি, বর্দ্ধমানের শ্যামসায়রে বহুকাল নিমজ্জিত ছিলেন। হঠাৎ একদিন একটি রাখাল ছেলে মূর্তিটি তোলে ও শ্রীশ্রীঠাকুরের একটি ভক্ত সন্তানকে এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করে, তিনি আবার সেটাকে ঠাকুরের হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হন। বহুকাল জলের নীচে থাকার ফলে তখন রাধারাণী কষ্টিপাথরের নির্মিত ব'লে বোধ হয়েছিল। সন্ধ্যায় শ্রীশ্রীঠাকুর ধ্যানে ব'সেছেন হঠাৎ দেখেন ঐ মূর্তি কিছু ভোগ চাচ্ছেন। সঙ্গে সঙ্গেই ঠাকুর ব্যবস্থা ক'রলেন ভোগ দেওয়ার এবং মূর্তি পরিষ্কার ক'রতেই অপরূপ অষ্টধাতু মূর্তির প্রকাশ হ'লো। রাধারাণী সেইদিন থেকেই নিত্য পূজিতা হ'চ্ছেন। কাশীপুর বাড়ীর পূজনীয়া ছোট পিসিমার আরাধিত গিরিধারী মূর্তি ছিলেন একক, ঠাকুরের পৈত্রিক ভিটায়। তাঁকে ছলে টেনে আনলেন রাধারাণী এবং এখন রাধারাণী ও গিরিধারীর যুগল মূর্তি আশ্রম বিগ্রহরূপে পূজা পাচ্ছেন আশ্রমের মন্দিরেই।

কিশোর গদাধরের আনুড়ের পথে কালো মেঘের মাঝে সাদা বলাকার দল দেখে সমাধি অবস্থার একটি ছোট্ট রৌপ্য মূর্তি ঠাকুর তাঁর সন্তান জয় কর্মকারকে দিয়ে তৈরী করান ও সেটির সাজ-সজ্জা সেবা পূজার ভার দেন অর্চনা মা'র হাতে, যেমন দিয়েছিলেন গোপালের সেবা পূজা ও সাজ-সজ্জাদির ভার তার হাতে। সেটি সে শ্রীঠাকুরের দেহরক্ষা কাল পর্যন্ত নিষ্ঠা সহকারে করেছে। শ্রীঠাকুরের তিরোধানের পর গোপালের সেবা পূজার ভার অর্পিত হয় সন্ন্যাসিনী গীতাপুরী মার হাতে এবং অদ্যাবধি সেই দায়িত্বটি সে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে আসছে।

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের জীবন দর্শনে বিশিষ্ট স্থান অধিকার ক'রেছিল যে তত্ত্বাদর্শসমূহ তার মধ্যে একটি হ'লো পিতামাতা অগ্রজ

অনুজ অতি নিকট আত্মীয়দের নিজ আধ্যাত্মিক ছত্রছায়ায় টেনে আনা। বৌদ্ধযুগে গৌতম বুদ্ধের মহাবোধি লাভের পর যখন তিনি এসেছিলেন কপিলাবস্তু নগরীতে তখন নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতার মধ্যে সাড়া প'ড়ে গিয়েছিল তাঁর কৃপা লাভের জন্য। এমন কি পিতা শুদ্ধোধন, পালিকা মাতা গোতমী, পত্নী গোপা, পুত্র রাহুল প্রভৃতি বহু আত্মীয়স্বজন সকলেই তাঁর কৃপা লাভে ধন্য হলেন এবং তাঁদের মধ্যে অনেকেই অর্হত্ব অর্জন ক'রে সঙ্ঘভুক্ত হলেন। ঠিক সেই ভাবেই প্রায় আড়াই হাজার বৎসর পরে ঠাকুর সত্যানন্দ পিতা মহেন্দ্রনাথ, মাতা কাশীশ্বরী, অগ্রজ সত্যসাধন, অগ্রজ পত্নী পারুলবালা, অনুজ সত্যকিঙ্কর, অনুজ পত্নীদ্বয় বিভাদেবী ও আশালতা ও ভ্রাতুষ্পুত্র সিদ্ধার্থকে সন্ন্যাস মন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে জগতে এক অবিস্মরণীয় আদর্শের স্থাপনা করলেন। শুদ্ধমাত্র স্বীয় পরিবারের সকলকে সন্ন্যাস দান নয়, এক একটি ভোগমখী পরিপূর্ণ সংসারকে ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত ক'রে সঙ্ঘে স্থান দিয়ে বিদ্যাদান, অন্নদান প্রভৃতি অশেষ জনকল্যাণকর কাজে নিযুক্ত করেছেন।

সমাজের উচ্চস্তরে অবস্থিত যাঁরা তাঁরা ছাড়াও আধ্যাত্মিক সর্বাধিকার বঞ্চিত নৈতিকতার মানহীন সর্বভাবে অবহেলিত অস্পৃশ্য ও অন্ত্যজ কথিত মানুষ এমন কি আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত লোকও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নাই। বাতিকার আশ্রমে সমবেত হয়েছে শত শত অন্ত্যজ শ্রেণীর মানব; শ্রীশ্রীঠাকুর তাদের বল্লেন, তোমরা কোনও ক্রমেই হীন নও—হিন্দু সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ তোমরা, জাতিকে সমাজকে খাড়া করে রেখেছ তোমরা। পরদিনই শ্রীশ্রীঠাকুর শত শত অস্পৃশ্য অন্ত্যজকে ঋত্বিক মাধ্যমে দীক্ষাদান করে আধ্যাত্মিকতার পথে এগিয়ে দিলেন যাঁদের মধ্যে কেউ কেউ ভবিষ্যতে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের দীক্ষা গ্রহণ করে বেদশীষ হয়েছেন, অনেকে পেয়েছেন বৈদিক হোমাধিকার। সমাজের উন্নত অনুন্নত স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকল স্তরের মানুষের মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার জাগৃতি ও অগ্রগতির পথে দীক্ষাদান ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাস দান আলোচনা সৎসঙ্গ ও উপদেশাদি প্রদান ব্যতীত আরও কয়েকটি পন্থা

ঠাকুর গ্রহণ করলেন—তাদের মধ্যে অভিনয়, সঙ্গীত, ধর্মগ্রন্থ প্রণয়ন, আশ্রম মুখপত্রের প্রকাশ ইত্যাদি উল্লেখনীয়।

আশ্রম গ'ড়ে ওঠার পাঁচ ছয় বৎসরের মধ্যে প্রায় ১৫।১৬টা শাখা আশ্রমের পত্তন হয়ে গেছে বাংলা ও বিহারের বিভিন্ন স্থানে এবং প্রায় প্রত্যেকটির মাধ্যমে দরিদ্র নারায়ণদের অন্নদান, বিদ্যাদান ও ঔষধ দানের ব্যবস্থা করা হয়েছে এই তিনটিকে শ্রীশ্রীঠাকুর জনসাধারণের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় এবং আশ্রমের অবশ্য গ্রহণীয় কর্মপন্থা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। তাই প্রতিটি শাখা আশ্রমের আওতায় ঠাকুর প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন একটি করে বিদ্যালয় দাতব্য ঔষধালয় ও ব্যবস্থা করেছেন নিত্য অন্নদানের।

আমাদের দেশে ধর্মীয় প্রচারেব পন্থা সেই কোন পুরাকাল থেকেই ছিল অভিনয়ের মাধ্যমে। যাত্রা পাঁচালি কীর্তন গান পালা গান ও বর্তমান যুগের মঞ্চাভিনয় সবেরই সৃষ্টি এ হিসাবে। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের সপার্ষদ শ্রীবাস অঙ্গনে কৃষ্ণলীলার অভিনয় কৃষ্ণলীলারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। বিক্রমাদিত্যের যুগে কালিদাসের নাটকাবলীর অভিনয় ও রবীন্দ্রনাথের সময়ে রবীন্দ্র রচিত বহু নাটকের অভিনয়—এগুলি সমাজ জীবনে একটি অত্যুৎকৃষ্ট প্রচার পন্থা হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশ্রম যখন সিউড়ীতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং বহু বালক বালিকার অবাধ নিত্য আগমনে যখন আশ্রম প্রাঙ্গণ মুখরিত, তখন ঠাকুর স্বরচিত সুন্দর সুন্দর শ্রীরামকৃষ্ণ ভজন গান খেলার সঙ্গে তাদের গাওয়াতে লাগলেন। খেলার সুরু হতে শেষ পর্যন্ত হয় গান নয় ঠাকুরের নাম নেবার রীতি প্রচলিত হলো। তারপর ঠাকুর আদেশ দিলেন তাঁর একটি ত্যাগপন্থী প্রৌঢ় সন্তানকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জীবন আলেখ্য অবলম্বনে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনার। এটি রচনার পর অতিশয় সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হলো শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী ও ভক্ত সন্তানদের দ্বারা যাঁদের অনেকেই ছিলেন সুঅভিনেতা। তারপর সুরু হলো অভিনয়ের দ্বিতীয় পর্যায়। আশ্রমের ভক্ত বাড়ীর ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তথা আশ্রমস্থ

ছোট ছোট কন্যাগণ সুরু ক'রলো তাদের চেয়ে কিছু বড় আর একটি বালিকা সন্ন্যাসিনী অর্চনাপুরী রচিত নাটিকাগুলির অভিনয়, যেগুলি রচিত হয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের নির্দেশক্রমে ও শ্রীশ্রীঠাকুরেরই অমোঘ কৃপা শক্তি বলে। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে রচনা করে দিয়েছেন কয়েকটি সুন্দর নাটিকা এবং শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী ও গৃহী বিশেষ সন্তানগণ ও বহু সন্ত জীবন অবলম্বনে প্রায় পঁয়তাল্লিশখানি নাটিকা প্রণয়ণ করিয়েছেন উপরোক্ত লেখিকাকে দিয়ে যেগুলির প্রায় প্রত্যেকটিই সাধারণ রঙ্গমঞ্চে ঠিক প্রথম শ্রেণীর অভিনয়ের মত হয়েছে অভিনীত। এ সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা করেছে সুঅভিনয় আর তা দর্শন করে মুগ্ধ হয়েছেন বিস্মিত হয়েছেন সহস্র সহস্র দর্শকবৃন্দ ও প্রণাম জানিয়েছেন বারবার সেই যাদুকরের চরণে যাঁর যাদু দণ্ডের স্পর্শে সম্ভব হ'য়েছে এই সব নাটিকার রচনা ও মনোমুগ্ধকর অভিনয়।

মানুষের সামাজিক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক চেতনার জাগরণ কল্পে প্রয়োজন হয় কিছু বলিষ্ঠ রচনার—পুস্তকাদি ও প্রচার পত্রিকাদির। সেই কারণে আশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আশ্রমের মুখপত্র হিসাবে প্রকাশিত হ'লো "ভাবমুখে" নামক মাসিক পত্রিকা। শ্রীশ্রীঠাকুর নিজে, সাধুদের ও মায়েদের মধ্যে কেউ কেউ এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের গৃহীভক্তদের মধ্যে অনেকে এগিয়ে এলেন, যাঁদের রচনা প্রকাশিত হ'তে লাগলো নিয়মিত ভাবে পত্রিকার পৃষ্ঠায়। ভাবমুখে পত্রিকা প্রকাশের প্রথম দিকে শ্রীশ্রীঠাকুরকেই বিভিন্ন ছদ্মনামে লিখতে হ'য়েছে বহু প্রবন্ধাদি প্রতি মাসে। পত্রিকাটির সুনাম অব্যাহত গতিতে চলেছে আজও এবং তার রজত জয়ন্তী উৎসবও পালিত হয়েছে মহাসমারোহে ইংরাজী ১৯৭২ সালে। শ্রীশ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময়ী বাণী বেদছন্দা নামে পুস্তকাকারে পাঁচটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলি আমাদের মায়েরা তাঁদের রোজ-নামচায় ধ'রে রেখেছিলেন সযত্নে, যার প্রতিটি বাণী সাধন রহস্যের অপূর্ব নির্দেশিকা ব্যতীত কিছুই নয়। এছাড়া তাঁর অমর লেখনী মাধ্যমে বেরিয়েছে ৩ খণ্ডে প্রকাশিত World Philosophy, World Ethics

এর একটি খণ্ড ও World Psychologyর একটি খণ্ড। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ ও কবিতা এবং শিশুদের উপযোগী বহু কবিতা, প্রবন্ধ ও নাটিকা তিনি রচনা করেছেন। এছাড়া 'যুগে যুগে যার আসা' নামক ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের এক অপূর্ব জীবনী ও 'যুগাচার্য' নামক স্বামী অভেদানন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনী বাংলা সাহিত্যে তাঁর এক অভিনব সৃষ্টি—যেন গদ্যে লিখিত অপরূপ কাব্যলহরী। বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ এবং বৈজ্ঞানিক সত্যের সঙ্গে যাচাই না করে যুগের বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন মানুষ কোনও তথ্যকে স্বীকার করবে না। শ্রীশ্রীঠাকুর বিজ্ঞানের ছাত্র না হলেও উচ্চ বিজ্ঞানের বহু তত্ত্বের সঙ্গে আধ্যাত্মিক তত্ত্বের যে একটা মূলতঃ মিল আছে সেটি দেখিয়েছেন তাঁর বাণী সমূহে! শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় সন্তান শ্রীসত্যেন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি বিজ্ঞানের ছাত্র তাঁর কাছে এলেই তাঁদের ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতেন ও মীমাংসা করতেন এক একটি আধ্যাত্মিক সত্য বা তত্ত্বের সঙ্গে কিভাবে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক সত্যের একাত্মতা আছে।

ধর্মীয় প্রচারের অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে সঙ্গীত একটি খুব বড় রকমের যন্ত্র ও ভগবৎ লাভের পথে সুরদাস, মীরা, কবীর, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধক-কবিকুল তাঁদের অভীষ্ট লাভ করেছেন সঙ্গীতের মাধ্যমেই।

আমাদের ঠাকুরের সঙ্গীত ছিল প্রাণ। সাধনাবস্থায় যখন ২২ ঘণ্টা কাটিয়েছেন ধ্যান, জপ ও হোমে তখন হোমাবশিষ্ট কাঠকয়লা সাহায্যে মেঝের উপর কত গান লিখেছেন, গেয়েছেন ও মুছে দিয়েছেন, কখনও ছেলেদের সঙ্গে মেলার মাঝে লাইনের পর লাইন গান মুখে মুখে গেয়েছেন ও গাইয়েছেন ছেলেদের দিয়ে। কখনও ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে ঘন অন্ধকারের মাঝে স্বচ্ছন্দ গতিতে রচনা করে চলেছেন গান, যার এক একটি চরণ এক একজন মনে করে পরদিন লিখে নিয়েছেন। কখনও গোপালকে নিয়ে আদর করে স্বতঃ নিঃসারিত মুখে-মুখে রচিত গান বা কবিতা শোনাচ্ছেন, যা লিখে নিচ্ছেন তাঁর আদরের সন্ন্যাসিনী কন্যারা। সঙ্গীত

রচনার জন্য আমরা ঠাকুরকে কখনও কলম হাতে চিন্তা করতে দেখি নাই। সঙ্গীত যেন নিয়েছিল ঠাকুরের রূপ আর ঠাকুর যেন নিয়েছিলেন সঙ্গীতের রূপ। সঙ্গীত সুষমা শ্রীতে ভরা ছিল তাঁর দেহ। শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রায় বলতে শুনেছি—আমার আর কিছু থাকবে কিনা জানি না, তবে আমার সঙ্গীত থাকবে। শাশ্বত কবির মুখের এই বাণী। তাঁর সঙ্গীতের অমরত্ব সম্বন্ধে আমাদের নিঃসন্দেহ করে তোলে। পরবর্তী কালে যখন গোপাল, গদাধর শ্রীশ্রীমা, শ্রীশ্রীঠাকুর ও ভবতারিণী তাঁর এক সত্ত্বায় সত্ত্বান্বিত হয়েছেন, তখন তাঁর দৈনন্দিন কর্ম-ধারার মধ্যে একটি ছিন নিত্য একখানি বা দু'খানি গান রচনা করে তাতে সুর সংযোজনা করিয়ে তাঁদের নিবেদন করা। এইভাবে আমরা লেখায় ধরা প্রায় সাত হাজার গান পাই যেগুলির প্রত্যেকটাই দিব্যাতিদিব্য। কলকাতা বেতার কেন্দ্র হতে তাঁর বহু গান প্রচারিত হয়েছে এবং তাঁর নাম বেতার বিভাগে তালিকা ভুক্ত সঙ্গীত রচয়িতা হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেব জীবনের একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে, তিনি নিরন্তর আধ্যাত্মিক বিষয়ে যুক্ত থাকতেন। ভগবৎ বিষয় ভিন্ন একটি মুহূর্তও বৃথা ব্যয় করতেন না। এমন কি স্নান আহার বিশ্রামাদি সর্ব সময়েই তাঁকে কথামৃত বা অন্য সদ্‌গ্রন্থ পাঠ করে শোনানো হ'ত।

আধ্যাত্মিক অনুভূতির জগতে শ্রীশ্রীঠাকুর ছিলেন মহামায়ার আদরের সন্তান। তাঁর হাতে নিজেকে তুলে দিয়েছিলেন এবং জননীও তাঁকে ক্রোড়ে রেখেছিলেন। কিন্তু ভগবৎ বাৎসল্যরস চিরদিনই ভক্তকে টানে। আশ্রমের গোপাল—'দুষ্টু আর মিষ্টু'—ঠাকুরের সঙ্গে, আশ্রমবাসিনী মায়েদের সঙ্গে চলেছে তাঁর বিচিত্র লীলা। শ্রীশ্রীঠাকুর এই লীলায় মাতোয়ারা—আনন্দের সঙ্গে নিলেন যশোদা রাণীর ভূমিকা। এই লীলায় এক নিবিড় ভাবময়তায় নিজের হাতে বাৎসল্য রসে খাওয়ানোর কমনীয় কৃপা প্রকাশ পেলো। মাও চান মেয়ে হতে, চান গোপাল সেবা। যেখানে কৃপা বর্ষিত হলো, ভাগবতী আনন্দে বিভোর তিনি অপার্থিব অমৃত সন্দেশের সঙ্গে মুখে তুলে দিলেন পার্থিব আহার্য। শ্রীশ্রীগুরুর ব্রত

সাধনে এই ভাগবতী সেবা অন্যদিকে অদ্ভুত ভাবে কৃপাধন্য পাত্রে রূপান্তর ঘটায়। অমৃত অভ্যুদয় আনে। অচিন পথে শক্তি ও জ্ঞান, অমৃত ও করুণা সংবাহিত ও সঞ্চারিত হয়।

ধীরে ধীরে মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর এগিয়ে চলেছে কালচক্রের আবর্তনে, দেশ হ'তে দেশান্তরে ভারতের বাহিরেও বহুস্থানে ছড়িয়ে পড়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের নাম। হলিউডের চিত্রাভিনেত্রী, নাম অ্যানা হ্যারিসন, ভারতের সাধক ও ধর্মগুরুদের দর্শন ধন্যা হতে ও তাঁদের কাছে কিছু ধর্মোপদেশ পাবার উদ্দেশ্যে ভারতের পথে যাত্রার প্রাক্কালে শুনেছিলেন তাঁর এক বন্ধুর কাছে, যিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের Divine flashes পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলেন—কলকাতা যখন যাবে তখন স্বামী সত্যানন্দকে না দেখে ফিরো না, তাঁকে দেখলে তুমি মুগ্ধ হবে।

বহু ধর্মবেত্তা এসেছেন তাঁর কাছে ধর্মগুরু হিসাবে উপদেশ নিতে, শত শত দার্শনিক এসেছেন দর্শন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধান এবং মর্মোদ্ঘাটন মানসে, বহু কবি ও সাহিত্যিক এসেছেন মরমিয়া কবি ও সাহিত্যিক সত্যানন্দের দর্শন ও আলাপনে ধন্য হতে, বিজ্ঞানী এসেছেন বিজ্ঞান ও ধর্মতত্ত্বের মধ্যে একীকরণের কথা শুনতে। আবার ভারতের শ্রেষ্ঠ সুরকার, সঙ্গীতজ্ঞ ও যন্ত্রশিল্পিগণ এসেছেন তাঁর চরণে সঙ্গীতের ভেট দিতে, যাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ, বড়ে গোলাম আলি, পণ্ডিত ওঙ্কার নাথ, রতন জনকার, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব, আলি আকবর খান, রবিশঙ্কর, ভি জি যোগ প্রভৃতি।

১৯৬৬ সালে ঠাকুর স্বীয় গুরু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপার্ষদ শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দের শতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী উৎসব—যোগ্য মর্যাদায় ও মহা সমারোহের সঙ্গে উদযাপন করলেন তাঁর বিভিন্ন আশ্রমে বিভিন্ন সময়ে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের বহুদিনের সাধ বা স্বপ্ন ছিল একটি কাঁচের মন্দির নির্মাণের এবং সেটি তিনি বহু সময় ভক্তদের কাছেও বলতেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সন্তান শ্রীদেবানন্দ আগরওয়াল Hindusthan Safety Glass Factoryর মালিক ঐ বিষয়ে এগিয়ে এলেন একটি

কাঁচের মন্দির নির্মাণ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে। প্রায় দুই তিন বৎসরের প্রচেষ্টায় মন্দিরটি নির্মাণ হলো এবং ১৯৬৭ সালের মার্চ মাসে মণিমন্দিরের প্রতিষ্ঠা হলো মহাসমারোহে। ঐ বৎসরেই কালিপূজার দিন ত্রিনয়নী মার মূর্তি স্থাপিত হলো মন্দিরে শ্রীশ্রীঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার পিছনে একই সিংহাসনে। পরবর্তী বছর দুর্গাপূজার প্রারম্ভে একদিনের মধ্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রিয় সন্তান, যাঁকে ঠাকুর ডাকতেন ঘোষ মহারাজ নামে, তাঁর ঐকান্তিক চেষ্টা ও নিষ্ঠায় অঙ্গনের গঙ্গার দিকের সমস্ত রেলিং ও গেট ও একটি সুবৃহৎ সামিয়ানা তৈরী করিয়ে দিলেন। মূর্তিগুলির নির্মাণ কার্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের শিল্পী সন্তান ব্রহ্মচারী শঙ্কর চৈতন্যের অবদান প্রায় সবটুকুই। শ্রীশ্রীঠাকুর মার সংহার মূর্তি নয়, মার সৃজনময়ী ও বৈষ্ণবী রূপ পছন্দ করতেন। কাজেই ত্রিনয়নী মার মূর্তি হলো পদ্মোপরিস্থিতা, শিবহীনা, চতুর্ভুজা, বরাভয় করা, বিদ্যুৎহস্তা, কমণ্ডলু ধারিণী, আকাশ বর্ণা, অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিতা কিশোরী কালিকা। শ্রীশ্রীঠাকুর মাঝে মাঝে মার মাথায় শিখিপাখা ও একহাতে একটি রূপার বাঁশী দিয়ে সাজিয়ে দেওয়াতেন। আজও সেই ব্যবস্থাই চলছে। সপ্তাহে দুইবার করে মন্দির বিগ্রহগুলির বেশ পরিবর্তনের ব্যবস্থা হলো। শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত সন্তান শ্রীননীগোপাল চক্রবর্তী মহাশয় ত্রিনয়নী মার মূর্তি নির্মাণ ও পূজাদির সমস্ত ভার গ্রহণ করে শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করেছেন। মণিমন্দির ও তৎসম্মুখস্থ নাটমন্দির প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবার পরই শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, এই কাজই আমার শেষ কাজ। সেদিনও কেউ বোঝেন নাই বা বিশ্বাস করতে পারেন নাই সেই কথাটিকে তাঁর স্বধাম গমনের ইঙ্গিত বলে। ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসের এগারোই তারিখে ঠাকুর একটি গান লিখলেন—"মহাসাগরের ডাক শুনেছি যে নদীও এবার চলে চলে।" এ গান কেন লিখলেন বলায়, ঠাকুর বল্লেন—ও ঠিকই লেখা হয়েছে। সামান্য সামান্য শারীরিক অস্বাচ্ছন্দ মাঝে মাঝে এলেও রাত্রি ৪টা হতে পরদিন রাত্রি প্রায় দেড়টা পর্যন্ত যে সব দৈনন্দিন কার্যসূচী তাঁর ছিল, তার প্রত্যেকটি যথারীতি পালন করে যেতেন। ঐ সময় এক

এঁকদিন তাঁর অন্যমনস্কতা একটু বাড়তো এবং তিনি দূর আকাশে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যেন আত্ম-সমাহিত অবস্থায় থাকতেন। দেহ ছেড়ে দেবার দুই তিন দিন আগে, ঠাকুরের ঐরূপ ভাব দেখে, লেখক জিজ্ঞাসা করে-ছিলেন সেই কথা। তাতে ঠাকুর উত্তর দিয়েছিলেন, আমি মনটাকে গুটিয়ে নিয়েছি, দেশের অবস্থাও বিশেষ ভাল লাগছে না। দেশের তৎকালীন শোচনীয় অবস্থার কথা চিন্তা করেই লীলাসম্বরণের মাত্র দুদিন পূর্বে ঠাকুর একটি গান লিখলেন,—"তোর জগতের কেমন দশা ফিরে দেখ মা মহামায়া।" এটিই তাঁর শেষ রচনা, শেষ গান। অবশেষে ৫ই আগষ্ট, ১৯৬৯ (২০শে শ্রাবণ, ১৩৭৬) মঙ্গলবার বিকেল ৫টা ২০ মিনিটে স্বেচ্ছায় কুম্ভক সহায়ে মহাসমাধিতে চিরমগ্ন হন। ঠাকুরের তিরোধানের কিছুদিন পরে এক পরিচিত ভক্ত এসে প্রশ্ন করলেন, আমাদের ঠাকুর নাকি তাঁর নরলীলা সম্বরণের দিন ও ক্ষণটা তাঁর ডায়রীতে লিখে রেখে গেছেন, বহু পূর্বেই। ভক্তটি হঠাৎ এসে তেমনি আবার হঠাৎ চলে গেলেন। পরে ঠাকুরের ব্যক্তিগত ডায়রীগুলি অনুসন্ধান করে একটি ডায়রী খুলে সবিস্ময়ে দেখা গেল তাতে স্পষ্টাক্ষরে শ্রীহস্তে লেখা রয়েছে—"থ্রম্বসিস হলে ৫ই আগষ্ট বিকেল ৫টার সময় যেতে পারি।" খুব সম্ভব ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে এটি লিখেছেন।

লীলাসংবরণের পূর্ব দিন ডাক্তাররা ঘোষণা করলেন মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ আরম্ভ হয়েছে কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও ঠাকুরের জ্ঞানের ব্যত্যয় তো হয়নি, উপরন্তু সমস্ত রাত্রি ধরে উচ্চৈঃস্বরে নাম করে গেছেন। স্বধাম গমনের মাত্র কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও ভক্তদের ডেকে সিঁদুরের টিপ দিয়েছেন ও আশীর্বাদ করেছেন। স্বেচ্ছায় নরলীলা অবসানের কিছুক্ষণ মাত্র পূর্বে জগতের মঙ্গল কামনাতুর ঠাকুর আমার, ত্রিতাপদগ্ধ জগতবাসীকে দিয়ে গেলেন পরম আশীর্বাণী—তোমরা কুশলে থেকো, মঙ্গলে থেকো, শান্তিতে থেকো—আমি আশীর্বাদ করি বিশ্বে শান্তি ফিরে আসুক, বিশ্বের কল্যাণ হোক। ওঁ নমো ভগবতে সত্যানন্দায়।

যুগে যুগে যার আসা

নিবেদন

যে লোহা পরশমণির ক্ষণসান্নিধ্য লাভ করেছে তাকে যদি পরশমণির পরিচয় দিতে হয়—তাহলে কথায় নয়—নয়নের জলে। শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দজী আজন্ম সাধক ও সিদ্ধপুরুষ।

তিনি 'যুগে যুগে যার আসা' এই পুস্তকে তাঁর পরমারাধ্য শ্রীশ্রী৺ঠাকুর রামকৃষ্ণদেবের ভাবজীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব্ব আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। পরমহংসদেবকে এমনভাবে বুঝিতে ও বুঝাইতে পারার তিনি প্রকৃত অধিকারী কারণ তাঁহার জীবনযাত্রা একেবারে তাঁর পরমারাধ্য দেবতার জীবন-ধারায় হারা হইয়াছে।

পরমহংস-দেবের সাধনপথের সেই জ্বালাময়ী উৎকণ্ঠা, সেই অবোধগম্য বচন ও আচরণ, বিরহের সেই অসহ্য-যন্ত্রণা, মিলনের সেই শাশ্বত পরমানন্দের যে চিত্র লেখক ফুটাইয়াছেন তাহাতে তাঁহার অপরোক্ষ নিবিড় অনুভূতির ছাপ বর্ত্তমান।

পুস্তকখানি ক্ষুদ্র আকারে বটে কিন্তু ইহা কালজয়ী। ভক্তিরস-পিপাসু পাঠকগণের ইহা চিরদিনের আনন্দের বস্তু হইবে।

আশ্রমবাসিনী স্নেহময়ী মায়েরা ও আশ্রমবাসী ভক্তগণ এই গ্রন্থরাজকে পূজা করিবার অগ্রাধিকার আমাকে দিয়াছেন। আমি ভক্তিহীন, মন্ত্রহীন অভাজন—বক্ষের উষ্ণতায় ও চক্ষের জলে ইহার অভিষেক করিয়া—নতজানু হইয়া সজল নয়নে কৃতাঞ্জলী পুটে বলি—

'যৎপূজিতং মায়াদেব পরিপূর্ণং তদস্তমে'।

কুমুদরঞ্জন মল্লিক

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্ম স্বরূপিণে।
অবতারবরিষ্ঠায় রামকৃষ্ণায় তে নমঃ।

—স্বামী বিবেকানন্দ

ওঁ নিরঞ্জনং নিত্যমনন্তরূপং ভক্তানুকম্পাধৃতবিগ্রহং বৈ
ঈশাবতারং পরমেশমীড্যং তং রামকৃষ্ণং শিরসা নমামঃ।

—স্বামী অভেদানন্দ

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তারা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলা পথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে।
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি,
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

—রবীন্দ্রনাথ

এক

তুষারতীর্থ হিমালয়ের উপলে জাগা সাতরঙ্গা রামধনুর হাসি দেখেছ কি—আর দেখেছ সপ্তপর্ণের মাণিক ছড়িয়ে পড়া ভোরের আলোয় গগন গঙ্গা · ?

তেমনি এসেছিলেন আঁধার কারায় নীলমাণিকের ব্রজবধূ, আর বেথলহেমের 'পান্থশালায় হেম তনু ঈশামসী—আবার দেখি নদীয়ায় শচীর দুলাল শত চাঁদ মাথা অঙ্গে ··এবার কিন্তু বিশ্বের আর্তি নিয়ে এসেছিলেন চন্দ্রার ভাঙ্গা ঘরে এক মুঠো জুঁইএর মত গদাধর······সেদিন ধরণীতে জাগেনি কোন আগমনী—শুধু নেমে এসেছিল একটি আনন্দের ললিত—আর পুলকের একটি মদলেখ···

•স্বর্গ যেন দাঁড়িয়েছিল ধরার আঙ্গিনায়—আর ধরা···সে শুধু চেয়েছিল লাজুক নত চোখে।

আলোর দেশ সপ্তর্ষিমণ্ডল—জ্যোতিঘন বেড়া দেওয়া খণ্ডের ঘর পার হয়ে অখণ্ডের ঘর, রাশি রাশি জ্যোতিঘন তৈরী তার পথ···তমসঃ পরস্তাৎ···সমস্ত আঁধারের পারে সে দেশ—সেখানে ধরার ধূলির, ধরার দৈন্যের প্রবেশের পথ নাই—আছে শুধু শান্ত-শুদ্ধ-ধ্যানসুন্দরের প্রকাশ ··সেই যেখানে সাতটি ঋষি তাদের সমাধির গহন গাহনে নিবাত নিথর রূপে বসে আছেন জ্যোতির নগাধিরাজের মত ··সেই স্থানে ঘটলো এক পরম অভ্যুদয়। এসে দাঁড়ালো এক কুমার কিশোর—অরূপ যদি রূপায়িত হয়—সমস্ত স্বর্গের সুষমা যদি মোহমন্থন রূপ নেয়—মদির জ্যোছনা যদি নিথর নিবিড় হয়ে ধরা দেয় বাহুর বন্ধনে, তবুও তার শ্রীঅঙ্গের এক কণাও হয় কিনা সন্দেহ—যার ক্ষণিকের ইচ্ছা বিলাসে সব সুন্দরের প্রকাশ হয়, তার অকল্পনীয় রূপের কথা কি বলা যায়? সেই চির পিপাসিত ধ্যানের ধন—যুগ যুগ বেদনায় গড়া জ্যোতি-ঘন-তনু অমিময় কিশোর এসে দাঁড়ালো সপ্তর্ষি লোকে। সেদিন গগনে ভুবনে জেগেছিল যে হর্ষ, যে পুলক—তার প্রকাশের ভাষা যে নিথর।

সে তার তুষার উদ্ভিন্ন বাহু দিয়ে ধরল জড়িয়ে সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রবীণতম ঋষিকে, যার চিন্তায় ঋষির ধ্যান গম্ভীরতা—যার চিন্তায় ঋষির গহিন লোকে বাস, তার আগমনে ঋষির নেই সাড়া···কিশোর আর পারে না—ধীরে গভীরভাবে

জড়িয়ে ধরে তার ব্যাকুল বাহু দিয়ে ঋষির কণ্ঠ—শত বেণু-বীণায় বলে, ওগো ঋষি! জাগো, জাগো—আমি যে যাচ্ছি—তুমি যাবে না? এমনি করেই কি জাগাও দয়াময় সব নীরবতা—সব নিথরতা—সব জড়তা! যার ডাকে সৃষ্টি একদিন লীলায়িত হয়েছিল, তার ডাকে কি সাড়া না দিয়ে পারা যায়···

জাগেন ঋষি—সপ্তর্ষি মণ্ডলের প্রবীণতম ঋষির নিবিড়তম ধ্যান যায় ভেঙ্গে, স্তিমিত নেত্রে জেগে ওঠে প্রেমের স্পন্দন—সেদিন সেই পরমক্ষণে কেউ কি দেখেছিল দুটি অম্লান প্রভাতী তারার মত ধরার ধূলায় নেমে এসেছিল পার্থ আর তার সারথী, নর আর নারায়ণ, স্বামিজী আর শ্রীঠাকুর···

দুই

আঠারো শতকের বাংলা—কবির বাংলা—ঋষি তপস্বীর বাংলা—ধ্যানের বাংলা—সোনার বাংলা। তার শ্যামায়িত অঞ্চলে সুখে স্বচ্ছন্দে গৌরবে বাস করতো এই বাঙ্গালী।

মাঠে মাঠে ছিল শ্যাম শস্যের প্রাচুর্য, বড় বড় দীর্ঘিকার কাকচক্ষু জলে ছিল মাছের প্রাচুর্য সেই দেশে বাস করতো বলিষ্ঠ চিন্তাশীল এক জাতি যারা ছিল ভারতের তথা জগতের লুব্ধ নেত্রের লক্ষ্য। এই দেবভূমিতে বারে বারে এসেছেন কত সাধুসন্ত—সতী-সীমন্তিনী। এই দেবভূমির রাঙ্গা ধূলায় আপনাকে দিয়েছেন লুটিয়ে স্বয়ং ভগবান গৌরচন্দ্র। ধূলা হয়ে গেছে সোনা—জগৎ হয়ে গেছে ধন্য। আর আমরা মরণের মুখে পড়েও শত দুঃখে দৈন্যে জর্জ্জরিত হয়ে আজও আমরা অমর; বাংলার বুকে আজও জ্বলে প্রেমের, শান্তির, ত্যাগ বৈরাগ্যের, শৌর্যবীর্যের অনির্বাণ শিখা—সোনার বাংলা আজও মরেনি।

এই আঠারো শতকের বাংলায় জ্বলে উঠেছিল এক জীবন-সমিধের শিখা। হুগলী জেলার উত্তর পশ্চিমে, বাঁকুড়া-মেদিনীপুরের মিলন অঙ্গনে দেরে গ্রামেই বাস করতেন ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়—শিখাময় তাঁর জীবন।

ব্যথার আঁধার ভেঙ্গেই জেগে ওঠে মঙ্গলময়ী উষা, গ্রীষ্মের তৃষাতুর বুকেই করুণার ধারাসার আসে নেমে, ব্যথায় রাঙা হৃদয়েই জেগে ওঠেন ব্যথাহারী নারায়ণ···

যুগে যুগে এশিয়া তথা ভারতের বুক নিঙ্ড়ে ডাক উঠেছে ক্রন্দসী ধরার,

ডাক উঠেছে অধর্মের গ্লানির বিরুদ্ধে, অশিবের বিরুদ্ধে। অন্য দেশে ভোগ ব্যাকুলতা নিয়ে মানুষ তাঁর দুয়ারে বারে বারে আঘাত করেছে—তার ফলে সেই সব দেশে তাঁর প্রকাশ হয়েছে শুধু ভোগক্ষেম বহন করে। আর ভারতের ইতিহাস, দেবভূমির ইতিহাস, তাঁরই ইচ্ছায়, ভারত অন্য পথ নিয়েছে—সে পথ যোগক্ষেমের পথ – সত্য শিব-সুন্দরের পথ, তাই ভারত ও এশিয়ায় প্রকাশ ধর্ম-বীরদের—অবতারদের।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতকের জগতে নেমে এসেছিল অধর্মের এক রাশ আঁধার—জড়বাদের, অজ্ঞেয়বাদের দুরপনেয় মোহ। ফরাসী ও জার্মান জাতির মধ্যে ক্যাণ্ট, লামেট্রি, ফয়ারবাক্, মার্কস প্রভৃতিদের প্রকাশ চিন্তাশীল মাত্রেই দেখেছেন। ইংলণ্ডে দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে হবস্, হিউম্ প্রভৃতির মতবাদে এর প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। ভারতে কিন্তু পূর্ব হতেই ধর্মে নানা মত ও পথের সাধুসন্তেরা এত বিচিত্রতা এনেছিলেন যে, এদের ভিতরে একত্বের ভিত্তিভূমির সন্ধান পাওয়া দুরূহ হয়ে পড়েছিল। বেদমত ও সংস্কৃত ভাষা পরিহার করে, জাতির গণ্ডী বিনা বিচারে ভেঙ্গেচুরে সমভূমি করে, ধর্মের অঙ্গগুলির পরিহারে নিরাকারবাদ প্রচার করে ধর্মের যে কুশলতা সাধিত হয়েছিল, তাই আবার পরবর্তীকালে ধর্মের নামে যথেচ্ছাচারিতা এনে দেয়। আবার সেই যুগ-সন্ধিক্ষণে মুসলমান সভ্যতার ভোগবাদ আর রাষ্ট্রের সহায়তায় হিন্দুধর্মের সঙ্গে বিরোধ যে অনিষ্ট সাধন করেছিল, পাশ্চাত্য সভ্যতা তার শক্তি ও প্রলোভন নিয়ে, সন্দেহবাদ, জড়বাদ ও সর্বোপরি ভোগবাদ নিয়ে, তাতেই ইন্ধন যোগাল। ভারতের তথা বাংলার, এমন কি সারা জগতের এ এক সঙ্কটময় যুগ। জাতির ভিত্তিভূমি যেন শিথিল হতে বসেছিল···দিশাহারা তরণীর মত আমরা যেন অকূলে ভেসে চলেছিলাম – লক্ষ্যহীন, আশাহীন। ভারত-পথিক তখন নবীন আশায়, নবারুণের প্রতীক্ষায় উর্ধ্বমুখে আকুল হয়ে ছিল বসে।

এমনি যুগসঙ্কটে নেমে এলেন করুণার প্লাবনে মহাসমন্বয়-মূর্তি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেব। বিজ্ঞানের আলোয় মানুষের মন তখন একদিকে জড়বাদে সমাচ্ছন্ন, অন্যদিকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসে পথহারা। এই পথহারাদের পথের দিশারী হতে হ'লে এদের মতই হতে হয়, তাই ঠাকুর বিজ্ঞানের দৃষ্টি নিয়ে ভগবৎ প্রাপ্তির পথ দেখাতে সুরু করলেন। শুধু ব্যাকুলতাই হ'ল সম্বল – শুধু চোখের জলে ভরা হ'ল মঙ্গলঘট—নিজের জীবন বলি দিয়ে কেনা হ'ল মার আশিস।

এমনি করে সব প্রধান প্রধান ধর্মমতের সাধনে সিদ্ধ হয়ে যখন অদ্বৈত-সিদ্ধিতে মন অখণ্ডের ঘর থেকে আর নামতে চায় না, সেই সময় মা'ই আবার নামিয়ে আনলেন বিশ্বের কল্যাণে অখণ্ড হতে খণ্ডের রাজ্যে—বললেন, ভাবমুখে থাক।

কান পেতে যে কল্যাণবাণী শুনতে চেয়েছিল বিশ্ব, সেই বাণী মা নিজেই শুনিয়ে গেলেন, "ওরে তুই ভাবমুখে থাক"। এমনি করেই কি ভাববাদের (আইডিয়ালিজম্) প্রতিষ্ঠা হল উনবিংশ শতকের জগতে! এমনি করে তিনবার মার আদেশে মায়ের দুলাল নামলেন সমাধির সপ্তলোক হতে। মরুর বুকে সেদিন নেমেছিল কণ্ঠভরা তৃষাহরা অমৃত বরিষণ…যার কৃপাধারে শুধু বাংলা নয়, শুধু ভারত নয়, সমস্ত বিশ্ব অমৃতায়িত হচ্ছে…বিশ্বের উর্ধ্বে যে সব লোক আছে, সেখানেও চলেছে হর্ষপ্লাবন…আজ লোকে লোকে বসেছে নব-বোধনের মঙ্গলঘট আর আগমনীর মিলন মাঙ্গলিকে, দিক-দিক দেশ-দেশ হচ্ছে অনুরণিত।

সত্যসন্ধ ঋষি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের পিতা মাণিকরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ধর্মনিষ্ঠ মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শিবালয় ও চাটুজ্যেপুকুর আজও তাঁদের ধর্মনিষ্ঠা ও জনরঞ্জন চেষ্টার সাক্ষ্য দেয়। এঁর তিন পুত্র ও এক কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠ সন্তান ক্ষুদিরাম সম্ভবতঃ এগারশত একাশি সালে জন্মগ্রহণ করেন।

অশ্রু-ছাওয়া কল্পনায় আমরা আবার ফিরে যাই বাংলার সেই গৌরবের যুগে—আবার দেখি সোনার বাংলার সোনার ছেলেমেয়েদের…দেখি তেজস্বী আর্য-মহিমায় দীপ্ত ক্ষুদিরাম—দেহ-গৈরিকে অগ্নি-শিখার সুষমা—আর দেখি দুই পাশের লোক শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে করছে চরণ চুম্বন—দীর্ঘ দীপ্ত নেত্র, ভাবে ভক্তিতে আর ব্রহ্মতেজে আরক্তিম। আর অনাসক্তিতে, ত্যাগে, তপস্যায় দুই চরণ যেন ধরণীর ধূলিতে পড়েও পড়ে না…মনে হয় যেন এ স্বপ্নের বাংলা…এই অমর বাংলা—আমাদের চির বিদায়ের ধন।

আবার দেখি অবগাহনরত ব্রাহ্মণ উর্ধ্বমুখে গায়ত্রীর আবাহন করছেন—আয়াহি বরদে দেবি—চোখে দ্যুলোকের দ্যুতি—মুখ ভগবৎ বিভায় আরক্তিম। আর দীঘিকার তীরে সসম্ভ্রমে দণ্ডায়মান যুক্তকর স্নানার্থীরা। মনে হয় বর্তমানে সভ্যতার আলেয়ার হাতছানিতে আমরা যেন অন্ধ মরীচিকার পিছনে ছুটে চলেছি।

কালের যবনিকা সরিয়ে আবার আমাদের চোখে পড়ে এক অপূর্ব দৃশ্য... ভূদেব ব্রাহ্মণ ক্ষুদিরাম নিবাত নিস্পন্দ দেহে দাঁড়িয়ে জমিদার কক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দিতে দৃঢ়তার সঙ্গে করছেন অস্বীকার—অনুনয়, ভীতি কিছুই তাঁকে সত্যাশ্রয় থেকে বিচ্যুত করতে পারে না। সাতপুরুষের জননীর তুল্য ভিটা, পৈত্রিক-সম্পত্তি—কিছুরই মায়া তাঁকে টলাতে পারে না। এমনি সত্যনিষ্ঠা, প্রাণের বিনিময়ে সত্যকে আঁকড়ে থাকা, আর একবার আমরা দেখেছি অযোধ্যাধিপতি দশরথের। মিথ্যার বুকে কখনও সত্যস্বরূপ ভগবানের আবির্ভাব সম্ভবে না।

জীবনের শেষ প্রান্তে এমনিভাবে হৃতসর্বস্ব ব্রাহ্মণ দেরেপুরের অনতিদূরে কামারপুকুরে বন্ধু সুখলাল গোস্বামীর দেওয়া পর্ণকুটীরে এসে আশ্রয় নেন। সঙ্গের সম্বল ইহপরকালের সাথী গৃহদেবতা রঘুবীর—আর সম্বল বন্ধুবরের দেওয়া এক বিঘে দশ ছটাক ধান্য জমি - নাম লক্ষ্মীজলা মা লক্ষ্মীর ক্ষুদ্র স্বর্ণঝাঁপির মতই! এই জমি দেব-ব্রাহ্মণের গৃহে অফুরান সম্পদই হয়েছিল···শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের সেবায় এমনি একখণ্ড জমি আছে তারও নাম লক্ষ্মীজলা···গদাধর আর জগন্নাথ, ব্রহ্মসাগরের দুটি ফুট্ কিনা!

তিন

জর্জ বার্ণাড শ বিশ্বের বাণী মন্দিরের একজন দিক্‌পাল। তাঁর একটি কথা বেশ মনে লাগে বলেছেন তিনি, বেশ জোরেই বলেছেন, যখন বৈজ্ঞানিকেরা বিশ্বাস করেন যে, একটি ছুঁচের ডগায় লক্ষ লক্ষ বিদ্যুতিন্ নৃত্য করছে, অথচ তারা ধরা দেয় না স্থূললীলায়, তখন এটি ধ্রুবসত্য হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু যখন ভগবদ্বিশ্বাসীরা বলেন, দেবদূতেরা লীলা করেন সূক্ষ্মরূপে - আর দৃঢ়তার সঙ্গেই বলেন, উপলব্ধি করেই বলেন, তখন তা হয়ে দাঁড়ায় কুসংস্কার—হাসির খোরাক মাত্র। কিন্তু বাণী-পাদপীঠে আজ যাদের অর্ঘ্য শ্রেষ্ঠ বলে গণ্য, তাদের কথাই বলি—ধর্মই বিজ্ঞানের পথ-প্রদর্শক। এটি বলেছেন বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক আলবার্ট আইনস্টাইন।

অসময়ে এসেছেন অতিথি নারায়ণ—গৃহের সম্বল সামান্য। একদিকে উপবাসী নারায়ণ অন্যদিকে বাস্তবের নগ্নসত্য—গৃহলক্ষ্মীর ঘটল বিষম পরীক্ষা···মা

অন্নপূর্ণার নাম করে সামান্য যা-কিছু যোগাড় হল তাই দিলেন চাপিয়ে—সহসা দেখেন একি অঘটন, রন্ধনস্থালীর উপান্তে দুইখানি পদ্মহস্ত! ফলে সেই সামান্য আহার্য হয়ে উঠল মধুসূদনের দধিভাণ্ডের মতই অফুরান। অতিথি সৎকার করতে যে ব্যথা বেজেছিল জননীর বুকে সেই ব্যথাই বেজেছে বিশ্বজননী অন্নপূর্ণার বুকে · সেই দিন থেকে জননীর অন্নথালি অন্নপূর্ণার ভাণ্ডের মতই হত যেন অফুরন্ত ·· আর সেইদিন থেকে জননীরও কাজ হল কাশীর অন্নপূর্ণার মত নিরন্নদের ডেকে ডেকে অন্ন দেওয়া। জননী চন্দ্রার সেই অন্নপূর্ণার রূপ আজ সার্থক হয়েছে, আজ শ্রীরামকৃষ্ণ-জননীর সাধ পূর্ণ হয়েছে, বিশ্বের তৃষাতুর আর্তের জন্যে আজ রামকৃষ্ণ·সঙ্ঘের দেউল চিরমুক্ত ··

আর এক দিনের দিব্যদর্শন না বললে জননী চন্দ্রার দেবীত্বের পরিচয় দেওয়া পূর্ণ হবে না। আশ্বিনের আনন্দ-নন্দিত কোজাগরী রাত্রি · জননী চন্দ্রা পুত্রের আগমন উৎকণ্ঠায় ঘরবার করছেন, এমন সময় দেখেন পথে এক দেবীমূর্তি—নানা আভরণে বরদেহ সজ্জিত—কর্ণে কুণ্ডল, হস্তে বলয় - সরলা জননী অতি সরল-ভাবেই তাঁকে প্রশ্ন করলেন, মা, আমার ছেলের পুজো করে ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন জানো?—দেবীমূর্তি তাঁর পুত্রকে চিনবেন কেমন করে—এ প্রশ্ন তাঁর মনেই হল না। যাই হোক, দেবী বললেন—মা. আমি সেই বাড়ী থেকেই আসছি - তোমার ছেলের জন্য ভেবো না, সে আসছে। তখন জননী চন্দ্রা, স্বভাবসুলভ স্নেহার্দ্র অন্তরে তাঁকে স্বগৃহে বিশ্রামের জন্য ডাকলেন · কিন্তু দেবী· বারান্তরে আসবেন এই অভয় দিয়ে স্মিতহাস্যে হলেন অন্তর্হিতা। সারদারূপে আসার এই কি সূচনা।··· ··

বারশত একচল্লিশের একদিন—তপস্বী ব্রাহ্মণ, কন্যা কাত্যায়নীর শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত - কন্যা অসুস্থ, মনে হল যে, এ অসুস্থতা অন্য কোন কারণে—যেন কোন প্রেতাবেশ হয়েছে। দৃঢ়কণ্ঠে আদেশ করলেন—তুমি যেই হও, আমার কন্যাদেহ পরিত্যাগ করে স্থানান্তরে যাও।

সত্যই কন্যাদেহ অবলম্বনে সেই প্রেত অনুনয়ের কণ্ঠে উত্তর করলে,—প্রভু! আমায় মুক্ত করুন—গয়াধামে আপনার মঙ্গল হস্তের পিণ্ড পেলে আমি মুক্ত হয়ে যাব। করুণা বিগলিত ক্ষুদিরাম সঙ্গে সঙ্গে দিলেন সম্মতি।

এমনি করে ক্ষুদিরামের দ্বিতীয়বার তীর্থযাত্রার সূচনা হয়। প্রথমবারে তিনি রামেশ্বর সেতুবন্ধ প্রভৃতি তীর্থ সেরে আসেন।

ভারততীর্থ - ভারতের কাশী, কাঞ্চি, বৃন্দাবন, মথুরা, নদীয়া, কামারপুকুর — ভারতের ভালে গৌরব টীকা। শুধু ভারতে নয়—সর্বদেশের সর্বকালের এরা জয়স্তম্ভ। অনাগতদের জন্য এরা বহন করে এনেছে কত হারিয়ে যাওয়া গৌরব-স্মৃতি —কত ইতিহাস —কত পুরাণ কাহিনী —কত সাধু-সন্তের পবিত্র জীবন-নাট্য — কত সতী-সীমন্তিনীর পূত মর্মকথা অভিনীত হয়ে গেছে এর বুকে। ভারতের দর্শন, পুরাণ, রাজনীতি, অর্থনীতি, কাব্য কাহিনীর ইতিহাস — এই ভারত-তীর্থের ইতিহাস। এই ভারততীর্থ পথের ধূলি আজও মহীয়ান হয়ে আছে ভারত-পথিকের পদরেখায়। জগতের তৃষিত আত্মার আত্মীয় হয়ে আজও ভারত-তীর্থের ধূলি হয়ে আছে রাঙ্গা। বিস্মিত প্রতীচ্য তার গৌরবোন্নত শির অবনত করে আজও ভারতের পথরেখা চুম্বন করে। এই ভারততীর্থ পথের সোনার ধূলিকে বার বার জানাই প্রণাম।

বারাশত একচল্লিশের কোন একদিন ইষ্টের চরণে প্রণাম জানিয়ে, গৃহিণী চন্দ্রার কাছে বিদায় নিয়ে পুত্র-কন্যাদের কুশল কামনা করে গয়া-তীর্থের পথে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থঙ্কর ক্ষুদিরাম। পিছে পড়ে থাকে সুখনীড়—পুত্র কন্যাদের কলকথা—পিছে পড়ে থাকে জননী জন্মভূমি - তার সোহাগ স্বপন-মুখর দিনগুলি নিয়ে—অকম্প হৃদয়ে, বন্ধনমুক্ত গৈরিক প্রবাহের মত ছুটে চলেন ষষ্টিতিপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ — অভীষ্টের দর্শন পিপাসায়। তীর্থযাত্রা তখন মহাপ্রস্থানের মতই ভয়াবহ ছিল — ভক্ত হৃদয়ের পরীক্ষার পথবিশেষ ছিল এই তীর্থপথ।

চৈত্রের এক নব মুকুলিত দিনে তৈথিক ব্রাহ্মণ এসে পৌঁছলেন তাঁর যাত্রা শেষে -গয়া-তীর্থে। পিতৃপুরুষদের উদ্দেশ্যে কর্তব্যগুলি শেষ করে আনন্দ অবসাদে তিনি নিদ্রার বুকে পড়েন এলিয়ে। রজনীর গহিনে ধরণী তাঁর মোহজাল ছড়িয়ে কি যাদু রচনা করলেন, দেবতা তার একমাত্র সাক্ষী···

সর্বান্তর্যামীর লীলা দিয়ে, বিলাস দিয়ে রচনা এই স্বপ্নরাজ্য — এই স্বপ্নেই মানুষের স্ব স্বরূপের প্রকাশ — এই স্বপ্নের মোহজালে খসে যায় বৃথা আবরণ — সমাজের নাগপাশ -জগতের চাহিদা —মানুষ তখন দেবতার কাছে দাঁড়ায় তার নগ্ন-তৃষা নিয়ে আর সংস্কার নিয়ে। তাই দেবস্বপ্ন আমাদের সঙ্গে হৃদিস্থিত হৃষিকেশের নর্মলীলা মাত্র···আর···

চার

ঋষি তপস্বী ব্রাহ্মণের চক্ষে আঁধারের যবনিকা যায় সরে; দেখেন—পিতৃলোক হতে, পিতা পিতামহ এঁরা এসেছেন তাঁকে আশীর্বাদ করতে—অশ্রুর অভিষেকে তাঁদের চরণে প্রণতি জানান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ—চকিতে পট-ভূমিকার হয় পরিবর্তন। দিব্য জ্যোতিতে কুটীর যায় ভরে·· রোমাঞ্চ বিস্ময়ে দেব-ব্রাহ্মণ দেখেন, থমকিত বিদ্যুদ্দামের মত করুণ কান্তরূপে শ্রীগদাধর এসেছেন স্বয়ং। যুগ যুগ মথিত ভক্তের আকুতি দিয়ে গড়া সে বরতনু- দেখে ভক্ত যেন নিজেকে বিশ্বাস করতেই পারে না সহসা একি! সর্বহৃদয় মথিত করে যেন দূরাগত অলকার ঝংকারে বেজে ওঠে কমকণ্ঠ, ক্ষুদিরাম! আমি যে তোমার গৃহে যাব—বেপথু প্রাণের রোমাঞ্চ নিয়ে ভক্ত বলেন, আমি যে নিঃস্ব, তোমার সেবাধিকারের যোগত্যা যে আমার নাই প্রভু···। বিশ্বের দুয়ারে যিনি নিত্য ভিখারী—বিদুরের খুদ যাঁর কাছে চিরসুধাময়, তাঁর শ্রীমুখে জাগে হৃদয়-হরণ স্মিত হাসির একটি কণা। যুগে যুগে এই অভয় ইঙ্গিতেই তো তুমি মুছিয়ে দিয়েছ ভগবান-ভক্তের সব ব্যথা, সব দুঃখ—সব সঙ্কোচ—সব আর্তি! এমনি হাসি হেসেই বিলিয়ে গেছ আপনাকে দীন আর্ত ধরার ধূলায়—সেকি একবার। নিঃস্ব চোখে জাগে শুধু মৌন আকৃতি—শুধু দুটি ফোঁটা অশ্রু।

হৃদয় দেউল থাকে অর্গলিত—তাই দেবতার হয় না আসা। সহজ সরল মনের আকুতি দিয়েই খোলা যায় এই যুগ রুদ্ধ দ্বার, ঠাকুর বলতেন, সহজ সরল না হলে তাঁকে পাওয়া যায় না। জননী চন্দ্রা ছিলেন সরলতার প্রতিমূর্তি। ক্ষুদিরাম তখন গয়াতীর্থে—সঙ্গিনী ধনীমার সঙ্গে জননী চন্দ্রাও সেদিন যুগীদের শিবমন্দির প্রাঙ্গনে উপস্থিত—দেবতার পূজার উপচার হাতে। সহসা ধনী দেখে—ভাবাবেশে অবশ শিথিল হরিময় তনু লুটিয়ে হয়ে পড়ে হরচরণায়িত। তাড়াতাড়ি যথারীতি শুশ্রূষা করে ধনী, চন্দ্রার মুখে শুনেন—সে এক অপূর্ব দিব্য দর্শন। যেন দেবাদিদেব শংকরের দেহ-বিগলিত এক জ্যোতি-তরঙ্গ তাঁর দেহ মনকে সমাচ্ছন্ন করতে ছুটে আসছে, সে চেতন জ্যোতি-সমুদ্রে জননী আর নিজেকে সংবৃত রাখতে পারেন নাই কিন্তু প্রশ্নও জাগে রোগ বা অপদেবতার আবেশ নয় ত? ধনী দেয় প্রবোধ··

তবে এই দিব্য স্পর্শে দেহ হয়ে যায় দেবায়তন—আর ভগবানের আবির্ভাব

মহোৎসবের আয়োজন হয়ে যায় শুরু। নিত্য নিত্য নব নব দর্শন রভসে দেহ মনে জাগে হর্ষের প্লাবন। তনুতীর তার আবির্ভাবে যায় ভরে। বর্ষাভিষেকে কুলু নদীর বুকে যেমন জাগে হর্ষহিল্লোল - জাগে দুকুল-ভরা রূপ।

ধরণীর পরম লগ্নগুলি চুপিসারেই আসে—বরণীয় ক্ষণগুলির কথা ইতিহাসের পাতায় বড় একটা লেখা হয় না। মঙ্গলময়ী উষসীর মত ধীরে ধীরে ভরে দিয়ে যায় জীবনের পাত্র পূর্ণতায়…

আলেকজাণ্ডারের বা জারাক্সাসের রক্ত অভিযানের কথা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় নিবিড় নিষ্ঠায় বর্ণিত – কিন্তু বৈদিক ঋষি-কন্যার মানসে যেদিন রাত্রিদেবী জেগেছিলেন উদার উদ্বোধনে, সেদিনের কথা কেউ কি জানে? দীন মেরীর বুক ভরে যেদিন জগতের এক-তৃতীয়াংশ আলো-করা ভগবান ঈশামসী জেগেছিলেন, সেদিনের সাক্ষী ছিল আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মাত্র, আর দ্বাদশটি দীন ঋষি। তাঁদেরই আকুতিতে হয়ত নেমে এসেছিলেন পরিত্রাতা—জগৎ যাঁকে আজও চেনেনি। আবার সোনার চাঁদের রাকারূপে শচীর বুকে এসেছিলেন গৌরকিশোর আর সাথে এসেছিলেন চির শিশু নিত্যানন্দ, চোখের জলে ধরার কালিমা ধুয়ে দিতে। সেদিন সেই জ্যোৎস্নামদির রজনীর আকুলতা ছাড়া আর কি বা ছিল? আবার যেদিন চন্দ্রার রিক্ত বুকে এসেছিলেন গদাধরচন্দ্র, সেদিনও জাগেনি কোন মহোৎসব…জগৎ জুড়ে আর যাঁর করুণাধারা আর ভাবধারা সেবা-প্রেমের সঙ্গম করছে সৃষ্টি, তাঁর জন্মবাসরে ক্ষীণ দীপটীও গিয়েছিল দখিণাবায়ে নিভিয়ে। শিশু আশ্রয় নেয় ধানের চুল্লীতে—শিশু শিবের যোগ্য আশ্রয় · মনে পড়ে পরিত্রাতা ঈশামসীর জন্ম – পশুর খাদ্যাধারে।

গৃহ-কর্মের হয়ে গেছে সমাপ্তি, গৃহ-দেবতা রঘুবীর আর শীতলা মার ভোগাদি হয়ে গেছে সারা। ক্লান্ত নয়ন-পল্লব যখন রজনীর গহিন চুমায় আলসে অবশ—তখন নিদালীর মত নীরব পায়ে কে এসে দাঁড়ায়। কংসের আঁধার কারা একদিন যেমন উচ্ছল হয়েছিল নীলকান্তবেশে—তেমনি করেই কি এসেছিলে প্রভু নীরবে নিভৃতে নব-ফাল্গুনের শুক্লা দ্বিতীয়ার ম্লানায়মান রজনীর শেষ যামে—অচেনা সুবাসের মত!

সূক্ষ্মলোকের কথা—ভাবলোকের কথা, দিব্যলোকের কথা—আমরা স্থূললোকে স্থূলভাবে চাই পেতে, আর এই অসম্ভব সম্ভব না হলেই হয় না বিশ্বাস — হয় অপ্রত্যয়। স্থূলের ক্ষুধাই, জড়ের আকর্ষণই এর প্রধান কারণ। আবার সব

প্রত্যক্ষ সব প্রত্যয় মনেরই খেলামাত্র। অবতারদের জীবন—সাধারণ জীবন নয়। তাই এঁদের জীবনে জড়িয়ে থাকে অপ্রাকৃত অনেক কিছু, আর সেটি মেনে নেবার মত দৃষ্টিভঙ্গীরও হয় অভাব।

দেবশিশু তখন আট মাসের—জননীর আশা ও ব্যথা নিয়ে দিন কাটে··একদিন আনন্দকরোজ্জ্বল প্রাতে শিশুর শয্যাপ্রান্তে এসে দেখেন শিশু নাই—রয়েছেন এক আদিত্যবর্ণ দীর্ঘায়ত পুরুষ; গৃহ আলোয় আলোময়। জননী মাত্র কিছু আগেই শিশুকে গেছেন রেখে আর এর মধ্যেই এই অঘটন—ভয়ে বিস্ময়ে ছুটে যান ক্ষুদিরামের কাছে, আনেন তাঁকে ডেকে—কিন্তু এসে দেখেন যে, পট পরিবর্তন হয়ে গেছে ক্ষুদিরাম বোঝান এ সেই চক্রধারী গদাধরেরই লীলা·· উমা হৈমবতীর বর্ণনায় মহাকবি কুমারসম্ভবে বলেছেন—

দিনে দিনে সা পরিবর্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা
পুপোষ লাবণ্যময়ান বিশেষাণ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি।

চন্দ্রলেখা যেমন দিনে দিনে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়, তেমনি দিন দিন রূপে রূপময় হয়ে ওঠেন চন্দ্রার স্নেহচ্ছায়ে, দিনে দিনে চন্দ্রলেখার মতই বেড়ে ওঠেন গদাধর চন্দ্র হাস্যে লাস্যে নর্মলীলায়·

শিশুর মুখে ফুটে ওঠে স্বর্গের সুষমা- শিশুর অস্ফুট হাসিতে ঝরে পড়ে অলকার অলকার অলকানন্দা—শিশু যদি হয় অলকা হতে ঠিকরে পড়া রূপলেখা · তখন ধরায় জাগে নববসন্ত - কবির তুলিকা হয়ে ওঠে আকুল রূপতৃষ্ণায়। আর প্রাণের শুষ্কতটে জাগে লীলার হিল্লোল···র‍্যাফেলের শিশু ঈশার রূপায়ণ দেববালকদের নর্মলীলায় আজও হয়ে আছে চিরনন্দনের ধন—আজও হয়ে আছে অমর·বৃন্দাবনের লীলা-কিশোর নন্দদুলালের লীলারসে ধরণী আজও রসময়ী। আমাদের গদাধর গোপালকে নিয়ে তেমনিই এক আনন্দের হাট বসেছিল কামারপুকুরে। পিতার সঙ্গে ছেলে গেছে ভুরসুবোর বিখ্যাত মাণিক রাজাদের বাড়ী - মাণিক রাজা, ক্ষুদিরামের সত্যনিষ্ঠার পরিচয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে ছিলেন আবদ্ধ। ঐশ্বর্যের বাধা মহতের জন্য নয়...ছেলের অপরূপ রূপে বাড়ীর সবাই মুগ্ধ—বলে, আবার এসো বন্ধু তোমার এই ছেলেটিকে নিয়ে ··বন্ধুর হয়ত হয় না যাওয়া—ডাক আসে। বন্ধু তোমার পথ চেয়ে আছি—ছেলেটিকে না দেখে থাকতে পারছি না জেনো।

অন্তঃপুরচারিণী কল্যাণীরাও রাখতেন নানা আভরণ, গদাধরকে মনের মত সাজাতে ··বৃন্দাবন-চন্দ্রকে না দেখে ব্রজবনিতারা দেখত অন্ধকার···গদাধর-চন্দ্রকে কিছুদিন না দেখলে এদের মনে ঘনিয়ে থাকতো ব্যথার আঁধার। তাই বার বার আসত ডাক—উপচারের থালি সাজিয়ে।

শুধু কি রূপময়! যাত্রা, কবিগান, ছবি আঁকা, মাটির মূর্তি গড়া এসবে তার জুড়ি পাওয়া ভার। লাহা বাবুদের আটচালায় বসে পাঠশালা। মনে পড়ে সন্দীপনী মুনির পাঠশালায়, নওলকিশোরের লীলামূর্তি···পড়ায় বেশী সময় লাগে না—ছেলেদের নিয়ে আমের বনে গিয়ে, চলে দিব্য খেলা—শ্রীমতীর ভাবে—কখন চলে রূপাভিসার, কখন চলে নৃত্য, কথকতা, গান। এক একদিন এভাবে হারিয়ে যায় সব সম্বিৎ—ছেলেরা অবোধ, ভাবে বুঝি মূর্চ্ছা। ভাব-সমাধির রাজা নিজে এসে যখন লীলার পুনরাভিনয় করে, তখন সেই ঝরা ফুলের মালা-ই গন্ধমদির নব কিশলয়ের মতই হেসে ওঠে ধরণীর বুকে ··আমরা যেন সেই চির পুরাতনকে চিনেও পারি-না চিনতে, ধরেও পারি না ধরতে, ধরা দিতে অধরা হওয়া এই ত' তার খেলা ··

একদিন দেখা যায়—গদাধর ভাবে অবশ—উপবাসী—মুখে নাই কথা··· ধনী কি জানি যেন বুঝতে পারে—ছুটে এসে সবাইকে বলে, ওগো, তোমরা কে কি দেবে দাও, আজ তোমাদের অনুরাগের দেওয়া অন্ন না হলে ক্ষুধা ত' মিটবে না। দীনের ঠাকুর—দীনের আকূতি এমনি করেই করেন পূরণ। আর একদিন—ছুতোরের মেয়ে খেতির মা, দীনের আর্তি নিয়ে প্রার্থনা জানায়, সবাই খাওয়ায় গদাধরকে—তারও প্রাণ যে হয় আকুল ..অন্তর্যামীর প্রাণে যায় সে কথা—ছুটে আসে খেতির মার কাছে—বিদুরের দ্বারে দেবতা যে নিত্য-ভিখারী··

সেদিন দেবাত্মা ক্ষুদিরাম বসেছেন রঘুবীরের পূজায়, যেমন বসেন নিত্যদিন। স্রকচন্দনে আর মৌন নিবেদনে পূজা গেহ যেন পুণ্য আবির্ভাবে থমথম করছে ··কোথায় ছিল গদাধর ছুটে এল, লীলাঞ্চিত চরণে, এসে—পিতার পুষ্পপাত্রের মালা নিল তুলে—দেবতার চন্দনে নিজের বরদেহ হ'ল সজ্জিত। ললিত কলকণ্ঠে বলে দেখ দেখ, আমি কেমন সেজেছি! পিতা ধ্যাননেত্র মেলে দেখেন—গদাধর না রঘুবীর।...ভক্ত ভগবানে হয়ে যায় এক চকিত লীলার পালা। এমনি লীলা হয়েছিল সরযুর তীরে—ভক্ত তুলসীদাসের প্রীতির চন্দন

সেদিন কিশোরকুমার রামলক্ষ্মণ পরেছিলেন নিজে যেচে ··সেদিন কিন্তু এমন করে দেন নাই ধরা। লীলা নিত্য—সরযূর লীলা—নদীয়ার লীলা—আর কামার-পুকুরের লীলা—লীলা সেই একই… ..

গ্রামের কল্যাণী মায়েরা গদাইকে পেলে যেন সব যেত ভুলে—কেউ চাইত কিছু খাওয়াতে, কারো সাধ দুটি কৃষ্ণকথা শোনে, যাত্রার ভঙ্গীতে—কেউ চায় সাজাতে, পূজা করতে···যেখানে যায় সোনার কিশোরকে ঘিরে বসে যায় আনন্দের হাট···

সে এক নববর্ষার দিন ..আকুল করা নবীন মেঘভারে গগন ভুবন ঢাকা—চোখজুড়ান সেই কৃষ্ণকান্ত বর্ষাগমে নব আশার মত সবাই পুলক চঞ্চল…কবি-কিশোর, প্রকৃতির দুলাল সেদিন চলেছে আনমনা মনে আলের পথ ধরে…চকিতে নীল মেঘের বুকে দেখা গেল নর্মলীলায় ভেসে চলেছে একদল হংসবলাকা—অসীমে সীমাবিলাসের মত অপরূপ রূপে ধরা দেওয়ার মত। দেখা যায়—কিশোর গদাধর চকিতে আপন-হারা হয়ে লুটিয়ে পড়ে—হরিৎ-শ্যাম শয্যায় হর্ষোচ্ছ্বাসে পুলকোদ্গম চারু দেহ-- লুটিয়ে পড়া বিদ্যুৎ যেন···

সোনার কিশোরের এই প্রথম গভীর সমাধি - এই সমাধি তিন দিন ছিল—এই সমাধিই কি অসীমের বুকে আনন্দ বিহরণ মনরূপ বিহঙ্গের—যে কথা পরে শ্রীঠাকুর বলতেন, জ্ঞানীর ধ্যান—অনন্ত আকাশ—পাখী আনন্দে উড়ছে পাখা বিস্তার করে - আনন্দ ধরে না···

বিষাদের আঁধার ঘনিয়ে আসে। সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, আনন্দ-নিরানন্দ—মহামায়ার এই জগৎ বিলাস—দিনরাত্রির মত এরা আসে আবার চলে যায়—জাগে শুধু মার মুখে লীলায় উচ্ছল করুণার হাসি ··জীবনের মাঝে মরণের, আবার মরণেব বুকে জীবনের ছন্দ দোলা—এই ছন্দ মায়েরই দান—এরা আসেই, তবে মায়ের ছেলে, মায়েরই কৃপায় হেলায় এদের কাটিয়ে যায় - অশান্ত সমুদ্রে পাকা মাঝির মত · শাস্ত্রে কোথাও এঁদের স্থিতপ্রজ্ঞ বলেছেন, কোথাও তত্ত্বজ্ঞ পুরুষ বলা হয়েছে - কোথাও বা এঁরা যোগস্থ বলে নির্দেশিত ··

ভগবান তথাগত, জন্মের সঙ্গে সঙ্গে মাতৃহারা হন ··আচার্য শঙ্করকে শৈশবেই পিতৃহীন হতে হয়···কিশোর গদাধরের জীবনেও নেমে এল এমনি এক বিষাদের দিন। অষ্টষষ্টিতিপর ক্ষুদিরাম পূজা উপলক্ষে ভাগিনেয় রামচাঁদের গৃহ সেলামপুর গ্রামে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। বিজয়া-দশমীর দিন মার প্রতিমা নিরঞ্জনের

সঙ্গে সঙ্গে দেবতপস্বী ক্ষুদিরামের জীবনদীপের অমর-জ্যোতি রঘুবীরের স্মরণ নিয়ে চির-জ্যোতির সমুদ্রে যায় মিশে। কামারপুকুরের ধর্মের সংসারে নেমে এল বজ্র বৈশাখের দিন।

পাঁচ

দেবজনক ক্ষুদিরামের দেহান্তে জীবন্মৃত চন্দ্রার জীবনে এক বিশেষ পটক্ষেপ হয়। স্নেহান্ধ জননী তাঁর পক্ষপুটে, পিতৃহীন বালককে আপদে বিপদে ঢেকে রাখতে হলেন সজাগ···

জমিদার লাহাবাবুদের পান্থ-নিবাস গঙ্গাসাগর যাত্রাপথের সাধু-সন্তদের একটি ডেরা বিশেষ ছিল। এখন থেকে উদাসী-কিশোর এই সব সাধু-সন্তদের অনুরাগী হয়ে পড়ল বেশী করে। তাদের পূজা আরতি - আত্ম-নিবেদন—এই সব দেখে সে যেত আপন ভুলে। আর কোন কোন সিদ্ধ মহাত্মার চোখে সেই ভাবঘন কিশোর মূর্তির পিছনে যে বিরাট ভবিষ্যৎ, যে যুগচক্র উদয় অচলে আছে লুকিয়ে, তা ধরা পড়ে যেত। আর তারাও—প্রসাদে নির্মাল্যে, শ্রদ্ধা নিবেদনে, পরিতুষ্ট করতে চাইত আধফোটা এই লীলা কমলকে। গদাধরচন্দ্রের ললাটে চিরদিনের লিখন ছিল সাধুর রাজা হওয়া। পরে যেমন বলতেন, সাধুর রাজা হব সাধ ছিল—সেকথা তখন দিকচক্রে গুণ্ঠিত হয়ে থাকলেও দেখা যায় সাধুদেরও নানাভাবে সেবার ব্যবস্থা গদাধর করেছেন—কখন জোগান ধুনীর কাঠ, কখনও বাড়ী থেকে এনে দেন সিধার সম্ভার ··

এক একদিন তারা নবীন বৈরাগীর বেশে দেন সাজিয়ে আমাদের সোনার কিশোরকে - ভস্মাবশেষে আর গৈরিকে সে সোনার তনুর কি যে শোভা হত! আর সাধুসন্তরা যারা দ্রষ্টা, তারা সে রূপ-মাধুরীতে নন্দনের কি যে আনন্দ পেত তা বলা যায় না···মনে পড়ে গৌর রূপ,—

কি লাগিয়া দণ্ড ধরে, অরুণ বসন পরে
কি লাগিয়া মুড়াইল কেশ······

তবে চন্দ্রামার—ধনীমার বুকে জাগত আঁধারের আশঙ্কা—যদি এরা সোনার গদাইকে ভুলিয়ে নিয়ে চলে যায়? এমন ত শোনা যায়···

এক একদিন দেখা যায় গৃহকোণে পুত্রকে বুকে জড়িয়ে জননীর অঞ্চল যায়

ভিজে। জননীর দুঃখ গদাধরের বুকে জাগায় ব্যথা…মার কাছে সে কথা দেয়, সাধুদের সঙ্গ সে করবে না - পাছে মার প্রাণে লাগে ব্যথা। আর্তের ব্যথায় যিনি সমাধির সপ্তলোকে থাকতে পারেন নি, নেমে এসেছেন ধরার কঠিন ধূলায় —ভুলেছেন অলকার জ্যোতির্লোক – তাঁর বুক জননীর জন্য ব্যথিয়ে উঠবে এতো অসাধারণ কিছু নয়। জননী শচীর বুকভাঙ্গা ব্যথায় আমাদের নদীয়ার নিমাইও হয়ে পড়তেন আপনহারা। সেই একই লীলা—পরে যেমন বলেছেন, সব এক - এক দেখছ না। তবে সাধুরাও চন্দ্রাদুলালকে ছেড়ে পারে না থাকতে— তাই তারা এসে দাঁড়ায় কুটীর দ্বারে, আর মার আশঙ্কা যে মিছে তাও দেয় জানিয়ে—আবার ফোটে হাসি মার মুখে, মুছে যায় সব আশঙ্কা—আবার সাধুদের জমাতে জাগে লীলার আনন্দ।

হরিৎ অঞ্চলা, শ্যাম-মেখলা বাংলা, সত্যিই কবির বাংলা—ঋষির বাংলা। এই শ্যামা মেয়ের স্নেহ-ছায়ে বেড়ে উঠেছে কত যে কবি, কত যে ঋষি, ইতিহাস তার সব কথা ধরে রাখতে পারেনি। কত কুঞ্জে, কত যে গোপন জয়দেব, চণ্ডীদাস তাঁদের ললিত গাথা গেঁথে গেছেন—বনলক্ষ্মী হয়ত তার একমাত্র সাক্ষী, কত সাধুসন্ত, কাঙ্গাল বাউলের বেশে এই বাংলার ধূলায় গড়াগড়ি দিয়ে গেছেন ইতিহাসের পাতায় তার কোন চিহ্নই নাই। কিন্তু এর আকাশে বাতাসে, এর শ্যাম শোভায় তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়; শ্যামা মেয়ের কৃষ্ণতার করুণ অতল চোখে তার ঈষৎ আভাস আজও জেগে আছে—মার কোলে উঠে মার মুখের পানে আপন ভোলা শিশুর মত তাকালে হৃতসর্বস্ব পল্লীজননী আজো তেমনি স্নেহচুম্বনে জাগিয়ে তোলেন হৃদয়-তন্ত্রী জাগে কাব্য, জাগে দর্শন, এই স্নেহের পরসাদ আজও অফুরান হয়ে আছে মার বুকে…

বার মাসের তের পার্বণের একটি আনন্দোজ্জ্বল দিন—কামারপুরের শুচিস্মিতা পুরবাসিনীরা চলেছে পূজা উপচার হাতে, দেবী-বিশালাক্ষীর চরণান্তিকে। সঙ্গে চলেছেন আমাদের সোনার কিশোর গদাধর, হাস্যে লাস্যে, সঙ্গীতে মুখর হয়ে উঠেছে পল্লীবিতান—আলোছায়া দোলা বাংলা মার বুকে জাগল কি কাঁপন কে জানে · চকিতে বালক লুটিয়ে পড়ে চেতনহারা—দেব অঙ্গে পুলকশ্রী – মুখে রুচির হাসি, আলোয় আলোময়। সমবেত কণ্ঠে মার জয়ধ্বনিতে সে ভাবাবেশের অবসান হয় সেদিন। একি ভবতারিণীর প্রথম প্রকাশ – না দেবী বিশাইয়ের মহিমা উজ্জ্বল করা কে জানে ··

শুভ উপনয়ন বাসর—প্রজ্জ্বলিত হোমশিখার মতই দিব্যকান্তি গদাধর আছে দাঁড়িয়ে মুখে ব্রহ্মজ্ঞের দৃঢ়তা আর ব্রহ্মতেজের দীপ্তি, পল্লীবাসী ও পল্লীজননীগণ আনন্দে, শ্রদ্ধায় যুক্তকর এ যেন আচার্য শঙ্করের, ভগবান বামনের, উপনয়ন বাসরের নব রূপায়ণ। সহসা জাগে এক বিপত্তি—নব ব্রাহ্মণের ভিক্ষাপাত্র এগিয়ে আসে দীন ধনীমার দিকে সকলে সচকিত, অগ্রজ রামকুমার শশব্যস্ত— বালককে সাবধান করে দেন নীচ জাতির কাছে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ অশূদ্র-প্রতিগ্রাহী বংশের আচার বিরোধী। কিন্তু দণ্ডীধারী, করধৃত ভিক্ষাপাত্র বালক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ – সে পূর্বে দীন পালকমাতাকে কথা দিয়েছে তাকেই করবে ভিক্ষা-মাতা। সত্যরক্ষা ব্রাহ্মণের প্রথম কর্তব্য, "সত্যই কলির তপস্যা"– শেষ পর্যন্ত দীনের আকূতিই হয় জয়ী। অশ্রু-রোমাঞ্চে প্রথম ভিক্ষাপাত্র ভরে ওঠে দীনের শ্রদ্ধাঞ্জলিতে। যাঁর কৃপায় দীন দরিদ্র আজ দরিদ্রনারায়ণ রূপে জাগ্রত দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত —দিকে দিকে, দেশে দেশে যাঁর সেবায়তন গড়ে উঠেছে সেই দীন নারায়ণের জয় জয়কারে শুভ উপনয়ন বাসরের হয় পরিসমাপ্তি। এমনি দীনের পূজাই মহার্ঘ্য হয়েছিল ভগবান তথাগতের জীবনে "একমাত্র বাস" যিনি ভিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষুকের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষারূপে। ক্ষুদ্র ঘটনাই যে জীবনের নিরিখ।

কোন গ্রীক দার্শনিককে প্রশ্ন করা হয় শৈশবে আমাদের কি করা উচিত। তিনি উত্তর দেন, যৌবনে আমাদের যেটি কর্তব্য তার পরিকল্পই শৈশবের কৃত্য। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থের কথা। শিশুই বয়স্কদের পিতা। দেবকুমার ঈশামসীকে দেখা যায় বাল্যেই ধর্মদানে ব্রতী···গদাধরের কৈশোরও সেই লীলায় গরগর। লাহাবাবুদের শ্রাদ্ধ-বাসর—পণ্ডিত সমাজে প্রমা, প্রমাণ ইত্যাদি শাস্ত্রবিচারের ধূম গেছে লেগে। একস্থানে এসে আর কোন মীমাংসা হয় না শুধু বাক্‌বৈখরী হয়ে পড়ে—সহসা দেখা গেল মধ্যমণির মত শ্রাদ্ধমণ্ডপ আলো করে এসে দাঁড়ায় আমাদের সোনার কিশোর গদাধর। স্মিতহাস্যে সহজে দেয় মীমাংসা করে সমস্ত অনুপপত্তি—পণ্ডিত সমাজ হয় বিস্মিত। এত সহজে এমন জটিল প্রশ্নের এমন সুন্দর মীমাংসা, এই বালক কেমন করে পারে! মূক

বিস্ময়ে তারা তাকিয়ে থাকে বালকের দিব্যমুখের দিকে আর পুষ্পবৃষ্টির মত ঝরে পড়ে আশীর্বচন…এমনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হয়েছিল বহুদিন আগে আর এক বিদ্বৎ সভা—যেদিন ভগবান ঈশামসী বালকবেশে পরাস্ত করেছিল পণ্ডিতদের গর্ব।

শিব-চতুর্দ্দশী—সারা বাংলার নরনারীর বুক নিঙড়ে সেদিন জেগেছে শশাঙ্কশেখর শিবশঙ্করের জয়গান উপবাসখিন্ন ভক্তপ্রাণের সব আকূতিটুকু সেদিন একত্র হয়ে দেবাদিদেবের চরণে ধুতুরা বিল্বার্ঘ্যের মতই যেন স্থান পায়… আমাদের কিশোর গদাধরও সেদিন উপবাসক্লিষ্ট, দেহ মনে শিবময় সঙ্গে আছে সঙ্গী বয়স্যেরা। সহসা সংবাদ আসে সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবযাত্রায় যার শিবের অংশ গ্রহণ করার কথা, তার অসুস্থতায় সমস্ত অভিনয় পণ্ড হবার উপক্রম। সমবেত ভক্ত দর্শকের একান্ত ইচ্ছা যে গদাধর এ অংশটুকু গ্রহণ করে; গদাধর তখন প্রথম প্রহরের পূজান্তে শিবধ্যানে তন্ময়। সকলের ইচ্ছায় সেদিন পূজকের আসন ছেড়ে পূজ্যের আসনে বসতে হয় গদাধরকে—সেদিন যাত্রা আসরে উৎসুখ উন্মুখ নয়নে সহসা এক অপরূপ দৃশ্য প্রকাশিত হল…..ভাবময় বেপথু দেহে, জটাজটিল শিবসুন্দর কিশোর বেশে এসে উপস্থিত যাত্রার আসরে—টলমল অক্ষম চরণ অতিসন্তর্পণে বয়স্যেরা আনে সঙ্গে করে…চকিতে জয়ধ্বনি জাগে শত কণ্ঠের আর ভাবময় গদাধরের দেহছন্দ সমাধির নিস্তরঙ্গে হয়ে যায় নিশ্চল।…অভিনয় সেদিন আর অভিনয় ছিল না…

ছয়

তিনি নিত্য—তাঁর লীলাও নিত্য, নিত্য আর চেতন…ধরার গোষ্ঠে কান্না-হাসি নিয়ে গড়াগড়ি না দিলে অধরা রাখালের মন ভরে না…মার বুকে সোহাগ কাঁদন, সখা-সখীদের সঙ্গে নর্মলীলা সাধকের শত দায়ে ধরা পড়া আর যোগক্ষেম বহন করা—কেন এই খেলা তাঁর? কেন—তার উত্তর সেই বিরাট শিশু দেয় না, সে শুধু খেলেই যায় উচ্ছল নীল যমুনায় বাঁশী আজও বাজে—শুধু অভিনয়ের পটভূমি পালটায়, সাজবেশও কিছু বদলায়…বেথেলহেমে মেষশিশু আর সখাসখী নিয়ে খেলা - সেই বৃন্দাবন-লীলায় ফেরার পালাই ত…

নদীয়ায় সুরধুনীর বুকে নর্মলীলাও সেই একেরই খেলা·· আবার এই সেদিন মাণিকরাজার বনাঙ্গনে সেই খেলাই সেই রাখাল খেলেছে···

যাত্রার পালাগান শুনতে যেটুকু সময়···বয়স্যদের নিয়ে হয় যাত্রার দল—মুহুর্মুহু কুহুলিত আম্রকানন, রাখালের খেলাগেহ মনোরম পটভূমিকা করে রচনা ···উপরে নীলঢালা গগন, নীচে শ্যামা মেয়ের শ্যাম অঞ্চল, কাকচক্ষু জল নিয়ে টলটল করছে কালো দীঘি—এই রঙ্গভূমিতে আমাদের রঙ্গরাজের অভিনয় চলে নিত্য নিত্য, সেই যুগে যুগে চলে আসা লীলাই···"চালকলা বাঁধা বিদ্যা" থাকে পড়ে। পণ্ডিত মহাশয়ের মাঝে মাঝে আসরে দর্শক হয়ে আসাও হয়—পল্লীজননীরা ভরা কুম্ভ নিয়ে বনদেবীর মত অবসর করে নিষ্পলকে দেখে যান কৃষ্ণ-যাত্রা ক্ষণিকের জন্যে --চিনু শাঁখারী, প্রসন্ন দিদির মত দেব-আত্মাদের সজাগ চোখে ধরা পড়ে চতুর চূড়ামণির গোপন লীলা—আনন্দ সঙ্কোচে কারো চলে গোপন পূজা অশ্রুর অভিষেকে—

পরিবর্তনেই জগতের বিলাস জগতের মাধুর্য—দুঃখ আছে বলে সুখের বিলাস। রাতের কান্না মুছাতেই ত ঊষার এত আদর! লীলার পরিবর্তন হয় বলেই ভক্ত ভগবানের লীলা এত রসমধুর...লীলায় বিরহ-মিলন না থাকলে লীলাকজ্জল এত নিবিড় হয়ে জড়াতে পারত না ভগবানকে...কামারপুরে এই দিব্যলীলায় একদিন নেমে এল মাথুর সন্ধ্যা...পূবে রামকুমার কলিকাতায় ঝামাপুকুর অঞ্চলে এক চতুষ্পাঠি স্থাপন করেন সংসারে আয়ের কিছু সুবিধা হবে এই আশায়।—কনিষ্ঠের পড়াশুনা পাঠশালায় আর কুলাবে না; আর ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তার এখন প্রস্তুতির প্রয়োজন, সে চিন্তাতেও আমাদের গদাধরকে কলিকাতায় নিয়ে যাওয়া স্থির করেন অগ্রজ রামকুমার। শিশুর মত হাস্যে লাস্যে, চির শিশু গদাধরের তখন সপ্তদশ বর্ষ গেছে কেটে পল্লীমায়ের নর্মগেহে···

নওল কিশোর যেদিন বৃন্দাবনের প্রেমের হাট ভেঙ্গে চলে যান বৃহত্তর কল্যাণে, সেদিনের কথা মহাজন পদাবলীতে অশ্রু-সরসে আছে লেখা—আজও সে বেদন-লীলা ভুলতে পারেনি জগৎ—আজও ভক্তচক্ষে অশ্রুর বন্যা জাগে সেই বিদায় গোধূলি স্মরণ করে—শত শত কাব্য কাহিনী হয়েছে রচনা—তবু ত ফুরায় না বিরহ মাথুর—

যে পরম লগ্নগুলি আনন্দ লহরী তুলে বয়ে যায় অতীতে অসীমে, তাদের মর্যাদা বেড়ে ওঠে তখনি যখন আর তাদের ফিরে পাবার থাকে না উপায়—

তাই স্মৃতির তীর্থই আমাদের পরমতীর্থ—তাই ব্যথার বুকেই নিত্য লীলা করেন ব্যথাহারী আনন্দলীলার স্মৃতিতে।—স্বপ্নঘেরা স্মৃতিই তাঁর নিত্য অচলায়তন ...কামারপুকুরে আনন্দের হাট আজ বেদনাতুর—লীলা কিশোরের শত স্মৃতি মুখরিত নর্মগেহ আজ বিষাদ-খিন্ন—কুহুলিত মাণিকরাজার বন পিছনে থাকে পড়ে, কাকচক্ষু হালদার দীঘি, যার পাড়ে রমণীবেশে চরণ-চিহ্ন এঁকে চলে গেছেন নূপুরিত পায়ে কত কতদিন ; অঝোরে ঝরে সখাসখীদের ব্যথাতুর আঁখি, ম্লান রাখালের খেলা গেহের বাঁশী আজ নীরব, শ্যাম বনাঙ্গনে কত যে লীলা সমাধি, কত যে গোপন মধুর অভিনয়—কত যে বুক ভরা—দুঃখ-হরা চপলতা, কত চন্দ্রিম রজনীর লীলা—কত বর্ষণমুখর আম্রকাননের গোধূলী...ভুলিয়ে যাবার এই লগ্নে বাঁধভাঙ্গা অশ্রু গহন বুকে হয়ে ওঠে অসহ...

ক্ষণিকের নর্মলীলা, পূরবীর সুরে যায় থেমে, তবু জেগে থাকে মনের কোণে শত কান্নার আকৃতি চির চিরদিন—

জননী চন্দ্রার অঞ্চল যায় ভিজে, ধনীর দীন বুকের আকৃতি কোন সান্ত্বনাই মানতে পারে না—বষণ নত সন্ধ্যার মত দাঁড়িয়ে থাকে পল্লীজননীরা—জননীর চরণ বন্দনা করে, সবার কাছে বিদায় নিয়ে সখাদের বেদন আলিঙ্গনে উচ্ছল করে, অগ্রজের সঙ্গে ধীর গম্ভীর পায়ে জগৎ উদ্ধার ব্রতে চলেছেন গদাধর—অনাগত ভবিষ্যতের পানে ; সেদিন অরুণ প্রেমময় দুটি চক্ষুও কি সরস হয়নি, প্রাণের ইতিহাস এতে দেয় না সায়।

সেদিন গম্যস্থানে বাজেনি কোন মঙ্গলশঙ্খ, জাগেনি কোন হর্ষোচ্ছ্বাস—শুধু পল্লী জননীর বুক ভেঙ্গেই এই নবায়ন হয়েছিল শুরু...নারায়ণের নিত্য বৃন্দাবন যে বিদুরের দীন হৃদয়, যুগে যুগে...

সাত

নিথর গহীন রাত্রি...কলিকাতার জানবাজার অঞ্চলে এক বৃহৎ পুরী, জনমানবসঙ্কুল পুরী আজ নিরন্ধ্র নিদ্রায় চেতনাহারা...সমস্ত ঐশ্বর্য, সমস্ত গরিমা অবসান করে যে নিশা ধরণীর বুকে আসে নেমে, সে নিশা রচনা করে দেবতার বিলাস রাজ্য - এই লীলাসুষুপ্তির অন্তরালে চলে ভক্ত-ভগবানের দিব্যলীলা...

অহং যাকে দিনের আলোয় রাখে ঠেলে, সুষুপ্তির নিস্তরঙ্গ রাজ্যে তাকে পাওয়া যায় সহজে কৃপাতে ··

সুষুপ্তির দেউল খুলে দেবতা দেন দেখা···ভক্ত ও ভগবানের এই লীলার মাঝে থাকে যে ব্যবধান —সে ব্যবধান যেন গভীর রাতের গোপনে পাওয়া মার চুম্বনপুলক—ভুলো ছেলের জন্যে মার দরদ বেশী—তাই সুষুপ্তির এত মোহজাল —শাস্ত্র একে ব্রহ্মানুভূতির ক্ষণিক প্রকাশ বলে স্বীকার করেছেন···

এমনি এক মোহমদির দিব্য নিশা · রাণী রাসমণি শয়ন নিষন্ন। সহসা দেখেন —একি! মা ভবানী ভবভয়হারিণী ভবতারিণী, দিব্যরূপে আলোয় আলো করে —তাঁর শিয়রে হস্তে বরাভয়, দীপ্ত নয়নে করুণার প্রস্রবণ ..ধীর ললিত কণ্ঠে জাগে যুগের জাগরণী,—ভাগীরথী তীরে আমার প্রতিষ্ঠা।

চকিতে সুখস্বপ্ন যায় ভেঙে—একি স্বপ্ন না সত্য—কল্যাণী ভাবেন; যে কল্যাণশক্তি নিয়ে তখনকার বাংলায় একটা আলোড়নের সৃষ্টি করেছিলেন, দীন-দরিদ্রের গৃহে জন্ম নিয়ে দীন দরিদ্রের কাছে যার দক্ষিণাহস্ত চিরমুক্ত ছিল,—যার দৃঢ় হস্ত প্রয়োজন হলে কোম্পানী বাহাদুরকেও তটস্থ করতে ইতস্ততঃ করত না, সেই রাণীর কাছে এ প্রত্যাদেশ যে কি, তার পরিচয় বিশ্বের ইতিহাসে স্বর্ণদেউল হয়ে শোভা পাচ্ছে আজও —। মার চিহ্নিত নায়িকা পরদিন হতেই শুরু করে দেন আয়োজন —স্মৃতি থেকে মুছে যায় বহু আশাপোষিত বারাণসীর তীর্থপথ— মার জন্য নব বারাণসীর প্রতিষ্ঠা এখন থেকে তাঁর জীবনের স্বপ্নসাধ হয়ে দাঁড়ায়—

গঙ্গার পূর্বকূলে হেস্টি সাহেবের কূর্মাকৃতি ঘাট বিঘা ভূমিখণ্ড হল কেনা বহু আয়াসে। দশ বৎসর অক্লান্ত চেষ্টায় প্রায় নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে বিরাট দেউল গঙ্গার পূর্বকূল আলো করে উঠে দাঁড়াল- আর দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় কেনা দিনাজপুরের শালবাড়া পরগণা দেবসেবায় নির্দিষ্ট হয়ে রইল।

দেবী রাসমণির দিন কাটে আকুল উৎকণ্ঠায় শুভ লগ্নের প্রতীক্ষায়— ইতিমধ্যে মার অন্নভোগ শাস্ত্রসঙ্গত না হওয়ায় এক বিপত্তি হয় উপস্থিত। পরিশেষে ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ঝামাপুকুর টোল হতে নির্দেশ দেন রাণী যদি ঐ সম্পত্তি গুরুকে দান করেন, তবে শাস্ত্রমতে দেবীকে অন্নভোগ দেওয়া সম্ভব।—

এদিকে রাণী কৃচ্ছ্রসাধনায় দিন গুনছেন,—শাস্ত্রমতে পুণ্যাহ পেতে হয় দেরী —দিব্য সে এক রজনী, রাণী স্বপ্নে দেখেন মা ভবতারিণী যেন আকুল হয়ে

উঠেছেন প্রতিষ্ঠার লগ্ন চেয়ে—ভক্তও আকুল, ভগবানও আকুল—দুহুঁ মুখ চাহি দুহুঁ আজি কান্দে।

উদ্বোধিতা রাসমণি পরবর্তী স্নানযাত্রার দিন বিষ্ণুপর্বাহেই দেবী প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করেন . জননী যেন আর পারেন না অপেক্ষা করতে—বিশেষ সন্তান যে দ্বারে উপস্থিত - যে দিব্যলীলায় দিক দেশ যাবে ছেয়ে, তার পুণ্যাহ যে সমাগত। লীলার আকুলতা, এ যে তাঁরি দায়—।

মহাসমারোহের সব ব্যবস্থাই হয়ে গেছে সাঙ্গ ; এদিকে মা ভবতারিণীর পূজক যায় না পাওয়া। কাতরা রাণী তখন রামকুমারকে ঐ ভার নিতে সাগ্রহ সম্ভ্রমে জানান নিবেদন। অশূদ্র-প্রতিগ্রাহীর বংশে এরূপ কার্য্য অশাস্ত্রীয়, দেবীর প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধক আশঙ্কায় রামকুমার কেবল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থায় হলেন অগ্রসর —আর কৈবর্ত্তের পূজকপদে কেহ অগ্রসর না হওয়ায় রামকুমারকে বাধ্য হয়ে দেবীর পূজকের পদ করতে হয় গ্রহণ। বন্ধনহীন সন্তানের বাঁধবার এই হল প্রথম পৈঠা।

...প্রতিষ্ঠার দিন তখনকার কলিকাতার নামকরা ধনী রাণী রাসমণির মন্দির প্রতিষ্ঠা এক মহামহোৎসবের দিন হয়েছিল, একথা না বললেও চলে... বিশেষ প্রত্যাদেশিত রাণী এখন দিব্যশক্তিতে শক্তিময়ী—তিনি যে মার চিহ্নিতা কর্মী অষ্টনায়িকার মধ্যে প্রধান নায়িকা...ভারতের তথা জগতের ইতিহাসে আঠারশো বাষট্টি সালের আঠারই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার স্নানযাত্রার দিন এক অবিস্মরণীয় দিন।

মার ডাকে ছেলের কি দূরে থাকা হয়—রামকুমারের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে গদাধরও আসেন চলে—দক্ষিণেশ্বরের দেবারামে। মার মুখে ফোটে লীলার হাসি ঘরের ছেলে ঘরে ফিরল · ঝামাপুকুরের লীলার হয় অবসান—কিন্তু কেমন করে সেও এক লীলা পর্য্যায়—শ্রীঠাকুর রাসমণির অন্ন গ্রহণ করবেন না ঠিক করেছেন, এদিকে রামকুমার বুঝতে পারেন দৈব ইচ্ছা। একদিন ধরে নিয়ে যান মার চরণান্তিকে—বলেন "মার কি ইচ্ছা আয় দেখি—মার সামনে দুটি বিল্ব পাতায় জয় পত্র করা হল, সেদিন মার কাছে পুত্রের হ'ল পরাজয়। মার প্রসাদ যার ছেলে না খেলে মা কি প্রসন্ন হতে পারেন।

আট

এখন আমরা আর চন্দ্রাদুলালকে গদাধর বলব না। এখন তাঁর স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হবার দিন সমাগত। এখন থেকে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর…মার চরণান্তিকে সহস্রদলে বিলাসের দিন যে এসে পড়েছে! জননী পুত্রকে কোলের কাছে নিলেন টেনে—কিন্তু পুত্র যে চির আপনভোলা, সংসারবুদ্ধি রহিত চিরশিশু—নাবালক, তাকে দেখবার অছি যে চাই‥ এলেন হৃদয়রাম, শ্রীঠাকুরের ভাগিনেয়, বলিষ্ঠ-সুন্দর যুবক—শ্রীঠাকুরের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ও শ্রীঠাকুরের সর্বপ্রকার ভার গ্রহণের উপযুক্ত পাত্র…লীলার পাত্র ওঠে ভরে।

দাসত্ব স্বীকারে চিরদিনের অপ্রীতি…যেদিন নিরঞ্জন, পরে স্বামী নিরঞ্জনানন্দ, চাকরী স্বীকার করেন, শ্রীঠাকুর বলেছিলেন,—যদি মার জন্য চাকরী না করতিস তাহলে তোকে ছুঁতে পারতুম না। অবশ্য সাধারণের প্রতি তাঁর এ ভাব কখনই সম্ভব নয়। সংসারে থেকে কেউ বসে থাকলে তাকে কুমড়োকাটা-বট-ঠাকুরের গোত্র ত্যাগ করে কিছু আয়ের চেষ্টা করতেই বলতেন…

প্রথম দর্শনের একটা গভীরতা আছে, একটা মোহ আছে জীবনের প্রথম স্মৃতির মত। অবচেতন মনের বিলাসই হোক আর পূর্বজন্মের স্মৃতির সংস্কারই হোক, প্রথম দর্শনেই ভবিষ্যতের অনেক কিছু নির্দিষ্ট হয়ে যায়। মথুরামোহন রাণীর জামাতা—শ্রীঠাকুরের প্রতি এমনি এক আকর্ষণ অনুভব করেন প্রথম দর্শনেই—প্রথম দর্শনের দিন থেকেই মথুরামোহন ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে স্থায়ীভাবে রাখার জন্য এক অব্যক্ত আকুলতা অনুভব করেন…শ্রীঠাকুর কিন্তু দায়িত্ব স্বীকার, বিশেষ কৈবর্ত্তোর দাসত্ব—কোন মতে মেনেই নিতে পারেন না। ফলে ভক্ত ভগবানেব মধ্যে এক বিচিত্র লীলার সৃষ্টি হয়—মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রথম চারিমাস এমনি করেই যায় কেটে…ভক্তিমান মথুর শ্রীঠাকুরকে ধরেও যেন পারেন না ধরতে—শেষে একদিন মথুরামোহনের একান্ত ইচ্ছায় শ্রীঠাকুর মা ভবতারিণীর বেশকারীর পদ গ্রহণ করেন আর হৃদয়কে করে নেন তাঁর সহকারী ‥ জননীর মুখে ফোটে এক রঙ্গের হাসি—ত্রিকাল দীপ্তির হাসি…

পূজক ক্ষেত্রনাথ চলেছেন অতি সন্তর্পণে—হস্তে রাধাকান্ত বিগ্রহ, শয়ন-মন্দির হতে পূজামণ্ডপের পথে…শ্বেত পাথরের মণ্ডপ…চলার পথই পিছল, আর তার চেয়েও পিছল নিয়তির পথরেখা ‥সহসা ক্ষেত্রনাথ গেলেন পড়ে—দেববিগ্রহ হল ভগ্ন—বিনামেঘে বজ্রাঘাত…নন্দোৎসবের মধ্যাহ্নে—আনন্দসারঙ্গে

চকিতে নেমে এল সন্ধ্যার পূরবী...দক্ষিণেশ্বরের পুরীতে সহসা সহস্র প্রদীপ যেন ম্লান হয়ে গেল।

রাণীর কাছে সংবাদ গেল। কি করা উচিত—প্রধান পণ্ডিতদের বিচার-সভা হল ডাকা—শাস্ত্র নির্ভরে সিদ্ধান্ত হল, ভগ্নমূর্ত্তির গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন ·· মথুরামোহনের মন এতে দেয় না সাড়া। সহসা চোখে পড়ে যায় আলথাল ভাববিভোরতনু শ্রীঠাকুরকে কাছে গিয়ে সব নিবেদন করা হল—ভাবেই শ্রীঠাকুর দেন উত্তর,—রাণীর জামাই যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলে তবে কি তাকে ফেলে দিতে হবে·· সত্য—সহজ সত্য-সহজ সত্যের সহজ প্রকাশে আনন্দ-মথিত অন্তরের সাড়া পান মথুরামোহন, আর ব্যবস্থাও হয় সহজেই—দেব-বিগ্রহের সংস্কারের ব্যবস্থা শ্রীঠাকুরই নেন স্বহস্তে। এ কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেই ছিল-প্রাণের পূজায় দেবতা যেখানে অন্তরতম চিরজাগ্রত ধন, শুষ্ক শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সেখানে পায় না ঠাঁই। অন্তরের অন্তরতমকে চেনাতে শাস্ত্রের শস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন ত নাই।

মায়ের ছেলে এখন মায়ের কাছে—ছেলে যেমন মাকে পেয়ে মার মুখপানে চেয়ে থাকে আপনভোলা হয়ে, তেমনি চিরশিশু ঠাকুর কখন মার চরণ-নিকষে আত্মনিবেদনরত—কখন মা-মা করে চোখের জলে বুক যায় ভিজে, কখন বা নির্জনে—সন্ধ্যায়-রজনীর গহীনে-পঞ্চবটীর তলে ধ্যাননিমগ্ন—কখন বা জগৎ ভুলে গান ধরেছেন,—কোন হিসাবে হরহৃদে—আর বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর গঙ্গা হচ্ছে উচ্ছলিত···এমনি দুকূল ভাঙ্গা ব্যথা না হলে বুঝি মাকে যায় না পাওয়া···তাই পরবর্তীকালে শ্রীঠাকুরের সহজ পূজার মন্ত্র,—চাই ব্যাকুলতা।

আবার শাস্ত্রের মর্যাদাও ত রাখা চাই—দীক্ষা হয়নি, তাই দীক্ষার হয় ব্যবস্থা-অগ্রজ রামকুমার এখন ধীরে অক্ষম হয়ে পড়েছেন···মার পূজার ভার নিতে হবে—শক্তিসাধক শ্রীযুত কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে তাই দীক্ষার ব্যবস্থা হল···শাস্ত্রের ব্যবস্থা নষ্ট করতে ত অবতারদের আসা নয়—তাই যুগে যুগে তাঁরা গুরুর চরণে করেছেন নিজেদের নত, ···তাই দেখি মহাপ্রভুর আহুতি ঈশ্বরপুরীর কাছে, তাই ঈশামসিকে দেখি নতশিরে দাঁড়িয়েছেন জন্ দি ব্যাপটিস্টের চরণ নিকষে, শ্রীঠাকুরও একাধিক গুরুর চরণে জানিয়েছেন নতি—শাস্ত্রকে করেছেন সঞ্জীবিত।

মার ছেলেকে মার কাছে দিয়ে, মার পূজায় নিবিষ্ট দেখে রামকুমার একদিন

সহসা নিলেন বিদায়—পিতৃতুল্য অগ্রজের দেহাবসানে শ্রীঠাকুর যেন আবার হলেন পিতৃহারা—দেহ ধারণের ব্যথা নিতেই ত দেহে আসা, না হলে ব্যথাহারী হবেন কি করে ? বাংলার বারশত তেতাল্লিশ সালের এই ঘটনা ··

নয়

এইবার ঠাকুর নিলেন জলবার মন্ত্র। আকুল তৃষ্ণা নিয়ে এইবার শুরু হল তপস্যার অতলে ডুব দেওয়া···দিশাহারা প্রাণে জেগেছে মা-মা-ডাক···জাতি, কুল, শীলাদি অষ্টপাশ মুক্ত হয়ে চলে জপ ধ্যানাদি—কখন উন্মত্তের মত কালী-বাড়ীর কাঙ্গাল নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, কখন টাকা মাটি সাধনে গঙ্গায় অর্থ নিক্ষেপ, কখন উপবীত দেহাবরণাদি ত্যাগে শিবের মত ধ্যান নিরত। তখন দেহ মনের তপস্যা নিয়ে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত চলেছিলেন ছুটে অসীমের টানে - অশান্ত—অতন্দ্র—অবুঝ।

শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের কথা,—মার দেখা পেলাম না বলে বুকে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, সজোরে গামছা নিংড়ানো করে হৃদয়টাকে কে যেন নিংড়াচ্ছে—অস্থির হয়ে ভাবলাম তবে আর জীবনে আবশ্যক নাই,·· সহসা মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি তার উপর পড়লো ; উন্মত্তের মত ছুটে ধরতেই মার দর্শন পেলাম ···ঘর দ্বার মন্দির সব মিলিয়ে গেল—কোথাও যেন কিছুই নাই. আর দেখি কি এক অসীম চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্র···সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। কোন্ দিক দিয়ে সেদিন ও তার পরদিন গিয়েছে তার কিছুই জানতে পারি নাই··· (লীলাপ্রসঙ্গ)

শ্রীঠাকুর বলতেন, —ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়,—সতীর পতির প্রতি, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, আর মার সন্তানের প্রতি টান,—এই তিন টান এক হলে তাঁকে পাওয়া যায়। ব্যাকুলতার সাধন যে কি, নিজের জীবনেই বিশেষ করে দেখিয়ে গেছেন। নিজের মুখে বলেছেন,—তখন শরীরের দিকে মন না থাকায় চুল সব বড হয়ে, ধুলামাখা হয়ে, জটা পাকিয়ে গিয়েছিল—আর ধ্যানের গভীরতায় পাখীরা এসে মাথায় বসত—চেতন থাকত না · সময়ে সময়ে মার অদর্শনের ব্যথায় মাটিতে মাথা কুটে মুখ ঘসে এমন প্রার্থনা করতাম যে রক্ত পড়ত—আর সন্ধ্যা হলে সারাদিনের জপ ধ্যান প্রার্থনা ক্লান্ত শরীরে গঙ্গাকূলে লুটিয়ে পড়া ; কাতর ক্রন্দনে দিক ভরে যেত,—মা আর একটা দিন যে চলে

চকিতে নেমে এল সন্ধ্যার পূরবী...দক্ষিণেশ্বরের পুরীতে সহসা সহস্র প্রদীপ যেন ম্লান হয়ে গেল।

রাণীর কাছে সংবাদ গেল। কি করা উচিত—প্রধান পণ্ডিতদের বিচার-সভা হল ডাকা—শাস্ত্র নির্ভরে সিদ্ধান্ত হল, ভগ্নমূর্ত্তির গঙ্গাগর্ভে বিসর্জ্জন ·· মথুরামোহনের মন এতে দেয় না সাড়া। সহসা চোখে পড়ে যায় আলথাল ভাববিভোরতনু শ্রীঠাকুরকে কাছে গিয়ে সব নিবেদন করা হল—ভাবেই শ্রীঠাকুর দেন উত্তর,—রাণীর জামাই যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলে তবে কি তাকে ফেলে দিতে হবে--সত্য—সহজ সত্য—সহজ সত্যের সহজ প্রকাশে আনন্দ-মথিত অন্তরের সাড়া পান মথুরামোহন, আর ব্যবস্থাও হয় সহজেই—দেব-বিগ্রহের সংস্কারের ব্যবস্থা শ্রীঠাকুরই নেন স্বহস্তে। এ কাজের অভিজ্ঞতা তাঁর আগেই ছিল—প্রাণের পূজায় দেবতা যেখানে অন্তরতম চিরজাগ্রত ধন, শুষ্ক শাস্ত্রের নির্দ্দেশ সেখানে পায় না ঠাঁই। অন্তরের অন্তরতমকে চেনাতে শাস্ত্রের শস্ত্র প্রয়োগের প্রয়োজন ত নাই।

মায়ের ছেলে এখন মায়ের কাছে—ছেলে যেমন মাকে পেয়ে মার মুখপানে চেয়ে থাকে আপনভোলা হয়ে, তেমনি চিরশিশু ঠাকুর কখন মার চরণ-নিকষে আত্মনিবেদনরত—কখন মা-মা করে চোখের জলে বুক যায় ভিজে, কখন বা নির্জনে—সন্ধ্যায়—রজনীর গহীনে-পঞ্চবটীর তলে ধ্যাননিমগ্ন—কখন বা জগৎ ভুলে গান ধরেছেন,—কোন হিসাবে হরহৃদে—আর বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর গঙ্গা হচ্ছে উছলিত···এমনি দুকুল ভাঙ্গা ব্যথা না হলে বুঝি মাকে যায় না পাওয়া···তাই পরবর্তীকালে শ্রীঠাকুরের সহজ পূজার মন্ত্র,—চাই ব্যাকুলতা!

আবার শাস্ত্রের মর্যাদাও ত রাখা চাই—দীক্ষা হয়নি, তাই দীক্ষার হয় ব্যবস্থা—অগ্রজ রামকুমার এখন ধীরে অক্ষম হয়ে পড়েছেন·· মার পূজার ভার নিতে হবে—শক্তিসাধক শ্রীযুত কেনারাম ভট্টাচার্যের কাছে তাই দীক্ষার ব্যবস্থা হল···শাস্ত্রের ব্যবস্থা নষ্ট করতে ত অবতারদের আসা নয়—তাই যুগে যুগে তাঁরা গুরুর চরণে করেছেন নিজেদের নত, ···তাই দেখি মহাপ্রভুর আহুতি ঈশ্বরপুরীর কাছে, তাই ঈশামসিকে দেখি নতশিরে দাঁড়িয়েছেন জন্ দি ব্যাপটিস্টের চরণ নিকষে, শ্রীঠাকুরও একাধিক গুরুর চরণে জানিয়েছেন নতি—শাস্ত্রকে করেছেন সঞ্জীবিত।

মার ছেলেকে মার কাছে দিয়ে, মার পূজায় নিবিষ্ট দেখে রামকুমার একদিন

সহসা নিলেন বিদায়—পিতৃতুল্য অগ্রজের দেহাবসানে শ্রীঠাকুর যেন আবার হলেন পিতৃহারা—দেহ ধারণের ব্যথা নিতেই ত দেহে আসা, না হলে ব্যথাহারী হবেন কি করে? বাংলার বারশত তেতাল্লিশ সালের এই ঘটনা ..

নয়

এইবার ঠাকুর নিলেন জ্বলবার মন্ত্র। আকুল তৃষ্ণা নিয়ে এইবার শুরু হল তপস্যার অতলে ডুব দেওয়া...দিশাহারা প্রাণে জেগেছে মা-মা-ডাক...জাতি, কুল, শীলাদি অষ্টপাশ মুক্ত হয়ে চলে জপ ধ্যানাদি—কখন উন্মত্তের মত কালী-বাড়ীর কাঙ্গাল নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ, কখন টাকা মাটি সাধনে গঙ্গায় অর্থ নিক্ষেপ, কখন উপবীত দেহাবরণাদি ত্যাগে শিবের মত ধ্যান নিরত। তখন দেহ মনের তপস্যা নিয়ে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত চলেছিলেন ছুটে অসীমের টানে—অশান্ত—অতন্দ্র—অবুঝ।

শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখের কথা,—মার দেখা পেলাম না বলে বুকে তখন অসহ্য যন্ত্রণা, সজোরে গামছা নিঙড়ানো করে হৃদয়টাকে কে যেন নিঙড়াচ্ছে—অস্থির হয়ে ভাবলাম তবে আর জীবনে আবশ্যক নাই,.. সহসা মার ঘরে যে অসি ছিল দৃষ্টি তার উপর পড়লো; উন্মত্তের মত ছুটে ধরতেই মার দর্শন পেলাম ...ঘর দ্বার মন্দির সব মিলিয়ে গেল—কোথাও যেন কিছুই নাই, আর দেখি কি এক অসীম চেতন জ্যোতিঃ সমুদ্র...সংজ্ঞাশূন্য হয়ে পড়ে গেলাম। কোন্ দিক দিয়ে সেদিন ও তার পরদিন গিয়েছে তার কিছুই জানতে পারি নাই... (লীলাপ্রসঙ্গ)

শ্রীঠাকুর বলতেন,—ব্যাকুল হয়ে ডাকলে তাঁর দেখা পাওয়া যায়,—সতীর পতির প্রতি, বিষয়ীর বিষয়ের প্রতি, আর মার সন্তানের প্রতি টান,—এই তিন টান এক হলে তাঁকে পাওয়া যায়। ব্যাকুলতার সাধন যে কি, নিজের জীবনেই বিশেষ করে দেখিয়ে গেছেন। নিজের মুখে বলেছেন,—তখন শরীরের দিকে মন না থাকায় চুল সব বড় হয়ে, ধূলামাখা হয়ে, জটা পাকিয়ে গিয়েছিল—আর ধ্যানের গভীরতায় পাখীরা এসে মাথায় বসত—চেতন থাকত না। সময়ে সময়ে মার অদর্শনের ব্যথায় মাটিতে মাথা কুটে মুখ ঘসে এমন প্রার্থনা করতাম যে রক্ত পড়ত—আর সন্ধ্যা হলে সারাদিনের জপ ধ্যান প্রার্থনা ক্লান্ত শরীরে গঙ্গাকূলে লুটিয়ে পড়া; কাতর ক্রন্দনে দিক ভরে যেত,—মা আর একটা দিন যে চলে

গেল, এখনও দেখা দিলি না···লোকে ভাবত ছোট ঠাকুরের পেটে শূলব্যথা হয়েছে।

শ্রীঠাকুরের কথায় জীবকে ভক্তি প্রেম শেখাতেই অবতারের আসা—শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনেও দেখা যায় চিরবিরহীব প্রাণ নিয়ে, কি আকুল কান্নাই কেঁদে গেলেন সারা জীবন—ভগবদ্বিরহে চোখে নির্ঝরের মত ঝরত অঝোর ধারা···শ্রীঠাকুরের এখন থেকে মার নিরন্তর দর্শনের জন্যে এক আকুল ক্রন্দন বুক নিংড়ে উঠত জেগে, সবসময়ে সে যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে সময়ে সময়ে লুটিয়ে পড়তেন সম্বিৎহারা হয়ে। বুকফাটা ক্রন্দনে লোক যেতো দাঁড়িয়ে, তাদের সব উপহাস পরিহাস মরুমায়া বলে মনে হত আর এই লুটিয়ে পড়া অসহ বেদনায় যখন এসে দাঁড়াতেন জননী ভবতারিণী—স্মিতহাস্যে আলোয় আলো করে · ব্যথার অন্ধকারে জাগত শত চাঁদের বিলাস – আর স্বর্গের মাধুরী-ঝরা বাণীতে দিতেন সান্ত্বনা দিতেন শিক্ষা···কি সোহাগ হাসি জাগত ছেলেব মুখে, কি যে তৃপ্তি জাগত সারা অঙ্গের পুলকে—কে বলবে।

—রোস্ রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি তারপর খাস্···সহসা মন্দির মুখরিত হয়ে ওঠে, সকলে ছুটে গিয়ে দেখে শ্রীঠাকুরের অদ্ভুত পূজা. উন্মত্তের পূজা—শ্রীশ্রীঠাকুরের চোখে জগৎ তখন ছায়ার জগৎ · তখন তাঁর চোখে ফুটে উঠেছে মার অরূপ রূপ-- চিন্ময় মুখে ফুটে উঠেছে ভুবন-ভুলানো হাসি- কখন মার মন্দির সোপানে উঠত মার কমলফোটা চরণের ঝুমঝুম নূপুর—কখন দেখছেন মন্দিরের দ্বিতল অলিন্দে আকুল কেশ এলিয়ে দাঁড়িয়েছেন লীলা চঞ্চলা-- কখন হাত দিয়ে দেখছেন নিশ্বাস স্পন্দিত শ্রীমুখ। কখন বা উন্মত্তের মত খুঁজছেন মন্দির দেউলে শ্রীঅঙ্গের ছায়া·· আবার অস্ফুটে মার সঙ্গে চলেছে কত রঙ্গ কত পরিহাস, কখন বা মার কাছে মার খাটে হয় শোওয়া ··এমনি দিব্যলীলায় কাটে অপূর্ব দিনগুলি, ততোধিক অপূর্ব রাত্রির ক্ষণ। মার প্রথম দর্শনের পর কিছুদিন কোন কাজই হয় না সম্ভব·· পূজাদি ত দূরের কথা। অবুঝ হৃদয়রাম কবিরাজী চিকিৎসার করেন ব্যবস্থা—কিন্তু ভবরোগ বৈদ্যের চিকিৎসার কোন নিদানেই নেই।

ভাবময় ঠাকুর মার নাটমন্দিরে যে ভৈরব মূর্তি আছে তাকে দেখিয়ে মনকে ঐরূপ নিস্পন্দে ধ্যান করতে বলতেন—আর সত্যই দেখতেন ঐরূপ ভৈরব কাছে বসে আছেন, আর শূল হাতে ভয় দেখিয়ে নিবিষ্টে বলছেন ধ্যান করতে এমনি আবার পূজায় বসে যখন 'রং' ইত্যাদি মন্ত্রে দিগবন্ধন করতেন, তখন সত্যই

দেখতেন—যেন অগ্নিময় প্রাচীরের সৃষ্টি হয়ে গেছে চারিদিকে···আবার শরীরের মধ্যে পাপ পুরুষ বিনষ্ট হয়ে গেল. চিন্তা করা মাত্র দেখলেন মাতালের মত এক কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দেহ হতে বেরিয়ে গেল, শূল হাতে আর এক সন্ন্যাসী দেহ থেকে বাইরে এসে তাকে করল বিনাশ··· । ব্রহ্মের কল্পনায় জগৎ সৃষ্টি—এটি কল্পকথাই নয়, এই তার প্রমাণ।

দশ

অদ্ভুত অনুভব—ধ্যানে বসেই কে যেন ভিতর থেকে ঘট্‌ঘট্‌ করে একটার পর একটা গ্রন্থি বন্ধ করে দিচ্ছে—ধ্যানন্তে আবার ঐরকম করে সব যেত খুলে —কখন বা কুয়াসার মত চিৎজ্যোতিতে চারিদিক হত জ্যোতির্ময়···হয়ত এই শিক্ষাই আমাদের দিলেন—ধ্যানের নির্বিকল্পে শরীর এমনি নিশ্চল হয়—শুধু মনই হয় না।

বৈধী পূজা আর অনুরাগের পূজা· অনুরাগের পূজাই প্রাণের পূজা—শাস্ত্র, মন্ত্র এখানে মিথ্যাচার। বহির্মুখের মনে হবে এ পূজা উন্মত্তের পূজা···শ্রীঠাকুর জবা বিল্বার্ঘ্য, মার চরণে দেবার আগেই দিলেন নিজের মাথায়, নিজের চরণে—অন্নাদি নিবেদন করতে মার মুখেই দিলেন ধরে··হয়ত বা নিজেই খেতে শুরু করলেন—আর সেই উচ্ছিষ্টই মাকে করলেন নিবেদন···মার সঙ্গে চুপে চুপে কথা —কখনও বা মার চিবুক ধরে রঙ্গ-পরিহাস—এমন কি নৃত্যও চলেছে—এ ত পূজা নয়, মায়ে-ছেলেতে খেলা এ যেন অসীম সাগরের সঙ্গে অসীম গগনের উচ্ছল বিলাস।—যখন অবুঝ শিশু মার মুখে নিজের মুখ থেকেই খাবার দেয় ধরে কোন প্রশ্নই ত জাগে না মার দিক থেকে, না কারো দিক থেকেই···আপন হতে আপন মাকে কেউ আপন করে নেয় না তাই সাধারণে শ্রীঠাকুরের লীলার পায় না খেই। শুরু হয় কোলাহল—কিন্তু ভক্ত মথুর নিজে এসে সমস্ত দেখেন—এই ত পূজা—সত্যিকার পূজা। রাণীকে গিয়ে সংবাদ দিলেন অদ্ভুত পূজকের আরো অদ্ভুত এই পূজার কাহিনী—আর কর্মচারীদের দেন সাবধান করে যেন কোনরূপ বাধা না দেওয়া হয় এই সহজ পূজায়।

এদিকে শ্রীঠাকুর দিন দিন ভাবসাগরের গহনে ডুবে আর যেন উঠতেই চান না। নরেন্দ্রকে যেমন পরে বলতেন,—মনে কর এক খুলি রস রয়েছে, তুই

কোথায় বসে খাবি ? নরেন্দ্রনাথ বুদ্ধিমান, উত্তর দেন,—কেন আড়ায় বসে খাব, নইলে যে ডুবে যাব…ঠাকুর বলেন. তুই ত ভারি বোকা ! এ যে অমৃত সাগর ; এতে ডুবলে মানুষ মরে না—অমর হয়…শ্রীঠাকুরও এই অমৃত সাগরে ডুব ডুব করে আর যেন উঠতেই চাইতেন না। পূজাদি আর হয়ে ওঠে না—পূজার ভার নিতে হয় হৃদয়রামকে।

সাধনার শুরুতেই শ্রীঠাকুরের দেব অঙ্গে হল জ্বালা, এক মালসা আগুন বুকের ভিতর দিলে যেমন হয় পঞ্চতপার এই জ্বালায় ঠাকুর গঙ্গার জলে শ্রীঅঙ্গ ডুবিয়ে তিন চার ঘণ্টাতেও পেতেন না কোন স্বস্তি। আবার মার ক্ষণিকের অদর্শনেও অসহ ব্যথায় আছাড় খেয়ে মুখ ঘসে হতেন অ.ঝ আকুল, দেহ থাকা হয়ে পড়ত দায়। কিন্তু মার দর্শন এখন অবাধ হওয়ায় এভাব বেশীক্ষণ থাকতে পেত না—সৌম্যাৎ সৌম্যতরা রূপে এসে মা দিতেন আশ্বাস—দিতেন সান্ত্বনা, সব জ্বালা যেত জুড়িয়ে…যুগে যুগে এমন ছেলে পাওয়া যে ভাব

এই সময় শ্রীঠাকুর বিধিবৎ পূজায় হয়ে পড়েন অক্ষম, মার ইচ্ছায় খুল্লতাত পুত্র শ্রীরামতারক চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণেশ্বরে এসে পড়েন পূজার আর ভাবনা থাকে না এ ঘটনা আঠারোশো আটান্ন খৃষ্টাব্দের। এঁকেই শ্রীঠাকুর হলধারী বলে ডাকতেন।

শ্রীঠাকুর বলতেন—নাবালকের অছি এসে জোটে। পরমহংস ত বালক, বালকের মা চাই না ? মা আমি তোর মুখ্যু ছেলে, যা শেখাবার তুই শিখিয়ে দে…তাই এখন থেকে শ্রীঠাকুরের সাধনা-বিলাস চলে মার ইঙ্গিতে—জগজ্জননীর পাদপীঠেই ত জগৎগুরুর পাঠ।

মার অবাধ দর্শনের পর মার ইঙ্গিতেই শ্রীঠাকুর এখন হনুমানের দাস্যভাব সাধনে হলেন ব্রতী। ভক্তরাজ মহাবীরের চিন্তায় এখন আপনহারা। তাঁরি মত ব্যবহার লোকচক্ষে সেত উন্মত্তের আচরণ। এমনি দাস্য সাধনে দিন যায় —সহসা একদিন দেখেন, ধ্যান চিন্তা কিছু না করেই দেখেন, জ্যোতির্মণ্ডল মধ্যবর্তী এক মাতৃমূর্তি—পঞ্চবটীতল আলোয় আলো করে আসছেন—প্রেমে, করুণায়, ক্ষমা, তপস্যায় মূর্ত হয়েও যেন অমূর্ত—অবাক বিস্ময়ে শ্রীঠাকুর থাকেন চেয়ে—চকিতে একটি হনুমান এসে জানায় শরণাগতির নতি…অন্তর মথিত করে ধ্বনিত হয়—ইনিই সীতা—রামময় জীবিতা, সহিষ্ণুতার বেদনার মূর্ত বিগ্রহ, মা জানকী—আর প্রসাদ প্রসন্ন নয়নে নিকটে এসে শ্রীঠাকুরের বরদেহে যান মিলিয়ে

…দাস্য সাধনের শেষ কথা—ভক্ত ভগবান অভেদ—সে প্রতিষ্ঠা মা নিজেই গেলেন দিয়ে…জলবার মন্ত্র নিয়ে আসেন অবতার পুরুষেরা—তাই কি এই অভিন্নতা, সাধনার পূর্বাশায়…

এগারো

সেদিন গঙ্গায় দুকূল উচ্ছল বান—সহসা ভর্তাভারী মালী আনন্দ কলরবে জানায়—জোয়ারে ভেসেএসেছে পঞ্চবটীর বেড়া দেবারসব কিছু। কিছুদিন আগে শ্রীঠাকুর একটি অশ্বত্থের চারা লাগান নিজের হাতে আর হৃদয়রামকে দিয়ে বট, আমলকী, বেল আর অশোকের চারা ও দেন লাগিয়ে। উদ্দেশ্য পঞ্চবটীর ছায়ার গহিনে নিশ্চিন্তে ধ্যানে থাকবেন ডুবে। বেড়ার ছিল প্রয়োজন, গাছগুলি বাঁচাতে হবে। সহসা তরঙ্গময়ী গঙ্গাই দেন এনে গরানের খুঁটি, দড়ি, কাটারী সব কিছু…এই যোগক্ষেম তিনি বারবারই বহন করে এসেছেন ভক্তের জন্যে। শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর বরানগরের ভূতেব বাড়াতে জড় হয়েছেন সন্ন্যাসীর দল—দানার দল তপস্যার সমিধে আপনহারা—সহসা স্বামীপাদ বলেন, -আজ আর কেউ ভিক্ষেয় বেরুব না, দেখি তিনি আমাদের দেখেন কি না। এর পর কীর্তনানন্দে যান মেতে। সারাদিন যায়—জোটে না দুটি মুঠি অন্নও। রাত্রির কতকটা গেছে পার হয়ে, সহসা দুয়ারে পড়ে আঘাত। স্বামীপাদ বলেন, —ওপর থেকে দেখ্, হাতে যদি কিছু থাকে তবেই খুলবি দরজা। দেখা যায় নিকটেই লালাবাবুর গোপালবাড়ী, সেখান থেকে এসেছে প্রসাদ। জয়ধ্বনি পড়ে যায় নবীন সন্ন্যাসীর দলে। আরো পরের কথা ঝুসীতে অভেদ স্বামীপাদ গেছেন পরিব্রজ্যাপর্বে। বসে আছেন শ্রীঠাকুরের কৃপার উপর নির্ভর করে। বর্ষণসিক্ত দিনান্ত। সহসা এসে পড়ে আহারের উপায়ন অতি অতর্কিতে। বিবেক স্বামীপাদের হাথ্রাস প্রব্রজ্যায়ও এমনি এক ঘটনাই ঘটে। তৃষ্ণার্ত, ক্ষুৎক্ষাম, স্বামীপাদ আছেন বসে বৃক্ষমূলে—সহসা ছুটে আসে হালুইকর। হাতে আহার্য সম্পূট,—দৈব প্রেরণাতেই এসে পড়ে সে। এমনি কত কত দিন। আজ শ্রীঠাকুরের পূজা পর্যায়ে কোটী কোটী টাকা ধুলিমুষ্টির মত এসে পড়ছে। যোগক্ষেমের পাত্র কানায় কানায় উঠেছে ভরে। ভক্তের যোগক্ষেম ভগবান বহন করেন কিন্তু ভগবানের যোগক্ষম কে বহন করবে—তাই বোধহয়

এবার অন্য ব্যবস্থা হয়। তাই ভক্তাভারীই এ যুগের ভগবানের প্রথম যোগ-ক্ষেমধারী। যাই হোক প্রচ্ছায় পঞ্চবটীতে নিরন্ধ্র ধ্যানে ঠাকুর যান ডুবে,—যেন জগতের স্পন্দন হয়ে যায় স্তিমিত।

শ্রীঠাকুরের কথা,—ফুল ফুটলে ভ্রমর এসে আপনি জুটবে। সাধুদের তীর্থ পথে দিশা-জঙ্গল আর অন্নপানিব ব্যবস্থা না হলে চলে না। দক্ষিণেশ্বরের এই মহাতীর্থে ঐ দুটির অভাব ছিল না কোন দিনই, তাই জগন্নাথ আর সঙ্গম তীর্থের সন্ত-পথিকদের ডেরা হয়ে পড়েছিল এই দক্ষিণেশ্বর। ভাল ভাল সাধুদের চরণচিহ্নে আরো মহনীয় হয়ে উঠেছিল এই পরম স্থান। আর সাধুর রাজা ঠাকুরও এঁদের সঙ্গে নানা আলাপে শাস্ত্র-মীমাংসায় গড়ে তোলেন এক যুগান্তরী ভাবগঙ্গা।

সেদিন সাধনা-সাগর-সঞ্চারী শ্রীঠাকুর আছেন বসে, সহসা মুখ দিয়ে শুরু হল রক্তপাত। সীমপাতার মত মিসকালো তার রং। পড়তে পড়তে জমে যায় সে রক্ত,—সকলে অস্থির।···মনে পড়ে শ্রীযুত হলধারীকে ঠাকুরের সাধন বিষয়ে অবহিত করা। ক্রোধে অধীর অগ্রজ দেন অভিশাপ--তোর মুখ দিয়ে রক্ত পড়বে। ..মনে পড়ে বালির অভিশাপ মাথায় কুড়িয়ে নিয়েছিলেন ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যার ফলে কৃষ্ণাবতারে ব্যাধের শরাঘাত। দৈব নিদেশে সেদিন জনৈক প্রাচীন সাধু এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বর তীর্থে। তিনি বিশেষভাবে দেখে বলেন,—এ ভালই হয়েছে, এই রক্ত বেরিয়ে যাওয়া ভাল লক্ষণ। হটযোগের শেষ কথা জড সমাধি। সে সমাধি হলে শ্রীঠাকুরের লীলা-বিগ্রহ আর থাকত না। তখন চলছিল হটযোগের সাধন বিলাস।

শ্রীযুত হলধারীর সঙ্গে শ্রীঠাকুরের লীলা, সাধন কালের এক মধুর অধ্যায়। হলধারী পাণ্ডিত্যের অভিমানে সময় সময় শ্রীঠাকুরকে—মা ভবতারিণীকে অবজ্ঞা করতেন; আবার সময়ে সময়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করতেও হত না ভুল। একদিন মাকে তামসী বলে শ্রীঠাকুরের কাছে প্রমাণ করেন, নানা তর্কযুক্তির সহায়ে—বালকস্বভাব ঠাকুর সজল নয়নে বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন ছুটে মার চরণান্তিকে, মায়ের শরণাগত বালকের নিবেদনে ভবতারিণী কি স্থির থাকতে পারেন আশ্বাস না দিয়ে? ফিরে এসেই একেবারে চেপে বসেন হলধারীর স্কন্ধে। বলেন,—তুই মাকে তমোময়ী বলিস—মা যে ত্রিগুণময়ী আবার শুদ্ধসত্ত্ব গুণময়ী···হলধারী করেন পূজার ফুলে চরণ বন্দনা, জগদম্বা জ্ঞানে···কিন্তু শাস্ত্র বিচারের অহং আবার সব দেয় ভুলিয়ে···পানা-ঢাকা পুকুরের জল পানা সরিয়ে দিলে আবার যায়

ঢেকে। হলধারী আবার বিচার করতে বসেন। একদিন হলধারী দেখেন কালীবাড়ীর দীন-নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট—প্রসাদজ্ঞানে—শ্রীঠাকুর একান্ত ভক্তিভাবে করছেন গ্রহণ। দেখেই হলধারী হন দিশাহারা, বলেন,—দেখি তোর ছেলে-মেয়েদের কেমন করে বিয়ে হয় শ্রীঠাকুরের মাথায় হয় বজ্রাঘাত, বলেন,—এই যে বল সর্বভূতে ব্রহ্ম দৃষ্টি করতে—আর মনে কর বুঝি তোমার মত আমার ছেলেমেয়ে হবে? ধিক্ এই শাস্ত্রজ্ঞানে—হলধারীর শুষ্ক শাস্ত্রজ্ঞান শ্রীঠাকুরের বিজ্ঞান দৃষ্টির কাছে পায় না থই।

· যে যা বলে বালকস্বভাব শ্রীঠাকুরের সহজ সরল মনে মেনে নেওয়াই ছিল বৈশিষ্ট্য চিরদিনের—হলধারী এমনি বিচারে একদিন তাঁর সব দর্শন মিথ্যা বলে এমন ভাবে প্রমাণ করলেন—অধ্যাস, মায়া জগৎ-ভ্রান্তি—এই সব শাস্ত্রবাণী সহায়ে যে শ্রীঠাকুর আর স্থির থাকতে পারলেন না; তাঁর নিজের কথায়,—ভাবলাম, তবে ত ভাবে যত রূপ দেখেছি সে সব মিথ্যা—মা তবে আমায় ফাঁকি দিয়েছে—মন বড় ব্যাকুল হল, আর দারুণ অভিমানে, কেঁদে কেঁদে মাকে বললুম, মা নিরক্ষর অবুঝ বলে আমায় কি এমনি ফাঁক দিতে হয়—সে কান্নার তোড় আর থামে না—

···কুঠীর ঘরে এই লীলা—সহসা দেখেন মেঝে থেকে ধোঁয়ার মত উঠছে—চিন্ময় সে ধোঁয়া, আর তার ভেতর গৌরবর্ণ সৌম্য শ্মশ্রুল এক মুখ—জীবন্ত চিন্ময়,—সেখান থেকে এক বাণী শুনলাম, —'ভাবমুখে থাক'—তিনবার ঐ কথা বলার পর ঐ শ্রীমূর্তি কুয়াসায় গলে গেল—আর ঐ শ্রীমূর্ত্তি কুয়াসাও গেল সরে···মন এক শান্তি নিথরে সান্ত্বনায় গেল ভরে

হলধারীর যুক্তিতর্ক আর একবার ঘটায় এমনি বিভ্রম—সেবারও মা তাঁর সন্তানকে বুঝিয়ে দিতে ঘটের পাশে হলেন আবির্ভূত, বল্লেন—ভাবমুখে থাক—এই বাণীই আবার তিনি পান—নিরন্তর ছয়মাস নির্বিকল্প ভূমিতে বাস করবার পর, মন যখন সপ্তভূমিতে বিলীন হয়ে যাবার যো হয়েছিল—সে বাণী কিন্তু শরীরী নয়—আত্মায় আত্মায় সে বাণী···

শ্রীঠাকুরের তিনবার তিন রকম অনুভূতি হয়েছিল—মনে হয় প্রথমবার উপনিষদের হিরণ্য-গর্ভ পুরুষ, যিনি 'আপ্রনখাৎ সৌবর্ণম্'—তিনিই এসেছিলেন, দ্বিতীয় বারের দর্শন মানবীয় রূপে আর তৃতীয়বার বাগ্‌ব্রহ্ম রূপের, স্ফোটরূপের প্রমাণ পেয়ে হয়েছিলেন আশ্বস্ত.. শ্রীঠাকুরকে বুঝাতে মাকেও অনেক কিছু

করতে হয়েছিল ··এমন অবুঝ ছেলে না হলে দর্শনের কথা—'বেদবেদান্তের পারে' যাবে কেমন করে ?

বারো

শ্রীঠাকুরের কথা—'মন মুখ এক করাই সাধন'—দেখা যায় যখন সমলোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চন জ্ঞান করতে হবে স্থির করলেন, তখন এক হাতে টাকা নিয়ে আর এক হাতে মাটি নিয়ে টাকা মাটি সত্য সত্য সমজ্ঞান করে উভয়কেই গঙ্গা-গর্ভে দিলেন বিসর্জন···আবার যখন শুচি অশুচিতে সমজ্ঞান সাধন করতে হবে, দেখা যায়—সত্য সত্যই নিম্ন জাতির বিষ্ঠা নিজের মাথার কেশ দিয়ে পরিষ্কার করছেন, আর সবভূতে সমজ্ঞান করতে দীন-নারায়ণদের উচ্ছিষ্ট মাথায় করে গঙ্গা-গর্ভে দিচ্ছেন বিসর্জন···এইভাবে স্থূল ও সূক্ষ্মের সাধন—তিনি নিজে করে না দেখালে লোকের গ্রহণযোগ্য হত না—আপনি আচরি ধর্ম শিখান অপরে···নিজে যেমন বলতেন—আমি ষোল টাং করেছি তোরা এক টাং কর ; বলতেন,—মন যখন শুদ্ধ হয়, তখন সেই মনই গুরুর কাজ করে। ...অবতার পুরুষদের মন নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত ত' বটেই বরং আরো কিছু···তাই মনে যা উঠত বা শাস্ত্রের সব কথা প্রত্যক্ষ হোত।

শ্রীঠাকুরের নিজের কথা, আমারি মত দেখতে এক যুবক সন্ন্যাসী আমার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসত—যখন তখন, আর অনেক বিষয়ে উপদেশ দিত—সে যে-সব উপদেশ দিত,কালে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, তোতাপুরী এদের কাছেও সেই একই উপদেশ পেয়েছি। যখন এই সন্ন্যাসী বাইরে আসতো, তখন এই দেহটা হয় একেবারে বাহ্যজ্ঞানহীন হয়ে পড়ত, না হয় কিছু সংজ্ঞা থাকত··এঁদের গুরু-করণের উদ্দেশ্য শুধু শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা, শুধু নজির মাত্র। শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষা লগ্নে এমান ঘটনাই ত' ঘটেছিল।

সাধনার প্রথম চার বৎসরের শেষের দিকে শ্রীঠাকুর আছেন কামারপুকুরে। তখনকার দর্শন একটু অন্যরকম—

শ্যামছন্দ শিহরগ্রামের বনপথ···শিবিকায় চলেছেন শ্রীঠাকুর—বালকের লীলা কৌতুক দুই চোখে, পল্লী জননীর স্নেহচুম্বনে আবার যেন জেগেছে ছায়া-ঘেরা মধুর বাল্যস্মৃতি। সহসা দেখেন দুটি সুঠাম সুন্দর কিশোর, আনন্দঘনতনু, তাঁর

দেহ হতে বেরিয়ে এসে—শুরু করে নর্মলীলা—কখন দূর বন রেখায় যায় হারিয়ে, কখন বা পাল্কীর কাছে এসে হাস্যে লাস্যে হয় আপনহারা—অনেকক্ষণই চলে এই দিব্যলীলা, শেষে তারা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গেই আপনাদের ফেলে হারিয়ে···পরে ভৈরবী ব্রাহ্মণী শুনেই বলেন.—এরাই নিত্যানন্দ—শ্রীচৈতন্য···আর তুমি একাধারে দুই-ই, তাই এমন দেখেছ বাবা।

শ্রীঠাকুরের প্রেমোন্মাদনা আকুল করে তোলে চন্দ্রামাকে—তাই ডেকে নিলেন নয়নমণিকে কামারপুরে···পল্লীমার স্নেহশীতল বুকে—জননীর বেদন-ঘন আলিঙ্গনে যদি জুড়ায় সন্তানের ব্যথা, জুড়ায় সব আধি-ব্যাধি—ফিরে এলেন চন্দ্রার বুকে, ফিরে এলেন পল্লীর দুলাল পল্লীর পাখী-ডাকা, ছায়াঢাকা শ্যামগেহে ···এবার কিন্তু আর সেই লীলা কিশোর নয়, ফিরে এলেন ভবতারিণীর আদরের দুলাল আধো-ফোটা ঠাকুর—ক্ষণে ক্ষণে সমাধি, ক্ষণে মার সঙ্গে আনন্দ বিলাস—পল্লীবাসীর চক্ষে মনে হয় উন্মত্তের বিকার বিশেষ। শুরু হল ওষুধ, ঝাড় ফুঁক···যিনি ভবরোগ বৈদ্যের মাথার মণি, তাঁর বৈদ্য যে সারা বিশ্বেও মেলে না, —তাই এ রোগের ঔষধ যায় না পাওয়া—রোগও যায় থেকে।

ভস্ম আর বৈরাগ্যের আলেয়া পল্লী-শ্মশান—সাধকের বেদনামথিত আত্মার আত্মায় গ্রামান্তের এই শ্মশানভূমি···নির্জন সাধনায় মনকে অভ্যস্ত করবার যোগ্যক্ষেত্র এই দিব্যস্থান—যুগে যুগে সাধকদের দিয়ে এসেছে ডাক—দিয়ে এসেছে অগ্রগতি···

কামারপুকুরের উপান্তে ভূতির খাল আর বুধুই মোড়লের শ্মশান—শ্রীঠাকুরের আবাল্য বিলাসভূমি—মার দর্শনের পরেও শ্রীঠাকুর শ্মশানের সাধনা আবার করেন শুরু—শিবাভোগ প্রেততর্পণ, শাস্ত্রমতে হল সুরু · সমস্ত শাস্ত্রমত পূর্ণতর করতেই যাঁর আসা তাঁর কাছে তন্ত্রের এই রহস্যময় পথ অজ্ঞাত থাকবে কেন···? কখন কখন রাত্রের দ্বিতীয়যামও অতীত হয়ে যেত তাঁর এই মরণ সাধনায়—জীবন-মৃত্যুর এই মিলনক্ষেত্রে কিছু কিছু যোগ-বিভূতির প্রকাশ এই সময়েই হয়।

কামারপুকুরে চট্টোপাধ্যায় গৃহে গোপনে বসেছে আত্মীয়দের এক বৈঠক—ঠিক হয় গদাধরের এই ভাবান্তরের একমাত্র প্রতিকার তার বন্ধন সৃষ্টি করা। বিবাহের মধুর বন্ধনই একমাত্র উপায়—চেষ্টা চলে কিন্তু অনেক অনুসন্ধানেও মনোমত পাত্রী যায় না পাওয়া—নারায়ণের পাশে প্রয়োজন যে নারায়ণীর—

কেটে যায় দিন—স্থির হয় না কিছুই—একদিন সহসা উদয় গদাধরচন্দ্র স্বয়ং। যাকে লুকিয়ে এই ব্যবস্থা, তিনিই এসে উপস্থিত। শিশুর উল্লাসে যেন না-জানা কৌতূহলেই বলেন,—ওগো তোমরা কি করছ? তার পরই ভাবস্থ···সর্বান্তর্যামী দেন চমক লাগিয়ে বলেন,—ওগো, কোথা খুঁজে মরছ, ঐ দেখগে অমুক গাঁয়ে অমুকের মেয়ে কুটো বাঁধা আছে···সকলের ত চক্ষুস্থির—যাকে আড়াল করতে গোপনের এই ব্যবস্থা, তারি মুখে এই কথা! দেবতার ঠাকুরালী একেই বলে—

বারশো ছেষট্টি সাল, নববর্ষ তখন সবে শুরু—ধরণীর পূর্বাশায় জেগেছে দাম্পত্য জীবনের নব মাঙ্গলিক শুভ বৈশাখের এক পুণ্যদিনে শ্রীঠাকুরের বিবাহের লগ্ন হল স্থির। স্থির হল জয়রামবাটীর শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যা সারদেশ্বরীর সঙ্গে। কন্যা তখন নিতান্ত শিশু—পঞ্চমীর চন্দ্রলেখা, আকুল কুন্দকলি—আর শ্রীঠাকুর তখন চতুর্বিংশতির শিবকান্ত···।

উমা-মহেশ্বরের বিবাহের মত দিব্য হতেও দিব্য এই বিবাহ—এতে ছিল না আড়ম্বরের লেশ মাত্র। কবি কালিদাস উমা-মহেশ্বরের বিবাহ বিন্যাসে লিখছেন,—

দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাসা বাল্যাজনাবিষ্কৃতলাঞ্ছনেন।
চন্দ্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্নমৌলেশ্চূড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্য॥

কলঙ্কহীন চন্দ্রলেখা যার মাথার আভরণ, তাঁর আর অন্য কি আভরণ প্রয়োজন—যিনি বিশ্বকে আলো করে আজ বিশ্বেশ্বর, তাঁর আভরণের বালাই ত কোন কালেই নাই। ভাবোল্লাসে, মার অনুরাগে তখন গরগর গদাধর তনু নিটোল মুক্তার মত উচ্ছল—আভরণ তখন আবরণ মাত্র···

কামারপুকুরের পথ - বিবাহের পরের এক পরম লগ্ন। রৌদ্র-করোজ্জ্বল দিন —একটি পাল্‌কী এসে দাঁড়িয়েছে ছায়ামন্থর চন্দ্রার গৃহদ্বারে—

চারিদিকে জাগে এক অপূর্ব চঞ্চলতা। পল্লী-জননীরা আবেগাকুল চোখে এসে দাঁড়ান, পল্লীদুলালদের চপলতা ক্ষণিকের তরে হয় স্তিমিত—সহসা এসে দাঁড়ান শ্রীঠাকুর—যাবেন শিহড়ে চেলাঞ্চল উড়ছে দূর দখিনায়—আবেগাকুল-নয়ন-নিথরিত-অমৃত নয়ন-পল্লবে যায় না ঢাকা—যেন সপ্তসায়র মথিত করে জেগেছে রূপশতদল সর্বঅঙ্গে স্বর্গের সুষমা—সকলের চোখে জাগে মোহমদির আবেশ·· শ্রীঠাকুর হৃদয়কে বলেন,—হৃদু, এত লোক সমাগম কেন? শোনেন, তাঁকে দেখতেই সবার এই আকূতি—শিশুসুলভ লজ্জা ছড়িয়ে পড়ে সারামুখে, ঢুকে পড়েন গৃহকোণে। এমনি হত শ্রীঠাকুরের, যখনি ফিরে যেতেন পল্লীগেহে···

ভোরের স্বপ্নজড়িমা ফুরাতে না ফুরাতেই আসতো পল্লীজননীরা কলসী কাঁখে হালদার পুকুরে—আর দর্শনোল্লোসের পালা সুরু হত চন্দ্রার কুটীরে। তাঁরা সাজিয়ে আনতেন গৃহ-প্রস্তুত সামান্য স্নেহোপচার। এরপর আসতেন পুরুষ ভক্তের দল—অপরাহ্নে আবার স্নানার্থিনীদের ভিড়—সন্ধ্যায় পুরুষ ভক্তদের মিলনোৎসব—শ্রীঠাকুরকে ঘিরে এমনি আনন্দের হাট বসত কামারপুকুরে··· দেবতার চরণ ঘিরে নিত্য জাগে নব বসন্ত—

নিত্য অগ্রসারী মহাকালের চক্রকে ফিরিয়ে দেখি - দিব্য বিবাহের এক দিব্য পর্ব--শিশু শিবানীর চক্ষে অনন্ত কৌতুহল, আর মহেশ্বরের চক্ষে মহাভাব ···দেহ মনে মহামাতৃকার বিলাস ক্ষণে ক্ষণে সমাধি···অমর্তের বিলাস মর্তের বুকে···কবির কথায় Bridal of the Earth and Sky—মর্তের সঙ্গে অমর্তের মিলন।

•মা ভবতারিণীর আহ্বান আসে, ফিরে আসেন মার দুলাল প'ড থাকে পল্লীগেহ, পড়ে থাকে জননীর অঞ্চল, সুরু হয় সাধন লীলা—মার জন্য আকুলতা · উন্মাদের মত মার অবাধ দর্শনের নিরন্তর প্রচেষ্টা—নিরন্তর প্রার্থনা, স্মরণ মনন···অতল ব্যাকুলতায় নিদ্রাহীন দিশাহীন দিব্যোন্মাদের দিন আবার আসে ফিরে। একথা বারশো সাতষট্টি সালের শেষের।

তেরো

কলিকাতার প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের গৃহ—কবিরাজ নবাগতের অদ্ভুত রোগের চিকিৎসায় চিন্তিত। বন্ধুস্থানীয় এক কবিরাজ রোগীর লক্ষণ দেখে সহসা বলে ওঠেন—এ রোগ চিকিৎসার অতীত—এ দিব্যোন্মাদের অবস্থা, নিদানে এ রোগের বিধান নাই রোগী আর কেহ নয় আমাদের ঠাকুর স্বয়ং, সঙ্গে আছেন পার্ষদ হৃদয়রাম—ভবরোগ বৈদ্যের সঙ্গে তখনকার ধন্বন্তরি গঙ্গাপ্রসাদের মিলন—এ বেশ রহস্যময় লীলা বলেই মনে হয়···এ তাঁর চিকিৎসা না গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা কে জানে— ?

এদিকে জননী চন্দ্রার বুক নিঙড়ে ওঠে। নিরুপায়ে গ্রামের বুড়োশিব তলায় ধন্না দিয়ে পড়েন পুত্রের কুশল কামনায় ; মুকুন্দপুরের শিবের প্রত্যাদেশ হল— পুত্রের উন্মাদ রোগ হয় নাই ঈশ্বরের আবেশ হয়েছে পূজান্তে কল্যাণী শান্তমনে

ফেরেন গৃহদেবতার দেউল ছায়ে। শ্রীঠাকুর সে সময়ের অবস্থা বলতে গিয়ে বলেছেন তাঁর পার্ষদদের,—মার চিন্তায় দীর্ঘ ছয় বৎসর চোখে নিদ্রা ছিল না, পলক ছিল না—সময়ের জ্ঞান ছিল না—নিজেকে নিজে দেখে ভয় হত, কেঁদে ফেলতাম, আর মাকে কেঁদে কেঁদে বলতাম,—মা তোকে ডেকে এই ফল হল—শরীরে এই রোগ দিলি, আবার শিশুর মত বলতাম, তা যা হবার হক, তুই আমায় কৃপা কর—দেখা দে·· প্রার্থনার পর মার দর্শন ও অভয়বাণীতে আশ্বস্ত হতাম···

ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য—তাইত' মথুর প্রথম দর্শনের দিন থেকেই অনুভব করে ঠাকুরের প্রতি একটা টান। তখন শ্রীঠাকুরকে সকলে উন্মাদ মনে করে নানা অকথা অকুণ্ঠে করছে প্রয়োগ—ব্যথিত মথুর শুভ অশুভ সব রকম চিকিৎসার চেষ্টায় হন না বিরত। এমন অবুঝ অবস্থায় থাকার ত' কথা নয়··· সেদিন শ্রীঠাকুর কুঠীর অদূরে পাদচারণা করছেন. তনুতীর্থে জেগেছে দলমল বিলাস—সহসা মথুর এসে পড়ে লুটিয়ে একেবারে তাঁর চরণে, চক্ষে নেমেছে অবাধ বর্ষণ—শ্রীঠাকুর যত বুঝান তার আকুলতা ততই যায় বেড়ে। শেষে সে সব ভেঙ্গে বলে,—বাবা তুমি বেড়াচ্ছ আর আমি স্পষ্ট দেখলাম তুমি নও আমার ঐ মন্দিরের মা, যখন এগিয়ে আসছো—আর যখন পেছিয়ে যাচ্ছ, দেখি বাবা বিশ্বনাথ—স্পষ্ট দেখলুম, চোখ মুছে বার বার দেখলুম···। অনেক বোঝানোর পরে মথুরের সে আকুলতা থামে·· ভাগ্যবান মথুরের কোষ্ঠীতে ছিল তাঁর ইষ্টদেব দেহধারণ করে তাঁর সঙ্গে ফিরবেন, রক্ষা করবেন—মথুর যে যোগভ্রষ্ট রসদ্দার, চিহ্নিত সেবক।

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন বিষম চঞ্চলতা—মন্দিরের কর্মচারীরা উন্মত্তের মত করে ছুটাছুটি, মথুরামোহনও ছুটে আসে ; দেখা যায় স্তব্ধ মন্দিরে আছেন মাত্র দুই জন—শ্রীঠাকুরের মুখে ঈষৎ করুণার হাসি, রাণী অনুতাপ গম্ভীর—আর ভবতারিণী ভবভয়হারিণী দক্ষিণেশ্বরী করুণায় স্ফুরিতাধরা···

কর্মচারীদের কলগুঞ্জনে প্রকাশ—রাণী সেদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে বসেছেন পূজায় আর শ্রীঠাকুরকে বলেন,—বাবা মার একটা নাম করত। শ্রীঠাকুরও অশ্রুল অনুরাগে ধরেন মার নাম—সহসা দেখা যায় দিব্যভাবে আপনহারা ঠাকুর রাণীর অঙ্গে করেন আঘাত, আর বলেন,—কি—এখানেও ঐ সব চিন্তা ···অষ্ট-নায়িকার একজন হলেও রাণী তখন তাঁর এক মামলার কথায় ছিলেন

আপনহারা। মন্দিরের কর্মচারীদের, পরিচারক পরিচারিকাদের কিন্তু দেন থামিয়ে—যার চিহ্নিতা সেবিকার সে সাধন শক্তি ছিল, ছিল নিজ অপরাধ বুঝবার মত জাগৃতি···শক্তিকে সংহত রাখাই শক্তিমানের লক্ষণ।

গুরুভাবের এই বিকাশ অবতার জীবনে এই প্রথম নয়—প্রেমাবতার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীঅদ্বৈতকে বেদনার্ত্ত কৃপায় ধন্য করা—আর 'আভে' দেবতার মন্দিরে ভগবান ঈশামসির বিষয়মুখী মানবদের তাড়না—আমাদের স্মরণে সহজেই ভেসে আসে। প্লাবন মেঘের বুকে বজ্র থাকে - আবার বর্ষণও থাকে।

সিদ্ধনায়িকা রাসমণি একদিন সহসা আঘাতিত হন, ফলে হয়ে পড়েন রোগগ্রস্ত—বিদায়লগ্ন আসন্ন বুঝে গঙ্গা তীরে অবস্থানের হল ব্যবস্থা।

আঠারোশোএকষট্টি সালে উনিশে ফেব্রুয়ারী সে এক অন্ধ তমাচ্ছন্ন রাত্রি··· রাণীকে করা হয়েছে অন্তর্জলী—সহসা রাণী চিৎকার করে ওঠেন - সরিয়ে দে—ওসব আলো সরিয়ে দে - মা আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় সব আলোয় আলোময়। কিছু স্থির হয়ে আবার বলেন,—মা এলে, কিন্তু পদ্ম যে সই দিলেনা-মা - কি হবে ?···রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর—মহানিশা—কর্মঅন্তে ক্লান্ত সন্তানের মার কোলে ফিরবার এইতো সময়। দেবী রাণীর দেহান্তে মথুরামোহনই কালীবাড়ীর সেবাধিকার লাভ করেন। তবে প্রয়াণ-লগ্নে দৃষ্টির যে স্বচ্ছতা হয় রাণীর শেষ আশঙ্কাই তার প্রমাণ।

বোধহয় শ্রীঠাকুরের কাজের সুবিধা হবে বলেই মথুরামোহনের এই উন্নতি। রাণীর মৃত্যুর পর দীর্ঘ এগার বৎসর শ্রীঠাকুরের সঙ্গ ও সেবার অধিকার জন্ম-জন্মান্তরেরি সুফল। ঐশ্বর্য্য ও তার যথার্থ ব্যবহার বিশেষ অধিকারীতেই সম্ভব। মথুরামোহন যোগভ্রষ্ট ও যোগ্য সেবাধিকারী ছিলেন তাই সাক্ষাৎ দেহধারী ভগবানের এমন সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন।

···আকুলোচ্ছলা গঙ্গা আর তেমনি আকুলোচ্ছল শ্রীঠাকুরের হৃদয়—সাধন সায়র তীরে আকুল নয়ন মেলে প্রতীক্ষা করছেন যেন কোন দিশারীর আশায়··· সহসা গঙ্গা-বক্ষে তরণীতে দেখা যায় আকুল-কেশা ভৈরবী-মূর্তি, মূর্ত উমা-মহেশ্বরী। শ্রীঠাকুর ত্বরিতে নিজ গৃহে যান ফিরে—হৃদয়কে দিয়ে ভৈরবীকে পাঠান ডেকে, অন্তরে জাগে হারিয়ে পাওয়া আত্মীয়ের দর্শনোল্লাস ; ভৈরবী ব্রাহ্মণীও যেন হারান সন্তানকে পেয়ে কলকণ্ঠে বলেন,—বাবা তুমি এখানে;—

আর মার নির্দেশে তোমায় কত খুঁজে বেড়াচ্ছি। জননী আর সন্তানের সুরু হয় কত কথা, গোপন সাধন রহস্যের উচ্ছলতা...বলেন, মা আমায় যে সবাই পাগল বলে একি সাত্য– সত্যি কি আমি মাকে ডেকে উন্মাদ হয়েছি? সত্যকার একজন সিদ্ধ সাধিকার দর্শনে এতদিনের যত জানাজানি, যত কানাকানি, যেন শেষ হতে চায় না... ভৈরবী আশ্বাস দেন,—কে বলে বাবা তোমায় পাগল, এযে মহাভাব—এই ভাব হয়েছিল শ্রীমতীর—এইভাবে আপনহারা হয়েছিলেন শ্রীমন্মহাপ্রভু। শাস্ত্রে এর শত প্রমাণ যে রয়েছে। আশ্বস্ত হল দিব্যশিশু, আকুল নেত্রে ঝরে পড়ে বেদনামথিত সমস্ত কথা—দরদী হিয়ার স্পর্শে ব্যথা ও অশ্রু আনে শ্রাবণের বর্ষণ—আনে তৃপ্তি · আনে পূর্ণতা...

সঞ্চিত বহু কথায় সেদিন হয়ে যায় বেলা। শ্রীঠাকুর ভবতারিণীর প্রসাদী মাখন মিছরী সব ভৈরবী মাকে দেন খেতে—তিনিও বালগোপাল ভাবে অগ্রভাগ শ্রীঠাকুরকে দিয়ে সে প্রসাদ করেন গ্রহণ। ভৈরবী ঠাকুরবাড়ীর ভাণ্ডার থেকে চাল, ডাল ভিক্ষা স্বরূপ নিয়ে অন্নাদি প্রস্তুত করে, বসেন ইষ্টের পূজায় · ইষ্ট রঘুবীর শিলা তাঁর সঙ্গেই থাকতেন।...ভাব সমাধিতে ভক্ত-ভগবানে যে লীলা, সর্বান্তর্যামী তার একমাত্র সাক্ষী · বাইরে থাকে শুধু আসন্ন শ্রাবণের শান্তি সহসা শ্রীঠাকুর কেমন করে এসে পড়েন, আর দেখা যায়—অর্ধবাহ্যে, নিবেদিত অন্নের অগ্রভাগ গ্রহণে একান্ত নিবিষ্ট, যেন তাঁকেই এতক্ষণ সমস্ত নিবেদন করা হচ্ছিল, যেন তাঁরই আবাহনে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর এত ভাবতন্ময়তা। ভৈরবী ভাবনেত্র মেলে শ্রীঠাকুরের এই লীলা বিলাসে চোখের জলে হয়ে পড়েন অবুঝ। শ্রীঠাকুর বলেন,—কি জানি কেন এমন করি ভৈরবী বলেন,—বাবা বুঝেছি এ কে করেছে? যার পথ চেয়ে কতদিন গেছে কেটে—কত অশ্রুগহন রাত্রি হয়েছে প্রভাত—আজ তাকেই যখন পেয়েছি মূর্তরূপে, তখন আর বাহ্য-পূজার প্রয়োজন নাই। সুরধুনীর পুণ্য-সলিলে স্থান পান এতদিনের পূজিত প্রাণের দেবতা রঘুবীর...দেবতা যখন জীবন্ত, চিন্ময়, তখন মৃন্ময় মূর্তির প্রয়োজন আর থাকে না। মহাজনের পদে—

"আমার বাহির দুয়ারে কপাট লেগেছে
ভিতর দুয়ার খোলা—"

ব্রাহ্মণী বলেন,—বাবা কে বলে পাগল—এ যে মহাভাব-- ভাবে মুহুর্মুহু

আপনহারা, - কীর্তনে পরমানন্দ –এযে শাস্ত্রে আছে ··আর তিনি যে আবার আসবেন—

'অদ্বৈতের গলা ধরি কন বারেবার।
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার॥
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার।'

প্রচ্ছায় শীতল পঞ্চবটী, দাবদগ্ধ ধরণীর পরম পরিতৃপ্তির সেই পঞ্চবটী, ব্যথার পঞ্চবটী, তার তলায় বসে শ্রীঠাকুর আর ভক্ত মথুরামোহন—বালকের সারল্যে ঠাকুর বলেন,—দেখ গো, ভৈরবী আমায় অবতার বলে, আর বলে যে শাস্ত্রে নাকি একথা আছে—মথুর যুক্তিবাদী ভক্ত। বলেন,—অবতার যে দশটীর বেশী নেই—এমন সময় দেখা যায় অশ্রু সরসে ভাবঅবশে নন্দরাণীর বেশে আসেন ভৈরবী স্বয়ং—হাতে মিষ্টান্নের থালি। আসামাত্রই শ্রীঠাকুর মথুরের দেন পরিচয় আর বলেন তার কথা। তেজোদীপ্তা ভৈরবী বলেন, কেন শাস্ত্রে এ সব আছে ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা আছে—আরো আছে অসংখ্যবার তাঁর অবতীর্ণ হবার সংবাদ— আর পণ্ডিতসমাজে এ কথা প্রমাণ করতেও আমি প্রস্তুত···

মথুর হন নীরব ··।

চৌদ্দ

যোগেশ্বরী ভৈরবী বিদুষী ছিলেন; আর তন্ত্রশাস্ত্রে তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল বলেই শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে এই সন্ধিক্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আসেন। এখন সকলেই, ঐসব সাত্ত্বিক বিকারকে উন্মাদের. লক্ষণ বলেই ধরে নিয়েছেন— এমন কি বালক স্বভাব ঠাকুরও তাই মেনে নিয়ে মার কাছে কাতর প্রার্থনা জানাচ্ছেন,--মা তোকে ডেকে আমার এই হল - শরীরে এমন ব্যাধি দিলি? এমনি দিনে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এলেন দক্ষিণেশ্বরে। তিনি কিন্তু প্রথম দেখাতেই শ্রীঠাকুরের মহাভাবের লক্ষণগুলি চিনতে পারেন, চিনলেন এই গোপন প্রেমধনকে —আর তার প্রমাণ দিতে পণ্ডিত সমাজকে করেন আহ্বান। প্রথমেই শ্রীঠাকুরের দেহে যে জ্বালা সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে হয়ে উঠত অসহ সেই জ্বালা

অবতার শরীরে ঈশ্বর বিরহেই উপস্থিত হয় একথা দিলেন জানিয়ে—আর ভক্তি-শাস্ত্রে এর প্রতিকার স্রক্‌চন্দন ধারণ বলে নির্দেশিত আছে, তার ব্যবস্থাও হয় সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল তিন দিন ঐ ব্যবস্থায় সব দাহ যায় জুড়িয়ে...ভৈরবী যোগেশ্বরী এমনি করেই শ্রীঠাকুর যে অবতার তার প্রথম প্রমাণ শাস্ত্রমুখে দেন ধরে।

বিরাট মনের ক্ষুধাও বিরাট—এই সময় শ্রীঠাকুরের মনে কেবলই খাবার কথা জাগে। খেয়ে উঠেই আবার যেন ক্ষিদে পায়—ভৈরবী মাকে বলেন সে কথা। বলেন,—এটা কি হল বল দেখি-কেবলি খাই খাই। ভৈরবী বলেন,—ভক্তিপথের এও যে একটা অবস্থা বাবা…শাস্ত্রমন্থন করে উপায় বের হয়—একটি ঘরে সব রকম খাদ্যবস্তু সংগ্রহ করে বলেন,—বাবা এই ঘরে থাক, আর যখন যা ইচ্ছা হবে খাবে। শ্রীঠাকুরও তাই করেন ··কখন এটা একটু, কখন সেটা একটু খান, নাড়াচাড়া করেন -তিন দিন এমন থাকার পর সে বিরাট ক্ষুধা যায় মিটে……

দক্ষিণেশ্বরে সেদিন এক সভা বসেছে—সভার মধ্যমণি, আলুথালু শিশুর মত কৌতূহলী আমাদের ঠাকুর—আর তখনকার প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ আর আর সাধক ও পণ্ডিতজন আছেন সদলে—মথুরও আছেন, আর আছেন যোগেশ্বরী ভৈরবী- জননীর মত সন্তানকে আড়াল করে। শ্রীঠাকুরের দেহের বিকার সব উন্মত্তের বিকার না মহাভাবের বিকাশ, সেই মীমাংসায় এ সভা আহ্বান করেছেন মথুর নিজে। প্রথমেই ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীঠাকুরের দেহের বিকারগুলিকে শ্রীমতী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাবের বিকারের মতই দিব্য, শাস্ত্র-সহায়ে সে কথা দৃঢ়কণ্ঠে প্রমাণ করতে সুরু করেন। শ্রীঠকুরের অবস্থা তখন আসর রসিক শিশুর মত—বেশ একটা আনন্দ কৌতূহলী আপন-ভোলা আচ্ছন্নে আছেন বসে, সঙ্গে কাবাব-চিনির বেটুয়া।

সব শুনে ভক্ত পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ বলেন, শাস্ত্রে যে উনিশটি মহাভাবের কথা আছে আর যার প্রকাশ কেবলমাত্র শ্রীমতী ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর জীবনবেদেই যায় দেখা যার দুই চারিটি মাত্র সাধারণ সাধকদের জীবনে দেখা দেয়—শ্রীঠাকুরের দেহে যেন সেই উনিশটি মহাভাবের বিরাট ঢল নেমেছে—জগদ্ধিতায়।—

অবাক বিস্ময়ে মথুর আর আর ভক্তেরা শুনেন সে কথা দূরাগত দৈবাণীর

মত—এতদূর আশা তাঁরা করেন নি। পুত্রের প্রতিষ্ঠায় যোগেশ্বরী ভৈরবীর জীবন-সানুতে জাগে অলকানন্দার হঠাৎ জলোচ্ছ্বাস···

শ্রীঠাকুর বলতেন,—আগে ফুল, তারপর ফল; তবে কোন কোন গাছে আগে ফল ধরে পরে ফুল হয়—স্বয়ং অবতীর্ণ ভাগবৎ প্রকাশের আবার কৃচ্ছ্র তপস্যার প্রয়োজন কি···উপনিষদে আছে সৃজনের তপস্যায় ব্রহ্মও হয়েছিলেন তপ্ত—'স তপো অতপ্যত"···গীতামুখেও ভগবান বলেছেন,—

> ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
> নানাবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥

যদিও আমার কর্তব্য বলে কিছু নাই, তবু আমি কর্ম করছি।

সব রকম সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করলে জগৎগুরুর পদবী গ্রহণ করা ত' সম্ভব নয়। তাই ভবতারিণীরই নির্দেশে শ্রীঠাকুরের এই সাধন-সমুদ্রে নিত্য নিত্য ডুবে যাওয়া ··

শ্রীশ্রীভবতারিণীর নির্দেশে যোগেশ্বরী শ্রীঠাকুরকে প্রথম বিধিবৎ সাধনে প্রেরণা দেন. এ সাধন তন্ত্রের সাধন···এর আগে একমাত্র ব্যাকুলতাই ছিল সাধনার সম্বল—শিশু যেমন মার জন্যে ব্যাকুল হয়, শ্রীঠাকুরও তেমনি অবুঝ আকুল ডাকে দেখা পান মার, এ আকুলতা এ অভ্র-বিলেহ ব্যথা—স্বয়ং ভগবানের ব্যথা - এঁর নিরিখ কে বুঝবে? ভগবৎ বিরহে গৌরসুন্দরের চোখে ঝরণার মত জল ঝরত আর মহাভাব-স্বরূপিণী শ্রীমতীর কৃষ্ণ-বিরহ আজও ভক্তি-রাজ্যে চির অচিন্ত্য হয়েই আছে।

শ্রীঠাকুরের দিব্য অনুভূতি যে শাস্ত্রসিদ্ধ, মস্তিষ্কের বিকার মাত্র নয়, একথা প্রমাণ করতে ভৈরবী যোগেশ্বরী দেবতার উত্তরসাধিকার পদগ্রহণ করেন, রহস্যময় তন্ত্রপথে—বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানি তন্ত্র, একে একে সুরু হয় তাদের সাধন। তৈরী হল পঞ্চবটী, বিল্বমূলে পঞ্চমুণ্ডীর আসন—নিত্য অমানিশায় সুরু হয় নব নব সাধন লীলা। গহিন রাত্রির অন্তরালে, ততোধিক গহিণ তন্ত্রসাধনার দুএকটি করতেই অধিকাংশ পথিক হয় পথহারা শ্রীঠাকুরের সেই সব সাধনায় সিদ্ধি লাভ করতে কিন্তু তিন দিনের বেশী লাগে না। এইসব সাধনার সময় শ্রীঠাকুরের দিব্য উপলব্ধির ইতি করা যায় না· ·কুল-কুণ্ডলিনী দর্শন, ষোড়শী দর্শন অনাহত ধ্বনি শ্রবণ, অষ্টসিদ্ধিলাভ, মহামায়ার দর্শন– এদের মধ্যে ষোড়শী-

মূর্তি রূপে অপরূপ—দেহ-সুষমা যেন গলে গলে চারিদিকে জমা হয়ে আছে। এমনি আরো কত…আর নিজের আলো-পুলকিত-তনু— তার প্রকাশে ভাষা যে দিশা হারায়।

এই সব সাধনার ফলে শ্রীঠাকুরের সন্তানভাবের প্রতিষ্ঠা হয় পূর্ণ—দেহ মনে এসে যায় এক অপরূপ দিব্যতা.. এই রূপের কথা বলতে গিয়ে শ্রীমা বলেছেন, — থম থম করে চলে যেতেন গঙ্গায় নাইতে, লোকে চেয়ে থাকত—ঐ উনি আসছেন। দেহে সোনার ইষ্টকবচের সঙ্গে অঙ্গকান্তি থাকত এক হয়ে।

…বিদ্যুৎবন্ত ললিত-লাবণিম সে শিবতনুর রূপ ঢাকতে শ্রীঠাকুরকে চাদর ব্যবহার করতে হত— মা ভবতারিণীর কাছে জাগত কাতর প্রার্থনা,— ঢুকে যা, ঢুকে যা। ছেলের এ কাতর প্রার্থনা মার কাছে অপূর্ণ থাকে নাই এবার শ্রীনিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব - ভৈরবী মার কথা • তাই কি ঠাকুর ধ্যানের বুকে ধরা দিতেও হয়ে যান অধরা।

এই তন্ত্র-সমুদ্রে শ্রীঠাকুরের দীর্ঘ দুই বৎসর যায় কেটে—সন বারশো সাতষট্টির শেষ থেকে বারশো উনসত্তর পর্যন্ত।

পনেরো

মায়ের কৃষ্ণায়ত চিন্ময় দুটি চোখের ইঙ্গিতেই বুঝি সুরু হল বৈষ্ণব সাধনার অভিনব ইতিহাস—সাধনার প্রথমেই সুরু হয় সাধুসন্তদের সেবার ব্যবস্থা— বৈষ্ণব সেবন। কৃপাধিকারী মথুরের আর তর সয় না। সঙ্গে সঙ্গে একটি ঘর সাধুদের সেবাসম্ভারে হয়ে ওঠে পূর্ণ। লোটা কম্বল, এমন কি সাধনের দ্রব্যাদি— অন্নপানির ত কথাই নাই—

শ্রীঠাকুরের কথা,—ফুল ফুটলে ভ্রমর এসে জুটে— তাই ভ্রমরের মত সাধককুল আসতে সুরু করল দলে দলে। পঞ্চবটীতে বসে যায় সন্তদের দিব্যমেলা, আর মুখর হয়ে ওঠে সন্তদের দিব্য ভজনে—এক এক সময় এক এক রকম সাধুদের ভীড় লেগে যায়, শ্রীঠাকুরেরই কথা.—সব পেট বৈরাগীর দল নয়, ভাল ভাল সাধুরা সব আসতেন—তাদের—সাধনে, ভজনে, আলাপে, সংলাপে দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠত উজ্জ্বল, আর দেখা যেত তাদের মধ্যমণির মত শ্রীঠাকুর আছেন বসে —সাধুদের রাজা, সব পথের দিশারী—দিব্যভাবে দলমল।

এমনি এক প্রেমমঙ্গল দিন, দেখা যায় ভাবরসে বিভোর এক সাধু এসে আসন বিছালেন পঞ্চবটীর কল্পমূলে—সন্ধানীর চোখ মেলে ঠাকুর এক ইঙ্গিতেই ধরতে পারেন এই আধিকারিক পুরুষকে—বুঝতে পারেন একে দিয়ে মার এক বিচিত্র বিলাস হবে অদূর দিক-রেখায়।

প্রথম চার বৎসরে সাধনের যে ঝড় বয়ে গিয়েছিলো—কখন দাস্য ভাবে, কখন সখ্য ভাবে—দিন যে কিভাবে কেটে যেত তার কোনো নিবিখ ছিল না। ভক্তরাজ মহাবীরের দাস্যভাবে বৃক্ষ আরোহণ আর ফল মূল আহার ..দেহ মনের এই একত্র সাধন শ্রীঠাকুরের চিরদিনের রীতি ছিল—শুধু মনের সাধনে, শুধু দেহের সাধনে তৃপ্তি হত না কোনদিনই · দেহেরই মন আর মনেরই ত দেহ···

বাৎসল্য-ভাব সাধনের আগে স্ত্রী ভাবের আরোপে সাধনা হয়ে গেছে সুরু··· সেদিন জানবাজারে রাসমণির বাড়ীতে পূজার মহামহোৎসব···ভক্ত মথুর দেখেন এক মহীয়সী মহিলা, নানা আভরণে মার পাশে চামর ব্যজনে নিবিষ্ট—সেবানুরাগে, ভাবে, তনুতীরে বিদ্যুদ্দাম বিকশিত···ওদিকে দেবীর শ্রীমুখে চিন্ময় হাসির একটুকরো—দিব্য আবেশে মন্দির যেন থমথম করছে। ভক্ত মথুর পারে না বুঝতে, কে ইনি? অন্তঃপুরে যান ছুটে গৃহিণীর কাছে; অবাক বিস্ময়ে শুনেন,—চিনলে না, ওযে আমাদের বাবা—স্ত্রীবেশে মাকে চামর করছেন। চেনা দুষ্কর। নিজেই বলতেন,—অচিনে গাছ দেখেছ, কেউ চেনে না।

ভাবের রাজা শ্রীঠাকুর যখন যেভাবে থাকতেন, তাতেই তন্ময় হয়ে যেতেন, ডাইলিউট্ হয়ে যেতেন—শ্রীঠাকুরেরই কথা,—ভক্তি ভাব, কোমল ভাব·· তাই এই ভাব সাধনের সময় শ্রীঠাকুর স্ত্রীবেশেই বরদেহ করতেন সজ্জিত—দেহমনে প্রকাশিত হত সেই বিলাস বিভ্রম, চামর করা, মালা গাঁথায়, কেটে যেত কত দিব্যদিন—দিব্যরাত।

এমনি করে বাৎসল্য রস সাধনের মুখে শ্রীঠাকুর নিজেকে তৈরী করে নিচ্ছেন, এমন সময় এই জটাধারীর হল প্রকাশ আর মার ইঙ্গিতে শ্রীঠাকুর তাঁর কাছে রামাৎ সাধনে নিলেন দীক্ষা।

বাবাজীর ছিল গোপন সাধন—বাইরে দেখা যেত একটি অষ্টধাতুর রামলালা মূর্তি নিত্যসঙ্গী। সেবা-পূজায়, তন্ময় আকুলতায়, মূর্তি যেন মূর্ত · জীবন্ত—দিব্য. ·· এর অন্তরালে যে অদ্ভুত রহস্য ছিল লুকানো, সন্ধানী দৃষ্টিতে সেটির পড়ে যায়

ধরা—ঠাকুর দেখেন অষ্টধাতু নয়! এ যে চেতনঘন লীলামূর্তি।···দক্ষিণেশ্বরের রম্য একদিন—একদিকে হরছন্দা গঙ্গা, অন্যদিকে পূজাছন্দিত মন্দিরশ্রেণী। শ্রীঠাকুর আছেন বসে নিজ গর্ভগৃহে, লীলাস্ফুরিত তুটি আঁখি—সহসা বাবাজী আসেন ছুটে—চোখে এক মরণ মোহ···স্খলিত তুই চরণ...যেন সর্বহারা · এসেই যেন চিরচাওয়ার ধনকে পান, আঁকড়ে ধরে বুক নিঙড়ে বলেন,—আমি এত কষ্ট করে রেঁধে বেড়ে তোর জন্যে বসে আছি আর তুই এখানে খেলছিস—আমার সারা জীবনের মরণ সাধনার এই ফল? দয়ামায়া তোর কপালে সাত জন্মেও লেখেনি - বনে চলে গেলি, বাপ কেঁদে কেঁদে মরে গেল—তোর ভ্রূক্ষেপ নেই—তাতে আবার আমার মত দীনের জন্য তোর আর কি ব্যথা বাজবে বল্? চোখের জলে, অভিমানে যেন ভেঙ্গে পড়েন - তারপর তাকে ধরে নিয়ে যান ছোট ছেলের মত···একি সাধনা, না সিদ্ধি, না সিদ্ধের সিদ্ধি···।

চির মনের মাণিক, গোপন ধনকে এমনি ভাবঘন শিশু-মূর্তিতে পাওয়া যে কত যুগের কত জন্মের সাধনা তা বলা কঠিন যাই হোক বড় চুম্বকের টানে কিন্তু এই ভাবঘন শিশুর আর জটাধারীকে মনে ধরে না - তার হাতে খাওয়া, তার আদর আবদার যেন মনেই পড়ে না। সে ছুটে ছুটে আসে শ্রীঠাকুরের কাছে। বায়না ধরে এটা খাব, সেটা করব; কখন বা কোলে উঠবে, চলতে যেন পারে না—কখন কোলে আর থাকবে না—রোদে ঘুরে বেড়াবে—রাঙা চরণ ব্যথার ধুলায় কেমন সাজবে তাই দেখতে যেন অবুঝ··রোদের তাতে, রাখাল ছেলেদের সঙ্গে খেলার বিলাস যে যুগে যুগেই হয়েছে—ভুল ত হবার নয়···ওদিকে বাবাজী অশ্রু-সায়রে থাকে বসে উপচার সাজিয়ে—বিরহ অভিমানে ধূলায় লুটায় তার জটিল শির···লীলা হয় ভক্ত ভগবানে—এবার লীলা দেবতার সঙ্গে দেবতার - যুগে যুগেই এ লীলা সাগরের মত উচ্ছল। হয়ত গঙ্গায় নাইতে যাবেন - রামলালা নিলো সঙ্গ।· গঙ্গায় নেমে ঝাঁপাই ঝুরচে—যত বারণ করা যায় ততই উচ্ছলতা চলে বেড়ে···সরযূর নীল জলে নীলকান্ত-তনুর বিলাস জাগে মনে; উপরে আর কে ওঠে? শেষে ঠাকুর ধরেন চেপে—ভয়ে ত্রস্তে লীলায় জাগে থমক অসময়ের বায়না—ক্ষিদে পেয়েছে, কি আর থাকবে—কিছু খই হল দেওয়া · হঠাৎ ওকি? ছেলে ওঠে কেঁদে—খইতে ছিল ধান জিভ গেছে চিরে···মায়ে পোয়ে হয় অশ্রুর বোঝাপড়া—যে মুখে রাণীর ক্ষীর, সর দিতে হত কত কুণ্ঠা, সেই মুখে দিয়েছি ধান. আবার জিভ গেছে চিরে—কমল ঠোঁটে অশ্রুর

চুমা পড়ে ঝরে—বেড়েই ওঠে ব্যথা। শ্যামল নীলতনু—নাচন ছন্দে কখন আগে কখন পিছে যায় ছুটে—দিনে দিনে লীলার কমল যেন শতদল মেলে ওঠে ফুটে···ওদিকে জটাধারীর বুকে দুকুল-ভাঙ্গা বিরহ। শেষে একদিন জটাধারী এল শ্রীঠাকুরের কাছে—বিষাদ থমকিত—বর্ষণ-ক্ষান্ত মেঘের মত—চোখে অশ্রু হাসির শরৎ—এসেই বলে—ঠাকুর আমার—আমার লালজী, আজ আশ মিটিয়ে যেমনটি চেয়েছি তেমনটি হয়েই দিয়েছে দেখা—আজ আমার আর কোন দুঃখ নেই। আজ তোমার কাছে থেকে ওর সুখ, সেই আমার পরম আনন্দ—লালজী বলেছে সে আর যাবে না—তোমার কাছেই বেদনার ধনকে রেখে যাব ···তাই তোমাদের দুজনের কাছে চাই বিদায়—চির বিদায়···এমনি করেই কি প্রীতির বন্ধনে ঘিরে আবার নিজেই দাও ছিঁড়ে নিঠুর নির্মম বিরহ-কোমল হাতে ···নিত্য লীলার একি বিলাস—কে জানে···

—শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী সার্থক—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতার্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্বাহো কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্॥

যোগেশ্বরী ভৈরবীর কাছে প্রবর্তকের যে সাধনা, সেই সাধনার সিদ্ধের সিদ্ধি হল সাধকাগ্রণী জটাধারীর কাছে বাৎসল্য ভাবের দীক্ষায় আর শিক্ষায় ·· জটাধারীও পেলেন শ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর সাধনার প্রতিষ্ঠা। শ্রীঠাকুরের পূতসঙ্গে বাৎসল্য ভাব সাধনায় তিনি যে এগিয়ে পড়েন একথা তাঁর নিজের কথা থেকেই আমরা বুঝতে পারি · শ্রীঠাকুর সবাইকে এগিয়ে পড় বলতেন, কাঠুরের গল্পটি বলে—এ শিক্ষা তাঁর জগৎগুরু পদবী গ্রহণেরই ফল।

তবে জটাধারী আর রামলালার সঙ্গে ঠাকুরের যে মধুর লীলা বিলাস তার তুলনা ইতিহাসে পাওয়া দুরূহ। জটাধারীর মত সাধক যুগে যুগেই বিরল—ইষ্টের দর্শন লাভই বিরল; তার উপর সেই ইষ্টকে নিত্য নিত্য চিন্ময়রূপে দেখা আর তার সঙ্গে বিলাস আরো দুর্লভ! আবার শ্রীঠাকুরের সেই চিন্ময় রূপকে, জটাধারীর অতি প্রিয় বহুদিনের সাধনের ধনকে আপন করে নেওয়া আরো দুর্লভ···চিদঘন ভাবমূর্তিকে নিয়ে এমনি কাড়াকাড়ির বিলাস ভাবরাজ্যের রাজা

ছাড়া আর কারো জীবনবেদে আছে বলে আমাদের জানা নাই। পৃথিবীতে এ লীলার পুনরাবৃত্তি আজও হয়নি—

ষোল

মানুষের মনে তিনটি ভাব আছে—চিন্তা, বোধ ও ইচ্ছা—পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের এই মত। এরা একত্র থাকে আর এদের পৃথক করাও কঠিন। তবে যখন যেটির হয় বেশী প্রকাশ, তখন সেটিই আমাদের কাছে বেশী কার্যকরী হয় সাধনার রাজ্যে এগুলিকে করা হয়েছে উপায়স্বরূপ। মধুর ভাবে বা ভক্তিযোগে, বোধ বা ফিলিং তত্ত্বের ওপর জোর দেওয়া হয়, জ্ঞানযোগে, চিন্তা বা থিঙ্কিং তত্ত্বের উপর জোর থাকে, আর রাজযোগে, উইলিং বা ইচ্ছা তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে। যার মনে যে তত্ত্বের প্রাধান্য থাকে, তার ভগবৎসত্তার সঙ্গে সেই ভাবে সাধনায় আশু ফল লাভ হয় এ সুনিশ্চিত। তন্ত্রের সাধনাতেও এই ভাবে সাধনাকে সহজ গতিশীল করা হয়েছে। তবে ভাবের আবেগ-শৈলে, মানুষের পতন হওয়া স্বাভাবিক। চিন্তা বা ইচ্ছার রাজ্য অপেক্ষাকৃত কঠিন আর পতনও তেমনি অপেক্ষাকৃত অস্বাভাবিক। আর ভাবাবেগের পথ সহজ পথ, তাই সাধনায় এই পথের পথিকদের সংখ্যাই অধিক। আর তাদের পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনাও সেই কারণে অধিক। অবশ্য বাংলার আকাশে বাতাসে ভাবের আধিক্য থাকায়, বেদান্ত সাধনার পরিবর্তে তন্ত্র ও বৈষ্ণব সাধনার উর্বর ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে বাংলার মাটি।

সাধারণতঃ বৈষ্ণব মতে ভাব পঞ্চরসাশ্রিত - শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তভাব ছিল ঋষিদের আর দাস্য ভাব মহাবীরের। সখ্যভাবে ব্রজবালকগণ ভগবানকে লাভ করেছিলেন। বাৎসল্যভাবে জননী যশোদা শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করেন আর শ্রীমতী ছিলেন সর্বভাবময়ী—মধুর ভাবের মূর্তবিগ্রহ—শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি—শ্রীমতীর ভাবের অংশ মাত্রও জীবের সাধ্য নয়, বৈষ্ণব আচার্যদের এই মত— রায় রামানন্দ মুখে মহাপ্রভুর আস্বাদন—

ইহার মধ্যে রাধার প্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥॥

পঞ্চভাবের মধ্যে গোস্বামীপাদগণ ব্রজবনপুষ্ট মধুরভাবকেই সর্বপ্রধান স্থান

দিয়েছেন। অবশ্য শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর—ভাবপঞ্চকের ক্রমান্বয়ে একে তার পূর্ববর্তীর ভাবযুক্ত হয়ে থাকে ; আর মধুর ভাব সর্বভাবের শীর্ষে থেকে সর্বভাবের মাধুর্য আস্বাদন করায়। মনের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, যে-কোন ভাবের মধ্যে অন্য ভাবগুলি বীজাকারে রয়েছে। তবে বর্তমান মনো-বিজ্ঞানীরা মাতৃভাবের (মেটারন্যাল্ ড্রাইভ্) প্রাধান্যের কথা ব্যবহারিক ভাবে দেখতে পেয়েছেন, একথা পাশ্চাত্য শাস্ত্রে আমরা পাই। শ্রীঠাকুরকে জননী ভবতারিণীও এই কথাই জানিয়েছিলেন সাধনার শেষ রহস্য হিসাবে—মাতৃভাব, সাধনার শেষ কথা—তাই শ্রীঠাকুর সব ভাবসাধনে ডুব দিলেও মাতৃভাবেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রেখেছিলেন আজীবন।

মার ইঙ্গিতে মধুর ভাব সাধনে অগ্রসর শ্রীঠাকুরের বেশভূষার পরিবর্তন আপনিই হয়েছিল। উপনিষদে আছে "তপসোবাপ্যলিঙ্গাৎ"···তপস্যা করবার সময় যথাযথ চিহ্নধারণ দরকার। শ্রীঠাকুরও তাই যখন যে ভাবে সাধন করেছেন তার উপযুক্ত চিহ্ন বা ভেক ধারণ স্বতঃই করেছেন। এমনি করে শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা করতেই যে অবতারদের আগমন। স্বামিজীও বলতেন,—এবার নিরক্ষর হয়ে আসার উদ্দেশ্য – শাস্ত্র যে সত্য—শাস্ত্রে কিছু কিছু প্রক্ষিপ্ত অংশ থাকলেও শাস্ত্রের যা মুখ্য কথা যা চিরদিন দ্রষ্টাদের সত্য উপলব্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত, তাই প্রমাণিত করা। যাই হোক দেখা যায় – তন্ত্র সাধনার সময় রুদ্রাক্ষাদি ধারণ, বাৎসল্য সাধনায় বৈষ্ণব জনোচিত চন্দনাদি ধারণ, আবার বৈদান্তিক সাধনকালে গুরু দত্ত কাষায় ধারণ করে শাস্ত্র মর্যাদা রক্ষা করেন। মধুর ভাবের সাধন সহায়ক স্ত্রীজনসুলভ বেশভূষায় নিজ বরাঙ্গ সজ্জিত করেছিলেন, এই প্রয়োজনে—একদিকে শাস্ত্র মর্যাদা···অন্যদিকে দেহ মনে সাধনার সঙ্গতি···ভগবান ইশার বাণী,—আমি পূর্ণ করতেই আসি, নষ্ট করতে নয়।

আজু দখিনাপুরে নব আনন্দ বাধাই····

সেদিন উষার মাঙ্গলিকের মত সবার চোখে এক অপরূপ দৃশ্য পড়ল—

রাই করত অভিসার
শিরিষ কুসুম জিনি কোমল পদতলে
বিপথে পড়ত অনিবার।

যেন দখিনাপুরের নবব্রজে আজ ব্রজেশ্বরী স্বয়ং অবতীর্ণা—রাতুল রক্তোৎপল চরণ আধ ধরণীর ধূলায় পড়ে কি না পড়ে, চাঁচর কেশপাশ, আভরণ সিঞ্জিত বরদেহ—

হাতে ফুলের সাজি...সকলে চমকিত হয়ে ভাবে কে বরবর্ণিনী···ভাগিনেয় হৃদুও দূর থেকে ভাবে কে ইনি...কাছে এসে দেখে···এযে আমাদের ঠাকুর···মধুর ভাবে আজ বিরহিণী সেজেছেন—মথুরামোহন পরমানন্দে এনে নিয়েছেন সব আভরণ ইষ্টের চরণে···কান্তভাবের সাধনা, বিরহের সাধনা, বুক নিঙড়ে ওঠা নয়নাসারে বুক যায় ভেসে—অন্তর মথিত করে নিরন্তর জাগে -কোথায় ব্রজরাজ—কোথায় মধুর মথুরাপুর - বল্লভের জন্য গাঁথেন মালা, বুক-ভাঙ্গা আকুতি নিরন্তর হয় নিবেদিত – বিরহ জরজর তনুতে আবার জাগে সেই প্রথম দিনের দাবদাহ—বুক নিংড়ে জাগে—কোথা সেই শ্যামসুন্দর নিঠুর নটবর মোহন মুরলীধারী --কখন মা ভবতারিণীর চরণান্তিকে জানান ব্রজরাজের দর্শন প্রার্থনা—কাত্যায়নীর প্রসন্নতা না হলে ত শ্যামলসুন্দরকে যাবে না পাওয়া···কৈশোরের স্বপ্ন ছিল ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা হব—সুন্দর হবে বরতনু—আর থাকবে একটি গরু, সারাদিন তার দুধে মিষ্টান্ন করে রজনী জেগে অপেক্ষা করব শ্যামল কিশোরের অভিসারের—সে বেদনার অভিসার আজ আর স্বপ্ন নয়—সেই ব্রজমাধুরীর অপার্থিব বিলাস ধূলায় বিলাতে আজ বুঝি শ্রীমতীর নব বরবেশ··· ইতিহাসের এ এক নব-ভারতী···শাস্ত্র হয়ে ওঠে উজ্জ্বল···ভক্তের প্রাণতীর্থে জাগে অনুরাগের বর্ষণ··· ।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দেহ বিগ্রহে শ্রীকৃষ্ণ বিরহে অষ্টসাত্ত্বিক বিকারের কথা শুনা যায় শাস্ত্রমুখে—শ্রীঠাকুরের শরীরেও সেই অনুভব, সেই দাহ, বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণ ···সেই সবই গিয়েছিল দেখা, আর তাঁরই মত কৃষ্ণ বিরহের অসহ যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে মৃতের মত থাকতেন পড়ে···ভাবেতে ভরল তনু হরল গেয়ান।

বৈষ্ণব মতবিবেকে আছে শ্রীমতীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ দর্শন অসম্ভব—শ্রীঠাকুর এবার শ্রীমতীর কৃপাকণার জন্য, তাঁর প্রসন্নতার জন্য সেই বেদন গহন রূপাসায়রে নিজেকে ফেলেন হারিয়ে···নিরন্তর সেই বররূপের ধ্যানে হলেন তন্ময়—এই বুক নিঙড়ান আকুলতায় অভিষ্ট যে সরে থাকতে পারে না কোন দিন—সহসা এল সে সুদিন · মহাভাবময়ী, শ্রীকৃষ্ণ-প্রেম-স্বরূপিণী শ্রীমতী দিলেন দর্শন—নাগকেশরের কেশরের মত রম্য সে রূপ--সে অরূপ রূপের ত বর্ণনা হয় না···মহাজনদের যুগ যুগ সাধনা হার মেনেছে সে রূপকদম্বের প্রকাশে—

যাঁহা যাঁহা অরুণ চরণ চল চলই
তাঁহা তাঁহা থল কমল দলমলই ।

যাঁহা যাঁহা নয়ন বিকাশ

তাঁহা তাঁহা কমল পরকাশ।

যাঁহা লহু হাস সঞ্চার

তাঁহা তাঁহা অমিয়া বিথার

হেরইতে সে ধনি থোর

অব তিন ভুবন অগোর ॥

আর আমাদের শ্রীঠাকুরের সে দর্শনে কি হল…

ভণয়ে বিদ্যাপতি সো বর নাগর

রাইরূপ হেরি গরগর অন্তর

দুইরূপ আর দুই থাকে না— এক হয়ে যায়।

ন সো রমণ ন হাম রমণী

দুঁহুঁ এক পেশল মনোভাব জানি…

মধুর ভাবের শেষ কথা— প্রেমাস্পদের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়া…আর ভিন্ন দেহমন থাকা ত সম্ভব নয়…

চণ্ডীদাসে কয়—দুঁহুঁ এক হয়—

হয় বা না হয় ভিন্ন…

কৃষ্ণ আস্বাদনের ছল আর যে রাখা যায় না…

রহে যে বসিয়া - দুঁহুঁ মিলাইয়া

সকল একই তনু…

এরপর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন হয়ে ওঠে অবাধ · যাঁহা যাঁহা নেত্র পড়ে, তাঁহা তাঁহা কৃষ্ণ স্ফুরে…মরমী কবিদের কল্পনা সার্থক করতেই যে পরম কবিদের আসা।

·· সেদিন আপনভাবে আপনহারা হয়ে আছেন বসে…বিষ্ণুমন্দির প্রাঙ্গণে… শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের আস্বাদন-বিলাসের থমকিত বিদ্যুতের মত এসে দাঁড়ান জ্যোতিঘন তনু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ…আর শ্রীমূর্তির পদদ্বন্দ্ব থেকে জ্যোতি তরঙ্গ এসে ভগবৎ স্পর্শ করে শ্রীঠাকুরের বুকে যায় মিলিয়ে—তিন বস্তুকে করে অখণ্ড… 'ভাগবৎ, ভক্ত ভগবান, তিনে এক একে তিন'…এই তত্ত্বের প্রকাশ সেদিন এমনি স্বতঃই হয়েছিল। ভগবান যেদিন ভক্ত হন সেদিন লীলা হয়ে ওঠে এমনি স্পর্শ পুলকের ধন—এমনি গহন নিবিড়।

মধুর ভাবের সাধন শেষ হয় আঠারশো পঁয়ষট্টি সালে। এর পরই আসেন অদ্বৈত সিদ্ধি নিয়ে পরমহংস তোতাপুরীজী, শুরু হয় সাধনের আর এক গম্ভীর অধ্যায় ।

সতেরো

দক্ষিণেশ্বরী ভবতারিণী ভবভয়হারিণী আছেন দাঁড়িয়ে—ত্রিনয়নে করুণা-নির্ঝর—আলোছায়ায় মন্দির করছে থমথম···চেতন-ঘন বিগ্রহ যেন কথায় আকুল—আকুল কালো চোখে যেন রয়েছেন পথ চেয়ে...। সহসা এসে দাঁড়ান ভাব গরগর শ্রীঠাকুর মার মুখ চাওয়া ছেলে, এসেই একান্ত আকূতিতে জানান অন্তরের প্রার্থনা - আর মাও দেন সম্মতি...সঙ্গে সঙ্গে চলেন তেমনি বেপথু পদে ···ফিরে যান গঙ্গাতীরের চাঁদনীতে, যেখানে দাঁড়িয়ে জটাজটিল এক দীর্ঘায়ত পুরুষ -প্রণামান্তে জানান মার অনুমতি·· ইনিই পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী - নর্মদাতীরে দীর্ঘ চল্লিশ বৎসরের সাধনায় বেদান্ত বিজ্ঞানে হয়েছিলেন সিদ্ধ — আর নির্লিপ্ত বায়ুর মত যদৃচ্ছা ভ্রমণরত হয়ে চলেছেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে—সিদ্ধ তীর্থঙ্কর...আজ এসে পড়েছেন শ্রীদক্ষিণেশ্বরে · জননীর বোধহয় ইচ্ছা ছিল স্নেহের দুলালকে বেদান্তের শেষ সাধনে দেবেন দীক্ষা আর তোতাপুরীজীরও হবে পূর্ণাভিষেক কালী-ব্রহ্মমন্ত্রে, দক্ষিণেশ্বরের সমন্বয়ের মহাসমুদ্রে ডুব না দিলে ত কারো পূর্ণতা হবে না আর ঠাকুরও হয়ত সেদিন সেই চাঁদনীতে বসে গাইছিলেন—ডুব ডুব ডুব রূপ সাগরে আমার মন—আর ভাবছিলেন অনন্ত ভাবসমুদ্রে আবার কবে ডুব দেব, আবার কবে মার অভয় চরণান্তকে কুড়িয়ে পাব নব তত্ত্বমণি।

দৈব প্রেরিত তোতাপুরী প্রথম দেখাতেই যেন কতকটা বুঝতে পারেন শ্রীঠাকুরকে—সেদিন চাঁদনীতে মার চিন্তায় একান্ত আনমনা—শ্রীঠাকুর আছেন বসে—আলোঘেরা মুখে চোখ পড়লে চোখ যায় ঠিকরে, হয়ে যায় সমাহিত ··। প্রথম দর্শনেই পুরীজী হন বিস্মিত, এমন উত্তমপুরুষ ত তাঁর দৃষ্টিতে পড়েনি কোথাও · বাংলার এই চঞ্চল প্রকৃতিতে এমন আধারও আছে!—আহত বিস্ময়ে ধীরে যান এগিয়ে—উত্তম আধার পেলে আচার্যের মন থাকে না স্থির।···ঈশ্বর-পুরীর প্রব্রজ্যা সে ত নবদ্বীপচন্দ্রের জন্যেই।

আকাশের অভিসারেই ত মেঘ ছুটে আসে—তার জন্যেই ত তার কাজল কালো রূপ— ।

জগৎগুরুদের জীবনবেদের কথায় কোথাও কারো কোন ক্ষুণ্ণতার হয় না উদয়·· পূর্ণতা সাধনের জন্যই ত তাঁরা আসেন—আসেন ধন্য করতে—আপন হতেও আপন করতে ..

দক্ষিণেশ্বরে সে সময় শোকতাপজীর্ণা জননী করছেন বাস, দেবতনয়ের সান্নিধ্যে—রিক্ত সরলতা নিয়ে ; নিত্য স্মরণ মনন এই ছিল তাঁর শেষ অবলম্বন। বিশেষ কোন চাহিদা, বিশেষ কোন আশা ছিল না কোনদিনই···আজও জীবনের এই শান্ত সন্ধ্যায় ঠাকুরই তাঁর একমাত্র আশার দেউটি, তাঁর অঞ্চলের নিধি, চির বুক-চেরা ধন। শ্রীমান মথুর ভক্তহৃদয়ের একান্ত আকুতিতে গেছেন সেদিন তাঁর চরণ-বন্দনায়। ভাবেন শ্রীঠাকুরকে একটি তালুক লেখাপড়া করে দিতে গিয়ে বিপত্তির কথা···সম্পত্তির নামে শ্রীঠাকুরের রুদ্ররূপ আর নিজের ব্যথাহত চিত্তে ফিরে আসা। চতুর ভক্ত মথুর এবার শেষ চেষ্টায় যান এগিয়ে বৃদ্ধা জননীকে যদি দিতে পারেন কিছু সম্পত্তি ··প্রশ্ন করেন,—ঠাকুরমা, আমার কাছে ত কিছু চাওনা, আমি ত পর নই, যা প্রয়োজন আছে দেবজননী আমার কাছে নাওনা চেয়ে। বারবার এমনি অনুনয়ে বৃদ্ধা পড়েন চিন্তায়, মনে পড়ে এক আনার তামাক পাতা, মুখে দেবার গুলেরই তাঁর অভাব···এই অর্থসর্বস্ব যুগে, এই নিত্য বর্ধমান বাসনার বহ্নিমুখে শ্রীঠাকুরের মত ত্যাগীশিরোমণিকে বুকে পেতে হলে এমনি সরল নিস্পৃহ জননীরই প্রয়োজন—তেজস্বী মথুরের দুচোখে নামে গঙ্গাধারা—মহৎ দেখে কাঁদতে পারা তবেই কাঁদা ধন্য হয়—চিরন্তনী এই বাণী···

মাতৃভক্তিতে শ্রীঠাকুর ছিলেন আদর্শ। যার মনে পাছে ব্যথা জাগে তাই তোতাপুরীজীর কাছে চাইলেন গোপনে দীক্ষা—পুরীজীও হলেন সম্মত ··আর অনিকেত সন্ন্যাসী নিজের আসন বিস্তীর্ণ করলেন পঞ্চবটী মূলে, শুভদিনের প্রতীক্ষায়···

ভারতের ভাগ্যে এমন শুভদিন যুগে যুগেই বিরল···যেদিন কেশব ভারতীর কুটীরে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসমন্ত্রে মুণ্ডন করেন তাঁর কপোলকুন্তল শত শত আকুল নরনারীর অশ্রু বিনিময়ে, জগতের মুক্তি-তীর্থ সৃষ্টি করতে ; সে এক বিষাদ সুন্দর দিন···আর এমনি আর এক অশ্রু-হাসির দিনে পঞ্চবটীর সাধন কুটীরের গোপনে

ভাব-বেপথু তনুতে শত সুষমা জড়িয়ে বসেছেন শ্রীঠাকুর আপনাকে নিঃশেষে আহুতি দিতে, জগতের দুঃখ দৈন্যের বিনিময়ে নিজেকে দিতে বিকিয়ে, শুধু জননী যোগেশ্বরীর চোখে জেগেছিল দুটি ফোঁটা অশ্রু—আর ধরণী মৌনমুখে, নিথরিত বুকে শুধু অপেক্ষাই করেছিল ভাবী মঙ্গল মহিমায়···

কৃতশ্রাদ্ধ. মুক্তির দিশারী সেদিন বসেছেন সমিদ্ধ হোমাগ্নি সান্নিধ্যে—পূত বৈদিক মন্ত্রছন্দে স্পন্দিত হয়ে উঠেছে বিশ্বের হৃদয়-তন্ত্রী· মধুছন্দার মন্ত্রমালায় মধু ক্ষরিত হচ্ছে আকাশে বাতাসে। সে ধ্বনি বিরাটের চরণ স্পর্শ করে যেন ফিরে আসে নব জাগরণের - নব উদ্বোধনের বাণী নিয়ে···মায়া উপহিত জীব চৈতন্যের স্বরূপ নিজেতে আরোপিত করে প্রার্থনা মন্ত্র ধ্বনিত হচ্ছে,—পৃথ্বী, অপ, তেজ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চ শুদ্ধ হউক—আহুতি প্রভাবে রজোগুণ প্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা ··এমনি বহু প্রার্থনায় হোম হয় শেষ। গুরুদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে ভূষিত শ্রীঠাকুর স্বয়ং ব্রহ্মের মত আছেন বসে আর তাঁর অগ্রে মহাভাগ্যবান পুরীজী বেদান্ত নির্ণীত উপদেশাবলী শিষ্যকে যাচ্ছেন বলে—উছলিত গঙ্গায় সেদিন যেন নিথরিত শান্তি...জননী ভবতারিণীর মুখে ফুটে উঠেছে রেদ হাসি··। আর ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী বলে চলেছেন,—যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা কথা শুনে তাহা তুচ্ছ, তাহাতে পরমানন্দ নাই। নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখম্· ·ইত্যাদি· সেদিন গুরু যেন সমস্ত শক্তি সমাহিত করে শিষ্যের অন্তরে ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভাসিত করতে চাইছেন নির্বিকল্প সমাধি সহায়ে—কিন্তু মায়ের ছেলে শ্রীঠ কুরের হল এক বিপত্তি—জগতের ইতিহাসে কোন সাধকের এ পর্যন্ত যে সঙ্কট উপস্থিত হয় নাই সেই দিব্য-সঙ্কটে ব্রহ্ম হলেন আবৃত। পুরীজীরও সঙ্কট ঠাকুরেরও সঙ্কট—মন নির্বিকল্প হয়েও যেন হয় না—সব বিষয় সহজেই হয় নিরস্ত কিন্তু ভবতারিণীর বরাভয়া মূর্তি—যুগে যুগে যাঁর কৃপায় হয়েছেন ধন্য—হারিয়েছেন নিজের সত্ত্বা—তাঁকে অ-বিষয় করা হয় না যে···শেষে জ্ঞান-খড়্গ স্বয়ং মা ই দিলেন যেন এনে—মাতৃমূর্তি গেল সরে···তখন নিত্যমুক্ত শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বরূপ শ্রীঠাকুর হলেন সমাধিতে আপনহারা—যেন কপাট পড়ল বার দুয়ারে ·· নামরূপাত্মক জগৎ হল অন্তর্হিত ··দেশকালাতীত আত্মাই শুধু বিরাজিত হয়ে থাকে স্বমহিমায়···আর তোতাপুরী বিরাট বিস্ময়ে চুপে চুপে কুটীর থেকে এলেন বেরিয়ে—দুয়ারে তালা দিয়ে নিজের আসন বিছালেন পঞ্চবটি মূলে, শ্রীঠাকুরের

আহ্বান প্রতীক্ষায় ··দিন যায় রাত আসে—উদগ্রীব প্রহর গণনায় পুরীজী হয়ে উঠেন আকুল—কুটীরে নাই কোন সাড়া—নাই কোন স্পন্দন—এমনি করে তিন দিন হল অতীত—শঙ্কাসঙ্কুল হৃদয় আর পারে না থাকতে, ছুটে যান কুটির সান্নিধ্যে · খুলে ফেলেন অর্গল···দেখেন জ্যোতির্মণ্ডলীতে ঠাকুর তেমনি নিবাত-নিষ্কম্প-দীপশিখার মত আছেন বসে—সমাধির নিস্তরঙ্গ সমুদ্রে—ভাবেন একি অদ্ভুত মায়া · যে নির্বিকল্প অবস্থা লাভ তাঁর চল্লিশ বৎসর সাধনার ধন তাই মাত্র এক মুহূর্তে অধিগত হল কোন রহস্যে—শিষ্যের লক্ষণ দেখে সন্দেহের অবকাশ মাত্র থাকে না ..আনন্দ বিস্ময়ে ভাবেন কে এই দিব্যপুরুষ—যাঁকে বেদান্ত দীক্ষা দিয়ে আজ তিনিও ধন্য··শাস্ত্রও পূর্ণ ··নব উষসীর উন্মুক্ত দ্বার দিয়ে ছুটে আসে এক ঝলক আলোর মাঙ্গলিক ..।

আঠারো

কিন্তু মার মুখে জাগে এক অলখ অদ্ভুত হাসি ..শ্রীঠাকুরের বেদান্তের অদ্বৈত সিদ্ধি ত হল, তবু পুরীজী কেন পারেন না দক্ষিণেশ্বরের মায়া নির্মুক্ত হতে ··পুরী গোস্বামীর নিয়ম ছিল তিন দিনের বেশী কোথাও থাকবেন না—নাগা সম্প্রদায়ের মণ্ডলীশ্বর তিনি—বায়ুর মত মুক্ত হয়ে বিচরণ করবেন দেশ হতে দেশান্তরে, এই ছিল তাঁর সহজ সঙ্কল্প শিশুর মত আবরণহীন, বন্ধনহীন জীবন ছিল পুরীজীর—দিবসের অধিক সময় শবের মত থাকতেন পড়ে ব্রহ্মধ্যানে—পাশে ধুনীর পূতঅগ্নি নিত্য সাক্ষীর মত থাকত জেগে, আর গভীর গম্ভীর নিশীথের গোপনে নির্বিকল্প ধ্যানে নিজেকে দিতেন বিলীন করে—এই ছিল তাঁর নিত্য নিয়মের বজ্রকঠিন বন্ধন···রহস্যময় শ্রীঠাকুর আর চির রহস্যময়ী জননীর মাঝে কি যেন হয় বোঝা-পড়া—গুরুদক্ষিণা ত দিতে হবে...গুরু শিষ্য আছেন·বসে; সম্মুখে নিত্য·সাক্ষের ধুনী। প্রশ্ন করেন ঠাকুর—হ্যাঁগো, তোমার আবার ধ্যান কেন—নির্বিকল্প সিদ্ধি ত হয়ে গেছে। প্রসন্ন ইঙ্গিতে পুরীজী দেখিয়ে দেন তাঁর চির উজ্জ্বল লোটাটি। বলেন,—নিত্য না মাজলে মলিন হয়ে পড়ে না? তেমনি মনকেও নিত্য সমাধিতে নির্মল রাখতে হয়। গুরুর এখনও বোঝার বাকী। শিষ্য দিব্য-হাসি হেসে বলেন, —যদি সোনার লোটা হয়?···গুরু বিস্ময় বিমুগ্ধের দৃষ্টিতে চেয়ে বলেন, সত্য, তাহলে আর মাজা·ঘষার নাই প্রয়োজন—নিত্য·পুরুষের মন যে সোনার লোটা...

তমসা ছাওয়া এক অমারাত্রি—পুরীজী উঠে বসেছেন, সমাধির নিস্তরঙ্গে মনকে করবেন বৃত্তিহীন—হব্যবাহন পবিত্র ধুনী হয়ে ওঠে উজ্জ্বল—পঞ্চবটী হয়ে ওঠে ধ্যানগম্ভীর। সহসা পঞ্চবটীর শাখায় জাগে এক অদ্ভুত কম্পন···চেয়ে দেখেন দীর্ঘাকৃতি এক পুরুষ নেমে আসছেন—ব্রহ্মনিষ্ঠ অভীপ্রতিষ্ঠ সন্ন্যাসী প্রশ্ন করেন,—কে তুমি? উত্তর আসে,—আমি এই দেবরামের রক্ষক—মহাদেবের অনুচর ভৈরব। পুরীজী হেসে উত্তর দেন,—উভয়েই ব্রহ্মের প্রকাশ—এস ধ্যান কর···স্মিতহাস্যে ভৈরব যান মিলিয়ে···

পরদিন তোতাপুরী আর ঠাকুর আছেন বসে—রাত্রের ঘটনা শুনে শ্রীঠাকুর বলেন, সত্যিই উনি দেবভূমি রক্ষক ভৈরব, আমাকেও দিয়েছেন দর্শন সময়ে সময়ে...।

সেদিন শ্রীঠাকুর একটু চিন্তিত—কোম্পানীবাহাদুরের বারুদখানা তখন দক্ষিণেশ্বরের পাশে—সরকার চাইলেন দেবস্থান অধিকার করতে রাজকীয় শক্তিতে—দেবতার চিন্তা—দেব-ভৈরব পারেন না সইতে। দেখা দিয়ে দিলেন আশ্বাস—রাণী রাসমণির কাছে সে যাত্রা কোম্পানীর হয় হার। আর একবারের কথা, পঞ্চবটীর নিশুত রাত্রি, ভৈরবের হল প্রকাশ। স্বামিপাদ তখন জ্বলছেন তপস্যার অগ্নিতে—জ্বলন্ত ধুনীর কাঠ নিয়ে নিজ অনুচরকে করেন সংযত—এ এক রহস্য বটে। অন্য একদিনের কথা—মথুরামোহনের ছেলের সংকল্প পঞ্চবটীতে করবেন জলসাঘর। শ্রীপ্রভুর জাগে উদ্বেগ, ডেকে বলেন,—কে আছ মহাপুরুষ —দেবস্থান যে যায়। ঝড়ের দোলায় এসে হাজির দেবানুচর—জানান অভয়ের ইঙ্গিত। আর এক রহস্যের কথা—পুরীজী শ্রীঠাকুরকে কিমিয়াবিদ্যা দানের সংকল্প জানান। এই বিদ্যায় ইতর ধাতুকে স্বর্ণে পরিণত করা যায়। গুরু-পরম্পরা প্রাপ্ত এই বিদ্যা সাধুসম্প্রদায় তাঁদের স্বার্থগন্ধহীন প্রয়োজনে ব্যবহার করেন। মাতৃনিষ্ঠ সন্তান, যাঁর প্রাণে নিত্য জাগ্রত—অষ্ট সিদ্ধি চাই না মা—তাঁর কাছে এ সব সিদ্ধাই যে একান্ত হেয় বলে পরিত্যক্ত হবে একথা বাহুল্যমাত্র। গুরুর এ শিক্ষারও প্রয়োজন ছিল।

পুরীজী পাঞ্জাবের লুধিয়ানার অধিবাসী ছিলেন বলে শুনা যায়, আর সাতশ নাগাসম্প্রদায়ের তিনি ছিলেন মণ্ডলীশ্বর—পরমহংস পদবীতে প্রতিষ্ঠিত। পরমহংস না হলে কেউ মণ্ডলীশ্বর রূপে গণ্য হতেন না—তোতাপুরীজী পরমহংসই ছিলেন। বিশেষতঃ যতদূর জানা যায় তিনি বাল-ব্রহ্মচারীরূপেই গুরু-গৃহে আসেন।

যোগীরাজ তাঁর গুরু, গুরুগৃহে গুরু সন্নিধানে ধীরে ধীরে জ্ঞাননিষ্ঠার ফলে চল্লিশ বছরের সাধনায় নির্বিকল্পে হন প্রতিষ্ঠিত ··'চারগাছে বেড়া দেওয়া' জীবন তিনি পান চিরন্তনের জন্যে—ফলে জগতে যে মায়ার খেলা কিছু থাকতে পারে,'সাবাস মা দক্ষিণে কালী. ভুবন ভেল্কী লাগিয়ে দিলি' বলে মহামায়ার কিছু খেলা থাকতে পারে—এ বিষয়ে পুরীজী ছিলেন একেবারে মায়া উপহিত। ভবতারিণীর কথা, শক্তির কথা, শুনে পুরীজী হতেন রহস্যে অধীর—ব্রহ্মজ্ঞানের দম্ভে, নাম করা শুনলে বলতেন, কাহে রোটী ঠোক্‌তে হো ? ভক্তির পথ—ভগবানকে আপন হতেও আপন করে নেওয়ার পথ যে সম্ভব —এ বিষয়ে তাঁর জানাশোনা ছিল একান্ত অল্প—তিনি শুধু জানতেন শান্তভাবে স্ব-স্বরূপে থাকা কিন্তু ঈশ্বরও যে মায়ার রাজ্যে মায়াধীশ – এ বিজ্ঞানে আজও তাঁর হয়নি দীক্ষা।

· কিন্তু সে পরিচয়ের দিন এসে পড়েছে—ব্রহ্ম এসে পড়েছেন মহামায়ার খাসতালুকে—শ্রীদক্ষিণেশ্বরে—পুরুষকারের সঙ্গে দৈবের আজ মহাপরীক্ষার দিন ··মনে পড়ে অবিমুক্ত ক্ষেত্রে বারাণসীতে আচার্য শঙ্করের সঙ্গে মহামায়ার ছলনা—গঙ্গা-গর্ভ হতে উত্থানে অসমর্থ আচার্যের কাছে জগজ্জননী জরতী বেশে দেন দেখা, বলেন,—গঙ্গা গর্ভে কেন বাবা ? . আচার্য উত্তর দেন,—মা আমি উত্থান্ শক্তিহীন·· হাসিয়া জননী দেন উত্তর,—কিন্তু, শক্তি যে মান না বাবা ?··· সহসা আচার্যের প্রজ্ঞা-নয়ন যায় খুলে আর সেই মুহূর্তে বেরিয়ে আসে প্রসিদ্ধ মাতৃগাথা···

> শিবঃশক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং
> নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি (আনন্দ লহরী)
> শক্তির চরণে পুরুষকারের ভূলুণ্ঠ প্রণাম···

রাত্রি নিথর, নিস্পন্দ···প্রকৃতির এই প্রকাশ-গোপন-রূপ নিয়ে মহাকালী অধরা অসীমারূপে আছেন দাঁড়িয়ে, অস্ফুট হাসিতে দিক দেশ-ছেয়ে...ঘুমন্ত আপনভোলা সন্তানের শিয়রে দাঁড়িয়েছেন স্নেহস্নিগ্ধ সর্বাণী, সর্বসন্তাপহারিণী বিশ্বজননী···যেন বেদমন্ত্রের নাসদীয় সূক্ত ধ্বনিত হচ্ছে—তখন সৎও ছিল না অসৎও ছিল না...তমাচ্ছন্ন জল ছিল কি···মৃত্যুও ছিল না, অমৃত্যুও ছিল না · দিন রাত্রির ব্যবধানে আলোও ছিল না···আদিতে অন্ধকার সমাচ্ছন্ন যেন প্রকাশহীন ছিল সৃষ্টির মহাজলধি – সেই অন্ধকার নির্বাণে নিজেকে বিলুপ্ত করতে গঙ্গাগর্ভে চলেছেন এক বিরাট পুরুষ···মন সমাধিতে অন্তর্মুখ – ধীর পদক্ষেপে চলেছেন

বিলুপ্তির পথে···নদী যেমন চলে সাগর বুকে হারিয়ে যেতে, সীমা যেমন নিত্য হারায় অসীমাতে...মুখে চোখে নাই কোন ক্ষোভ, নাই কোন শোকের রেখা—সহসা তাঁর অন্তর মথিত করে জাগে এক আকুল নিবেদন...এ কি মায়া—অগাধ গঙ্গা আজ জলহীন! ডুবে যাবার অত জলও নাই গঙ্গার বুকে—প্রায় পরপারে এসে পড়েন তবু জানুসম রয়ে গেছে জলরেখা·· সহসা সেই অরূপ হয়ে ওঠে রূপায়িত।

...জাগেন মহামাতৃকা...সৃষ্টি স্থিতি সংহারকারিণী ভবতারিণী···রহস্যময়ীর স্মিতাধরে ঠিকরে-পড়া করুণাকণায় ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত অপ্রমা যায় মুছে। সর্বসন্তাপহরা মার কোলে উঠে ছেলের নয়নপল্লবে নেমে আসে অফুরান শান্তি অসীম আনন্দ · ফিরে আসে নবজীবনের বাণী নিয়ে, নব-ছন্দের ঋক্ নিয়ে... আজ তিনি জেনেছেন তাঁর আপন মাকে—অসীমা আজ করুণার্দ্র রূপে দিয়েছেন ধরা ..গঙ্গাগর্ভ দ্রষ্টার অনুভূতিতে গভীর অম্বারবে ওঠে ভরে···ফিরে আসেন পায়ে পায়ে—অম্বাভবানী ধ্বনিতে গঙ্গাগর্ভ মুখর করে। নির্গুণ ব্রহ্মের আজ সাকার রূপে পেয়েছেন দর্শন ··আজ অম্বাভবানী তাঁর স্ব-স্বরূপ দিয়েছেন জানিয়ে —'লীলাও সত্য'—পরদিন শ্রীঠাকুর পঞ্চবটীতে এসে দেখেন সে মানুষ আর নেই।

তিনদিন থাকার ছিল ইচ্ছা, দীর্ঘ এগারমাস হয়ে গেছে সায়। যোগনিষ্ঠ দৃঢ় শরীর বাংলার জল হাওয়ায় হয়ে পড়ে কাতর—তোতাপুরীর দেহে অতিসার রোগের হল সৃষ্টি—সমাধির সপ্তভূমে মনকে আর যায় না রাখা—বার বার নেমে আসে মায়ার রাজ্যে, দেহ পিঞ্জরে, পঞ্চভূতের ফাঁদে—অনেক দিনের চেষ্টাতেও যখন অক্ষম হয়ে পড়েন তখন পুরুষসিংহ দেহ অধ্যাসকে চান গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন দিতে। ব্রহ্মলীন পুরুষ হবেন বিদেহমুক্ত, পুরুষকার সহায়ে—পুরুষকার সহায়েই তিনি হয়েছেন শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বরূপ · কিন্তু মহামায়ার রাজ্যে একমাত্র পুরুষ সেই পুরুষোত্তম—পুরুষকার যে তাঁরই·· আর মহামায়া যে তাঁরই স্বরূপ···তিনি দ্বার ছেড়ে না দিলে ত হয় না—শ্রীঠাকুর যা এতদিন পুরীজীকে বোঝাতে চেয়েছিলেন —এবার শ্রীঠাকুরের কথায় আর রহস্য জাগে না·· জাগেন অম্বাভবানী স্বয়ং।

বলেন,—দেখো মার কথায় রহস্য করতে, তাই মা তোমায় এতদিন আটকে রেখেছিলেন। আজ বুঝলে তাঁর স্বরূপ—জগজ্জননীর কৃপা না হলে কিছু হয় না। গাছের একটি পাতাও নড়ে না···সচ্চিদানন্দ-সমুদ্র কূলকিনারা নাই,

ভক্তি হিমে স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি ব্যক্তিভাব, কখন কখন সাকার-রূপ ধরে থাকেন—ব্যক্তি হয়ে দেখা দেন—আড়াই হাত দূরে শ্রীরামচন্দ্র যিনি সাক্ষাৎ ঈশ্বর—মধ্যে সীতা-রূপিণী মায়া ব্যবধান আছে বলে লক্ষ্মণ-রূপ জীব সেই ঈশ্বরকে দেখতে পান নাই। তাঁর কৃপা পেতে হলে আদ্যাশক্তিরূপিণী তাঁকে প্রসন্ন করতে হয়; তিনিই মহামায়া,—জগৎকে মুগ্ধ করে সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করেছেন। সেই মহামায়া দ্বার ছেড়ে দিলে তবে মন্দিরে যাওয়া যায়—বাইরে পড়ে থাকলে সেই নিত্য সচ্চিদানন্দ পুরুষকে জানাতে পারা যায় না···ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। আজ ছোট ছেলেটির মত তোতাপুরীজী সব শোনেন - গুরু-শিষ্য সম্বন্ধ যেন কোন সোনারকাঠির ছোঁয়ায় হয়ে গেছে রূপান্তর...শেষে একান্ত আকুতিতে বলেন,—তোমার মাকে এবার বল আমায় ছেড়ে দিতে—এখন বুঝেছি,—তাঁর কৃপাতেই বুঝেছি তাঁর স্বরূপ।

তখন দখিনা বায়ুতে মায়াপুরীর প্রভাতী সুর আসছে ভেসে—অলকানন্দায় সে ধ্বনি হচ্ছে ছন্দিত - গগনে ভুবনে স্পন্দিত হচ্ছে,—'লীলা-লীলা—মঙ্গল লীলা।'

নবারুণের আলোছায়াতে পূর্বাশায় জেগেছে অপরূপ মায়া মার মায়া··· আর মার মন্দির মুখে চলেছেন লীলা গরগর তনু শ্রীঠাকুর; হাততালিতে ছন্দিত হচ্ছে সাবাস মা দক্ষিণাকালী ভুবন ভেল্কী লাগিয়ে দিলি—আর পিছনে নতমস্তকে চলেছেন জটাজটিল ব্রহ্মসদৃশ তোতাপুরীজী, মুখে শ্রদ্ধার বেদহাসি··· এ যেন ভক্তির দিশায় এগিয়ে চলেছে জ্ঞান—দৈবের ইঙ্গিতে চলেছে পুরুষকার··· এই মহামিলনে মন্দির ওঠে ভরে—মা যে এই পরম-লগ্নের প্রতীক্ষায় ছিলেন অধীর। কৃপাধন্য পুরীজী মার চরণান্তিকে জানান বিদায়ের পরম প্রণতি আর ঝরে পড়ে দুটি ফোঁটা আকুতি, সমাধি নিথর নয়ন পল্লবে—আর মার করুণাবিথার নয়ন ভঙ্গে জেগে ওঠে প্রসন্ন স্নিগ্ধ আশিস্··বিদায় লগ্নের পরম পাথেয়···

উনিশ

সচ্চিদানন্দ সাগরের বিরাটশিশু—খেলতে খেলতে খেলায় হয়ে পড়ে শ্রান্ত··· নিজেই যেমন বলেছেন,—যারা ভাল মাছ ধরতে পারে, তারা যেমন মাছ

তোলার আগে খেলিয়ে নেয়—তেমনি মা ভবতারিণী সাধনার সায় করতে গিয়েও মাঝে মাঝে দিচ্ছিলেন ছেড়ে—আদরে জড়ান তাঁর সন্তানকে।

এমনি একদিন, ক্ষণে ক্ষণে সমাধির অতলে হারিয়ে যাওয়া তনুমন নিয়ে বসে আছেন পঞ্চবটীর শান্তনীড়ে। সহসা স্নেহাস্পদ মথুর এসে একান্ত আকুতিতে লুটিয়ে পড়ে অভয় চরণতলে, সর্বহারা উন্মাদের মত—কেঁদে বলে,—বাবা আমার সর্বনাশ হতে বসেছে, তোমার মেয়ে জগদম্বার আজ শেষ অবস্থা, ডাক্তারেরা সব আশা ছেড়ে দিয়েছে—আজ ইষ্টের সেবাধিকার থেকেও বঞ্চিত হতে চলেছি। ভক্তের আর্তিতে শ্রীঠাকুর আর পারেন না স্থির থাকতে, করুণার্দ্র কণ্ঠে অভয় দেন,—যাও সেরে যাবে। এরপর আর কোন রোগই ত থাকা সম্ভব নয়…পরে কিন্তু গোপন-লীলার ঠাকুর, অষ্ট সিদ্ধির ঐশ্বর্য যার কাছে খনি-ঢাকা মণি হয়েই রয়ে গেল—কথাটার মোড় ফিরিয়ে বলেন,—ঐ রোগটার ভোগ এই দেহটার ওপর দিয়ে হতে থাকল।—কয়েক মাস পেটের পীড়া আর সব অসুস্থতায় বরদেহ হয়ে পড়ে ক্ষিন্ন। কৃপাধন্য মথুরের কথা বলতে গিয়ে শ্রীঠাকুর বলেছিলেন,—মথুর যে এতদিন সেবা করেছিল, সেকি অমনি করেছিল—মা এর ভিতর দিয়ে তাকে অদ্ভুত অদ্ভুত অনেক সব দেখিয়েছিল।

অনাদি-সংস্কার প্রবাহে জীবের নির্বিকল্পে অবস্থা লাভ একান্ত দুরূহ। সাধারণ জীবকোটী এ অবস্থায় একুশদিন মাত্র দেহে থাকতে সক্ষম হয়। বেদান্ত শাস্ত্রে আছে—ব্রহ্মের কামনালীলায় সৃজনের এই শতপর্ণি শতদল—আর জীবের জীবত্বও ঐ কামনারই বন্ধন লীলা, ঘটে ঘটে, ঘরে ঘরে এই লীলায় সৃষ্টি বিধৃত ও পুষ্পিত। এই বাসনার পঞ্চ স্কন্দকে বুদ্ধদেব বলেছেন,—হে গৃহ-নির্মাতা তোমায় আমি চিনেছি আর গৃহ-নির্মাণে সক্ষম হবে না। সেই জন্মমৃত্যুর বীজ বাসনার নিবৃত্তি হলে আর দেহ ধারণ সম্ভব হয় না; তবে যাঁরা শ্রীভগবানের বিশেষ অধিকার নিয়ে আসেন, সেই আধিকারিক পুরুষদের আর অবতারদের কথা ভিন্ন। শ্রীযুক্ত মাষ্টারমশাই যেমন বলতেন,—অন্য সবাই যেন কলে ফেলে তৈরী আর অবতার যেন তাঁর নিজের হাতে তৈরী—এই আধিকারিক পুরুষ ও অবতার পুরুষেরা শ্রীভগবানের কৃপায় ও ইঙ্গিতে নির্বিকল্প ভূমি হতে নেমে আসেন—শ্রীভগবানের নির্দেশিত বিশেষ কর্মের অধিকার নিয়ে। এই সব লোকোত্তর পুরুষের উদয়েই ত উদয় অচলে জাগে স্বর্ণছড়া।

ফেলে আসা অশ্রুসরস সেই দিনগুলি—প্রথম আকুলতা—বুক ভাঙ্গা সেই

আকুলতাকে সম্বল করে চলেছে অধরাকে ধরার সাধন—মাও আকুল, ছেলেও আকুল—কখন মা চুম্বক. ছেলে লোহা—আবার কখন বা ছেলের আকর্ষণ আর মার অদর্শন—এই অশ্রুলীলার বিলাসে চলে যায় দিন ..লীলা উচ্ছলা জননী একদিন দেখা দিলেন—নয়ন ঠিকরে জগৎ যেন নড়ছে—নয়ন জুড়ান সে রূপ—বিশ্ব নিঙড়ান সে বাণী ..বলেন,—তুই অক্ষর হতে চাস ?···দিব্য শিশু ত জানেনা অক্ষর মানে কি? তাই উত্তরে থাকেন মৌনমুখে—ভাবেন একি লীলা লীলাময়ী। তবে উত্তর হয়ত পেয়েছিলেন মা জননী—আজ দীর্ঘদিন পরে এসেছে সেই অক্ষর হবার পরমলগ্ন—তোতাপুরীজীর শিক্ষায় ··

দক্ষিণেশ্বরের রঙ্গমঞ্চে সে এক করুণ দৃশ্যের অবতারণা···অদ্ভুত এক পুরুষ, অচাওয়া অতিথির মত এসে পড়েছেন পুণ্য দেবারামে—এসেই দেখেন পুরুষোত্তমের অক্ষর অবস্থা—অবস্থা ত নয়—ধরার ধূলায় দেব-শরীরকে লুটিয়ে দিয়ে ধূলাকে সোনা করে তোলার ছল। চুলগুলি ধূলায় গেছে জট পাকিয়ে—দিন কোন্ দিকে আসে, কোন্ দিকে যায় তার ঠিক ঠিকানা নাই—মুখে মাছি ঢুকছে শরীরে নাই সান—জীবনের চিহ্নমাত্র হীন—সে সোনার তনু ধূলায় ধূসর··· মনে পড়ে স্বর্ণপ্রতিমা উমা মহেশ্বরীর তপস্যা···দেহ হয়ে গেছে দিনচন্দ্রের মত নিষ্প্রভ। কালিদাসের বর্ণনায়—

'শশাঙ্ক লেখামিব পশ্যতে দিবা সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে'

আর মনে পড়ে শ্রীমতীর শ্যামবিরহে জরজর দেহ—

—সোনার বরণ হইল শ্যাম সোঙরি সোঙরি তুহারি নাম।

···কে বুঝবে মহাভাবের এ বিলাস—কে দেখবে ভবোদ্ভব এ মহিমা··· বুঝেছিলেন মার নির্দেশ এই বরেণ্য সাধু—ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি চিরদিন নাম, গোত্রহীন—সেই মহাপুরুষ এসেই পারেন বুঝতে ধূলায় ঢাকা এই মনের মণিকে, কেন মা তাকে টেনে এনেছেন বাঙ্গলার এই গঙ্গাতীরে। এসেই একটি রুলের মত লাঠি নিয়ে ধীর আঘাতে বরাঙ্গে আনতে থাকেন চেতনা—আর সেই অবসরে শ্রীমুখে ধরে দেন মার কিছু প্রসাদ···ধন্য সেই সন্তের চরণে সারাবিশ্বের প্রণাম হোক জড়ো। তবে জগতের মহান্‌রা অচেনা থাকাই ভালো—অমর্যাদাই যে জগতের নিয়ম।

মার বঙ্কিম-লীলাভঙ্গিম নয়নে জাগে ভ্রূকুটি···দেহ রাখতে হলে আর এ· অবস্থায় সন্তানকে রাখা চলে না। তখন সেই অখণ্ডের ঘরে জাগে বাণী,—

ওরে তুই ভাবমুখে থাক··ধীরে স্থূল চেতন রাজ্যে নেমে আসে মন—দীর্ঘ ছয়মাসের অবসানে···। নির্বিকল্পের অসম্ভবকে সম্ভব করে শ্রীঠাকুর হলেন বুথিত—তখন দেহে আর দেহ ছিল না···

উচ্চ-সাধনার ক্ষেত্র সব রকমে কুশল থাকে—দেহে মনে পারিপার্শ্বিকে একটা স্বচ্ছন্দের প্রয়োজন। শ্রীঠাকুরের মনের ত কথাই নাই—দেহও ছিল সুষমার সঙ্গে দৃঢ়তায় মণিমঞ্জুষা ..পল্লীজননীর স্নেহপুষ্ট দুলালের অঙ্গে সর্বকুশলতাই যেন পূর্ণভাবে ছিল জড়ান ; তাই দীর্ঘ বারো বছরের মরণপণ সাধনে শরীর ভেঙ্গেও চায়নি ভাঙতে – পড়েও যায়নি পড়ে – দেব বিগ্রহ চিরদিনই লীলা বিগ্রহ।

একে সর্বসমিধের নির্বিকল্প, তাতে আবার দীর্ঘ ছয়মাসের অবস্থিতি, দেবদেহ হল ক্লিন্ন—না জগদম্বা দাসীর রোগ গ্রহণে এল কঠিন দেহের ভোগ. কে জানে ·· জগতের পাপ তাপ গ্রহণে ভগবান ঈশামসির ক্রুশবিদ্ধ হওয়ায়..:দেবমানব বুদ্ধদেবের সারা-বিশ্বের দুঃখকষ্ট নিজ বরদেহে বরণ করে নেওয়ার প্রার্থনায় ধরণী একদিন ধন্য হয়েছে · মনে পড়ে গলরোগের জর্জর ব্যাধিতে শ্রীঠাকুর একান্ত ক্লিষ্ট—তবু ভাবের নাই বিরাম, মুহুর্মুহু সমাধিতে হয়ে যাচ্ছেন আপনহারা··· এমনি একদিন দেখেন বিদেহ হয়ে পুরুষোত্তম এসেছেন বেরিয়ে. আর তার পিঠময় ঘা—লীলাময় ভাবেন কখনও ত অন্যায় করিনি তবে কেন এত জর্জরতা··· মুহূর্তে ম' দেন অভয় ··এসব যে তাঁর আদর করে তুলে নেওয়া ব্যথার মণিহার। জীবের দুঃখ কষ্টে মন হয় অবুঝ, তাই স্পর্শলীলায় আপন করে নেন তাদের জন্ম-জন্মান্তরীন শোক তাপ—আর তার ফলে দেবদেহের এই সন্তাপ কর্মফল ত যাবার নয় - তাই সৃষ্টির মহামন্থনের বিষ নীলকণ্ঠেরই কণ্ঠশোভা···এ বিষ যে তাঁরই !

কুড়ি

শ্যামার দুলালের সাধ ছিল, সাধুর রাজা হব ভক্তের রাজা হব। ভব-ভয়হারিণী ভবতারিণীর নয়নকোণা রহস্যে হয়ে ওঠে ঘন, দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের মন্দিরে জেগে ওঠে সাধুর মেলা। পেটবৈরাগী সাধু নয়, বড় বড় সব তপস্বী সমর্থী সাধু—আর ধুম লেগে যায় তাদের বেদান্ত বিচারে—ব্রহ্ম জিজ্ঞাসায় যখন অমীমাংসার সমুদ্রে তাঁরা হয়ে পড়েন দিশাহারা, দিশারী দেন গতি-নির্দেশ—শুধু

কি নির্দেশ? সাধনরহস্যপুরীর চাবিকাঠি যাঁর হাতে—সপ্তভূমির ভূমাদৃষ্টি নিয়ে তিনিই দেখিয়ে দিতেন সমাধির রহস্য গহন অবস্থা—কথা বলতে বলতে হয়ে যেতেন নিবাত নিথর—আর সাধুরা দিশা পেয়ে দিশাহারা চোখে থাকতেন চেয়ে ধ্যান নন্দিত শ্রীমুখের পানে—কে এই লোকোত্তর পুরুষ—অসীম-গগন-বিহারী, যুগে যুগেই বিরল যাঁর আসা—স্মৃতি-সুরভিত দিক-চক্রবালে জাগে ধ্যান-সুন্দরের সেই বেদ-হাসি—চারিদিকে সাধুসন্তদের দিব্য-মেলা—আর তার মাঝে আলো করে বসে আছেন সন্তদের রাজাধিরাজ...মর্তে অমরার আমন্ত্রণ।

সেদিন হরি-চরণ-বিচ্যুত সুরধুনী হরিপাদ-স্পর্শে ফেনাস্যময়ী—আর দক্ষিণেশ্বরের চাঁদনীর ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন আমাদের বাসুদেব—বিশ্বময়, অলকার আলো ছিটান চাঁদনী—সহসা ব্যথাহারী করে ওঠেন আর্তনাদ—ছুটে আসে অনুচর হৃদয়, ছুটে আসে সমবেতরা—দেখে ব্যথাতুর ভগবানের পিঠে পাঁচটি আঙ্গুল রক্তরাগে উঠেছে ফুটে—চীৎকার করে ওঠে ব্যথার ব্যথী হৃদয়রাম, —কে এ কাজ করলে মামা? রহস্যে দেখিয়ে দেন কলহরত মাঝিদের। একি বৈদান্তিক বিশ্বানুভূতি না বিশ্বার্তিহারী নারায়ণের করুণাদ্ররূপ···।

আর একদিন, ধরার অলকা দক্ষিণেশ্বর সেদিন শ্যাম-শোভায়, হরিতে হিরণে, দখিণার শিহরণে হয়ে উঠেছে স্বপ্নাতুর আর স্বপন সুরভিত, আপনহারা ভাব-বিলসিত তনুতে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বময় করুণকান্ত গদাধর সুন্দর—শ্যাম ধরণীর সঙ্গে এক হয়ে গেছে শোভন শ্যামতনু—সহসা জাগে এক আর্তি—অনুতে অনুতে যে সূক্ষ্ম তনুর বিথার—সেই তনুতে জাগে বিশ্বের ব্যথা•••বাইরে দেখা যায় শ্যাম-তৃণদল দুপায়ে দলে কে যেন গেছে চলে—।

দক্ষিণেশ্বরের দিব্য নটমঞ্চে সেদিন সুরু আর এক অভিনয়···রহস্যময়ী জননীর মত ঘনিয়ে এসেছে সন্ধ্যার অন্ধকার—পঞ্চবটী ছায়াময়, ঠাকুরের শ্রীমন্দির তিমিরান্বিত···বাসুদেবকুটীর এক অস্ফুট ধ্বনিতে, বিজাতীয় ধ্বনিতে, ছন্দিত হচ্ছে—আকুল আবেগোচ্ছল আল্লার নামে মর্ত্যগৃহে নেমে এসেছে অমর্ত্যের মহিমা···সহসা কুটীর ঘর বিদ্যুৎ-বিলাসে হয়ে ওঠে বিহ্বল—দেখা যায়—দীর্ঘ-শ্মশ্রু বিশিষ্ট গম্ভীর এক পুরুষের দিব্য আবির্ভাব, আর তাঁর সম্মুখে নতজানুতে অবস্থিত শ্রীঠাকুর—দুই দেবমূর্তির অন্তরাল নিমেষে যায় মুছে—আর শ্রীঠাকুর হয়ে যান সমাধি উধাও।

শ্রীঠাকুরের বেদান্ত সাধনেই ভারতীয় সাধনায় সুদীর্ঘ পরিক্রমার হয় অবসান।

এই দেবমনের এমনই অদ্ভুত ছিল গঠন, সাধন সমুদ্রে নিরন্তর বিহার করাই যেন ছিল সেই চিরতৃষিত মনের কামনা···আনন্দনিকেতন দক্ষিণেশ্বর সর্বধর্মের সমন্বয় ভূমিতে পরিণত হয়েছিল সুরু থেকেই—সেদিন প্রেমচ্ছায় সুরধুনীর কূলে এসে পড়েছেন এক সুফী মহাপুরুষ—গোবিন্দ তাঁর নাম। ক্ষত্রিয় দেহ সেই সিদ্ধসাধক মার অলখ ইঙ্গিতেই যেন এসে পড়েছেন এই দেবভূমিতে, আর শ্রীঠাকুরের সন্ধানী চোখে পড়তেও লাগে না বেশী সময়—সুরু হয়ে যায় ইস্‌লাম সাধন সুফী মতে—এ সাধন পরম প্রেমের সাধন—এমতে বিশ্বের সকলেই এক বন্ধনে বাঁধা—সবার বাঞ্ছিত ধন, সবার প্রেমাস্পদ সেই এক পরমপুরুষ মহামহিম—বিভিন্ন ধর্মে তাঁর নামের ভিন্নতামাত্র—ভাগবৎ সত্তার একত্ব, প্রেমের মহত্ত্ব, গুরুর গুরুত্ব, সুফী ধর্মের এই তিনটি প্রধান বাণী—ভাগবৎ সত্তা যেন প্রেমের অগাধ জলধি, আর গুরু যেন মহতী স্রোতস্বতী—আর মানব সাধারণ যেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার—নদীর স্রোতেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাধার যায় ভরে, তাঁরা প্রেমেই ভরে দেন শিষ্যের ক্ষুদ্রতা···

দেহ মনের মিলিত ছন্দবিলাসে এমনি অভ্যস্ত ছিলেন এই দেব-মানব যে একান্ত অজানিতে দেহ হত মনের নর্মচারী—তাই দেখি ইস্‌লাম ধর্মসাধনে তিনবার নামাজ, আল্লার নাম জপ, ঐ ধর্মাবলম্বীদের আহার গ্রহণ—এমন কি শ্রীমন্দিরে প্রবেশের চেষ্টামাত্র গিয়েছিল হারিয়ে—আর মাত্র তিন দিনেই মহামহিম মহম্মদের দর্শনে হয়েছিলেন ধন্য . । কবে, আর কতদিনে সব পথের পথিকরা পাবে এই মহাসমন্বয় সাগরের সন্ধান ?

একুশ

মহাকালের কাছে সময়ের গতি চির-নিস্পন্দিত, চির অচল তাই মহামানবের জীবনের ক্ষণগুলি চিরস্থির, যেন রাত্রির অন্ধকারে সন্ধ্যার মাঙ্গলিক।

বৈদিক ছন্দে সাবিত্রী গায়ত্রীর প্রথম রূপের বর্ণনা আছে রবিমণ্ডল-মধ্যস্থা অক্ষসূত্র কমণ্ডলুধরা···মনে পড়ে শ্রীমাকে শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ; প্রথম মিলন-লগ্নে জয়রামবাটীতে অনিন্দিতা শুচি শুভ্রা প্রথম উষসীর মত হৈমবতী আর নন্দীভৃঙ্গীর মত হৃদয়রাম রাশি রাশি পদ্মফুলের নিবেদনে চরণপ্রান্ত করে তুলেছে আকুল···পদ্মালয়ে পদ্মালয়া আছেন দাঁড়িয়ে, ব্রীড়ানত নয়ন নিথরে নেমেছে সারা বিশ্বের শান্তি-মৈত্রী-করুণা—যেন রূপ অরুণা···

নির্বিকল্পের পর শ্রীঠাকুরের দেব-শরীর প্রায় ছয়মাস অতিসারাদিতে হয়ে পড়ে ক্ষিন্ন। ভক্ত মথুরাদি তখন জননী-জন্মভূমির শ্যাম স্নেহনীড়ে ফিরে পাঠালেন শ্যামা মেয়ের অঞ্চলের ধনকে। শ্যাম-মেখলা জননীর কোলে পল্লীদুলালের যদি বা ফিরে আসে হৃতস্বাস্থ্য। বাংলার এই সব অঞ্চল তখন কল্যাণময়ী জননীর মত সর্ববিষয়ে ছিল শুভদা সুখদা স্বাস্থ্যে-সম্পদে, ধ্যানে-ধর্মে। তখন বাংলার শাল-তমাল-তালবন-নীলার মাঝে ছিল স্বাস্থ্য, ছিল শান্তি—

শ্রীঠাকুর দীর্ঘায়ত তপ-সন্তপ্ত দেহে ফিরে এলেন মার বুকে। পল্লীজননীর শ্যাম অপাঙ্গে যেন ফিরে এল পুরানো দিনের হারানো আনন্দ · সেই বৃন্দাবন বিলাস—সেই সখা-সখী সঙ্গে লীলালাস্যের অফুরান আনন্দ···বেদন নিঙড়ান নয়নে যেন আবার জেগে ওঠে স্মৃতি-শিহরিত বাল্য-লীলা। সেটি বারশত চুয়াত্তর সালের জ্যৈষ্ঠের এক সোনার দিন।

পল্লীর পটভূমিতে কালচক্রে এসে গেছে পরিবর্তন—জীবনছন্দের সে আলো হাসিতে সুরু হয়েছে ইমনের বীণ - সখাসখীদের সে সব দিন হয়ত চিরদিনই গেছে ফুরিয়ে—তাদের জীবন জাহ্নবীতে আজ থমক জাগান কৈশোরের স্বপ্ন—স্বপ্নের মতই গেছে ঝরে—তবে দিব্য লীলা ত ফুরাবার নয়—সেই লীলা-লাস্যেরও দিন এল ফিরে ··তবু—তবু মনে হয় সেদিন যেন আর আসে না। বসন্ত ফিরে আসে তবু সে দখিণা—সে মধুকর—যেন আর আসে না···মহাকালের নীল অনন্তে, রামধনুর দিনগুলি চিরদিনের মত যায় হারিয়ে।

সখাসখীরা তেমনি এসে দাঁড়ায় দিনান্তের ছায়ে। আনন্দের হাটবাজার আবার সুরু হয় পল্লীবিতানে—কত সরস পুণ্য কথার স্বপ্ন আল্পনায় প্রহরগুলি হয়ে ওঠে রঙ্গীন—কল্পলোকের ক্ষণগুলি ভেসে যায় যেন ছড়ান পদ্মকর্ণী, মিশে যায় মৌন মহাকালের অনন্ত নিঃশেষে···

ঝিল্লী জোনাক-জাগা ত্রিযামারজনী। গৃহ-কল্যাণীরা সুষুপ্তির শান্তিতে নিমগ্ন। সহসা ভাববেপথু চরণে এসে দাঁড়ান ঠাকুর—না—ভবতারিণী। ভাবগম্ভীর নয়নে সমাধির সপ্ত-সমুদ্রের বিথার—করুণাস্যে উচ্ছলিত তনু বিশ্বের আর্তিহারী আর্ত কণ্ঠে বলেন,—ওগো সব শুনে, আমায় খেতে দিলে না, এই ত আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি···খুঁজে পেতে পাওয়া অতি সামান্য একটু মাছচাটুই আর তাই দিয়ে খেয়ে ফেলেন এক রেক চালের অন্ন। মনে পড়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মহাভাবের ভোজনলীলা শ্রীবাস অঙ্গনে :

ব্যবহারে জন শত দুইএর আহার।
নিমেষে খাইয়া বোলে কি আছয়ে আর ॥

গৃহকর্ম হয়ে গেছে সারা। রঘুবীরের প্রসাদের কণিকাও সেদিন আর নাই। কল্যাণী জননীদের বুকে ঘনায় মেঘ সঙ্কুলতা···দেবতা ভিখারী - দেবতা আকুল—ভিখারীর চির অতৃপ্তি নিয়েই ত তোমার আসা। যুগে যুগে এইত তোমার বেদনবঞ্চিত বাসনা! দুর্যোধনের ঐশ্বর্যে জাগে না চরণের কমলবিলাস—যেখানে দীনের আর্তিই সম্বল, সেখানে বিদুরের লুকানো ব্যথাতেই পড়ে দৃষ্টি-প্রসাদ··· যুগে যুগে তাই দীন হীন দেবকী-শচী-মেরীর কোলই করেছ স্পর্শলোল!

বাইশ

দেবভূমি কামারপুকুর—দেবমানবের দিব্য লীলাঙ্কিত এ ভূমি দীনের নাম নিয়েও আজ সে প্রাণধর্মে নয় দীন—বিশ্বের দেউলে এ দেবভূমির আরতি হয়ে গেছে সুরু—দূর সুদূর পাশ্চাত্যের বিনম্র প্রণতিতে আজ এর ধূলিকণা আকুল··· কল্পলোকে ভেসে আসে সপ্তসাগরমন্থনধন প্রেমমন্দিরপদে চলেছেন পল্লীর পথে পথে, আগে পিছে তৃষিত নয়নের প্রহরা, আর দুই চরণে জেগে আছে ক্ষণ-সমাধি ·· চলার ছন্দে সেদিন ছড়িয়ে গেছেন অশ্রু সরস হরি নামামৃত—ফুলিয়া-নদীয়া-শান্তিপুরের প্রেমঅঙ্গনে—আজ ছড়িয়ে যাচ্ছেন, সমাধির অকৈতব মণি কাল ভুলানো কালো মেয়ের থমক জাগা চরণের ঝলক···তাই কামারপুকুরের ধন্য নরনারীর ভিড়ে পাই ভক্ত চিহ্ন,সে ত ঠাকুরকে বাল্যেই চিনেছিল। প্রসন্ন-জননী, দীনমেয়ে ধনী, পাইন কন্যা মরমী রুক্মিণী · এমনি নাম না জানা আরো কত··· একদিন সমাধি সায়রে আপনহারা শ্রীঠাকুর আছেন বসে, চারিদিকে ঝলমল করছে ভক্ত গ্রহদল—এমন সময়ে 'জনৈকা সবাইকে অবহিত করে বলেন, -উনি এখন সচ্চিদানন্দ সায়রে মীন হয়ে খেলা করছেন—গোল করো না সব! অতি সাধারণ পুরচারিণী এই জননীর এমন সহজ যোগজ দৃষ্টি কার দান—মহাভারতের কাহিনীতেই শুধু এর পরিচয় পাওয়া যায়···মনে পড়ে ধর্মব্যাধের কাহিনীতে পতিব্রতা নারীর কথা।

· অন্নপূর্ণার দুয়ারে শিব চিরদিনই ভিক্ষুক চিরদিনই প্রার্থী···জয়রামবাটীর সে এক রহস্যরঙীন রাত্রি স্তিমিত ক্লান্তদীপের শিখা নির্বাণমুখে·· পুরজননীদের অবসন্ন

দেহে নেমে এসেছে স্বপ্নজড়িমা। সহসা শিশু ভোলানাথ শিথিল পায়ে এসে দাঁড়ায় বিশ্বশোষী তৃষ্ণা নিয়ে, আকুলতা নিয়ে···ভক্তের দুয়ারে ভগবানের এ আকুতি নিত্যকার। বিশ্বের দেউলে বিশ্বদেবতার নিত্য আকিঞ্চন—এ মহা-ভিক্ষুকের আশা পূর্ণ করবে কে?···তবু এ ছলনা. এ লীলার বিলাসে রচনা করেন নবনব কল্পলোক···গৃহ সেদিন অতিথি অভ্যাগতের আগমনে রিক্তভাণ্ড—পুরজননীরা হয়ে উঠেন আকুল ˙ এই অসময়ের চিরবাঞ্ছিত, চিরবঞ্চিত অতিথিকে কি দিবে তার যোগ্য উপায়ন—জননী সারদেশ্বরী তখন ছিলেন উপস্থিত—তাঁর শ্রীহস্তের পরিবেশনে সেদিন নারায়ণ হন পরিতুষ্ট। দ্রৌপদীর সামান্য শাকান্নের মত এই অন্নাবশেষই কি আজ দেশে দেশে নিয়ে আসছে পরিতৃপ্তির প্রসন্নতা ·· এমনি কত কতদিন—সুরধুনীর দুই কূলে সেদিন বুক জুড়ানো আঁধারঘন এসেছে নেমে—এমনি আকুল করা কালোরূপে মা জাগেন শিয়রে—যাদের নয়নে নাই ঘুম, যারা অথির নয়নে জাগে পথ প্রহরায় তাদেরি দুচোখ ভরে লুকোচুরির রঙ্গিণী দেয় ধরা। ক্ষীণ দীপালোক ক্ষীণতর হয়ে এসেছে দ্বিযামা রজনীর মোহে। বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে জাগেন নারায়ণ—কল্যাণী সারদেশ্বরী তখন নহবতে তাঁর শ্রীহস্তের নিবেদন—সুজির পরমান্ন জনৈকা ভক্ত মেয়ে যান নিয়ে প্রভুর মন্দিরে···দেখেন এক বিরাট আবির্ভাবে দেউল করছে থমথম—আলো-ছায়ায় কাঁপন ধরা সে ভূমিতে প্রবেশে জাগে শঙ্কা—ভোজনলীলায় ভক্ত ভীতি বিস্ময়ে দেখেন শ্রীঠাকুর নয় মা-ই ভিতরে জলজল করছেন—সব নিবেদনের ধন যে তিনিই ··আমাদের হৃদয় দেবতার, আমাদের আরাধ্য দেবতার কাছে, পৌঁছায় না আমাদের নিবেদনের দৈন্য তাই দেবতা থাকেন নিত্য অতৃপ্ত, নিত্য উপবাসী—আর তারই ক্ষণ প্রকাশ মানবের বহু সৌভাগ্যে অবতার পুরুষের জীবনে। শ্রীঠাকুরের কথা ভক্তের জন্যেই অবতার।

এই যাত্রালগ্নে যোগেশ্বরী ভৈরবী শ্রীঠাকুরের সঙ্গেই ছিলেন। নানা কারণে এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা। হয়ত গুরুপদবী যাঁরা গ্রহণ করেন তাঁরা সঙ্গে থাকলে মর্যাদা লঙ্ঘনের সম্ভাবনা থাকে। যোগেশ্বরী এই লগ্নেই শ্রীঠাকুরের কাছে বিদায় নিয়ে বারাণসীর বানপ্রস্থে করেন যাত্রা, আর যাত্রার আগে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে শ্রীঠাকুরের চরণে ফুলগন্ধ নিবেদনে নিজেকে করেন নিবেদিত··· তাঁর যোগৈশ্বর্য্যময় দিব্যলীলার এইখানেই হয় নিরাবৃত্তি।

সাতটি দিব্যমাস এমনি করে আলো হাসি আর আনন্দে হয়ে আসে শেষ।

বারশো চুয়াম্ন সালের মার্গশীর্ষে শ্রীঠাকুর ফিরে আসেন দখিণাপুরের দেবারামে ···কামারপুরের ক্ষণ-বসন্তের হয় অবসান—দিব্যধামে আবার নেমে আসে বিষাদের নিথরতা ··

তেইশ

গীতামুখে শ্রীভগবান বলেছেন—

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

অবতার বরিষ্ঠের ত' কথা নাই—অবতারদেরও প্রতি পদক্ষেপে ফুটে ওঠে পথের দিশা, সন্ধানী আলো—তমসা ছাওয়া যুগচক্রবালের দিশারী যে তারাই··· সর্বকল্যাণ গুণের আকর এইসব লোকোত্তর পুরুষদের জীবনালোকে পাই প্রকৃত পথের নিশানা কল্যাণ মার্গের নিরিখ ··তাই দেখি শ্রীঠাকুরকে তীর্থঙ্করের দিব্যরূপে—নিত্য ছুটে গেছেন সাধুদের মেলায় লীলায়িত কৈশোরে – সাধনার মন্থন পাত্র হাতে ছুটে গেছেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে কাশী, বৃন্দাবন, মথুরা এইসব তীর্থ চরণাম্বিত হয়েছে, অমৃতায়িত হয়েছে—বুক পেতে হয়ে উঠেছে মহীয়ান···বেদোদধির মন্থন শেষে অমৃতের পাত্র যখন কানায় কানায় হয়ে উঠেছে ফেনিল তখন দেখি ছুটছেন হরিরস মদিরোন্মত্ত—কোথায় ব্রহ্মানন্দ কেশব, কোথায় মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, পরমহংস দয়ানন্দ—ছুটে গেছেন পেনিটির মহোৎসবে কলুটোলার হরিসভায় লীলারসে গরগর ··শুধুই কি লীলা—লীলার পিছনে আছে এক বিরাট প্রয়োজন জগদ্ধিতের অসীম ইচ্ছা · ফিরে চাওয়া চোখে পাই প্রেমঘনতনু—করুণ কান্ত—গৌর কিশোরের প্রেমাবেশে তীর্থ হতে তীর্থান্তরে ছুটে চলা—ধূলার নূপুর পায়ে—নয়নামৃতে ঝরে পড়া অকৈতব হরিপ্রেম—রূপে সুরধুনীর দুইকূল আকুল···আর চোখে পড়ে, ধীর গম্ভীরে চলেছেন ঈশামসি—দীন দ্বাদশ দিশারীদের সঙ্গে নিয়ে অমরার বার্তা বহন করে চলেছেন জুডীয়াতে – চলেছেন জেরিকোতে—দুহাতে শুধু কুড়িয়ে নিচ্ছেন অপমান অপবাদ—কণ্টকের মুকুট···

সন বারশো চুয়াত্তর সালের মাঘ মাসের মাঝামাঝি, শ্রীঠাকুরকে মধ্যমণি করে রাজ আড়ম্বরে মথুরামোহন করেন তীর্থযাত্রা। দেওঘর তীর্থে করুণাবতার

শ্রীঠাকুর ঘটালেন এক বিশেষ বিপত্তি—দেবস্থানের পথরেখায় পড়ে পল্লীজননীর কয়েকটি রিক্তনীড—নিরাভরণ দীন-সন্তানের বসতি—দীনের নারায়ণ, বিশ্বের ব্যথাহারী ব্যথায় হলেন অধীর,—এদের একদিন খাওয়াতে হবে আর একখানা করে কাপড় দিতে হবে,—মার দেওয়ানকে।

মথুর রাজসিক ভক্ত—দীন নারায়ণের সেবায় তার মন ওঠে না—প্রকাশ্যে জানান অসম্মতি···আর্তিহারী নারায়ণের নয়নপল্লবে তখন শরতের শিশির—যে ব্যথার অমৃতে আজ জগৎ অমৃতায়িত—সেই ব্যথার ঢলে মথুরও যান গলে—বিশেষ যখন শ্রীঠাকুর তাদের মাঝে গিয়ে বসে পড়েন আর বলেন,—এদের যে কেউ নেই আমি ছাড়া—আমি এদের কাছেই থাকব। মথুর কলকাতায় লোক পাঠিয়ে সে যাত্রা এই অঘটনকারী কল্যাণময়ের হাতে পান নিষ্কৃতি। রাণাঘাটেও কৃপাধন্য মথুরের ভাগ্যে আর একবার ভগবানের এ করুণার্দ্র-রূপ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছিল।

মর্ত্তের মানুষের অমর্ত্তের দেবতাকে মর্য্যাদা দেওয়া ত সহজ নয়—সম্ভবও নয়—তাই বোধ হয় ভক্ত ভগবানের বিলাস-গুলিও ক্ষণ বিধ্বংসী···ভক্ত মথুরের মন তীর্থপথের চঞ্চল পথিক, ক্ষণিক বিস্মৃতিতে ভুলে যায় আপনার ইষ্টকে। শ্রীঠাকুর মধ্যপথে একবার কার্য্যান্তরে পড়েন নেমে—লৌহশকট যাত্রাপথে দেয় পাড়ি, যন্ত্রের ঔদ্ধত্যে। সাগর সৈকতে ফেলে আসা, পথ চাওয়া নবকুমারকে আমরা কতক অনুমানে আনতে পারি, কিন্তু শ্রীভগবানকে ফেলে যাওয়ার পথকে আমরা নিরুদ্ধ নিস্পন্দে শুধু প্রণাম জানিয়ে হই ক্ষান্ত—তবে সে পথ আমাদের দুর্ভাগ্যেরই পথ ···শ্রীঠাকুরের অদৃশ্য ইঙ্গিতে জনৈক বিশিষ্ট রেলকর্মচারী, রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, একখানি নিজস্ব স্বতন্ত্র গাড়ীতে শ্রীঠাকুরকে তুলে নিয়ে শ্রীভগবানের কাণ্ডারী হবার সার্থকতা করেন অর্জন।...জগন্নাথের রথচক্র চির গতিশীল—আমাদের অহং সে চক্রে চির নিষ্পেষিত হয়···এই আমাদের ভাগ্যলিপি।

মণিকর্ণিকা—স্বর্ণময়ী মণিপ্রদীপ এই মণিকর্ণিকা চিরমুক্তির তীর্থ—অমর্ত্ত আর মর্ত্তের অমৃত সেতু। সেদিন সূর্য্য-করোজ্জল পুণ্যতোয়া ভাগীরথী কূলে শিখাময়ী এই শ্মশানক্ষেত্রের এক রম্য প্রভাত—শুচিশুভ্র শান্ত নিথর, জীবনের এই শেষ পৈঠা সেদিন এক নব অভ্যুদয়ের প্রতীক্ষায় ছিল দীপ্ত, গঙ্গাতরঙ্গ যেন কার আবাহনীতে রচনা করেছিল জলের আলপনা—সহসা গগন, গঙ্গা সব যেন

আলোকে পুলকে হয়ে ওঠে আকুল—হয়ে ওঠে ধ্যানসুন্দর······

দেখা যায় ভাগীরথীর দুইকূল উজ্জ্বল করে নৌকার কিনারায় এসে দাঁড়িয়েছেন ভাব-নিথর শ্রীঠাকুর, চোখে মুখে প্রভাতী তারার নিথর—সঙ্গের অনুচরদের মাঝেও জাগে কোলাহল···হয়ত একটা অঘটন যাবে ঘটে—মথুর, হৃদয়ের কাছে এ দৃশ্য নূতন নয়, তাঁরাও অবহিত হন, তাঁরাও এসে দাঁড়ান···ক্রমে সমাধি-মন্থন মনে জাগে চেতনা—বলেন সব কথা···সে এক রহস্য লোকের কাহিনী।

কাশীর পঞ্চতীর্থ দর্শনের চিরাচরিত প্রথায়- শ্রীমান মথুর ঠাকুরকে একটি নৌকা করে নিয়ে বেরিয়েছিল সেদিন প্রভাতে। ভাব বিলসিত ঠাকুরও শিশুর সরলতায় আয়ত দুইচোখ মেলে দেখছেন কাশীর রম্যশ্রী···সহসা চোখে পড়ে মণিকর্ণিকা—দেখেন চিতাধূম ধূসরিত মণিকর্ণিকা আলো করে দাঁড়িয়েছেন কাশীর বিশ্বনাথ নিজে—মুক্তি যজ্ঞের যজ্ঞেশ্বর—পিঙ্গল জটাপীড বিশাল সেই মহান্ পুরুষ, শবদেহের কর্ণে তারকব্রহ্ম মন্ত্রে করছেন তাদের কপালমোচনের ব্যবস্থা—আর শিবের পাশে আছেন শিবগেহিনী ভবানী স্বয়ং··· আর কিছু কি দর্শন হয় নি? গোপন-লীলার নব-বিশ্বনাথের সঙ্গে কাশীর বিশ্বনাথের মিলন—দুই ভাবদেহের এক হয়ে যাওয়াই মনে হয় এই সমাধির রহস্য। কাশীর কৃপাতীর্থ সব সাধনার শেষ কথা নির্ব্বাণ-মুক্তি জীবের অনায়াসে হওয়ার ঐই ত কারণ—অকারণ কৃপার এক কণায় সমস্ত বিশ্বের মুক্তিও ত'তুচ্ছ কথা—

কাশীর সচল-বিগ্রহ ত্রৈলঙ্গ-স্বামীপাদকেও শ্রীঠাকুর এই যাত্রায় দর্শন করেন, স্বহস্তে পরমান্ন দেন মুখে তুলে আর সাধনেব একটী প্রশ্নে তীর্থমাহাত্ম্য করে তোলেন পূর্ণতর। ত্রৈলঙ্গ-স্বামিজীও নিজের নস্যকৌটা তাঁর কাছে ধরে দেন শ্রদ্ধা নিবেদনে···তীর্থঙ্কর মহাপুরুষের অবস্থিতিতে তাঁদের আগমনে···তাঁদের সেবা পরিচর্যায় তীর্থ হয়ে উঠে উজ্জ্বল, তাই তীর্থে তীর্থকৃত্যগুলির এত শাস্ত্র-প্রসিদ্ধি।

কাশীতে শ্রীঠাকুরের, হরশির-বিলসনা, চন্দ্ররেখায়িত গঙ্গার বুকে এক বিশেষ বিলাস ছিল—নৌকাবিহার—কেদারনাথের মন্দির এই দর্শন পর্যায়ে পড়ে। কেদারের মন্দিরে তাঁর ভাবোচ্ছল অবস্থায়, ঐস্থানের মাহাত্ম্য সহজেই মনে আনে। ভক্তজননী শ্রীমাও এখানে এসে এর বিশেষত্ব উপলব্ধি কোরেছেন, বলেছেন,—এই কেদার—সেই কেদার······

চব্বিশ

কাশীধামে এসেও রাজসিক মথুরের রাজ-ঐশ্বর্যে চলাফেরা যায়নি বাদ। এখান থেকে মথুর তীর্থকৃত্যে কয়েকদিনের জন্য যান প্রয়াগে—কিন্তু সন্ন্যাসীর রাজা, সাধুর রাজা শ্রীঠাকুর যে চির-গলিত হস্ত—তিনি শুধু তীর্থ দর্শন করেই আবার শিবপুরীতে আসেন ফিরে। পক্ষাধিককাল কাশীবাসের পর বৃন্দাবনকে করলেন ধন্য। সেই বহু-বিস্মৃত কথা ..যেদিন গৌর কিশোরের প্রেমাশ্রু-সিঞ্চনে জেগেছিল নব মুকুলিত ভাব-কদম্ব, আর আজ—গোপন গৌরচন্দ্রের মধুর ভাব-বেপথু চারণে ব্রজের সিদ্ধসাধকদের নয়নে ফিরে এসেছিল চিরপুরাতনের সেই প্রেমবিলাস।

গঙ্গামাঈ ছিলেন এমনই এক সিদ্ধ-সাধিকা। শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন যুগের প্রয়োজনে, আর কলমালতার দল, পার্ষদদেরদল সঙ্গেই আসেন—এঁরা না এলে লীলা হয় না পুষ্ট—পরিবেশের হয়না পূর্ণতা। জ্যোৎস্নামত্ত যামিনীতে তারার কুচর প্রয়োজন চন্দ্রের শোভায়, আবার তারকিত রাত্রিরও চাই চন্দ্রিম বিলাস। শ্রীঠাকুর তাঁর এ যুগের পার্ষদদের নির্দ্দেশ করতেন পূর্বযুগের নাম ক্রমে—কেউবা ঋষি-কৃষ্ণের দলের, কাকেও বা বলতেন মহাপ্রভুর গণ।

গঙ্গামাঈ ছিলেন সেই হারানো ব্রজ-বিপিনের শ্রীমতীর প্রধানা সঙ্গী, ললিতা সখী—এ যুগেও ছুটে এসেছেন এ যুগের কৃষ্ণচন্দ্রের ক্ষণদর্শনে নিজেকে করতে ধন্য...দূর থেকে রসাস্বাদনের এক নিবিড়তা আছে—ভীড়ের মধ্যে মনকে হারিয়ে হয় না রসাভাস—এঁরা চান এমন একটি পরিবেশ যেখানে ভগবানের প্রেম-মাধুর্য্য থাকে নিত্য অবগুণ্ঠিত···চন্দ্রালোকের মুক্তাধারায় এঁরা যান হারিয়ে কিন্তু গহন কুঞ্জের রহস্য বিলাসে এঁদের প্রেম হয় রসনিবিড়। গঙ্গামাঈ তাই বেছে নিয়েছিলেন দূর বৃন্দাবনের কুঞ্জ পরিবেশ। বৃন্দাবনে নিত্য-বিরহ-লীলায় চিরদয়িতের জন্য বেদন আনন্দে দিন যেত কেটে—সন্ধানীর চোখকে যায় না ঠেকান—ভীড় জমে ওঠে সাধুসন্তদের—ভীড় জমে ওঠে মধু-পিয়াসী ভক্তভ্রমরের। প্রেমবিহ্বলতায় আর ভাব-বিলাসে তাঁর কুঞ্জ হয়ে উঠত বেণু নিংড়ানো যমুনার মত আবেগোচ্ছল—দেহের দুকূলে জাগত মগ্নপুলকের স্বপ্ন-শিহর—নয়নে জাগত অশ্রুর নির্ঝর ; তখন প্রেম-বৃন্দাবনে বুঝিবা ফিরে আসত সেই পুরানো দিনের

হারানো কথা…ব্যথাহত হলেও স্মৃতির সুরভিতে নিত্য জাগে পিপাসিত হৃদয়ের এক পরমতৃপ্তি ‥অসীম বিরহের এইত সীমার পৈঠা ‥

জীবনের এক একটি পরমক্ষণ আসে—আসে এক একটি মহেন্দ্রলগ্ন যাকে ভুলতে গিয়ে যায় না ভোলা—মনের মণিকোঠায় হয়ে যায় চিরন্তনী…সাধকের চোখে এইগুলি হয় দিশারী আলো—কবির গাথায় এইগুলি হয়ে উঠে ছন্দের মণিমঞ্জুষা—দার্শনিকের প্রাণে তত্ত্বপ্রকাশ আর সাধারণের কাছে চির রহস্যময়ের, চির অধরার ধরা দেওয়ার ছল… ।

সেদিন গঙ্গামা র কুঞ্জে এল এমনি এক পুষ্পলগ্ন—ভাবতন্ময় চোখ মেলে বসে আছেন জীবনের শেষ পৈঠায়—কত বিনিদ্র পথ চাওয়া রাত্রি হয়েছে গহিন—কত অশ্রুর অভিষেকে পাষাণ দেবতার মেলেনি সাড়া…সহসা জীবনের জীর্ণদুয়ারে ওঠে কার আকুলকরা ডাক…জীবন দেবতাই ত এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর ব্যর্থ বসন্তের কুঞ্জে। চেনা জনকে চিনতে হয় না দেরী—শত যুগের আর্ত্ত পিপাসিত প্রাণকে চেনাতে হয় না চিরদয়িতের থমকিত চরণ‥তাই প্রথম দর্শনেই গঙ্গামাঈ তাঁর ইষ্টকে পারেন ধরতে—এ যে মূর্ত্ত কৃষ্ণপ্রেম, শ্রীমতি স্বয়ং…

আপন ইষ্টকে ইনি সুমিষ্ট দুলারা শব্দে অভিহিত করতেন। প্রথম দর্শনেই দুলারী ব'লে শ্রীঠাকুরকে টেনে নিতে সিদ্ধ সাধিকার হয় না ভুল। এর পর সুরু হয় বৃন্দাবনের নিত্যলালা—সুরু হল প্রেম বৈবর্ত্ত—সেই ফেনিয়ে ওঠা অশ্রুহাসির মান, মাথুর—এরপর দুলারীকে ঘিরে দিনের পর দিন চলে গঙ্গামায়ের আনন্দ-বিলাস—কখন নিজের হাতে খাইয়ে দেওয়া, নয়নাসারে সম্বিতহারা হয়ে, কখন বা পুলক কদম্বিত তনুতে পড়েন এলিয়ে দুলারীর বরদেহে… ।

নিজে মহৎ না হলে মহৎকে যায় না চেনা—যুগে যুগে যারা কল্যাণদীপ দিয়েছে জেলে আঁধারের বুকে—তাদের চেনার চোখ যুগে যুগেই বিরল।

দুলারী আর ললিতাসখীর মিলনের ক্ষণ, অবসান জানেনা—জানেনা বিরাম, বিশ্রাম—নদী যেন পেয়েছে মহাসাগরের কোল, অচাওয়া অভিসারে বিরহ বিচ্ছেদের লগ্ন হয়ে যায় ভুল….

এদিকে দক্ষিণেশ্বরীর লালায় পড়ে গেছে ছেদ—ভুবনভুলানো লীলার বোধনেই যেন নীরাজনার আয়োজন…

সহসা শ্রীঠাকুরের চিত্তের নিভৃতে জাগে মার করুণ দুটি আঁখি, নহবতের নিঃসঙ্গে আছেন বসে তারি পথে দুই চোখ মেলে—কে তাঁকে বুড়ো বয়সে

দেখবে, সেবা করবে···আর ত থাকা হয় না।

যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরকে জন্ম দিয়েছেন আর সম্প্রতি নহবতে বাস করছেন···

গঙ্গামার জীবনে অকালের দখিণা যেন কার অভিশাপে হয়ে গেল ঝরা পাতার হিমেল।—

নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস
সুখ গেল পিয় সাথ দুখ মঝু পাশ।

সব ঠিক হয়েছিল—গঙ্গামা তার পরম পাওয়া দুলারীকে রাখবে কাছে—করবে প্রাণান্ত সেবায় আকুল···সহসা শ্রীঠাকুর বলেন,—না আমায় যেতে হবে···বজ্রাহতের মত গঙ্গামার জীবনে নেমে আসে অসীম বিরহের রাত্রি···মৃত্যুর মত অসহ।

লীলা নিত্য—তাই নিত্য-ব্রজে ব্রজেশ্বরের বাঁশরী কোনদিনই হয় না নীরব। তবু শ্রীঠাকুরকে চলে আসতে হয় পক্ষাধিক পরে। প্রকাশলীলায় ছেদ আছে—বিরহ-মিলন আছে—তাই প্রকাশ-লীলা এত মধুর!

শিবপুরীতে তন্ত্রগুরু ভৈরবী যোগেশ্বরীর সঙ্গে ঠাকুরের হয়েছিল পুনর্মিলন। শ্রীঠাকুর তাঁকে নিয়ে আসেন বৃন্দাবনে। আর এই বৃন্দাবনেই ঘটে তার লীলাবসান—ভৈরবী জননীর বহুদিন যশোদা ভাবে অবস্থানের চরম পরিণতি এই ব্রজের ধূলে মিশে যাওয়া—তাই ত শ্রীঠাকুর তাকে এনেছিলেন এই লীলাতীর্থে—এটি ঘটে বারশো পঁচাত্তর সালে।

সত্য-শিব-সুন্দরের যারা পূজারী—সত্য-শিব-সুন্দরের প্রকাশ যাঁদের জীবনবেদ—তাঁদের চলার পথে তাই শ্রীভগবানের বিভূতির হয় সহজ প্রকাশ। গীতা মুখে ভগবান তাই বলেছেন—যা কিছু বিভূতিযুক্ত হয়, সত্ত্ব, শ্রী-যুক্ত আর উর্জ্জিত সবই তাঁর তেজ-অংশ সম্ভূত। তাই কবি, শিল্পী এদের স্থান শ্রীঠাকুরের চরণান্তিকেই। আর সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ অবতার পুরুষদের ত কথাই নাই—তাদের স্পর্শেই সত্য-শিব-সুন্দরের জাগরণ···অরুণায়িত পূর্বাশায় কমলদলের হাসি যে আপনি ফোটে। সত্য-শিব সুন্দরের স্বরূপ যাঁরা তাঁদের আবির্ভাবেই ধূলায় জাগে সত্য, জাগে শিব, জাগে সুন্দর—তাইত কৃষ্ণ-অবতারের পর ভারতে যে গীতার সুরলহরী বয়ে গিয়েছিল, তারি প্রকাশ আজো না না কাব্যে, না না গীতে পাই ··গৌরকিশোরের সংকীর্ত্তন আজো মহাজন পদাবলীতে সারা

ভারতে ছড়িয়ে রয়েছে সুর-তরঙ্গিণীর অমৃতধারার মত! বুদ্ধদেবের করুণা-মৈত্রীর বাণীও নানা সংঘারামের ভাস্কর্য্যে অপরূপ শ্রীনন্দিত হয়ে রয়েছে আজো। রাসেল প্রমুখ দার্শনিকেরা ভগবান ঈশামশিকে রোমান শিল্পকলার ধ্বংসের কারণ বলে নির্ণয় করেন। কিন্তু আমরা দেখি যে অপরূপ শিল্পের নিদর্শনে 'নোতরদেম' প্রভৃতি ভজনালয়গুলি গড়ে উঠেছে ও বর্ত্তমান সভ্যতার শিল্পপ্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়ে উঠেছে, সে সব যে খৃষ্টিয় ঐতিহ্যের ফল নয় একথা বলা চলেনা;

তখন কাশীতে বীণ্‌কার মহেশ সরকারের প্রসিদ্ধি ছিল—শ্রীর প্রতিষ্ঠা—সুন্দরের প্রতিষ্ঠা—শ্রীঠাকুর না হলে আর কে করে? তাই ছুটে যান বীণ শুনতে; আর শুনতে শুনতে অসীমের ছন্দে সুরসুন্দর হয়ে যান আপনহারা।

গয়াতীর্থ শ্রীঠাকুরের আবির্ভাবভূমি—তাইত হয়না যাওয়া সেই পরমধামে, মথুরের একান্ত বাসনা সত্ত্বেও। অবতার আর অবতার-প্রতিম পুরুষদের মনের একটি সহজ গতি ভূমার দিকে—লয়ের দিকে। তাই কোন স্থানে, কালে বা পাত্রে যদি সেই লয়মুখী মনের উদ্বোধন হয় তবে দেহে আর দেহ থাকা হয়ে পড়ে দুরূহ। শ্রীঠাকুর ঐ দেবস্থান দর্শনের ইচ্ছা করেন সংবরণ।

দীর্ঘ চারিমাস অন্তে তীর্থদেবতা ফিরলেন তীর্থরাজ দক্ষিণেশ্বরে—ভবতারিণীর নয়নতীরে হাসি এল ফিরে...বারশো পঁচাত্তর সালের জৈষ্ঠ্যের এই ঘটনা। মার চরণছন্দে অশ্রুসরস নতিতে ফিরে আসার সংবাদ দিয়ে নহবতে চন্দ্রা মার চরণে প্রণাম নিবেদন করলেন, আর মার আশীষ মাথায় ধরে শ্রীঠাকুর পরমানন্দে আবার দক্ষিণেশ্বরের নর্মলীলায় হয়ে যান আপনহারা—বৃন্দাবনের রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ দেবপুরীতে দেন ছড়িয়ে—বলেন, আজ হতে এই ধাম হল ব্রজধামের স্বরূপ। যে তীর্থে স্বয়ং ভগবানের মরণান্ত তপস্যায় হল সর্বধর্মের প্রতিষ্ঠা, দেবতার শত অশ্রু-হাসিতে উচ্ছল যে ভূমি—সে ভূমিতে আবার রজের কি প্রয়োজন?···বোধহয় দ্বাপর-লীলার যোগসূত্রে এই সারূপ্য-সাধন।

পঁচিশ

অধরার ধরা দেওয়া, অরূপের রূপায়িত হওয়া—অবতার লীলা,—এই ত নরলীলা—এই ত আঁধারের রূপায়ণ। সেদিন গহিন হতে গহিন হয়ে উঠেছে মায়ের অব্যক্ত রূপ—পঞ্চবটি হয়ে উঠেছে দর্শন বিঘাতক—অন্ধ-তমসাচ্ছন্ন—মায়া

আবরণের স্তরবিন্যাসে ভয়াল ··

সহসা সেই সূচিভেদ্য অবলুপ্তি যেন জেগে ওঠে কার তীব্র উচ্ছ্বাসে—ও রামকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ—ওরে আমরা ত মানুষ নই, দেবতা !

অন্ধকারের বুক চিরে পাগল হ'য়ে ছুটে বেড়ায় এই বাণী—গঙ্গার অন্য কুলেও জাগে তার সাড়া ..পাগলের মত হৃদয়রাম বলে,—মামা মামা আমরা ত মানুষ নই—তার চোখে তখন অকূল অন্ধকারের বুকে জেগেছে প্রমার প্রকাশনী··· দেখেছে শ্রীঠাকুরের স্বরূপ জ্যোতিঘন তনু, আর নিজেকেও চিনেছে দেবানুচররূপে —চির চিন্ময়—চির ভাস্বর ..সে হারিয়ে ফেলে বাস্তবকে ক্ষণিকে হয়ে পড়ে উন্মাদ···

সেই উন্মত্ত চীৎকারে শ্রীঠাকুরও হ'য়ে পড়েন ত্রস্ত—তাকে স্থির করবার মন্ত্র নির্ভর প্রার্ণেরই মন্ত্র—সে মন্ত্রে তিমিরায়িত রজনী যেন আরো গহিন হয়ে ওঠে··· মা—মা—দে · মা—জড় করে দে...

যাঁর চৈতন্যে জগৎ চৈতন্য · যাঁর ইচ্ছায় যুগ-যুগব্যাপী জড়ের বুকে নেমে এসেছে প্রাণের স্পন্দন —হেসে উঠেছে সোনার কাঠির পরশে শত যুগের ঘুমআঁখি —তাঁর ইচ্ছাতেই আবার চেতনের চোখে নামে জড়তার মোহ...এ আশীর্ব্বাদ না অভিশাপ কে জানে... ?

সেবকের চোখে তখন নেমেছে মৃত্যুর আঁধার, অর্গল-লুণ্ঠিত আকুলতায় সে বল্লে,—মামা একি করলে, আমাকে জড় করে দিলে ! আধার আর আধেয়— কৃপা আর পাত্র, দুয়েরইত প্রয়োজন···সমন্বয়ের জগতে কেউ কাউকে এড়িয়ে থাকতে পারে না···তাই অযোগ্য আধারে কৃপা পারল না কুলাতে · শুধু বুক ভাঙ্গা কান্নাই হয়ে রইল চিরন্তনী···

পত্নী-বিয়োগ বিধুর হৃদয়রামের তখন নববৈরাগ্য—শ্রীঠাকুরের সাহচর্য্যে তীর্থদর্শনের পর এই আঘাতে মন হয়ে পড়ে একান্ত বিষণ্ণ-বিধুর. শ্মশান-রিক্ততায় পরিপূর্ণ···পূজা আরাধনায় নিষ্ঠা হয়ে ওঠে নিবিড়···শ্রীঠাকুরের অনুকরণে ধ্যান জপাদিতে মন হয়ে ওঠে নিবাত...আর সেই সঙ্গে শ্রীঠাকুরের কাছে জানায় ঐকান্তিক প্রার্থনা গভীর উপলব্ধির সহজলভ্য প্রকাশ। শ্রীঠাকুর গাইতেন, —কল্পতরু মূলে রই, যখন যে ফল বাঞ্ছা করি সেই ফল প্রাপ্ত হই—কল্পতরু মূলে তার যে বাস—এতদিনের সেবাপরিচর্য্যায় সেবকের অন্তরে, সহজ প্রেরণায়, একথা নিশ্চিত হয়ে দাঁড়িয়েছিল—তার মন সহজ করেই ধরে নিয়েছিল যে দিব্যদর্শনের

চাবিকাঠি শ্রীঠাকুরের হাতে নিত্য দিনের জন্যই রাখা আছে। তাই সে জানায় তার প্রার্থনা শ্রীঠাকুরের কল্পমূলে। এরপর হৃদয়ের হল এক অপূর্ব্ব পরিবর্তন—জ্যোতিঘন মূর্ত্তি দর্শনাদিতে ভাবাবেগে সকলের কাছে সে এক দর্শনীয় বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মথুর বলে,—বাবা এ আবার কি? আমরা যে তোমার চিরসেবক, নন্দী ভৃঙ্গী—আমাদের এসব কেন?

শ্রীঠাকুর বলতেন,—এগিয়ে পড়—প্রথমে চন্দনকাঠের বন, তারপর রূপোর খনি—তারপর সোনার খনি—তারপর হীরের খনি...হৃদয় পড়ে থাকবার মন্ত্র পায়নি; সেও তপস্যার পাল ভরে চলে এগিয়ে—সেদিন পঞ্চবটীর আঁধার-থমকে শ্রীঠাকুর চলেছেন, চরণে ভাব-বেপথু ছন্দ, মুখে মার নাম—যুগের অন্ধকার শত-চন্দ্রিম-প্রকাশে হয়ে উঠেছে শান্তির স্নিগ্ধতায় নিবাত নিথর সহসা শাণিত চিৎকারে অন্ধকার হয়ে যায় বিচ্ছিন্ন, মামা-গো পুড়ে মলাম, পুড়ে মলাম। ত্রস্তে শ্রীঠাকুর যান এগিয়ে, দেখেন চির-পবিত্র পঞ্চবটীর সাধনপীঠে যন্ত্রণা-কাতর হৃদয়। করুণার্দ্র স্নেহস্পর্শে হটকারী সেবকের জ্বালা যায় জুড়িয়ে···হৃদয়ের একান্ত সাধ জেগেছিল শ্রীঠাকুরের মত উপলব্ধিতে ধন্য করে তুলবে তার জীবন, তাই পঞ্চবটীতে দুঃসাহসের অভিযান। গুরু নির্দ্দেশিত পদ্ধতি আর ক্রম, ধর্মজীবনের এই পাথেয় বিহীনে আঘাটায় বহু তরণী হয়েছে চর্ণ-বিচূর্ণ।

হৃদয়রাম শ্রীঠাকুরের ছিল অসীম কৃপার পাত্র। হৃদয় এই সময় নিজ আবাস শিহরে আয়োজন করে শারদীয়া পূজার। শ্রীমান মথুরের পূজামণ্ডপ, শ্রীঠাকুর না হলে হয়ে পড়ে শ্মশানশূন্য, তাই শ্রীঠাকুরকে তার চলত না ছাড়া। শ্রীঠাকুরও তাই সেবককে আশ্বাস দিলেন সূক্ষ্মশরীরে হৃদয়ের পূজার মণ্ডপে হবেন উপস্থিত। আরো উপবাসক্লিষ্ট মনে পূজার একাগ্রতা হয় না, তাই হৃদয়রামকে কিছু আহারের অনুজ্ঞাও এই সঙ্গে দেন। যথা সময়ে পূজা আরতিতে দেবীর পাশে তনুজ্যোতিতে শ্রীঠাকুর কৃপাবিষ্ট সেবককে করেছেন ধন্য—করেছেন তৃপ্ত

ছাব্বিশ

নবদ্বীপ এখন আর বাণীপীঠ নবদ্বীপ নাই। দেশ-বিদেশের বিদ্যার্থীর বাগ-বৈভবে গঙ্গাকূল আর মুখরিত হয় না। গদাধর, গঙ্গেশ, রঘুনাথ এদের কণ্ঠ এখন নীরব। নিমাই-পণ্ডিতের যুগও নটরাজের নটছন্দে হয়ে গেছে গতিহারা

…তবু স্মৃতি সুরভিত সুরধুনীর হাতছানিতে আজো প্রাণ হয়ে ওঠে আকুল— তবু শত দেউলে মুখরিত লীলার নদীয়া পথিক প্রাণকে দেয় ডাক।

অনেকের কাছে প্রত্যক্ষবাদী বলে কোঁতে, বেন্থাম্ প্রভৃতির নাম আজো ঋষিপদবীতে হয়ে আছে অক্ষুণ্ণ —আজো অনেকে রাসেল্ প্রমুখ অজ্ঞেয়বাদীদের আনম্রশিরে জানায় শ্রদ্ধা…শ্রীঠাকুর স্বয়ং অবতার হয়েও মহাপ্রভুর অবতারত্ব, প্রত্যক্ষবাদীর বিচারে, বৈজ্ঞানিকের বিচারে যাচাই করে নিয়েছেন মেনে, বিশ্বাসের ষোল আনায়। বৈজ্ঞানিক যুগে ধর্মবিজ্ঞানের প্রমাণ শ্রীঠাকুরের সারা জীবনের ছিল সাধনা – তাই ছুটে গেলেন নবদ্বীপে, গুপ্ত বৃন্দাবনে—বড গোঁসাই এর বাড়ী, ছোট গোঁসাইএর বাড়ী। মন্দির-বিগ্রহ্ সব দর্শন হল সারা। কিন্তু দেবতার কোন সাড়াই যে তৃসিত নয়ন পায় না—পায় না পিপাসিত শ্রবণ—

ক্ষ্যাপার খুঁজে ফেরা পরশমণির চির-হারান রতন হয়েই ডুবে থাকে নিরাশার আঁধারে‥ সব জায়গায় এক এক 'কাঠের মুরদ' হাত তুলে দাঁড়িয়ে আছে, দেখে প্রাণ শুষ্কতায় ওঠে ভরে…রিক্ত তৃষ্ণায় নৌকায় উঠেছেন—এমন সময় রহস্য যবনিকা যায় সরে…শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে পরম পরশ-মণির প্রকাশ যেন শত বীণাবেণুকে করে তোলে ব্যথিত · ঐ এলোরে ঐ এলো…যে পরম রূপের প্রকাশে কবি সুরদাস অন্ধ হয়ে জানিয়েছিলেন প্রার্থনা সব রূপের চির-নিবাণ, আজ সেই রূপোত্তমের দর্শনে শ্রীঠাকুর হয়ে পড়েন সম্বিৎহারা। সাধারণ রূপেরই একটা মাদকতা আছে—আর সব রূপের রূপময় যিনি, তাঁর দর্শনের মদিরতায় চেতন হারান যে সাধারণ কথাই—গৌর কিশোরের আর নিত্যানন্দের ঢল ঢল কাঁচা লাবণি মাখা সোনারতনু, শ্রীঠাকুরের দেবদেহে এক হয়ে যায় আর সব অবতারদের সমষ্টি শ্রীঠাকুরও হয়ে পড়েন অন্তর্দশায় আপনহারা, পরে যেমন, ভৈরবী যোগেশ্বরী বলেছেন,—এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব।

নদীয়া বিনোদই বৃন্দাবনের লীলাস্থানগুলির করেন প্রকাশ, ধর্ম-সংস্থাপনের এও যে এক অঙ্গ, এর জন্যইত যুগে যুগে দুখের ঘরে আসা। নদীয়ার অপ্রাকৃত স্থানগুলি আজ গঙ্গাগর্ভে চিরবিলীন, তাই শ্রীঠাকুরের ঐ দর্শন গঙ্গাগর্ভেই হয়।

সাতাশ

স্বর্গের দেবতা যখন ধূলায় আতুল হয়ে আসেন, খেলার ছলে, তখন ধূলার ধনই হয়ে যান। সোনার তনু ধূলায় রাঙ্গান এ এক অপরূপ লীলা—আমাদেরই মত কান্নাহাসির মাণিক হয়ে মাটির ঘরে গড়াগড়ি দিয়ে কি সুখ, কি যে আনন্দ—স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করে নানান দোলায় দুলে যাওয়ায় কি যে যাদু আছে কে জানে···

অবতারেরও শরীর ধরতে হয়, সুখ দুখও আছে, আত্মীয় স্বজনের বিয়োগও ত সইতে হয়, আলোছায়ায় খেলাঘরও বাঁধতে হয়—

অগ্রজ রামকুমারের পুত্র অক্ষয়, মাতৃহীন বালক, অতি শৈশবেই শ্রীঠাকুরের স্নেহ শিশিবে মানুষ; কামারপুকুরের নর্মলীলার অবসানে, অক্ষয় মাত্র দুই কি তিন বছরের দিব্য শিশু—দীর্ঘদিন পর আজ সে সপ্তদশের দীর্ঘায়ত যুবক, সুন্দর, সুঠাম···শ্রীমৎ তোতাপুরীর বিদায়লগ্নের কিছু পরেই দক্ষিণেশ্বরীর দেউলে রাধা-গোবিন্দের প্রাণঢালা পূজায় অক্ষয় এসে দেয় যোগ—এটি বারশো বাহাত্তর সালের প্রথম দিকের কথা—

লীলার রাজ্যে দেবতারও মহামায়াকে হয় মানতে। ভাগ্যের পরিহাসের হাসিতে দিতে হয় যোগ। দেবতার স্নেহরসসিঞ্চিত প্রাণ—অক্ষয়ের পূজা জপে ছিল অপূর্ব্ব নিষ্ঠা-রাধাগোবিন্দের পূজায় সে হয়ে যেত আপনহারা··· লোকারণ্যের মন্দির, সমারোহের মন্দির তার কাছে হয়ে যেত শূন্যপুরী··· ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার এমনি যেত কেটে। মন্দিরের পূজার পর আবার শিবের পূজায় নিজেকে নিবিষ্ট করে রাখত গঙ্গার উপকূলে, এরপর স্বপাকের ব্যবস্থা; পরে শ্রীমদ্ভাগবৎ পাঠে নিজেকে দিত বিলিয়ে। দেববংশে দেবতারই উদ্ভব হয়। উপনিষদও বলেন···ব্রহ্মজ্ঞের কুলেই ব্রহ্মজ্ঞের জন্ম হয়। একথা সত্য। শ্রীঠাকুরও যেমন বলতেন,—কলুমে আমের গাছে কি নেকো আম হয়? সবদিকেই অক্ষয় ছিল দিব্য মানুষ···

মুমূর্ষু সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘন হয়ে আসে গঙ্গার দুই তীর—রহস্য যবনিকা ধীরে ধীরে নেমে আসে ধরণীর দুই চোখে···কুঠির ঘরে ক্ষীণ প্রদীপশিখা নির্ব্বাণমুখী—স্তিমিত থমকিত গৃহে শুনা যায় গভীর-গম্ভীর আশ্বাসের স্বর,—

অক্ষয়, বল—গঙ্গা-নারায়ণ ওঁ রাম···তিন তিনবার সেই ধ্বনি জীবন মৃত্যুর মাঝে যেন দিব্য এক অমৃত সেতু করল রচনা—ধীরে ধীরে মৃত্যুর অন্ধকারে নেমে আসে অমৃত লোকের প্রশান্তি—ধীরে ধীরে অমর্ত্যের পথে যাত্রা করে মর্ত্যের আর্ত, ব্যথা জর্জর প্রাণ।

অক্ষয়ের দিব্যজীবনে ছিল দুরপনেয় এক অভিশাপ·· বিবাহের উৎসব হবে তার কাছে মরণের পরিহাস—তার ভবিষ্যৎদর্শী পিতা রামেশ্বরও কোন দিন তাকে কোলে করেননি ; বলতেন,—মায়া বাড়াবার দরকার নাই। যাই হোক আত্মীয়দের বিশেষ চেষ্টায় অক্ষয়ের অশুভ বিবাহ বারশো ছিয়াত্তর সালের বৈশাখে সম্পন্ন হয় আর তার পরই বিষম জ্বর-বিকারে অক্ষয় হয় শয্যাগত—শ্রীঠাকুর প্রথম হতেই দেন সাবধান করে। কিন্তু ললাট-লিপিতো মুছে ফেলা যায় না, তাই অস্তাচল আসে ঘনিয়ে। অক্ষয় শ্রীঠাকুরের চরণে প্রণাম জানিয়ে—শ্রীমুখের অভয়বাণী শুনে যাত্রা করেন বিশ্বনাথের পরমধামে···

শ্রীঠাকুরের মাঝেও ত ছিল সাধারণ মনের এক করুণকান্ত স্নেহ নির্ঝর··· অক্ষয়ের মৃত্যুতে শ্রীপ্রভু সাধারণ মানুষের দেহবুদ্ধি অঙ্গীকার করে যে বিষম ব্যথা পেয়েছেন সেকথা নিজমুখেই দিয়েছেন জানিয়ে। লোকের কাছে শোক মোহের অতীত বলে পরিচয় দিয়ে, তুরীয় বলে প্রচারের চেষ্টা কোনদিনই করেননি। শোনা যায় শ্রীহরিদাস ঠাকুরের অন্তর্ধানে, মহাপ্রভুর বিরহজ্বালায় শরীর এত সন্তপ্ত হয়েছিল যে শুষ্কপত্র দেহে পড়লে ধূপশলাকার মত উঠত জ্বলে। শ্রীঠাকুরের এই মানুষ ভাব মনস্বী মোক্ষমুলারকে করেছে অভিভূত, আর অকুণ্ঠে সেকথা দিয়েছেন ধরে তার বিখ্যাত পুস্তকে।

শ্রীঠাকুরের কথা—আহা পুত্র শোকের মত কি আছে? খোলটা থেকে বেরোয় কি না? অক্ষয় মোলো তখন কিছু হলনা। কেমন করে মানুষ মরে বেশ দাঁড়িয়ে দেখলুম···যেন খাপের ভেতর থেকে বার করে নিলে, তলোয়ারের কিছু হল না—খাপটা পড়ে রইল···খুব আনন্দ হল, হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম—পরদিন এখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কে যেন প্রাণের ভেতরটা গামছা যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্ছে—অক্ষয়ের জন্য প্রাণটা এমনি করছে। মানুষের মাঝে যেমন থাকে প্রজ্ঞা আর পশুত্বের খেলা···অবতারদের মাঝেও তেমনি জেগে থাকে চিরন্তন দেবত্বের মাঝে মাটীর মানুষের ক্ষুদ্রতা—কিন্তু সে ক্ষুদ্রতা বিদুরের ক্ষুদের মতই চির অপার্থিব—চির মধুর—চির মোহমেদুর···

এখানে শ্রীঠাকুরের দর্শনে, পরলোকের এক অপরূপ রহস্য ভেদ হয়। মৃত্যুর পরে জ্যোতির্ময় আত্মা যেন তলোয়ারের মত চকিতে যায় বেরিয়ে, খাপ ছাড়া তখন তার আকার থাকে, তবে সেটি জ্যোতির্ময় ও সূক্ষ্ম। যা পড়ে থাকে দেহ—সেটা খাপের মতই জড়। সাধারণতঃ তলোয়ারটাই কর্ম করে, খাপটা জড়বৎ থাকে ; তেমনি দেহান্তেও সেই চিন্ময় আত্মা দেহ থেকে যায় বেরিয়ে আর শ্রীভগবানই তাকে টেনে নেন যেমন তলোয়ারটি মানুষেই নেয় টেনে।

অক্ষয়ের পর শ্রীঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বরই নিয়েছিলেন বিষ্ণু মন্দিরের পূজার ভার।

শ্রীমান মথুর এরপর শ্রীঠাকুরকে সঙ্গে নিয়ে যান জমিদারী ও পৈতৃকগৃহ দর্শনে, রাণাঘাট, সাতক্ষীরা প্রভৃতি স্থানে। ভক্ত মথুর জমিদারী দর্শনের সময় স্বীয় ইষ্টকে হস্তীপৃষ্ঠে বসিয়ে নিজে শিবিকা করে গিয়েছিলেন। তিনি নিজেকে ঠাকুরের খাজাঞ্চি বলে যে পরিচয় দিতেন এটি তারি নিদর্শন।

আভাস

ভাগবৎ ভক্ত ভগবান, তিনে এক একে তিন—শ্রীঠাকুরের এই মহাবাণীতে যেন সমস্ত বিশ্ব বিধৃত রয়েছে। ভাগবৎ বলতে শাস্ত্র-নিচয় আর শ্রীভগবানের সৃষ্টিমাত্রেই ভক্ত পর্য্যায়ে পড়ে। স্তরভেদে ভক্তের আবার বিভিন্নরূপ। উত্তম, মধ্যম, অধম—বহুরূপে তার প্রকাশ। অজ্ঞেয় ও অবিশ্বাসী এরাও ভক্তগোষ্ঠীর মধ্যে গণ্য। অজ্ঞেয়বাদী দার্শনিক রাসেলের পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস—ভগবানের প্রচ্ছন্ন জয়গানে উচ্ছ্বসিত।

সেদিন কলুটোলার হরিসভার আসরে নেমে এসেছে এক হরিবাসরের রাত্রি—চন্দনে, আলিম্পনে, ধূপে, সৌরভে, সুমধুর হরিকথায়—মাটীর মর্ত্যে যেন অমর্ত্যের শ্যামশোভা হচ্ছিল স্পন্দিত—কেবল শূন্যমুখে পড়েছিল মহাপ্রভুর শুভ্র-সুন্দর পুষ্পাকীর্ণ আসনখানি…গ্রীক দর্শনে সক্রেটিসের কথার সঙ্গে আমাদের শ্রীঠাকুরের কথার অদ্ভুত সঙ্গতি দেখতে পাই। আরিস্টটল বলেছেন,—তিনি নিজে অচঞ্চল থেকে আমাদের করেন আকর্ষণ। আর শ্রীঠাকুর বলেছেন,—তিনি যেন চুম্বক আর ভক্ত যেন ছুঁচ… কিন্তু শ্রীঠাকুরের কথা সক্রেটিসের উপরের

কথা। শ্রীঠাকুর আরও বলেছেন,—আবার কখন ভক্ত হন চুম্বক আর ভগবান হন ছুঁচ। চুম্বকের স্পর্শে লোহা চুম্বক হয়ে যায় একথা বিজ্ঞানের এক নিকষিত সত্য। কাজেই ভগবৎ নামে ও চিন্তায় ভক্ত যে চুম্বক হবে একথা আর প্রমাণ প্রয়োগে বুঝতে হয় না।

যাই হোক্ সেদিন সেই দিব্যমন্দির সন্ধ্যায় ভাগবৎ আর ভক্তের মিলন আকৃতিতে ভগবানের হল আবিভাব, স্থূলে আনন্দঘন-মূত্তিতে—দেখা গেল ভাব-বিগলিত-তনু আমাদের ঠাকুর দাঁড়িয়েছেন শ্রীচৈতন্য আসনে—উভয় হস্তে মহাপ্রভুর প্রেমমুদ্রা নয়নে আনন্দাশ্রু, প্রেম বিজৃম্ভিত ঈষৎ হাসিতে উছলিত—সমাধি নিথরিত দেহে প্রেমমূত্তি স্বয়ং মহাপ্রভুর হয়েছে আবির্ভাব। ভক্তকণ্ঠে মুহুর্মুহু হরিধ্বনিতে আর কীর্তন উচ্ছ্বাসে সেদিনের সভা-সমাপ্তির সে অপূর্ব্ব কাহিনী কলুটোলার হরিসভার এক গরিমাময় সার্থকতা!

উচ্চবিজ্ঞানের তত্ত্বে দেখা যায় জগতে বৃহৎ বস্তুর সন্নিকটে স্থান কালের এক অসমতলের সৃষ্টি হয়। বৈজ্ঞানিক আইনষ্টাইন প্রভৃতির এই মত। শ্রীঠাকুরের হরিসভার আবির্ভাবে যে উচ্চ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার নীচেই এক বৈষম্যের হল উৎপত্তি।

শ্রীঠাকুরের স্থানান্তরে গমনের পরই এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে নানা জল্পনা কল্পনা চলে। আর এর পরিসমাপ্তি হয় কালনার ভগবান দাস বাবাজীর কাছে নির্দিষ্ট ভাবষ্যৎ কর্মপদ্ধতির বিধি প্রার্থনায়। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মুখে ঐ বিবরণে, সিদ্ধ ভগবানদাস বাবাজী ভাবিষ্যতে চৈতন্য আসন রক্ষার ব্যবস্থা করেন।

মহাপুরুষদেরও ক্ষণিক ভুলের বিলাস আছে। বৃন্দাবনে ব্রহ্মারও ভুল হয়েছিল। তিনি কৃষ্ণবাসুদেবকে অসামান্য বলে ধারণায় অক্ষম হন, ফলে গোবৎস ও গোপবালকদের হরণ, আর ভগবানের ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিতে বৃন্দাবনে ঘরে ঘরে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লীলার কথা ভাগবৎ শাস্ত্রে রসমেদুর বর্ণনা আছে।

ভগবানদাস বাবাজীরও শিক্ষার প্রয়োজন ছিল। তাই দেখি সেদিন পুণ্য-তরঙ্গিণী গঙ্গা-পথে শ্রীঠাকুরও উপস্থিত কালনার আশ্রম প্রাঙ্গণে। বরদেহ শ্বেতশুভ্র বসনে আবৃত—গোপন লীলার ছলে ধরা দিতেই যেন আসা—একে অবতার লীলাই গোপন লীলা, আর গুপ্তনট আমাদের এই ঠাকুরের লীলা আরো লুকানো তাই হৃদয়ের সমভিব্যাহারে এসে দাঁড়িয়েছেন কালনার সিদ্ধ ভগবান-দাস বাবাজীর দেউলদ্বারে। হৃদয়কে করেছেন অগ্রদূত আর নিজে আছেন

প্রতীক্ষারত। সিদ্ধ দাসজী বিনয়ের অবতার। বহু সম্মানে হৃদয়কে করলেন আপ্যায়িত। হৃদর ঠাকুরের আগমন বার্ত্তা নিবেদনের আগেই সিদ্ধ মহাপুরুষ সাধনা-প্রসূত দিব্যদৃষ্টিতে শ্রীঠাকুরের সমাগতি পারেন জানতে। যাই হোক শ্রীঠাকুর সাদরে হলেন অভ্যর্থিত। শ্রীঠাকুর কিন্তু আসার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পান বাবাজী মহারাজের জনৈক সাধুর প্রতি তিরস্কার বাণী। অবতার বরিষ্ঠদের জীবনের ব্রত ধর্মের গ্লানি অপনয়ন করা। ভগবান বুদ্ধকে দেখি—দেবদত্তের বিরোধিতায় নিযুক্ত। ভগবান ঈশামসিকে দেখি—জিহোভার মন্দিরে কাঞ্চন-কলুষের পণ্যশালায়···আচার্য্য শঙ্করকে দেখি দিগ্বিজয়ের পথে ধর্মের জয়রথে··· তাই শ্রীঠাকুর, বাবাজী মহারাজের নিরভিমান চিত্তের ক্ষণভিন্ন অশান্তির সংস্কার অপবাহে, ভাব ভূমিকার রহস্যময় লোক হতে।

সিদ্ধ হলে কি হয়—শ্রীঠাকুর বলতেন,—সিদ্ধ হলে কি আর দুটো শিং বেরোয়, সিদ্ধ হলে নরম হয়। সিদ্ধ ভগবানদাসজীও তাই শ্রীঠাকুরের মহাভাবের প্রেরণার শিক্ষা নম্রশিরেই নিলেন। এর পর ভাবগর্গর হরি কথা, অঙ্গনের মঙ্গল দীপটিকে স্নিগ্ধ নিবিড়তায় যে ভরে তুলেছিল একথা সহজেই মনে হয়। সিদ্ধ ভগবানদাসজী শ্রীঠাকুরের মহাভাবের অবস্থা প্রত্যক্ষে নিজেকে কৃতার্থ মনে করেন আর পূর্বাপরাধ স্মরণে তৃণ-দীনতায় ক্ষমাভিক্ষায় এই লীলার পটক্ষেপ হয়।

ঊনত্রিংশ

শ্রীমন্মহাপ্রভুর মাত্র সার্দ্ধ-তিনজন রসদ্দার ছিলেন। এবার শ্রীঠাকুরেরও মাত্র সার্দ্ধ-তিনজনের ভাগ্যেই ঐ ভার ছিল। দীর্ঘ চৌদ্দবৎসর শ্রীঠাকুরের সেবার ভার মথুরের সৌভাগ্যেরই পরিচয়। দিব্য সেবাধিকার বহু ভাগ্যেরই কথা। অবতারের সাক্ষাৎকার যুগে যুগেই বিরল—আর তাঁর স্বরূপ জানা আরো বিরল—তাঁদের কৃপাতেইত এটী সম্ভব হয়। পরশমণি শ্রীঠাকুরের স্পর্শে মথুরের জীবনে ঘটে এক বিশেষ রূপান্তর। এর ফলে শ্রীঠাকুরের রসদ্দারের কথায় ও কাজে এসে গিয়েছিল এক অপার্থিব দিব্যতা। সে একদিনের কথা—মথুর অসুস্থ, শয্যালীন, জানবাজারের গৃহে, অনেকদিন শ্রীপ্রভুর চরণ দর্শনে বঞ্চিত—চিত্তে জাগে আকুল তৃষ্ণা, দর্শনের পিপাসা—ভক্তের আকুল আহ্বানে ভগবান আর কি

পারেন স্থির থাকতে? হয়ত এও এক পরীক্ষা—হয়ত মথুরের মনে ছিল কিছু দ্বন্দ—ভক্ত ভগবানের লীলায় প্রবেশ নিষেধ। দুঃখ, ব্যাধি, অশান্তি এদের এক পরম পরিণতি আছে—আছে এক চরম প্রয়োজন—যে অহং আমাদের পরমার্থের পথে রচনা করেছে বিরাট এক বাধা সেই অহং হয়ে পড়ে আপনহারা—তার স্থূলতা যায় হারিয়ে। জমিদার মথুরের দর্প আর অহংএর গুঁড়ি গেছে সরে—ভক্ত মথুর প্রতীক্ষারত—আছেন শ্রীঠাকুরের পথ চেয়ে—সহসা যেন স্বপ্নমথিত বেশে এসে দাঁড়ান আর্ত্তিহারী স্বয়ং—করুণ-কান্ত নয়ন—ভক্তের ভগবান···রোগ কাতর চক্ষে তখন নেমেছে ভক্তির মন্দাকিনী···আবেগে দুটি হাত জুড়ে প্রার্থনা করেন,—একটু কৃপা - আর সেই সঙ্গে ভবসাগর পারের পাথেয় শ্রীগুরুর চরণ-রজের একটী কণা—শরীরের জন্যে ত নয়—এ যে সর্বপ্রয়োজনের পারের আয়োজন। শ্রীঠাকুরের শিহরিত তনুতে নামে ভাবগঙ্গা—আর মথুর আকুল নয়নে সে পরম-কাণ্ডারীর চরণে নিঃশেষে নিজেকে দেন বিলিয়ে···

দীর্ঘ পনেরটি বর্ষ এমনি দিব্য সেবাধিকার মহাকালের মন্দিরে রয় জড়িয়ে। মথুরের জীবন-প্রদীপ ক্ষীণ হয়ে আসে। বারশো আটাত্তর সালে আষাঢ়ের মেঘ মলিন এক দিনে মথুরের এল বহু দূরের ডাক—অসুখের সংবাদ হৃদয়রাম নিত্য দিতেন এনে। শেষের সেদিন শ্রীঠাকুর তাকেও আর পাঠান নি। নিজ মন্দিরের আধো ছায়ে হলেন সমাধিস্থ, আর সমাধিভঙ্গে মথুরের দেবীলোক প্রস্থানের কথা করেন প্রকাশ। সেবক-প্রধানের জীবন-যবনিকার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঠাকুরের জীবন-নাট্যের আর এক অঙ্কের হয় সমাপ্তি—মহাকালের, মহা-নাটকের অন্তহীন লীলা—চির-ছন্দে চলাই শুধু জানে।

ত্রিশ

যুগচক্র যায় ঘুরে—ফাগুনের বনান্তে নবজগরণীর পূর্ব্বাশা দেয় দেখা—বাঁকুড়ার শ্যাম-পথ-রেখা বেয়ে চলেছেন তীর্থকামী কয়েকটি নরনারী—শ্রান্ত নয়নে জেগে আছে ভক্তির আকুতি—চলেছেন কালীক্ষেত্রে, সুরধুনী তীরে স্নান পুণ্যের উদ্দেশ্যে—

ব্যথার রাত্রি চিরদিনই গহিন—তার চেয়েও গহন গাহন রাত্রি নেমেছে দুঃখজর্জর ধরণীর বুকে—রহস্য নীরব চটিতে মাত্র একটি প্রাণী আছে জেগে—

নিথর রোগকাতর দেহ, আর বেদনাহত আচ্ছন্নে জাগে শুধু দূর দুটী করুণায়িত দিঠী···সহসা চমক জাগে সারা তনু মনে। সারা বিশ্বের আর্ত্তিহারী – যুগে যুগের জ্বালা জুড়ান, করুণার্দ্র করে কে যেন সারা দেহে দেয় অমৃতের প্রলেপ—চেয়ে দেখেন রূপ ত নয়—ভরা চাঁদের নীলিমা অঙ্গে মেখে এসে বসেছে—কালোর আলো এক মেয়ে যেন আঁধারকাঁদা মেঘের বুকে বিদ্যুতের বিলাস—নীলকান্ত-মণির হাসি—যেন আলোয় জ্বলে যাওয়া নয়ন-পল্লবে তৃপ্তির রূপাঞ্জন—বিশ্বের সব আলোকে লজ্জা দিতেই যেন বসেছে এই কাল ভুলানো মেয়ে. বেদন লুণ্ঠিত কণ্ঠে প্রশ্ন জাগে, – তুমি কে গা – প্রসাদ প্রসন্নে আসে উত্তর, – আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি···

দক্ষিণেশ্বর। - সুখ স্বপ্নের দখিণাপুরী! সপ্ত-সায়র সেঁচা তীর্থ—চির আশা-মন্থন দেবায়তন! অবাক বিস্ময়ে আবার জাগে প্রশ্ন, আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে দেখব, তাঁর সেবা করব - উত্তর আসে,—সেকি, তুমি যাবে বৈকি - সেবা করবে, তোমার জন্যেই ত তাকে সেখানে আটকে রেখেছি। শিহর লাগা পুলকে সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন জাগে, —বটে, তুমি আমার কে হও গা... সারাবিশ্ব কান পেতে শোনে—নিরন্ধ্র নিথর চিত্তে—অবুঝ অবোধ প্রাণে শোনে, —আমি তোমার বোন হই ··একি রহস্য কে জানে? আজও কি কেউ বুঝেছে মূর্ত্ত-অমূর্ত্তের ধরা দেওয়ার কি এই অভিনয়···। সব দুঃখ, সব জ্বালা যায় জুড়িয়ে —অগাধ প্রশান্তিতে তনুমনে নামে তন্দ্রাবেশ···ধরা ছোঁয়ার জগৎ যায় হারিয়ে ···কূজন মুখর ভোরের আলোয় জননী জেগে দেখেন, দেহ মনে অসুস্থতার নাই কোন চিহ্ন—সুখ স্বপ্নের রেশের মত শুধু জাগে আয়ত মেদুর দুটী আঁখি··· দক্ষিণেশ্বরের আবাহন ইঙ্গিতের মত···পিতা রামচন্দ্রের সঙ্গে ছায়াতল বাহিনী গঙ্গার মত চলেন শ্যামা-নন্দিনী, সাগর-সঙ্গমে—দক্ষিণেশ্বরের মহাতীর্থে··· · ·

তুমি এত দিনে এলে - শ্রীঠাকুর করেন প্রশ্ন—লোকমুখে শ্রীমা শুনেছেন কেবল একটি কথা - দেবতা হয়েছেন উন্মাদ···চক্ষুকর্ণের বিবাদ যায় মিটে। দেবতা চিরদিনই দেবতা···সেই সমাধিস্নিগ্ধ দেহ—করুণানিমিল নয়ন · বিশ্বার্ত্তিহারী তেমনি প্রেমহসিত বয়ান···চিরপিপাসিত নয়নে জাগে সব হারান দুটি ফোঁটা বকুলঝরা অশ্রু···আর দেহছন্দে সব সমাপনের একটি প্রণাম!

যুগের সারথি হতেই তো অবতীর্ণ হওয়া – ধর্মের প্রতিষ্ঠাই তো অবতরণের রহস্য···পাশ্চাত্যে মাতৃজাতির প্রতিষ্ঠার নিরিখ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় দেখা যায়—

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ, নানাভাবে মাতৃজাতিকে উদ্বুদ্ধ ও মুক্ত করার চেষ্টার মাহেন্দ্রলগ্ন ; এর সূত্র খুঁজতে গিয়ে আমরা দেখি অমা-মথিত দ্বিজামা এক রজনী—ফলহারিণী কালিকা-পূজার এক পুণ্যতিথি .....

তারকিত শত আঁখি মেলে সেদিন কালো মেয়ে প্রতীক্ষারত—নয়ন আসন্নে পরমলগ্নের এক সুখের থমক—আনন্দোচ্ছল সুরধুনী যেন নিরুদ্ধ আশায় কম্পিত—দক্ষিণেশ্বরে একদিকে সেদিন উৎসব সজ্জার রাত্রি, আর অন্যদিকে শ্রীঠাকুরের মন্দিরে জ্বলে উঠেছে একটি নিবাত প্রেম-প্রদীপ। সামান্য উপায়নে—ধূপে দীপে, প্রাণের পূজার মন্ত্রই হচ্ছে ছন্দিত...উদার অভ্যুদয়ের মুহূর্তগুলি ত ইতিহাসের হারানো পাতা—গভীর গম্ভীরে জাগে মধুছন্দের মন্ত্রমালা—ষোড়শী মাতৃকার আবাহনী—হে বালে—হে সর্বশক্তির অধিশ্বরী মাতঃ, ত্রিপুরাসুন্দরী, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর—রহস্যপূজার কন্দরে বসেছেন শ্রীঠাকুর আর আলিম্পনমণ্ডিত আসনে জননী সারদা—ত্রিপুরাসুন্দরী নিজে...সব সমাপ্তির পূজা—ফলহারিণী ভবানীর এই পূজাই শ্রীঠাকুরের শেষ পূজা—নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দেবার শেষ আয়োজন—আপন জপমালা দেবীর চরণে নিবেদনে জানান প্রণাম—হে সর্ব্বমঙ্গল্যে—শিবগেহিনি, নারায়ণি তোমায় প্রণাম ! প্রণাম !!

এর পরের কথা—ব্রহ্ম আর শক্তি হয়ে যায় অভেদ - দুই আত্মা সমাধিতে হয়ে যায়—অদ্বয়।

বিশ্বের মাতৃপ্রতিষ্ঠা এই দিনেই ঠিক হয়েছিল—মাতৃজাতির চিরকল্যাণের দ্বার সত্য করে এই দিনই হয়েছিল অপাবৃত—বিশ্বনাথ এই দিনেই নিজেকে করেন বিশ্বজননীর চরণে সমর্পণ—শিব যে অন্নপূর্ণার দ্বারে সর্ব্বহারা...বারশো আশির জ্যৈষ্ঠে ফলহারিণী তিথিই এই মহালগ্নের তিথি।

একত্রিংশ

শ্রীঠাকুর বলতেন জাবর কাটার কথা। বলতেন, কোনো দিব্য অনুভূতির পর জাবর কাটতে হয় সেটি নিয়ে, স্মৃতির তীর্থে তাকে করতে হয় চিরন্তন এই ঘটনার পর শ্রীমার শ্রীঠাকুরের দিব্য সান্নিধ্যে প্রায় বৎসরাধিক যায় কেটে। সব তপস্যার একটা পরিণতির কথা থাকে—অভীষ্টলাভের কথা থাকে—সাধারণ

তপস্যার পরিণতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুবিধা লাভ—কিন্তু দিব্য পুরুষের তপস্যা—ভূমার জন্যে তপস্যা, বহুজনের হিতের জন্যে বহুজনের সুখের জন্যে তপস্যা...

শ্রীঠাকুরের এই বিশ্বযজ্ঞ মানবেতিহাসে কি মহান ফলপ্রসূ হয়েছে সে বিচারের দিন আজও আসে নাই—তবে শুধু নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে দেখলেই চলবে না—জগন্নাথের রথরজ্জুতে, চক্রধারীর ধর্মচক্রে আমাদেরও দিতে হবে হাত। বিশ্বযজ্ঞে আমরাও যে ঋত্বিক···

এই সময় দুই পরম আত্মার মিলন ক্ষণগুলি যেন অম্লান দুটি ভোরের তারার মত থাকে ফুটে, পূততোয়া ভাগীরথীর বুকে ; কখন শ্রীঠাকুর সমাধিতে থাকেন আপনহারা, সারা রাত্রি—তাঁর পাশে থাকেন মা জননী, মূর্ত্তিমতী ভবতারিণী স্বয়ং—কোনো কোনো দিন হৃদয়রামকেও নিতে হয় ডেকে—শ্রীঠাকুরের সমাধি-ভঙ্গের সহায় হতে······

মা—মা একি বলছিস গো···কম্প্র করুণ ধ্বনিতে মুখর হয়ে ওঠে উদ্যান-বাটী···। শরণ ছন্দিত করে বেপথু নয়নে মার চরণে জানান পরম আর্ত্তি,—মা—মাগো এ্যক করছিস্ মা—অশান্ত বুকে তখন নেমেছে এক বিপরীত ভাবগঙ্গা—ভগবান ঈশামসির ভাবধারা—নিজেকে পারেন না ধরে রাখতে, সব চেষ্টা সব আকুলতা হয়ে যায় ব্যর্থ···নয়নোচ্ছলে দেখেন ঈশামসির আলেখ্য থেকে বিচ্ছুরিত জ্যোতিকণা, ঈশা সম্প্রদায়ের মন্দিরে ভক্ত সাধককুলের পূজা প্রার্থনা ও আত্মনিবেদনের অপরূপ রূপায়ণ—অবশে অপলকে শুধু চেয়ে থাকেন—পূর্ব্ব সংস্কার আসে ক্ষীণ হয়ে—আর তার পরিবর্ত্তে খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ভাব বিলাসে তনুমনে নামে বিজাতীয় সংস্কার বন্যা।

ভুল হয়ে যায় দক্ষিণেশ্বর—মুছে যায় ভবতারিণীর করুণাঘন নয়নান্তের প্রসাদ দৃষ্টি—ভুল হয়ে যায় এতদিনের সাধনার ধারা—তিন দিন, তিন রাত্রি এই দর্শন লীলায় ঠাকুর হয়ে থাকেন আপনহারা। কুম্ড়ে পোকা ধরা আরশুলার কথা ঠাকুর যেমন বলতেন—আর বলতেন,—ডিমে তা দেওয়া পাখী—তেমনি উদাস বিভোর নয়নে থাকেন বসে—চোখে নামে অপার্থিব ঈশামসির বিলাস-লীলা—তৃতীয়দিন পঞ্চবটী আলো কোরে এসে দাঁড়ান ঈশামসি স্বয়ং—শোভন সুন্দর, নয়ন বিশদে এক অপূর্ব্ব দীপ্তি ইহুদিজাতি-সুলভ নাসিকার কিছু খর্ব্বতা—যুগ যুগ মথিত করুণাবতারের দেহ যায় মিলিয়ে শ্রীঠাকুরের সমাধিবিলীন দেহে—যেমন পরে বলেছিলেন—দেখছনা এক-এক, এই দেহে এমন করে রয়েছেন।

ভক্ত ও রসদ্দার শম্ভু মল্লিকের উদ্যান গৃহ, দক্ষিণেশ্বরের মন্দির সংলগ্ন—শ্রীঠাকুরেরও সে গৃহে যাতায়াত ছিল। সেদিন শ্রীঠাকুর শম্ভুর গৃহসংলগ্ন ম্যাদোনা মূর্ত্তি দর্শনে ঐ ভাবে ঈশামসির পেয়েছিলেন দিশা—পেয়েছিলেন সাগরপারের পরশমণি।

বর্ত্তমান যুগ বৈজ্ঞানিক যুগ। বর্ত্তমান মানুষ যুক্তিবাদের মানুষ। বিনা বিচারে মেনে নেওয়া প্রগতিশীল মন সায় দেয়না। তাই দেখি শ্রীঠাকুর প্রচলিত ধর্ম্মমতগুলি নিচ্ছেন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে আর সুরু করছেন পরীক্ষামূলক অনুসন্ধান। একে একে চব্বিশটী তন্ত্র, বৈষ্ণবমতবিবেক পঞ্চভাবাশ্রয়ের হলো সায়। অদ্বৈত বেদান্তের বেদ্যকেও হল জানা। এরপর বৈদেশিক সাধনায় পেলেন মহম্মদের দর্শন—আর ঈশামসির পথে লাভ করলেন ঋষিখৃষ্টের একাত্মবোধ। নিজে যেমন বলতেন,—রত্নাকরের তীরে বাস করে যেমন মনে হয় আরো কত রত্ন আছে দেখি সাগর গর্ভে, তেমনি কত ভাবে, কত রূপে শ্রীভগবানকে লোকেরা ডাকে তাঁর দর্শনের চেষ্টা করে, সে সব পথের পরিচয় পেতে মন হত অস্থির। এমনি করে প্রচলিত প্রধান প্রধান ধর্মমতগুলি সত্য বলে পরিচয় করেই না বলতে সক্ষম হলেন,—যত মত তত পথ, সব পথই সত্য। সব শিয়ালের এক রা। আর এমনি করেই সব মতের সব পথের অবতার, প্রফেট্ বা মুরশিদ্ পদবীতে হলেন প্রতিষ্ঠিত। বর্ত্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ—একত্বের যুগ—এ যুগের মানুষ সারা বিশ্বকে একসূত্রে চায় বাঁধতে—এ যুগে মানবাত্মা সামান্য জাতির বা দেশের গণ্ডীতে চায় না বদ্ধ হতে - তাই এ যুগের ঠাকুরও নিলেন সব ধর্মের সাধনা ও সিদ্ধি—অবতারদেরও আছে ক্রম, আছে বিবর্ত্তন—তাই স্থান-কাল দৃষ্টে আমাদেরও স্বামিপাদের সুরে সুর মিলিয়ে বলতে হয়,—হে অবতার বরিষ্ঠ তোমায় জানাই আমার পরম প্রণতি!

বত্রিশ

ভক্তবীর গিরীশ ঘোষকে শ্রীঠাকুর দেখেছিলেন, মা ভবতারিণীর দক্ষিণ জানু থেকে বাইরে আসতে। শ্রীঠাকুর বলতেন,—গিরীশ ভৈরবের অবতার। ভৈরবের অবতার না হলে শ্রীঠাকুরকে এমন করে কে পাঁচসিকে পাঁচ আনা ভক্তি দিয়ে ধরতে পারে? কলকাতার বাগবাজার পল্লীতে সেদিন প্রদোষের অন্ধকার

এসেছে ঘনিয়ে, গৃহে গৃহে সন্ধ্যাদীপে আর মঙ্গলশঙ্খে দিনান্তের শুভসূচনা উঠেছে জেগে।

তখনকার এই অঞ্চল ছিল নিভৃত পল্লীজননীর মতই প্রশান্তিতে ভরা—আধো আলো, আধো ছায়া বুকে নিয়ে ধীরে নেমে আসত সন্ধ্যার আঁচল খসা আবেশ···নাট্যসম্রাটের গৃহদ্বারে সেদিন এসে দাঁড়িয়েছেন ধীর পদক্ষেপে যোগীন মহারাজ, পরে যিনি স্বামী যোগানন্দ নামে শ্রীমার একান্ত সেবক ও অনুগত হয়েছিলেন। নাট্যসম্রাট সেদিন ছিলেন অনুপস্থিত। বালক ভক্ত যোগীন ছিলেন প্রসিদ্ধ সাবর্ণ চৌধুরীর বংশের ছেলে—সহজেই শান্ত আর নম্র। ভক্তবীর গিরিশের গৃহে আসা তখন অনেকেরই ভীতির কারণ ছিল। বৈঠকখানা ঘরে নানা চিন্তায় আছেন বসে ভক্ত যোগীন,—সহসা ঘোষজা মহাশয় এসে উপস্থিত—তিনি তখন একান্ত মত্ত···। এসেই জড়িত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন,—কে হে ছোকরা—পরিচয় পেলেন—পরমহংসদেব পাঠিয়েছেন এক বাণ্ডিল বাতির' জন্যে—শুনেই তিনি দুয়ার ধারে পড়েন বসে···ভক্তবীর অভিনয়ে সে যুগে ছিলেন বিশেষ কুশলী, এ কথার লোক প্রসিদ্ধি আজও আছে। তাঁর নিজের কথায় পাই—জীবনে তাঁর দুটি বিষয়ে কৃতিত্ব ছিল, নাট্যসম্পাদনে আর 'নাট্যাভিনয়ে। মা ভবানী একদিন স্বপ্নে দর্শন দিলেন তাঁর একটি দিক হরণ উদ্দেশ্যে। ভৈরব নির্ভীক উত্তরে মঞ্চের কৃতিত্বই মার চরণে দেন বলিদান। এরপর থেকেই তাঁর অভিনয় গৌরব ম্লান হয়ে আসে—মা ভবতারিণীর দিব্যলীলা চিররহস্যায়িত। হরিশ্চন্দ্র নাটকে চণ্ডালের অভিনয়ে—আঁখ উপড়ে লেব বলে রক্তিম চক্ষুতে যখন এসে দাঁড়াতেন তখন প্রেক্ষাগৃহে এক বিভীষিকার হতো সৃষ্টি···যাই হোক সেদিন বোধ হয় রঙ্গমঞ্চে কোন অভিনয়ের পূর্বসূচী ছিল—সেই অবস্থাতেই তিনি নানা নটভঙ্গীতে শ্রীঠাকুরের এই প্রয়োজনে বারবার জানান প্রণতি, শ্রীদক্ষিণেশ্বরের উদ্দেশে। 'সেদিনের বাগবাজার পল্লী গৃহারণ্য ছিল না। শ্রীদক্ষিণেশ্বরীর মন্দিরশীর্ষ বাগবাজার অঞ্চল হতেই দৃষ্টিতে পড়ত।

এরপর যোগীন মহারাজের ভীত স্তিমিত চোখের উপর সুরু হয় এক অদ্ভুত নটরঙ্গ—ভক্তবীর গিরীশ উন্মত্ত ভঙ্গীতে সুরু করেন শ্রীঠাকুরের স্তব—এ স্তব, খেউর স্তব—শ্রীঠাকুরের চতুর্দ্দশ পুরুষকে জড়িত করে তিক্ত উক্তি—আর তার পর্বে পর্বে ভূলুণ্ঠিত প্রণতি। ঘনায়মান সন্ধ্যা নিবিড়তর হয়ে আসে, ভয়াবহ রজনী বালকের চক্ষে যেন নিথরতর হয়ে আসে—ভীতি জড়িত বালকের চক্ষু

তখন পলায়নের সন্ধিতে ইতস্তত দর্শনাকুল—কিন্তু দুয়ারে ভৈরবাবতার আছেন বসে—পলায়নের পথ মাত্র নাই ; ক্রমে গিরীশের সহজ চেতনা আসে ফিরে, তিনি ভৃত্যকে এক বাণ্ডিল মোমবাতি দিতে আদেশ দেন—সেদিন পলায়মান সন্ধ্যায় একটি ভক্তের পলায়ন যে অন্তর নিঙড়ান ব্যাকুল প্রার্থনারই সুফল, দক্ষিণেশ্বরের অন্তর্যামীই তার একমাত্র সাক্ষী !

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের লীলাব্রজে বসে আছেন নব-ব্রজরাজ। শ্রীঠাকুরের নিজের কথা,···সেদিন তীর্থঙ্কর বেশে ধূলি-ধূসরিত চরণে আবার এসে দাঁড়িয়েছেন দক্ষিণেশ্বরে—আর শ্রীহস্তে বৃন্দাবনের রজ ছড়িয়ে বলেন আধো ফোটা কথায়, —আজ হতে এস্থান বৃন্দাবনের মত তীর্থ হল···ভক্তবীর আছেন বসে, চিন্তাসমাকুল চিত্তে। সহসা শ্রীঠাকুর বলে ওঠেন,—গিরীশ সকাল সন্ধ্যায় স্মরণ মনন করবে—শ্রীপ্রভুর তখন অর্ধবাহ্য দশা—ঘোষজা ভাবেন, অভিনেতার সকাল সন্ধ্যার কোন নিরিখ নাই—আর তার ওপর তিনি ভৈরবের অবতার। চোখে ভেসে আসে কৈশোরের চপলতা···যে কাজে নিষেধ সেই কাজেই ছিল দক্ষতা। দেবতার উদ্দেশ্যে কুটোবাঁধা ফলটি না হলে তাঁর চোখে আসত না নিদ্রা। বাইবেলে কথিত ইভ-এর মত তাঁর নিষিদ্ধ ফলই ছিল প্রিয়। নিয়ম-কানুনের গণ্ডী না ভাঙ্গলে স্বস্তি হত না মনে; ভাবেন আর ভাবেন, চিন্তার হয় না শেষ। —তাও যদি না পার তবে,—অন্তর্যামী বলে ওঠেন,—খাবার শোবার আগে তাঁকে ডাকবে। দেবভৈরবের চিন্তা গভীরতর হয়ে আসে ; তার জীবনে খাওয়া ও শোওয়া দুইই অসাধারণের পর্যায়ে পড়ে—নিয়মও নাই, বন্ধনও নাই। ব্যথিয়ে ওঠে সারা চিত্ত—গুরুর এই সাধারণ উপদেশের মর্যাদা দিতে মন মাথা নাড়া দিতে থাকে বাসুকীর ফণার মত, নত মস্তকে অন্তর মথিত নীরবতায় গিরীশ শ্রীঠাকুরের চরণ চিন্তাই একমাত্র উপায় স্থির করে থাকেন বসে। লীলাকমলে তখন অলকার করুণা-গঙ্গা—সহসা বেদকণ্ঠে জাগে অশ্রুত এক বাণী,—তবে আমায় বকল্‌মা দাও। যেন বহু যুগের পরপার হতে সে ধ্বনি, সে বাণী, তৃষিত বিপর্যস্ত ভক্তের কর্ণে অমৃত করল সিঞ্চন—তনুমন বিলুণ্ঠিত একটি প্রণামে ভক্তবীর জানান তাঁর অন্তরের পরম স্বস্তি—পরম দৈন্য···পরে তাঁরই মুখে শুনি,—এবার আমায় উদ্ধার করতেই দেহ ধারণ করে আসা।···মত্ত ভক্তবীরের আর এক-দিনকার আকুলতা,—দাও বর ভগবান—সেবা করব—একটি প্রার্থনা—ছেলে হয়ে আসতে হবে···

সেবার অধিকার তিনি পেয়েছিলেন,—শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর একটি ছেলে হয় ; মাত্র চার বছর সে ছেলেটি বেঁচে ছিল, ভক্তবীরও তাকে শ্রীঠাকুরের মতই পরম সেবা যত্নে ভরিয়ে রাখেন। ভক্তবীর গিরীশ কখন মার দিকে তাকাতেন না। পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাসের ভক্ত বলতেন,—এ পাপচক্ষে মাকে দেখব না। তাঁর গৃহটা ছিল বলরাম মন্দিরের কাছে। হঠাৎ একদিন ছাদে আছেন, শুনলেন, শ্রীমা বলরাম মন্দিরের ছাদে আছেন দাঁড়িয়ে, ত্রস্তে ঘোষজা চোখে কাপড় দিয়ে নীচে নেমে আসেন পাছে মার দিকে পড়ে দৃষ্টি ! তাঁর সেই ছেলেটিই কিন্তু একদিন নটসম্রাটকে মার কাছে জোর করে নিয়ে যায় হাতে ধরে—অশ্রুল কণ্ঠে তিনি যতই বলেন,—ওরে মার কাছে আমি যাব না— আমি মহাপাপী—সে ততই জোর করে হাত ধরে টানে। শেষে জোর করে উপর তলায় সেই দেবশিশুই নিয়ে যায় ভক্তবীরকে—অনেক দিনের অভিমানের অন্তে ঘোষজা বলেন,—এই ছেলে থেকেই মা তোমায় পেলুম। মা তখন বাগবাজারে·

শ্রীঠাকুর তখন কাশীপুরে.. দ্বাপরে ভক্তের অভিশাপ মাথায় কুড়িয়ে আরক্ত শ্রীপাদপদ্মে গ্রহণ করেছেন ব্যাধের শর···আর এ যুগের শত শত ভক্তের জন্ম জন্মান্তরের আর্ত্তি নিজ অঙ্গে নিয়ে সেদিন ছিলেন শরশয্যায় নিষন্ন···

ইংরাজী বৎসরের শুভ উদ্বোধনের সে দিন—উদ্যান বাটীর হিরণ্ময় পথে দাঁড়িয়ে আছেন ভক্তবীর, সঙ্গে আছেন গৃহীভক্তেরা—প্রভুর প্রসঙ্গে প্রসন্ন করে তুলেছেন স্থানটি, পূর্বাশায় অনিমিখ দুই নয়ন রেখে—সহসা এসে দাঁড়ান নারায়ণ স্বয়ং—জয়ঘোষে আর জয়মন্ত্রে দিক যায় ভরে—তমসার নিবিড়তার মধ্যে শুকতারার মত শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে জাগে,—গিরীশ তুমি কি দেখেছ, যার জন্যে লোকের কাছে একে অবতার বলে বেড়াও ? ভক্তবীর তখন রজরঞ্জিত প্রাঙ্গণে নিজেকে দিয়েছেন লুটিয়ে—শ্লথকণ্ঠে বলেন,—ব্যাস, বাল্মিকী, যার কথা বলতে অক্ষম, তাঁর কথা আমি কি করে বলব ?—সমাধির শিহর জাগে দেব তনুতে— ক্ষীণ চন্দ্রে জাগে বেদ-হাসি—কণ্ঠে জাগে দেব-বাণী—তোমার চৈতন্য হোক··· পৌষের হিমস্নিগ্ধ সেই অরুণোচ্ছল প্রভাতে ভারতের তথা জগতের ভালে কি লিখন লিখে দিয়েছিল তা স্বয়ং বিধাতাই জানেন· তবে সেদিন দিব্য আবেগের দিব্য অনুভূতি· সমবেত সকলের জীবনেই এনে দিয়েছিল এক নব-প্রভাতের সূচনা—এক নব মুক্তিতীর্থ···

তেত্রিশ

পতিতোদ্ধারিণী সুরতরঙ্গিণী সেদিন ফেনিলোচ্ছল আনন্দচঞ্চল · দিনান্তের শান্ত শোভায় স্পন্দমান—স্তব্ধ দুই তীরে শ্যাম-তমালের রেখা যেন নিথরিত দৃষ্টিতে আছে চেয়ে। গঙ্গার তীরে ধীরে ধীরে ভেসে চলা একটি তরণীতে যুগসন্ধানী দুটি প্রেম কজ্জলিত আঁখিতে যেন কিসের উৎকণ্ঠা—সহসা সেই আকুল দিঠিতে উছলে ওঠে আনন্দ শিহর—যেন চিরচেনা আপনজনের মিলেছে সন্ধান। গঙ্গার পশ্চিমকূলে কামারহাটির এক উদ্যানবাটীর জীর্ণ বাতায়নে দেখা যায় আপনহারা ভাববিহ্বল দুটি আকুল নয়ন—একি আকর্ষণ না শক্তি সঞ্চার। মনে পড়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কথা—রামকেলীর পদধূলি অরুণচরণে রঞ্জিত করে চলেছেন হরিনামের বন্যায়—আর সঙ্গে চলেছেন সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদবৃন্দ—কীর্তনকলম্বিত দিকচক্রবাল হয়েছে পুলকাকুল—সহসা সুরধুনি সচকিত করে ফুকারিয়া ওঠেন,— নরোত্তম, নরোত্তম—মৌনমুখে সকলে চেয়ে থাকেন শ্রীপ্রভুর মুখচন্দ্রে—এ লীলার সন্ধান যায় না পাওয়া···দীর্ঘ দিন পরে নরোত্তম আত্মপ্রকাশ করলেন, তখনই এই রহস্যের হয় সমাধান—এই আকর্ষণ, এই আহ্বান কার অবতরণ সঙ্কেত··· আর মনে পড়ে বৃন্দাবন লীলায় মালিনীকে, বৃন্দাবনের আনন্দদুলালকে ফল দেওয়ার ছলে মাতৃ-হৃদয়ের আকুল আকুতি—লীলার পুনরাবৃত্তিতে সেই গোপালের মার আবার এই লীলার স্বর্গে নেমে আসা—আর নন্দপুরচন্দ্রকে আবার চন্দ্রা-চিতনন্দনরূপে খুঁজে পাওয়ার এই সূত্রপাত···ভগবানের যদি অবতীর্ণ হওয়া সত্য, তবে তাঁর লীলাসঙ্গীদের অবতরণের প্রয়োজন আছে, নইলে লীলা যে পুষ্ট হয় না। গোপালের মার পূর্বনাম অঘোরমণি। গুরু পুরোহিত বংশে তাঁর জন্ম—পিতা নীলমাধব, কামারহাটির গোবিন্দ দত্তের কুল পুরোহিত ছিলেন। বালবিধবা গোপালের মার নিষ্ঠা।বিষম, শুচিবাই বললেও অত্যুক্তি হয় না।

দক্ষিণেশ্বরের সে এক মঙ্গলময় দিন। প্রহরাধিক হয়ে গেছে অতীত—সহসা অঘোরমণির কণ্ঠে সচকিত হয়ে সকলে ছুটে এসে দেখে গোপালের মা স্তম্ভিত হয়ে আছেন দাঁড়িয়ে—শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ রহস্যে আরক্তিম...জানা গেল পরিবেশন মুখে শ্রীঠাকুর হঠাৎ গোপালের মার ভাতের কাঠিটি ফেলেছেন অশুচি করে—শুচি করার গোপন ছলেই। সেদিনের সে অন্ন গোপালের মার কোন প্রয়োজনেই লাগেনি—এমন কি রন্ধনের কাঠিটিও গঙ্গাগর্ভে পেয়েছিল স্থান।

রাত্রির গহিনে ডুবে আছে সুপ্তির ধরণী, মর্ম্মরিত উপকূল—গঙ্গায় ঈষৎ কম্পিত ঊর্মিতে এক অব্যক্ত ছন্দহিল্লোল—ছায়া আর আলোয় এক অপূর্ব মায়ালোক করেছে রচনা—রাত্রির তখন শেষ যাম, গঙ্গার প্রত্যন্তশায়ী প্রায়ান্ধকার গৃহে গোপালের মা জপ-নিবিষ্টা—সহসা ধ্যাননিষন্ন নেত্রে জাগে এক অপরূপ বিলাস—নব-নীরদ-দলিত-কান্তি বিদ্যুদ্দাম স্ফুরিত এক বালগোপালের মূর্তি—প্রেমস্ফুরিত নীল নয়নে চপল হাসি উচ্ছলিত—আকুল প্রসারিত দক্ষিণ মুঠিতে দ্যুলোকের অমিয়া…অশ্রুসরস পুলকাকুল এক চীৎকারে অন্ধকার যেন সচকিত হয়ে উঠে—বহুবাঞ্ছিত বহুবঞ্চিত গোপন ধনকে বুকে ধরে উন্মত্ত হৃদয় যেন জুড়াতে গিয়ে অসীম আকুতিতে যায় হারিয়ে—আনন্দ সুন্দরের লীলা তখন স্ফুরিত…গোপালের মার কোলে উঠেই ধরে খাবারের বায়না—ক্ষীর, সর, ননী—এসব চাই…

উচ্ছলিত অশ্রুতে দুকূল-হারা মন যেন কোন বাধাই মানতে চায় না—নিজের দুঃখ দুদশার কথায় কেবলি অশান্ত ধারায় ঝরে পড়ে বেদন নিবেদন—বলে,—বাবা অক্ষম দুঃখী, অনাথ—কোথায় ওসব পাব…রাজ্য-সাম্রাজ্য ভাঙ্গা-গড়ার খেলায় দুর্যোধনের পরমান্ন ফেলে বিদুরের ক্ষুদে, সুদামার শুখানো চিঁড়ায় যাঁর পরমানন্দ—পুরীর সিংহদ্বারে রঘুনাথ দাস গোস্বামীকে পুলকমুগ্ধ করতে পর্য্যুষিত অন্নে যার প্রসাদ দৃষ্টি, তাঁর কেন দীন জননীর ব্যথা অসহ করতে দুরন্ত এ প্রার্থনা কে জানে…অক্ষম অনিচ্ছায় গৃহ সঞ্চিত সামান্য নাড়ু এনে দেন অবোধ ছেলেকে শান্ত করতে।

দুরন্ত ছেলে খাবার বায়না অন্তে সুরু করে তার খেয়াল খুসীর খেলা—মালা নেয় কেড়ে, কখন কাঁধে, কখন কোলে চাপে, কখন চুলে ধরে, কান্না-হাসির মুক্তো পান্না ছড়িয়ে আকুল করে তোলে মার চিরতৃষিত ক্ষুধিত প্রাণ—চির অভ্যস্ত জপ সেদিন আর অজপা রয় না—আনন্দ দুলালকে পেয়ে বৈধী জপের বাধা সেদিন কোথায় যেন যায় ভেসে—সেদিন বিধি বন্ধনের অন্ধকারে নেমে এসেছে লীলার অরুণাভিসার··গৃহ কোণে বালারুণের মত দাঁড়িয়েছেন বালগোপাল—তাঁর চরণ থমকে জীবনের সব অন্ধকারই যে আলোয় আলোয় আলো হয়ে যায়—

চৌত্রিশ

লীলার স্বর্গে সেদিন প্রথম অরুণোদয়—অনুরাগের অরুণোদয়—কুড়িয়ে পাওয়া সাতরাজার ধন এক মাণিক,—এই পরম পাওয়ার মানুষ হয়ে যায় পাগল, সর্বহারা শৈল-সানুতে যেন দুকূল উছলে নেমে আসে পরম আনন্দের ঢল। ব্যথাহত মরণ মলিন দীর্ণ এই জীবন, প্রেমের মণি-প্রভায় হয়ে যায় বিভোর… চুপে চুপে, ক্ষণগণা দীর্ঘ রজনীর বুকে চেয়ে থাকা দুই অতন্দ্র নয়নে যখন নেমে আসে অমৃতের পুলক, তখন কি যে হয়—আর কি বা রয়—তার বর্ণনা লেখনীর কলঙ্কে কখন বিমলিন হয়নি—প্রেমের অলকায় সে অমরলিপি চিরনন্দিত। মর্ত্তের সঙ্গে অমর্ত্তের চিরমিলনের এ বার্ত্তা বহুবাঞ্ছিত স্বপনের মতই থাকে জেগে… যুগ-যুগ সঞ্চিত এ পরম ধন মানবের ভাগ্যে ক্বচিৎ আসে—বিশেষ এই মোহমলিন যুগে—

রায় রামানন্দ সেদিন পুণ্যতোয়া গোদাবরী তীরে নবহেমকান্তি-কান্ত গোরা রূপের পেয়েছেন দর্শন—সেদিনটি প্রেম-ব্রজের এক পরম দিন—প্রেমাভক্তির মন্দাকিনী ধারায় সেদিন রোমাঞ্চ জেগেছিল ধরণীর বুকে; একে একে সাধ্যকথা ভক্তশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ মুখে প্রভু শুনেন আর ভগীরথের মত প্রেমগঙ্গাকে উজানমুখে চলেন বইয়ে—

প্রভু কহে এহো হয়—আগে কহ আর
রায় কহে অবশ্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ সার।
রায় কহে বাৎসল্য প্রেম সর্বসাধ্য সার ॥

এই বাৎসল্য প্রেম পঞ্চরসের চতুর্থ পর্যায়ে—পরম ভাগবত নারদের কথায় এই ভক্তি, পরম প্রেমরূপা, যার স্পর্শে ধরণী অমৃতায়িত হয়—মানুষ তৃপ্ত হয়—উন্মত্ত হয়—স্তব্ধ হয়! সেই প্রেম অনির্বচনীয়া—আর মূকাস্বাদেই এর পরম প্রকাশ—আবার ভক্তের কথা বলতে গিয়ে উছলিত হয়ে বলেছেন—একান্ত অভ্যন্তরচারী এই ভক্তের মহিমা অবরুদ্ধ কণ্ঠে অশ্রুরোমাঞ্চিত পুলকে, ভক্ত, ভগবানের মহিমায় হন আপনহারা। তাঁদেয় স্পর্শে ধরণী পবিত্র, কুল পবিত্র, আর তীর্থ সুতীর্থ, কর্ম সুকর্ম হয়—শাস্ত্র পুণ্যতর হয়। আর যুগপাবন—এই ভক্তেরা যুগে যুগে

ভগবানেরই আপনজন—তাই কুরুযুদ্ধের সর্ব কোলাহল মথিত ভগবানের পরম আশ্বাসের বাণী,—আমার ভক্তের বিনাশ নাই।

শিশুসুন্দর সেদিন লীলারসে গোপালের মাকে করে তুলেছে আকুল—চঞ্চল শিশু খেয়াল খুসীর খেলায় তখনি কোলে ওঠে—তখনি কাঁধে চেপে বসে—তখনি ছুটে বাইরে যায়। সহসা গোপালকে বুকে জড়িয়ে গোপালের মার জাগে এক অপূব আবেগ·· দক্ষিণেশ্বরের আবছা হাতছানিতে বুঝি জেগেছে ছন্দ—দূরাগত বাঁশরীতে যেমন বৃন্দারণ্যে জেগেছিল ভরাচাঁদের আকুতি···বুক নিঙড়ান আঁধারের আছে চুপি চুপি ডাক, আলোর আকুতি আছে —আবার আঁধারের আবেদন যেন বেশী···বেড়িয়ে পড়েন মা আর ছেলে—ছেলে ধরেছে মাকে জড়িয়ে তার কোমল ভুজ-বল্লরী দিয়ে, আর বৃদ্ধা অপটু হাতে আঁকড়ে নিয়েছে পরম পাওয়া, অনেক চাওয়ার ধনকে ··ব্যথিয়ে জমা অশ্রু যখন ঝরে পড়ে আনন্দ শিহরের তপ্ত স্পর্শে, তখন চোখের কোণে চেপে রাখাই যে তার পরম সার্থকতা—সভায় শোভার রতন সে তো কোন দিনই নয়।

ছুটে চলে আপনহারা বেগে কামারহাটির পথ রেখা বেয়ে—কখন বুকে চেপে ধরে চপল গোপালকে—কখন মুখখানি তুলে, চুমায় চুমায় করে তোলে আকুল কমল কোমল কপোল। লোকে দেখে এক বৃদ্ধা উন্মাদের মত চলেছে, ভোরের আলোর মত—হুঁসহারা—দিশাহারা...লুটিয়ে পড়া আঁচল যেন মুছে চলেছে পিছনের সব চিহ্ন—বেদনার পুরাতন সব পরিচয়।

সেদিন দখিণাপুরীতে সানাইএর সুরে জেগেছে ভৈরবীর এক নূতন রূপ··· শিশুর থমক ভাঙ্গা ছায়ার মত জাগে যে ছন্দ, অফুট ফোটা কুঁড়ির বুকে ভাঙ্গা ভাঙ্গা ছায়ার মত জাগে যে আলাপ, মলয়ানিলে ভরা চাঁদের বুকে জাগে যে হিল্লোল—

দখিণাপুরী আলো করে সেদিন বসে আছেন দখিণাপুরচন্দ্র—প্রতীক্ষারত। নয়ন ভঙ্গে, দেহছন্দে জেগেছে এক অপরূপ নব সুষমার সঙ্গীত—যেন বৃন্দাবনের পূর্বগোষ্ঠ—

বসন পহিরণ আন

আলথাল কেশ নাহি লেশ-সান ॥

দক্ষিণ দুয়ারে সহসা ডাক পড়ল,—গোপাল—গোপাল···বিশ্বের মাতৃ হৃদয় নিঙড়ান এ ডাক যেন দুয়ারে দুয়ারে কর হেনে যায়—ডেকে যায় সর্বহারা প্রাণ,

বিশ্বের প্রাণপুরে শিহর জাগে—শিহর জাগে সন্তানহীন সব প্রাণে—শিহরিত হয় সুরধুনীর শান্তনীর—শিউরে ওঠে সদ্যজাগা পিউ পাপিয়ার দল ..আর আমাদের গদাধর সুন্দরের দেহ ছন্দে জাগে বাল-গোপালের সোহাগকাড়া নয়ন ভঙ্গ…।

অবশেষে এসেই বসে পড়েন গোপালের মা—আর গোপাল বেশে শ্রীঠাকুরের লীলার সাগর ওঠে ফেনিয়ে…যুগে যুগে জাগা সে লীলার সাগর ভাসিয়ে নিয়ে-গেছে ভক্তকে—আর তার সঙ্গে ভগবানও গেছেন ভেসে—হাসি অশ্রুর মোহনায়…

এমনি করেই শ্রীভগবানের জন্যে সব হারিয়ে ভেসে গেছেন মেবারের রাজ রাণী মীরা—এমনি দুকূলহারা ভক্তিতে ভেসে গেছেন রাজপুরোহিতের কন্যা, দেবী করমা—যার প্রীতির নিবেদিত অন্নের অপেক্ষায় শ্রীশ্রীজগন্নাথবল্লভ ভোগ গ্রহণে হয়েছেন বিরত—এমনি করেই ম্যাক্সিমিনিয়ার সম্রাটকে ঈশ্বরবিশ্বাসী করতে গিয়ে জীবন দিয়েছিলেন বলি, এলেকজান্দ্রিয়ার দেব-কুমারী ক্যাথারিন্—সেই স্রোতেই সম্রাট কনষ্টান্টাইনের মহিষী, দেবী হেলেনা হয়েছেন জেরুজালেমের দীন-তীর্থচারিণী…

পঁয়ত্রিশ

শ্রীঠাকুর বলতেন,—অনুরাগের বন্যা যখন আসে তখন সব একাকার হয়ে যায়—যখন মাঠে এক বাঁশ জল উঠে পড়ে তখন আর আলপথে ঘুরে যেতে হয় না। প্রথম অনুরাগে সব সমান বোধ হয়—প্রথম ঝড় উঠলে যখন ধুলো ওড়ে তখন আমগাছ, তেতুল গাছ সব এক বোধ হয়।

এতদিন গোপালের মার ছিল জপধ্যানের বিধিবাদের উপল পথ বেয়ে সাবধানে চলা—এতদিন পাখার প্রয়োজন ছিল হাওয়ার প্রয়োজনে—এখন বইতে সুরু করেছে কৃপার দখিণা—এখন শুধু পাল তুলে দেওয়ার প্রশান্তি—

আসার পথে থাকে দ্বিধাদ্বন্দ্বের আকুলতা, থাকে আশা-নিরাশায় ভয় বিহ্বলতা, আর ফেরার পথে থাকে শান্তির আনন্দ—প্রাপ্তির নিবিড়তা—আসার পথ ভিজিয়ে দেয় শিশুর ক্রন্দন আর যাবার পথরেখায় ছড়িয়ে পড়ে প্রসন্ন হাসির শুচি শুভ্র ছন্দ…তবে মাধবের প্রতিষ্ঠা হওয়া চাই, না হলে আসা যাওয়ার কূলে, থাকে শুধুই দুকূল ভাঙ্গা অশ্রু।

গোপালের মা ফিরে চলে কামারহাটির কুটীরে—বুকভরা প্রসন্নতা কুড়িয়ে পথধুলি হয়ে উঠে অনুরাগের রঙে রাঙ্গা—অকালে হোলির রঙে রাঙা হয়ে ওঠে ধরা ব্রজ,—ফাল্গুনের রাঙাদিন ; সঙ্গে আছেন প্রেমার্ত্ত প্রাণের মূর্ত্ত বিগ্রহ বালগোপাল—মেঘ-কজ্জলিত দুই নয়নে চপল হাসি চাপা, গোলাপের সুবাস নিঙড়ান দুই চরণ অঙ্গে নব বিদ্যুদ্দাম স্ফূরিত—অমৃতায়িত করে চলেছেন ভক্ত হিয়া•••

মনের অগোচরেই আমাদের আকুল প্রশ্ন জাগে—জীবনের ক্ষণ অবসরে কেন এমন হয় না—কেন চলার পথে এমন দেখা পাই না—সব ব্যথা, সব ক্ষুধা মেটাবার এই তো পথ—কৃপার তো হেতু নাই—সেই অরূপ রূপে সেই মানস-হরণ হাসিতে আমাদের কাছে এসে দাঁড়ালে এত কি পাষাণ হিয়া যে সে-রূপে গলবে না—ভুলে যাবে না সব বন্ধন, সব ক্রন্দন, ধরার সব কিছু ? এ প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই রহস্য ছলে দিয়েছেন,—সে মিটিংএ আমি ছিলাম না। অবশ্য ভক্ত কেদারের মুখের কথা নিয়েই বলেছেন একথা—ছলনাময়ের আবার মার চরণে এ প্রার্থনাও আছে,—মা একবার করে দেখা দিস্, না হলে কি নিয়ে থাকবে। এ-প্রশ্ন আমাদেরই মুখের প্রশ্ন—এ অভিযোগ আমাদেরই প্রাণের অভিযোগ—দেবতার মুখে এ শুধু ঠাকুরালী—ভক্ত যখন ছুঁচ হন, ভগবান হন চুম্বক, ভগবান চুম্বক হলে ভক্ত হন ছুঁচ—ভক্ত যখন ভাব-সাগরে দেয় ডুব, ভগবান তখন তাকে নিয়ে যান ভাসিয়ে—আর ভক্ত যখন ভাসতে চায়, ভগবান দেন ডুবিয়ে—

কামারহাটিতে এদিকে সুরু হয়ে গেছে গোপালের লীলাঙ্কন ; নূপুরিত চরণে জেগে উঠেছে বসন্তের বন জ্যোৎস্না, শুষ্ক বৃন্তে নবপত্রালির লাস্য—গোপালের মা যতই তাঁর এতদিনের ধ্যান জপে মন দিতে চান অভ্যাস বশে, ততই গোপাল দেয় বাধা—মালা নেয় কেড়ে—ধ্যান-গভীরতা অজস্র-চুম্বনে যায় হারিয়ে—শুতে গিয়ে আবদার জুড়ে চেয়ে বসে বালিশ, শুকনো নাড়ু দিলে মুখ নেয় সরিয়ে —খেতে খেতে দেয় খাইয়ে ; বৃদ্ধার—এতদিনের শান্তি আজ অশান্তির আনন্দে হয় দুকূলহারা। জপে-ধ্যানে, খাওয়া-শোওয়ার কোন বাঁধনই যেন সেই বাঁধনহারা চায় না রাখতে ; বহু সাধনার ধনকে পাওয়া যেমন দুরূহ, তার তালে তাল রাখা তারো চেয়ে কঠিন—গোপালের সঙ্গে কামারহাটির বামণীর জীবন্তে, জাগ্রতে এমনি লীলা চলে দুইমাস ধরে—এই দিব্য লীলার অতন্দ্রে

নিরন্ধ্রে দীর্ঘদিন থাকা অসম্ভব – তাই লীলাতে নেমে আসে ছেদ—শ্রীঠাকুরের আদেশে তিনি তাঁর জপের মালা ইত্যাদি গঙ্গায় দেন ফেলে নিশ্চিন্তে নির্দ্বন্দ্বে। নারায়ণের লীলার স্রোত স্তিমিত হয়ে এলেও দর্শনাদি একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায়নি। ভক্তি মন্দাকিনী নিত্য স্রোতময়ী—মরুপথে পথহারা সে-ত হবার নয়।

লীলা থেকে নিত্য আবার নিত্য থেকে লীলা - এই সঞ্চরণ, ভাবসাগরের মহামীনের সঞ্চরণ ক্ষণে সপ্তলোকে লোকাতীত হয়ে যাওয়া, ক্ষণে লোক-ললাম লীলা-স্ফুর্তিতে ভক্ত সঙ্গে বিহার করা, হাস্য-লাস্য—লীলার লহরে দুকূল ঘন হয়ে আসে। আবার স্রষ্টা সাক্ষীরূপ, আচার্য গুরুরূপও চিরজাগ্রত – চির সহজ—

সেদিন নৌকাবিহারে আসছেন দখিণাপুরের হাটে—শ্রীজগন্নাথের পুনর্যাত্রা উৎসব হয়ে গেছে সাঙ্গ—ভক্ত সঙ্গে চলেছেন ভক্তের ভাব বিগ্রহ শ্রীঠাকুর—স্বয়ধুনীর শান্ত শোভা করে তুলেছেন আনন্দ মেদুর—ভক্ত সঙ্গে ভক্ত সখা লীলা রসময় সহসা হয়ে পড়েন রুদ্রগম্ভীর – গোপালের মাকে ক্ষণনয়ন ভঙ্গেও দেন না ধরা—সুরভি সন্তপ্ত বসন্তানিল সহসা হয়ে যায় নিথর, সঙ্গীত মুখর উৎসবময়ী রজনী যেন হয়ে পড়ে দিশাহারা—শ্রীঠাকুরের মৌনমন্থর ভাবে সকলেই হয়ে পড়ে অস্থির ; শ্রীঠাকুরের দিকে সকলেরই প্রশ্ন দৃষ্টি—দেখা যায় শ্রীঠাকুরের দৃষ্টি বার বার ফিরে আসে একটি পুটলীতে আহত হয়ে—জানা গেল গোপালের মার পুটলি—ভক্ত বসু পরিবারের দানে সমৃদ্ধ এই পুটলি—সাধুর সঞ্চয় নিষেধ—তাই ত্যাগীর রাজার এই ভাব বৈলক্ষণ—মৌনকথার এ শিক্ষা গোপালের মা ভোলেননি সারা জীবনেও…

ছত্রিশ

আষাঢ়ের বর্ষণ প্রত্যাসন্ন দিন—শ্রীঠাকুর বলেছেন,—কামারহাটির বামণী কত কি দেখে, একলাটি নদীর ধারে ! একটী বাগানে নির্জন ঘরে থাকে—আর জপ করে। গোপাল কাছে শোয় – শিহর লাগে দেব দেহে লীলার অনুস্মরণে… ফিরে বুঝি আসে সেই সব দিন, রামলালা বিগ্রহ নিয়ে দেবতায় ঠাকুরালী… দেখে গোপালের রাঙা রাঙা হাত—সঙ্গে বেড়ায়—কথা কয় !

পরপারের কথা মানুষের কাছে চির অবগাহ গহিন—পরলোকের সন্ধানে মানুষ যুগে যুগেই সন্ধানী। আমাদের ষডদর্শনের ত কথাই নাই—গ্রীক

দার্শনিক প্লেটো থেকে আরম্ভ করে আধুনিক দর্শনও পরলোকের এই বধির যবনিকা সরিয়ে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টিতে কেবলই দেখতে চায়—কি আছে সেই রহস্য লোকে—সেই ছায়ার রাজ্যের কথা সব যুগেই মানুষের চিত্তকে করে তুলেছে উৎকণ্ঠিত—উদ্বেগ মথিত।

নীড় বিরহী মানুষ আজ পরকালের সুখ-সুবিধার কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা সেই মরণ সন্ধানে ব্যস্ত। তাই মার্কিন দেশে প্রেততত্ত্বের এত অনুশীলন। যদিও আত্মাকে হারিয়ে পাশ্চাত্য আজ অমর অনাত্মাতে (বায়োলজিক্যাল্ ইম্‌মর্ট্যালিটি) আশ্রয় নিয়েছে।

কামারহাটীতে সেদিন অলসমন্থর মধ্যাহ্ন—তন্দ্রা গহিন চোখে নেমেছে ক্লান্তি ছায়া—শ্রীঠাকুর শয়ন-নিষন্ন—পাশে মানসপুত্র রাখাল মহারাজ—শ্রীঠাকুরের আহারাদি হয়ে গেছে সারা। সহসা অতন্দ্র দিশারীর দৃষ্টি পথে এসে দাঁড়াল দুই প্রেত—নরকের সব বীভৎসতার মূর্ত্তরূপ—জানায় তাদের দুর্দশা—তাদের অশান্তি আলোর প্রকাশ যেমন আঁধারে পায় না থই—কুসুমিত বনজ্যোৎস্না মৎসগন্ধারমণীর চোখের ঘুম নেয় কেড়ে, তেমনি নরকের অধিবাসীদের অসহ হয়ে পড়ে স্বর্গের মহিমা—তারা মিনতি জানায় শ্রীঠাকুরের অদর্শনের—শ্রীঠাকুরও তাদের কল্যাণ মানসে ফিরে আসেন জগদম্বার খাস তালুকে—শ্রীদক্ষিণেশ্বরে। কামারহাটীতে শ্রীঠাকুরের এই আসা গোপালের মার আকুল আহ্বানেই।

পরে একদিন প্রশ্ন প্রসঙ্গে জাগে এই দুই প্রেতপুরুষের ভবিষ্যতের কথা—শ্রীমা এর উত্তরে জানান তাদের মুক্তির বাণী—শ্রীঠাকুরের দর্শন অমোঘ—ভগবদ্দর্শনের পর আর কোন অশুভ সংস্কার থাকতে পারে না·· অবতার, যিনি তারণ করতে আসেন—এটি শ্রীঠাকুরেই মুখের কথা—তাই ভোগক্ষেত্র পরলোক আজ মুক্তিক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে—তাঁরই কৃপায়।

পরম ভাগবৎ নারদের জীবন-বেদে ব্রহ্মানন্দের মধ্যে কলহানন্দেরও একটি স্থান ছিল। শ্রীঠাকুর বলেছেন ঈশ্বর বালকস্বভাব; তাই তাঁর ভক্তদের মধ্যেও এসে যায় বালখিল্য রূপ। শ্রীঠাকুরের লীলাঙ্গনেও দেখি মতবৈষম্যের লঘু পরিবেশের সৃষ্টি করা—স্বামিজীর সঙ্গে নাগমহাশয়ের, গিরীশবাবুর সঙ্গে স্বামিজীর প্রীতির বিসম্বাদ ছড়ান রয়েছে—কথামৃতের পাতায় পাতায়।

সেদিন দক্ষিণেশ্বরের ভক্তমেলায় এসেছেন শিবাবতার স্বামিজী আর

আমাদের গোপালের মা। শ্রীঠাকুরের রঙ্গ ওঠে উথ্‌লে—লীলার একদিকে বেদান্ত তত্ত্বের নরেন্দ্রনাথ, এযুগের সব্যসাচী - জ্ঞানে, ধ্যানে সহস্রদল কমল—আর একদিকে দীন হীন নামের কাঙ্গাল কৃপাধন্য গোপালের মা—একদিকে নরেন্দ্রনাথের বিচারের ক্ষুরধার, আর অন্যদিকে সরল গোপালের মার প্রেমার্ত্ত অশ্রুল বিশ্বাস। সবাই ভাবে জয় পরাজয়ের কথা—শেষে প্রেমার্দ্র প্রাণেরই হয় জয়—বাঁধভাঙ্গা অশ্রুর অভিষেকে জ্ঞান পড়ে থাকে বাইরে।

দেহকে শাস্ত্রে রথ বলেছে—আত্মা তার রথী···আবার বিরাট সৃষ্টিও যে তাঁর চিরাঞ্চনের জয় রথ···তাঁরই অধিষ্ঠান, আরাধনার স্থান···চিরচলার-ছন্দে, চির অর্চনার আনন্দে এই জয়রথের নিত্য যাত্রা—শিশু নীহারিকার মত নিরুদ্দেশের পথে চিরচঞ্চলিত—চির অনর্গলিত এর গতি—অনুর মাঝেও যিনি—বিরাটেও সেই তিনি—চলার মাঝে অচল—ধরাতে অধরা—আমাদের গদাধর গোপাল ··

মাহেশে জগন্নাথের জয়রথ ঘর্ঘরিত গতিতে চলেছে। রথযাত্রা লোকারণ্য—বাঁশীতে আর শিশুর হাসিতে উৎসব মুখরিত—মুহূর্তে যেন দেবতার ক্ষণা-ভিসারে নেমে এসেছে অমর্তের মহিমা···লীলাও যে নিত্য···

গোপালের মার নয়নপল্লব থেকে সরে যায় মোহাঞ্জন···সহসা উচকিত চীৎকারের উন্মত্ত উদ্দামে দেখেন জলে, স্থলে, গগনে, ভুবনে অন্তরে, বাহিরে দেবতা—প্রাণময়—মনোময়—সর্বময় · তাঁর নিজের কথা,– সেদিন আমি আর আমাতে ছিলুমনা—নেচে গেয়ে কুরুক্ষেত্র করেছিলাম ··মনে আসে খৃষ্টভক্ত সল্ চলেছেন দামাস্কাসের পথে—সহসা ভগবৎ জ্যোতি-সাগরে দিশাহারা হয়েই ত পেয়েছেন দিশা।

সাঁইত্রিশ·

লীলাও নিত্য···তাই শ্রীঠাকুরের অদর্শনেও গোপালের মার সঙ্গে গোপাল গদাধরের নিত্যলীলার হয় না ছেদ···সেদিন সিমলা নরেন্দ্রভবনে বসেছে ভক্তের মিলনমেলা—গোপালের মা সহসা এসে উপস্থিত। সকলে করে বসে গোপালের মার কাছে কিছু প্রশ্ন। বৃদ্ধা তখন গোপালের কাছে জানায় ভক্তদের আকুতি। চিন্ময় চপল কি সে কথা কানে নেয় গৃহ থেকে গৃহান্তরে সে চলে ছুটে · নূপুরিত চরণে ছন্দ তুলে, কোন কথা কানেই যায় নি যেন। তখন গোপালের উদ্দেশ্যে

নানা অভিযোগে লীলামুখর হয়ে ওঠে সে স্থল। শেষে যেন গৃহান্তরে কা'কে হঠাৎ ফেলেন ধরে—আর তার সঙ্গে ক্ষুব্ধ অনুযোগে বলেন,—আমায় কি এমনি দৌড় করিয়ে নিয়ে বেড়াতে হয় রে? এরপর একটি মিঠে চুমায় শিশুসুন্দরের সেদিনের লীলাছন্দ হয় শেষ।···তাইত শুনি দেবর্ষির মুখে—

তুলসী দলমাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা।
বিক্রীনীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্য ভক্তবৎসলঃ॥

তিনি যে নিজেকে বিকিয়ে দিতেই বসে আছেন।

মনস্বিনী নিবেদিতা কিন্তু চিনেছিলেন এই সহজ দিব্য-জীবন—তাই তিনি গোপালের মার অসুস্থতায় তাঁকে নিজের কাছে এনে রাখেন আর সেবা-সম্পদে তাঁর শেষের দিনগুলি করে রাখেন প্রসাদ প্রসন্ন···মহৎ দেখে কাঁদতে পারাই ত ধন্য কাঁদা।

সেদিনও আষাঢ়ের পূর্বাশায় আলোর জোয়ার রচনা করেছে ইহপরকালের অমৃত-সেতু—শিশুসুন্দরের, চির-সুন্দরের—অমলিন হাসিই যেন ফুটে উঠেছিল সেই সমাপ্তি উষায়—এমনি এক বর্ষণমুখর দিনে বাসুদেবময় হয়ে উঠেছিল তার অমৃতান্বিত জীবন আর তেমনি বর্ষাসন্ন দিনেই হল তার পরিনির্বাণ—কালের নেমি আবর্তনে মহাশূন্যে রাখে না কোন পদ-চিহ্ন কিন্তু স্মৃতির সুরভি রয়ে যায় চির অম্লান। লীলার সূর্য সেদিন অস্তাচলচুম্বী—কৃপাসিদ্ধ গোপালের মা শুয়েছেন গঙ্গায় অর্ধ-নিমর্জনে—কীর্তনের রোল অশ্রুল হয়ে উঠেছে গঙ্গার ক্ষুব্ধ বুকে··· নগ্নপারে, অশ্রুমুখে কাছে দাঁড়িয়ে নিবেদিতা—অমর আত্মা সেদিন রামকৃষ্ণ-লোকের অমৃতপথযাত্রী····

একদিন গোপাঙ্গনাদের আর্তি জেগেছিল ব্রজবনে—

জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ
শ্রয়তঃ ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।

হে প্রিয়, তোমার জন্মে ব্রজধাম নন্দিত···আজ বিংশ-শতাব্দীও শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁর একাদশজন পার্ষদের জন্মে সত্যই ধন্য···

ভক্ত ভগবানের সম্বন্ধ নিত্য। পাশ্চাত্যের মনস্বী হোয়াইট্ হেড বলেন,—ভগবান যেমন ভক্তকে সৃষ্টি করেছেন, ভক্তও তেমনি ভগবানকে করেছে সৃষ্টি।

শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সেদিন ঋষি দেবেন্দ্রনাথের দিব্যকথায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হয়েছে সৃষ্টি···শ্রীঠাকুরের প্রশ্নের উত্তরে ঋষি বলেন,—এই জগৎ যেন

একটি ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে—এক একটি ঝাড়ের দীপ। এ জগৎ কে জানতো? ঈশ্বর মানুষ করেছেন, তাঁর মহিমা প্রকাশ করবার জন্য; ঝাড়ের আলো না হলে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যন্ত দেখা যায় না।···যুগে যুগে তিনি এসেছেন বেথেল্‌হেমে পিটার প্রমুখ দ্বাদশ দীনার্তদেব নিয়ে ··এসেছেন নৈরঞ্জনার কুলে ধর্মচক্র প্রবর্তনে পাঁচজন নামগোত্রহীন তপস্বীর সঙ্গে—আবার এলেন সুরধুনীর পশ্চিমকূল আলো-করা গোরারূপে, আর সঙ্গে এলেন শ্রীপাদ, শ্রীবাস এঁরা সব···গঙ্গার পূবকূলে এবার এলেন এগারটি অস্ফুট কুঁড়ির মিলনমাল্যে—বিরাটের গলায় আজও যা অম্লান হয়ে দোদুল। এঁদের চরণ চিহ্নেই ত ধরণীতে রচনা হয় তীর্থবর্ত্ম··এঁদের লীলা সম্পুটেই ত রচনা হয় কত রামায়ণ—মহাভারত—কথামৃত—কত না কাব্য-কাহিনী—কত না অবদান কল্পলতা—চন্দ্রিম রাত্রির মোহমদির পরিবেশে, তারার ক্ষণপ্রভারও পরম প্রয়োজন··।

আটত্রিশ

ব্যথার বারাণসী কাশীপুর। গৌরীমা হয়তো কোন দিনই এখানে আসেননি। সে দৃশ্য ভক্তের যে অসহ্য। তবু সারদা-রামকৃষ্ণ লীলার অধ্যায়ে গৌরীমার অবদান সামান্য নয়। ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে লীলায় বলেন,—বলতো গৌরীদাসী তুই কাকে বড় বলিস।—মা ছিলেন পাশেই, রঙ্গছলে দেহে ছন্দ জাগিয়ে গৌরীমা বলেন—

> রাই হ'তে তুমি বড় নও হে বাঁকা বংশীধারী
> লোকের বিপদ হ'লে ডাকে মধুসূদন ব'লে
> তোমার বিপদ হ'লে পরে বাঁশীতে বল রাইকিশোরী॥

শ্রীমা লজ্জায় সারা, হাত চেপে ধরেন গৌরীমার—শ্রীঠাকুরও ভক্তের কাছে হার মেনে যান চলে—শিবানীর দরজায়, শিব যে চিরদিনের ভিক্ষুক।

দক্ষিণেশ্বরের আর একটি মুক্তাঝরা দিন—মা নেমেছেন স্নান পুণ্যোদক গঙ্গায়, উপরের সিঁড়িতে গৌরীমা। সহসা ত্রস্তে মা আসেন ছুটে—গৌরীমাকে ধরেন জড়িয়ে। মার যেন বড় ভয়। বলেন,—কুমীর গো—গৌরীমার রহস্য যেন মুখে জড়িয়েই থাকে, বলেন,—কুমীর নয়, মকর বাহিনীকে দেখতে মকর এসেছিলেন।

শ্রীঠাকুরের মন নিত্যি থাকে উঁচু সুরে বাঁধা। তবু যেন ধূলার ধরণীকে পারেন না ছাড়তে। একদিন জগজ্জননী মেয়েদের দুঃখে আকুল হয়ে বলেন গৌরীমাকে,– ছাখ গৌরী, আমি জল ঢালি তুই কাদা চটকা–সাধারণ কাজের লোকদের নিয়ে এই উপমা–গৌরীমায়ের সব তাতেই রহস্য। তিনি বলেন,—এখানে কাদা কোথায় যে চটকাবো—শ্রীঠাকুর তখন সত্যিই জল ঢালছিলেন। বলেন,—আমি কি বললুম, আর তুই কি বুঝলি। এ দেশের মায়েদের বড় দুঃখ, তোকে তাদের মধ্যে কাজ করতে হবে।

তখন গৌরীমা বলেন,- সংসারী লোকের সঙ্গে আমার পোষাবে না। আমায় কয়েকটি মেয়ে দাও, হিমালয়ে তাদের মানুষ করে আনি।

শ্রীঠাকুর বলেন,—না গো না—এই টাউনে বসেই তোকে কাজ করতে হবে।

—কলকাতায় মেয়েদের আশ্রমের এর থেকেই সূচনা।

গৌরীমা প্রথম জীবনে ছিলেন মৃড়ানী—ভবানীপুর এঁদের আদিবাস। কালিঘাটের পূজায় এঁর বংশগত অধিকার ছিল বলেই বিবাহের অগ্রসূচীতেই ইনি গৃহত্যাগ করেন। শ্রীঠাকুরের দর্শন আর কৃপা অতি শৈশবেই পান। পরে গোমুখ থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত প্রব্রজ্যা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন কক্ষচ্যুত তারার মত শিখাময়ী গৌরী মেয়ে।

নানা অবস্থা বিপর্য্যয়ে অগ্নিতুল্য তেজস্বিনী গৌরীমা নানা দিব্যদর্শনে ধন্য হয়েছেন। রাজস্থানে একবার কোন মন্দিরে দেখেন মন্দিরের মধ্যেই একটি সুঠামতনু কিশোর ভোজনরত। ভাবলেন হয়তো পূজারীদেরই কোন বালক। পরে দেখেন তিনিই আবার সিংহাসনে আসীন। মুহূর্ত্তে দৃষ্টি হয়ে যায় স্বচ্ছ। বুঝতে পারেন কে ইনি!

আবার যখন কেদারবদরীর পথে, তখন সহসা জনৈকা মহিমময়ী মাতৃমূর্ত্তির প্রকাশ। বলেন তিনি অতি আদরেই,—এ লালী তুম্ কিধার যাওগী—উত্তর শুনে অল্পসময়েই এক নিভৃত পথ ধরে তাকে মন্দির দ্বারে পৌঁছে দেন। স্থানীয় পাহাড়ী ছেলেরা শুনে হয় অবাক, এপথ দিয়ে যাওয়া-আসা অসম্ভব বলেই তারা জানে।

এরপর আসে কর্মময় জীবন। শ্রীঠাকুরের বাণী বহন করে প্রথম ব্যারাকপুরে, পরে কলকাতা, নবদ্বীপ আর গিরিডির শাখা আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়।

ধীরে ছায়া নেমে আসে—মহাযাত্রার দিন ছোট ছোট ছেলেরা জিজ্ঞেস করে

দিদিমা কোথায় যাবে -সহজ উত্তর আসে,—রামকৃষ্ণলোক—ধূপের মত পূতকল্প জীবনের শেষে শ্রীঠাকুরের চরণ ··রম্য চরণই এদের চরম পরিণতি।

উনচল্লিশ

ওরে এতদিনে আসতে হয়···আকুল উচ্ছাসে ভাষা হয়ে ওঠে উত্তরের উতল হাওয়া—আমার মুখ যে পুড়ে গেল, বিষয়ীদের সঙ্গে কথা কয়ে—ব্যথার মূর্চ্ছনায় জেগে ওঠে মর্তের মন্দাকিনী—যুক্ত করে বলেন ঠাকুর,—জানি ওগো সপ্তর্ষির-ঋষি তুমি নররূপী নারায়ণ - দীর্ঘ প্রতীক্ষারত—ত্রিযামা নিশান্তে আজ ধরণীর পরিত্রাণেই এসে দাঁড়িয়েছ পার্থের মতই দীপ্ত রূপে···বাইরে তখন তুরন্ত উত্তর বায়ুর উল্লাস হয়ে এসেছে স্তিমিত। অবিশ্বাসের উচ্ছাস যেন দক্ষিণাপুরের পূর্বদুয়ারে থমকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে, ধরণীর পূর্বাশায় সেদিন নবজাগরণের দক্ষিণার প্রথম শিহর···

শীকরকণাবাহী উত্তর হাওয়া সেদিন উত্তরায়ণে যেন ক্ষণে ক্ষণে হয়ে উঠে উতলা। হিমশীতল হেমন্তের গঙ্গার থমক তরঙ্গ যেন কোন অনাগতের অগ্রছায়ে হয়ে উঠেছে রম। ··কোন চঞ্চল পান্থের পদসঞ্চারে দক্ষিণাপুরী হয়ে উঠেছে স্পন্দমান। এদিকে ধ্যান সুন্দরের সমস্ত দেহে যেন ক্ষণভিন্ন আকুলতায় জাগে শিহর ; বহুদিন বঞ্চিত, যুগ যুগ বাঞ্ছিত যেন কার আশায় উচকিত···মনে পড়ে নিত্যানন্দ প্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভুর মিলন মঙ্গল—

হেন বুঝি মোর চিতে লয় এই কথা
কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে হেথা
পূর্বে মুঞি বলিয়াছো তোমা সভাস্থানে
কোন মহাজন সনে হৈব দর্শনে। (চৈঃ ভাঃ পৃঃ ১৫৩)

সেদিন দক্ষিণাপুর ভক্ত-সমাগমে মুখর, ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ এসেছেন দর্শনের আকুলতা নিয়ে, সঙ্গে এনেছেন নরেন্দ্রনাথকে।

পশ্চিমের দুয়ার খুলেই এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ—ভোগমত্ত ধরণীর পশ্চিম দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছেন পূর্ব-তোরণের ত্যাগের দেবতা···যুগে যুগে প্রাচ্যই

প্রতীচ্যকে দিয়েছে ত্যাগের দীক্ষা--ভগবান ঈশামসি, ভগবান জরথুষ্ট্র, কনফুসীয়স্, লাউৎজে—এঁদের সকলেরই উদয়ের পথ এই প্রাচ্য তীর্থ ··

অঙ্গ দেবতাকে চিনতে শ্রীঠাকুরের দেরী হয় না—গঙ্গাজলের জালার কাছেই নিলেন ঠাঁই—যাঁর বিদ্যুদ্দন্ত লেখনীতে একদিন গঙ্গামহিমা—মহাদেবের জটা-নিঃসৃত গঙ্গাবারির মতই নিষ্যন্দিত হয়েছিল, পূজার পূজ্য সেই গঙ্গবারি-পূরিততোয়াধারের মতই ধরণী সেদিন স্বামীপাদের জ্ঞান করুণার পুণ্যনীরে গহন গাহনের প্রতীক্ষায় আকুল।

তনুমন নিঃশেষে নিবেদিত হল অশান্ত হৃদয়ের ব্যথা --কণ্ঠে জাগল,-- মন চল নিজ নিকেতনে···পরবাসী আপনভোলা শিব যেন পথহারা -- দিশাহারা ক্ষণভিন্ন কুজ্ঝটির বুকে পেয়েছে অরুণিমার রাঙ্গা হাসি। সমাধির সপ্তসায়র মথিত প্রাণে ঠাকুর আদরে দেন ভরে তাঁর আদরের নরকে···সেদিন দক্ষিণেশ্বরের মাঙ্গলিকে জেগেছিল নূতন এক মূর্চ্ছনা—প্রাচীন ভারতে নিদাঘীর মোহাঙ্গনে পূর্বাশার প্রথম আবেদন।

নিশির ডাকে অমার অবলুপ্তিতে মানুষ নিঃশব্দে যায় হারিয়ে—এ ডাক অমানুষের ডাক—কিন্তু যদি ডাক দেন নারায়ণ স্বয়ং তাঁর পাঞ্চজন্যে, আঁধার আত্মা জ্যোতির সমুদ্রে নিজেকে না হারিয়েই ত পারে না।

সেদিন কুঠির ছাতে জেগেছে অসীমের দিশাহারা আহ্বান—ডাকেন ঠাকুর, —ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস, আয়···কুণ্ডলিনীর ধরণীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে সে ডাক জাগায় কাঁপন—বন্ধনের মাঝে জাগায় মুক্তির মুক্তা···এ ডাক একদিন জেগেছিল ভগবান বুদ্ধের করুণায়িত বুকে—এ ডাক জেগেছিল গৌরচন্দ্রের প্রেমার্ত প্রাণে আর নীড় বিরাগীরা দলে দলে এসেছিল ছুটে -

সিমলার ঘুমমাখা পল্লীতে সুষুপ্তির চুম্বনে নিথর হয়ে আছে সপ্তসাগরের ঋষি —সহসা সেই সর্বহারা নিশির ডাক এসে লাগে অর্গলিত হৃদয় দুয়ারে—ছুটে চলেন নরেন্দ্রনাথ দখিণাপুরার' ঠাকুরের কাছে—তন্দ্রাস্তিমিত নয়নে কিসের আচ্ছন্নতা কে জানে—স্পন্দহীন দেহ থাকে পড়ে সেই আড়ম্বরহীন গৃহকোণে— —সেদিন আত্মায় পরমাত্মায় সে কি কানাকানি হয়েছিল ইতিহাসের পাতায় সে রহস্য নিবিড়তায় স্তব্ধ।

চল্লিশ

মহামায়ার বিরাট শক্তিকে কাজে লাগাতেই তাঁর নেমে আসা জগৎ খেলায় ···গীতামুখে তাইত তাঁর কথা,—প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্যঃ বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ··· ঠাকুরও বলেছেন,—অবতার লীলায় যোগমায়া ভেল্কী লাগিয়ে দেন। তাইত দেখি সেই বিরাট মায়াবী যুগে যুগে এক পরম আকর্ষণীয় বস্তু কথায়, কাজে, চলাফেরায় তাঁর মায়ার যাদুদণ্ডে মানুষ হয়ে যায় আপনহারা—যুগে যুগেই কথার মায়াজাল রচনা করেছেন···বুদ্ধ অবতারে জাতকের কল্পকথায় লোক হয়েছে মুগ্ধ —বেথেলহেমেও ছোট ছোট কথা কাহিনীতে হরণ করেছেন বিশ্বের প্রাণ— আজও সে অবদান অনবদ্য। দক্ষিণেশ্বরেও দেখি সেই একই লীলাঙ্কন--লীলার রাখী তিনি নিজেই পরেছেন—তাইত লীলার বৈচিত্র্যেও জেগে থাকে একটি বাদী স্বর। দক্ষিণেশ্বরেও দেখি ছোট ছোট কণিকাতে দিয়েছেন বড় বড় সমস্যার সমাধান, ছোট ছোট কথায় হয়েছে অমৃতের সিন্ধু।

সেদিনের আসরে এসেছেন নরেন্দ্রনাথ—সরস আলাপে দক্ষিণেশ্বর হয়ে উঠেছে মর্ম্মরিত। বলেন ঠাকুর,—দেখ একজন মরে ভূত হয়েছিল, অনেকদিন একা থেকে থেকে সঙ্গীর অভাবে ছট্‌ফটানি আরম্ভ করে দিলে। কোন স্থানে কেউ মরছে শুনলে ছুটে যেত—ভাবত এইবার বুঝি সঙ্গী জুটবে। দেখত মৃত ব্যক্তির গঙ্গাস্পর্শে হয়েছে মুক্তি—এমনি করে তার সঙ্গীর অভাব মেটেনি। আমারও ঠিক সেই দশা—তোকে দেখে ভেবেছিলাম বুঝি একটা সঙ্গী জুটল— কিন্তু তুইত বল্‌লি তোর বাপ মা আছে। আমার সঙ্গী পাওয়া আর হোল না ···নরেন্দ্রনাথের চিরউন্নত শির সেদিন কুণ্ঠায় হয়ে পড়ে একান্ত নম্র। স্তিমিত স্মৃতির দুয়ার খুলে ভাবেন··

প্রথম দর্শনের দিন গেছে কেটে—শক্তিমান নরেন্দ্রনাথের প্রাণে জেগে থাকে অসীমের একটি আকুল ডাক—সাড়া দিতে গিয়ে যেন জাগে না সাড়া—সিংহ-শিশুর থমকিত শরীরে জাগে শক্তির পরীক্ষা···বাঁধনের গঙ্গাধারার মত কূলে কূলে জাগে মুক্তির আকুলতা···দিনে দিনে মাস যায় সরে···নরেন্দ্রনাথ হয়ে পড়েন অশান্ত···সেদিন এক পরমলগ্নে বাঁধভাঙ্গা জোয়ারে ছুটে চলেন সপ্তর্ষির ঋষি, অসীমের টানে উধাও যেন গঙ্গা—নয়নে স্বাতী লোকের চিরতৃষা···আলো আর ছায়ার মিতালী তার পদক্ষেপে—

ভগবান সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আছেন বসে ভাবে অর্ধনগ্ন আপনহারা—উন্মত্তের মত প্রবেশ করেন নরেন্দ্রনাথ—চোখে সারা যুগের প্রশ্ন ছাওয়া - হিউম, মিল্, বেন্, শঙ্করের তৃষ্ণা নিয়ে উপলভঙ্গ গতিতে এসেছেন সর্ব-তীর্থসার, দক্ষিণেশ্বরে—সর্বতৃষার গঙ্গাযমুনায়···

শ্রীঠাকুর এলেন এগিয়ে, তার প্রশ্নের উত্তরে চোখে জেগেছে শিব সম্মোহনের যাদু। দাক্ষায়ণীর মত দক্ষিণচরণটি দিলেন তাঁর বুকে ছুঁইয়ে—ত্রস্ত চকিত সচেষ্ট নরেন্দ্রনাথের বিশ্বে সহসা নেমে এল অবলুপ্তির ঘূর্ণি—উচকিত নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে জাগে ভয়ার্ত এক চীৎকার,—ওগো! আমার একি করলে আমার যে বাবা আছে · অসীমের মমতা নিয়ে শ্রীঠাকুরের জাগে খলখল হাসি—এ হাসি যেন মহামায়ার নিজের খেয়াল খুসীর খেলায়, নিজের পরাজয়েরই হাসি—বলেন, —আচ্ছা থাক্, থাক্. পরে হবে।

এই পরের জন্যই প্রয়োজন ছিল দীর্ঘ পাঁচ বৎসরের পরম প্রতীক্ষা - এর জন্যই প্রয়োজন ছিল সিদ্ধার্থের সব হারাণর পথবৈরাগ্য।

এর পরের কথা সেদিন পুণ্য তীর্থে তীর্থযাত্রীদের লেগেছে ভীড়, মধুকরের মত তারা ঘিরে আছেন দেবতাকে সহসা নরেন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত, জ্বলন্ত উল্কার জ্বালা নিয়ে।

শ্রীঠাকুরও তাকে সরিয়ে নিয়ে যান যদুমল্লিকের উদ্যানবাটীতে—সবার দৃষ্টির আড়ালে—স্বভাব-চেতন নরেন্দ্রনাথ নিজেকে ঠিক রাখতে শত চেষ্টাতেও হয়ে পড়েন আপনহারা— মায়াবী ঠাকুরের কাছে সর্বহারার মত দিলেন ধরা ·

আমাদের সুচৈতন্যে জমা আছে পূর্বাপর সব সংস্কাররাশি—এই নিয়েই আমাদের ব্যক্তিত্ব-এই দিয়েই আমাদের মন-এই সংস্কারের প্রেরণাই আমাদের স্বর্গনরকের নিয়ন্তা—এর মুক্তিকেই নানা শাস্ত্রে নানা ভাবে করেছে অভিনন্দিত পরম পুরুষার্থ বলে। স্বামিপাদের মগ্নচৈতন্যকে সেদিন জাগ্রত করলেন শ্রীঠাকুর তাঁর শ্রীহস্তের যাদুস্পর্শে; সেদিন স্বপ্নোত্থিতের মত ভাবী বিবেকানন্দ প্রকাশ করলেন আত্মকাহিনী—ভাবী তথাগতের অনাগত জীবনবেদ···

সম্বিৎ পেয়ে স্বামিপাদ দেখেন শ্রীঠাকুরের মুখে বেদমথিত তৃপ্তির হাসি—আর বীরসন্ন্যাসীর চোখে নেমে এসেছে অসহনীয় স্বপ্ন-সংঘাত;

একচল্লিশ

উনবিংশ শতাব্দীর মানবাত্মা বিজ্ঞানময়। বৈজ্ঞানিক সত্যই এযুগে চরম সত্য। বিজ্ঞানের যুগ-সন্ধানী আলোই বর্তমান যুগের দিশা ..তাই যুগের দিশারীকেও দেখি বিজ্ঞানঘন দৃষ্টি নিয়ে ভক্তদের সঙ্গে করেছেন বিলাস—তবে এ বিজ্ঞানঘন দৃষ্টিতে রয়েছে বর্তমানের কষ্টিপাথরে নিকষিত অতি বিজ্ঞানীর রহস্য ঋক্।

প্রথম দর্শনেই শ্রীঠাকুর ভক্তদের নিতেন বিড়ে করে, আর নিজেও বলতেন, —সাধুকে দিনে দেখবি, রাত্রে দেখবি তবে সাধুকে বিশ্বাস করবি। নিরীক্ষা পরীক্ষা মুখে চলত, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন সংস্থান, হাতের ওজন, চোখের গড়ন— এমনি সব আধি-ভৌতিক পরীক্ষা। এরপর হত তার আধ্যাত্মিক পরীক্ষা—এ পরীক্ষা ভক্তের অন্তরের সংস্কাররাজির সঙ্গে পরিচিত হওয়া; আর পরীক্ষা ছিল ভবতারিণীর চরণ নিকশে, বিশ্বমনের মণিকোঠায় সন্ধান নেওয়া, আধি-দৈবিক এই পরীক্ষা—সব রকমে বাজিয়ে নেওয়া, কেন যে এত পরীক্ষা এর শেষ উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কারণাতীতের কারণ খুঁজতে যাওয়া অবান্তর চেষ্টা তবে সম্ভবের মধ্যে এও মনে হয় যে শ্রীঠাকুরের শিশু-স্বভাব মনে যত রকম সমস্যার কথা উঠত সবই তিনি নিরসন করে হতে পারতেন শান্ত। বর্তমানের বিহেভিয়ারিষ্টের দৃষ্টিভঙ্গীতে শ্রীঠাকুর ধর্মরাজ্যে এক বিশেষ পদ্ধতির সৃষ্টি করলেন।

সেদিনের ব্রাহ্মসমাজ নবোদিত জ্যোতিষ্কের মত স্বপ্রভায় সমুজ্জ্বল—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব, বিজয়কৃষ্ণ প্রভৃতি আচার্য্যগণের প্রকাশে সমাজ-মণ্ডল তখন আলোয় আলোময়। এঁদের ঘিরে ছিলেন ছোট-বড় তারার মালা —তাঁদের সত্য, নিষ্ঠা, জ্ঞান এইসব সদগুণে বাংলার ব্রাহ্মসমাজ সেদিন সত্যই আকর্ষণ করেছিল জগতের প্রণতিনম্র শ্রদ্ধা।

ব্রাহ্মসমাজের এমনি ক্ষণ বসন্তের সেই লগ্ন যেন আরো রমণীয় হয়ে উঠেছিলো শ্রীঠাকুরের শুভ আবির্ভাবে। মহর্ষি, ব্রহ্মানন্দ, বিজয়, শিবনাথ, প্রতাপ এঁরা সকলেই শ্রীঠাকুরের সঙ্গে সান্নিধ্যে, আলাপ আপ্যায়নে হয়েছেন তৃপ্ত, হয়েছেন ধন্য—মহাপুণ্যের সে একদিন

সেদিন সমাজগৃহে সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্মের মহিমা যেন আরো মহিমান্বিত হয়ে উঠেছে, উৎসব পরিবেশে আর দীপমালায়। সহসা নিরুদ্ধ বিষয়ে সমবেতদের

নয়ন সমক্ষে মূর্ত্ত সত্য-শিব-সুন্দরের মতই এসে দাঁড়ান শ্রীঠাকুর—বেদ-বিনীত ভাবোচ্ছল ঈষৎ হাসির ঠিকরে ব্রহ্মবিজ্ঞান বিকশিত—প্রবেশমাত্র দেহকান্তিতে জাগে সমাধির নিবাত শান্তি—

অনন্ত নিথরিত ব্রহ্মসমুদ্রে যেদিন জেগেছিল আনন্দ হিল্লোল—যেদিন বিশ্বের সহস্রশীর্ষা পুরুষ জেগে উঠে জাগিয়েছিলেন বিশ্বের প্রাণ—সহস্র ধারায় উদ্বেলিত জোয়ারের গঙ্গার মত সেদিন বিশ্বের বুকে জাগিয়েছিল অমৃতের প্লাবন—এই শান্ত উপাসনাগম্ভীর সভাতেও শ্রীঠাকুরের ক্ষণসঞ্চরণে তেমনি জেগেছিল হর্ষের এক আনন্দ নির্ঝর—সমবেতদের ধৈর্য্যধৃত ব্রহ্ম-চিন্তার বাঁধ গিয়েছিল ভেঙে। সমাজকর্তৃপক্ষ উপায়হীন বিহ্বলতায় উৎসবগৃহ করে দেন আলোকহীন—নিষ্প্রভ দীপমালার মধ্যে স্বপ্রকাশ চন্দ্রমণির মত শুধু শ্রীঠাকুরই ছিলেন দীপ্যমান। জ্যোতির সমুদ্রে খদ্যোতপুঞ্জের প্রয়োজন, নিষ্প্রয়োজনেই।

সহসা উল্কার মত ছুটে আসেন নরেন্দ্রনাথ সমাধিধৃত বিগ্রহের পুরোভাগে—বিশৃঙ্খল ক্ষুব্ধ জনস্রোতে শ্রীঠাকুরের দেহরক্ষা যে একান্ত প্রয়োজন। সমাধি-ব্যুত্থিত শ্রীঠাকুরকে ধীরে ধীরে নিয়ে আসেন সমাজগৃহের বাইরে তাঁকে দেখতে এসেই ত দেবতার এই অপমান! সিংহশিশু নরেন্দ্রনাথের কণ্ঠে সেদিন জেগেছিল অনেক স্নেহ-তিরস্কার। তীব্রযুক্তিতে সেদিন মৃগতৃষিত রাজর্ষির কথায় জানাতে ভুলে যান নি ভবিষ্যতের সতর্কবাণী।

মার চরণ নিকষে ফিরে এসে ক্ষুদ্র শিশুর আর্ত্তি নিয়ে শ্রীঠাকুরের কণ্ঠে জাগে এক পরম নিবেদন নরেন যে এমন সব বলে, তবে কি মা আমি মোহমুগ্ধ, তবে কি আমি অপরাধী? দলমল গহন-গাহিনা জননীর পরম আশ্বাসে সেদিন দেবকণ্ঠে জেগেছিল যে কথা, নরেন্দ্রনাথের মুক্ত মুখরতা তার কোন উত্তরই জুগিয়ে দিতে পারে নি। শ্রীঠাকুর জানান—ওরে মা বলেছেন তোর মধ্যে নারায়ণ দেখি, তাই তোকে এত ভালবাসি। ভালবাসায় দেবতা মানুষ হয়—না মানুষকে করে দেবতা না তুইই!...

দ্বিত্রিংশ

দক্ষিণেশ্বরে জেগে উঠেছে এক রহস্যরম্য দিন—গঙ্গাতরঙ্গ যেন করতালি রঙ্গে হয়ে উঠেছে হরিময়। দীর্ঘ মন্দিরশীর্ষ অলকার চুম্বনে হয়ে উঠেছে

অরুণায়িত.. লীলা রসময় শ্রীঠাকুর মধুর নৃত্যছন্দে ভাবোল্লাসে আত্মহারা ··কখন গঙ্গাদর্শনে কখন দক্ষিণেশ্বরীর মন্দির মুখে—ভক্তগুঞ্জনে আর ভগবৎ লীলাঙ্গনে দক্ষিণাপুরে সেদিন অলকার আল্পনা· সহসা নরেন্দ্রনাথ এসে পড়েন শ্রীপ্রভুর চরণনিকষে, যেন শিবজটাহারা গঙ্গাধারা—যার দর্শনে শ্রীঠাকুর হয়ে পড়েন সমাধি নিমগ্ন—যার অদর্শনে নয়নস্পন্দে ঝরেছে অঝোর শাওনের ধারা, তারই আগমনে শ্রীপ্রভু আজ মৌনমন্থর—নরেন্দ্রনাথ চিন্তাকুল চিত্তে গিয়ে বসেন হাজরা প্রভৃতি ভক্তের সঙ্গে—ভাবেন শ্রীঠাকুরের ভাববিহ্বলতার কথা· ক্ষণে আসেন ফিরে স্নিগ্ধ প্রসন্নতার আশায়, দেখেন শ্রীঠাকুর বিমুখ শয়নে রয়েছেন শুয়ে—বিভ্রান্ত সন্ধ্যায় ফিরে যান নরেন্দ্রনাথ ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে।

এমনি দিন দিন করে মাস যায় কেটে,—দক্ষিণেশ্বরের দণ্ডপলগুলি হয়ে ওঠে দীর্ঘতর—শ্রীঠাকুরের বিরূপতায়। কিন্তু আসে না ত কোন ছেদ, কোন পরিবর্তন—এই নিরুদ্ধ নিস্তব্ধতার রহস্যে সকলেই হয়ে ওঠে অস্থির।

সহসা একদিন শ্রীঠাকুর নরেন্দ্রকে অযাচিত প্রশ্নে কাছে তোলেন হঠচকিত,—নরেন! এতদিন ধরে একটা কথাও বলিনি, তবে আসিস কেন?· ভেঙ্গে পড়া মেঘধারার মত উত্তর দেন নরেন্দ্রনাথ,—আপনাকে ভাল লাগে তাই ত আসি—উত্তরে চন্দ্রমুখে জাগে শুধু প্রসন্নতার একটুকরো হাসি···লীলার এই পরীক্ষায় ভক্তের হয় হার, না ভগবান যান হেরে, কে জানে? ·····

নরেন্দ্রনাথের তখন নবানুরাগের বর্ষা,—তপস্যার বন্যায় তখন দ্বাদশপার্ষদ আপনহারা হয়ে চলেছেন ভেসে—শ্রীঠাকুর ডেকে বলেন,—ওরে! অণিমাদি বিভূতি আমার আয়ত্তে রয়েছে, তোকে কাজ করতে হবে—তখন এটি কাজে লাগবে। যদি নিতে চাস তবে মাকে বলি। সপ্তর্ষির রাজাধিরাজের দৃষ্টি-বিলাসে এই লাউকুমড়ো সিদ্ধাই যে কত অসার, সে কথা শ্রীঠাকুরই জানেন সবার চেয়ে বেশী—তবু ছলনার হয় না শেষ।

সঙ্গীত যেন সন্ধ্যার সুর—ঘরে ফেরার ডাক—সাঁঝের কোলে মায়ের চুমা—যমুনার কূলে অকূলের অভিসার···দখিণাপুরের সুরধুনীকূলে সেদিন হরিকণ্ঠে জেগেছে ব্যাথার মীড়

কথা কহিতে ডরাই, না কহিতে ডরাই
মনে সন্দ হয় বুঝি তোমা ধনে হারাই হা—রাই

আকাশ-গলা শিশিরের মত ঝরে পড়ে প্রাণকাড়া সুর—আর নরেন্দ্রনাথ! —তার প্রাণ-শতদলও আর্দ্র হয়ে ওঠে ব্যথায়—সঞ্চিত বেদনা বর্ষণার্দ্র অন্ধকারেই পরে ঝরে—অশান্ত অসীম সাগরের বুকে যে সঙ্গীত, সেও যে সব হারানোর ডাক, আর সেই ডাকেইতো ছুটে আসে সাত সায়রের সুরধুনী—আপনহারা নরেন্দ্রনাথকে আজ ডেকেছেন স্বয়ং ঠাকুর, আর নরেন্দ্রনাথের দুকূল গেল ভেসে—লোকে শুনলো—আমাদের একটা হয়ে গেল ..বিয়োগবিধুর নরেন্দ্রনাথের বুকে জেগেছিল সর্বনাশা আগ্নেয়গিরির অভিসার—দুঃখ দুর্দশায় ঊর্ধ্বশিখ নরেন্দ্র সেদিন সব ছেড়ে উধাও হবার ব্যবস্থাই রেখেছিলেন করে—কিন্তু শ্রীঠাকুরের চোখের জলে আর আর্তিতে তাঁর সব ব্যথাই যায় ধুয়ে মুছে—শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখে শোনেন,—জানি তুমি মার কাজেই এসেছ - সংসারে তোমার থাকা ত হবে না—তবে আমি যতদিন থাকি ততদিন থাক।

অশ্রুসরস সন্ধ্যায় এমনি করেই সমাপ্তি ঘটে ঘর ছাড়ার—ঘরে ফেরার পালা, পার্থ আর সারথির মধ্যে যে বিচ্ছেদের মেঘ এসেছিল ঘনিয়ে তার আঠারো পর্বেই এই বর্ষণ উচ্ছ্বাস।

তেতাল্লিশ

সেদিন মঙ্গলবার—জয়মঙ্গলার খাসতালুক সেদিন ধরেছে গহন গহীন রূপ। দিনান্তের জ্বালা আর অশান্তির বুক-চাপা ব্যথায়, ধরা দিয়েছে শান্ত সন্ধ্যার বুক জুড়ান স্পর্শ। কৈশোরের কাহিনী এসে মিশে যায় অনাগতের স্বপ্ন কুহেলীতে ···ধীরে দীর্ঘ ছায়াপদক্ষেপে নেমে আসে অধীর অন্ধকার, আশা-আশঙ্কার আবরণ, গঙ্গা তরঙ্গে মিশে যায় ঝিল্লীর একটানা সুর—ফুটে ওঠে এক অস্ফুট রহস্যের মীড—অতীত অনাগতের রূপায়ণ—ধরণীর ঐক্যতানে আনে এক পরম বৈচিত্র্য···অতীত হয় অস্ফুট অনাগতের মোহ-মদির বর্ণলেপে।

সেদিনও নরেন্দ্রনাথ এসেছেন মহাসাগরের ডাকে জীবনের শেষ প্রশ্ন নিয়ে; শ্রীঠাকুরের কাছে জানান মিনতি। শ্রীমুখের আশ্বাসে বসে থাকেন দিনান্তের প্রতীক্ষায়—রাত্রির প্রহরান্ত যে তাঁর জীবনের সন্ধিক্ষণ। মা ভবতারিণীকে মনে প্রাণে মেনে নিতে আজও ত পারে নি তাঁর অন্তরলোক—কালোরূপের অকূল পারাবারে আজও তাঁর কূল চাওয়ার নাই অন্ত। আজ মার চরণান্তিকে

তাঁর একটিমাত্র প্রার্থনায় সমাপ্তি হবে সব সংশয়—শ্রীঠাকুর বলেছেন, আজ কালী কল্পতরুমূলে তাঁর অভীষ্ট পূর্ণ হবার দিন—যা চাইবি তাই হবে।

ধীরে সেই সন্ধিক্ষণ আসে নেমে—বিরাট যন্ত্রীর হাতে যন্ত্রচালিত নরেন্দ্রনাথের দেহমনে নেমেছে এক অজানা মদির বিহ্বলতা। বেপথু শরীরে চলেন নরেন্দ্রনাথ জীবন-মরণতীর্থে—ভবতারিণীর চরণান্তিকে—মৃন্ময়ী সেদিন চিন্ময়ীরূপে দিয়েছেন হাতছানি।

চন্দিম বাঁশীর উচ্ছল ডাকেই ত অলকানন্দার উতল সাড়া মার আকুল আহ্বানে ছেলের বুকের আগল আপনিই যায় খসে—তেমন ডাকার মত ত কেউ ডাকে না, তেমন চাওয়ার মত ত কেউ চায় না, তাই ত আমরা নিরন্ধ্র নিস্তব্ধতায় থাকি পড়ে—জড়ের চৈতন্য, না চৈতন্যের জড়তা কে বলবে?

নরেন্দ্রনাথের বুকে সে ডাক আজ পৌঁছেচে—সপ্তর্ষির জীবনে আজ কুহেলীর মুক্তি-লগ্ন—ধীর পদক্ষেপে দেব-অঙ্গন পার হন নরেন্দ্রনাথ, এবার ধীর চরণে এসে দাঁড়ান বিশ্বের রহস্যময়ীর তোরণ তলে—নিমেষে চক্ষের আবরণ যায় সরে—চকিতে প্রাণের সব বন্ধন যায় শিথিল হয়ে—আয়ত দৃষ্টি তুলে দেখেন—চৈতন্যঘন ব্রহ্মময়ী অরূপ রূপে মন্দির আলো করে তাঁর সর্বাভীষ্ট পূর্ণ করতে রয়েছেন দাঁড়িয়ে; জীবনের সর্ব-সংশয় সর্ব অকল্যাণ অভয় হাতে দিতে চান সরিয়ে। সহস্রদল-পদ্ম আপনহারা হয়ে লুটিয়ে পড়েন মার চরণপদ্মে—অন্তরালে সব কলগুঞ্জন তখন নিথরিত হয়ে জেগেছে একটিমাত্র আকুতি,—মা বিবেক দাও—বৈরাগ্য দাও তোমার অভয়পদে অহৈতুকী ভক্তিতে করে তোল দর্শনের অবাধ অধিকারী।

হিমালয়ের অটলকে টলান চিরদিনই দায়—নরেন্দ্রনাথের দৃঢ় মনে আবার রহস্যের জাল আসে ঘনিয়ে—ফিরে যান শ্রীপ্রভুর মন্দিরে—শ্রীঠাকুরের প্রশ্নে জানান প্রার্থনার কথা—জগৎসম্বিৎ ফিরে আসে—মনে পড়ে অনশনক্লিষ্ট মা ও ভাইদের মুখ—আবার আশ্বাস দেন শ্রীঠাকুর—আবার দেন পাঠিয়ে মার চরণছন্দে—শিবাবতারের মুখে কিন্তু লাউ-কুমড়োর প্রার্থনা জাগতে গিয়েও যেন জাগে না—ফিরে ফিরেই প্রার্থনা জানান—মা, বিবেক দাও, বৈরাগ্য দাও—তোমার রাতুল চরণে একান্ত ভক্তির কণাধিকার মাত্রই······অবচেতনের আধোদেশে আছে এক পরম অবচেতন—সেখানেই আছে আমাদের প্রাণ-পুরুষ—মণিকোঠায় সেই শিব-সত্বাই শাশ্বত—তাঁর বাণীই ত অন্ধকারের বুকে

এনে দেয় সত্যকার সন্ধানী আলো—সেই দিশারীর ইঙ্গিতেই আপনহারা শিব নানা পথে চলেই ত পায় পরম পথের সন্ধান—এই অবচেতনের অবচেতনই ত তৃণকীটকে নিয়ে চলেছে শিবপীঠে……

চুয়াল্লিশ

প্রেম-মদিরাক্ষী সুরধুনীর পাণিহাটির কূল সেদিন হরিময়—সেদিন আবার দুকূলে জেগেছে হরিনামের বান—কীর্তনের রোলে উঠেছে—

সুরধনী তীরে হরি বলে কে রে
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছেরে ॥

সত্যই সেদিন যেন প্রেমদাতা নিতাই আবার এসে দাঁড়িয়েছেন সুরধুনী কূল আলো করে—রসোচ্ছল হরিনামে শ্রীঠাকুরের—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণী অবনী বহিয়া যায়,
আর ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মূরছা পায়—

রূপে অপরূপ! সে দেখায় জীবন-মরণ যায় হারিয়ে—কীর্তন-সম্প্রদায় তাই আপনহারা হয়ে ধরেছে—

হরি বলে কে রে - জয় রাধে বলে কে-রে - -
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে।

ভাবঘন মূর্তি শ্রীঠাকুরের কীর্তনে ছিল অন্তরের আবেগই বেশী। ধরা দিতে অধরা সেই আনন্দঘন বিগ্রহ—ফুলময় তনু যেন জ্যোতি সাগরের আধো একটি ফুল—সমাগত কীর্তন সম্প্রদায় যেন আবার ফিরে পায় নদীয়া বিনোদকে। আবার যেন কীর্তনের হাটবাজার যায় বসে। আবার ধরণীর শীতার্ত বুকে ফিরে আসে দখিণার সমারোহ…ব্রজবিপিনে ফিরে আসে বেতস বনের নিঃসন… মনে পড়ে গৌরকিশোরের কীর্তন বিলাস—

প্রভু দেখি লোকে কহে হইয়া বিস্ময়
এ-রূপ এ-প্রেম লৌকিক কভু নয়।

যাঁহার দর্শনে লোক প্রেমমত্ত হইয়া
হাসে কাঁদে নাচে গায় কৃষ্ণনাম লৈয়া
সার্থক জানিও ইহো কৃষ্ণ অবতার
মথুরা আইল লোকে করিতে নিস্তার।

—(চরিতামৃত)

আরও—নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর
চরণের তাল শুনি অতি মনোহর
ভাবাবেশে মালা নাহি রহয়ে গলায়
ছিণ্ডিয়া পড়য়ে গিয়া ভকতের গায়।

—(চৈতন্য ভাগবত)

যুগে যুগে কীর্তনলীলা এনেছে বিপুল সমারোহ, আর যুগে যুগে এই লীলার উচ্ছলে নেমে এসেছেন প্রভু স্বয়ং—যুগে যুগেই আপনহারা মত্ততায় নিজেকে গলিয়েছেন আর গলে গেছে পাষাণের প্রাণ ··

ভাবে মহাপ্রভুর শ্রীঅঙ্গের বর্ণনায়—

গৌরবর্ণ দেহ ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি
ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি।
ক্ষণে ধ্যান করে ক্ষণে মুরলীর ছন্দ
সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবন চন্দ্র।

—(চৈতন্য ভাগবত)

উপনিষদে বৃক্ষকে ব্রহ্মের স্তব্ধতার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে—

বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবিতিষ্ঠত্যেক
স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেন সর্বম্।

শ্রীমদ্ভগবৎ গীতায় শ্রীভগবান নিজেকে তুলনা করেছেন বৃক্ষের সঙ্গে। ত্রেতায় দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবট যেন সত্যের সাক্ষী হয়েই ছিল দাঁড়িয়ে···বৃন্দাবনে রম্য বংশীবট হয়েছিল নিত্য রাসস্থলী আর রামকৃষ্ণ-লীলায় পঞ্চবট তপস্যার অগ্নিতে আজও শিখাময়। পাণিহাটির বটমূলও নিত্যানন্দ প্রভুর অধ্যুষিত পরমস্থান। এই লীলাসত্রে পরম ভাগবত শ্রীরঘুনাথদাস গোস্বামী দণ্ডছলে শ্রীলনিত্যানন্দের ভক্তসেবার বিধান মাথা পেতে নিয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছিলেন। ভাব-

মন্থরে শ্রীঠাকুর এইস্থলে এসে পৌঁছন—সঙ্গে এক অখণ্ড জনস্রোত—ভক্তদল চিরাচরিত প্রথায় মাল্‌সা ভোগেরও করেন ব্যবস্থা।

শুদ্ধসত্ত্ব বিগ্রহ শ্রীঠাকুরের তনুমনে ছিল এক সপ্ত লোকের শুদ্ধি। শ্রীঠাকুরের কথায় - সূর্যোদয়ের আগে তোলা মাখন নূতন হাঁড়িতে রাখা—এটি অবশ্য তাঁর পার্ষদদের জন্যেই বলা। পূর্ণ আদর্শে এতটুকু প্রতিসিদ্ধিও অমার্জ্জনীয়।...পূত গঙ্গাবারি নিষেবিত বটতটে বসেছে ভক্ত মেলা—কুহুলিত হয়ে উঠেছে হরি-নামাবলি। ভাবমুখে শ্রীঠাকুরের তখন অর্দ্ধবাহ্য—ভক্ত সঙ্গে চিরদিন তিনি ছিলেন আপনহারা—সহসা ভেকধারী এক বাবাজী মাল্‌সা ভোগের কিয়দংশ গ্রহণ করে ভাবমন্থর শ্রীঠাকুরের দিকে হন অগ্রসর ভক্তরা গণে প্রমাদ—তাদের চিরদিনের জানা শ্রীঠাকুর যে স্পর্শকাতর - সোনার শ্যাম-অঙ্গ যে সহজেই হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত...ব্রহ্মানন্দ কেশব বলতেন,—এতবড় আধার আজ পর্য্যন্ত জগতে আসে নাই - এঁদের দেহ কাঁচের আলমারিতে সযত্নে রক্ষা করতে হয়, না হলে থাকে না। বাবাজীর অশুচি স্পর্শে শ্রীঠাকুরের দেহ মনে জাগে তীব্র প্রতিক্রিয়া —ভাব-বিহ্বলতা যায় সরে—শ্রীঠাকুর প্রসাদ গ্রহণে হন বিরত। শেষে অন্য এক ভক্তের দেওয়া অমৃত কণায় আনে পরিতৃপ্তি।

মণি সেনের গৃহ-বিগ্রহ দর্শনান্তে রাঘব পণ্ডিতের শ্রীবিগ্রহ দর্শন পথে শ্রীঠাকুরের প্রায় তিনঘণ্টা কেটে যায়—জনসমাগমই এর প্রধান কারণ।

শরণাতুর এক কণ্ঠে জাগে আর্ত্তি...সহসা এসে লুটিয়ে পড়ে কোন্নগরের ভক্ত নবচৈতন্য। অসীম ব্যাকুলতা নিয়ে তিনি এসেছেন ছুটে শ্রীঠাকুরের আগমন সংবাদে। তখন প্রত্যাসন্ন বিদায়মুখে শ্রীঠাকুর নৌকায় উঠেছেন সবে।

মহাভাব বিলসিত তনুতে জাগে করুণার্দ্র শিহরণ, ঈষৎ হাসিতে জেগে ওঠে প্রেমার্ত্তি—চকিতে বরহস্তের স্পর্শে নবচৈতন্যের জীবনে নেমে আসে অমরার ক্ষণভিন্ন সংবাদ।

...লোকে দেখে আনন্দলোকের বিভ্রম বিলাসে ভক্ত হয়ে পড়েছেন উন্মত্ত। সেইদিন থেকেই তার জীবন নদীর হয় দিক পরিবর্তন - সার্থক কবি সত্যই বলেছেন—

ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা॥

নবচৈতন্যের জীবনে পরমচৈতন্যের আবির্ভাব লগ্ন, এমনি অঘটনরেই ঘটনা—

পঁয়তাল্লিশ

সুখ-দুঃখের মালায় গাঁথা এই জগৎ। এই মালার আলোছায়াতেই জগৎ এত বিচিত্র। আমাদের ধুলার ধরণীর শোভা এই মালা। কিন্তু এই মালা যখন জগন্নাথ নিজের গলায় নিজেই পরেন, তখন এই মালা হয়ে যায় পরম রমণীয়—স্পর্শমণির স্পর্শে হয়ে যায় মণির মণি—

যুগে যুগে শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এই মঙ্গল মাল্যে নিজেকে সাজাতে। ভগবান ঈশামসি নিলেন ক্রুশের মৃত্যু কণ্টক, আর দিয়ে গেলেন ক্ষমার অবদান··· নিত্যানন্দ প্রভু নিলেন রক্তরাঙ্গা প্রেমের রাখী, হরে নিলেন যুগ যুগ সঞ্চিত পাপ ভার · ভক্তের সেবার আর্ত্তি নিয়ে ভগবান তথাগত নিলেন দারুণ ব্যাধি... ত্রেতায় ভগবানের হৃদয় ভূষণ ভৃগু পদলাঞ্ছন আজও আঁকা রয়েছে তাঁর শ্রীঅঙ্গে ...আর এ যুগে রামকৃষ্ণ নিলেন পাদুকা লাঞ্ছন সমাধির পরম লগ্নে—আর বুক নিংড়ে নিলেন দুরন্ত ব্যাধির তিলে তিলে জ্বলে যাওয়া - নিজেই বলেন, - এই দেব দেহে পাপস্পর্শ হয় নি কোন দিনই—তবে কেন এ বেদনার্ত্তি? ছলনাময়ের এই প্রশ্ন নিজেকেই করা। নিজেই বলেন,—দেহ ছেড়ে মনটা বেরিয়ে এসেছে, দেখি তার পিঠময় ঘা। মা দেখান যত লোক এসে স্পর্শ করে, আর তাদের ভোগ নিতে হয়, তাই এই দুরন্ত ব্যাধি।

অসাধ্য কর্কট রোগের উপশমের জন্য শ্রীঠাকুরকে আনা হল শ্যামপুকুরের একটি ভাড়া বাড়ীতে—আঠার শতকের পঁচাশি সালের ভাদ্রর এক বিষাদময় দিন—শ্রীঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরের পূত পরিবেশ ছেড়ে চলে আসতে হয় কলিকাতার লোকাবর্তে।

...শ্যামাপূজার রাত্রি। শ্যামপুকুরে সে এক শোক রহস্যের পরিবেশ—তমোময়ী রজনীর চারিদিকে পূজার উপাচার সজ্জিত—ভক্তের আকূতি আর ধূপ চন্দনে হাসিকান্না যায় মিশে, ভক্তদের মনে নানা কথার মেলা—ধীরে পূজার লগ্ন যায় বয়ে—পূজার প্রদীপ হয়ে আসে ক্ষীণ—সহসা পাঁচসিকা পাঁচআনার ভক্ত গিরিশের কণ্ঠে জাগে জয়বাণী—পুষ্প উপচারে শ্রীঠাকুরের চরণ দুটি ওঠে ভরে, একে একে ভক্তদের ভাব বিহ্বল অর্ঘ্য নির্মাল্যে রহস্য যবনিকা যায় খসে। শ্রীঠাকুরের দেবদেহে অভয় মুদ্রায় বিলসিত হয় ভবভয়হারিণীর অরূপ রূপ—পূজায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা পূজ্য নিজেই গেলেন করে...

কালী আর ব্রহ্ম অভেদ—আবার তেমনি অভেদ, লীলা আর নিত্য। ভবতারিণীর প্রকাশমূর্তি লীলামূর্তিতেই শ্রীঠাকুর। রোগজর্জর দেহে, জীবনের অবসন্ন মুহূর্তে শ্রীঠাকুরের দেহে এই প্রকাশেই আসন্ন অবসরের আয়োজন ছিল নিহিত। শ্রীঠাকুর বলতেন,—যখনই দেখবে অগ্রভাগ দিয়ে খাদ্যগ্রহণ করছি, যখনই দেখবে লোকে গণছে, মানছে তখনই জানবে অবসান দিন এসেছে ঘনিয়ে। গোপন দিশারীর প্রকাশ নিদর্শন যে নিষিদ্ধ।

মহাকালিকার এই মহাপূজায় নিজেকে প্রকাশ করেই শ্রীঠাকুর টানতে চাইলেন চিরবিচ্ছেদের যবনিকা। বিশ্বের দীপাধার নির্বাণের পূর্বমুহূর্তে স্বর্ণশিখায় হয়ে উঠেছিল বেদনাময়।

শ্যামহীন শ্যামপুকুর রং পড়ে। শ্রীঠাকুর যান কাশীপুর উদ্যানবাটীর প্রশস্ত গৃহে। একান্ত প্রাণের আকুতিতে ভক্তের প্রাণ শ্যামপুকুরের অপরিসর গৃহে শ্রীঠাকুরকে চান না রাখতে। তাঁরা ভাবেন দক্ষিণেশ্বরীর অন্দর কেল্লার মত উদার প্রশস্ত গৃহ কলিকাতা মধ্যে না পেলেও, আলো হাওয়ার ত্রুটি না হলেই শ্রীঠাকুরের শরীরের কিছু কুশল হতে পারে। তাই কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে শ্রীঠাকুরের স্থানান্তরিত করা হল।

এই শ্যামপুকুরেই একদিন নেমে এসেছিল পূবপশ্চিমের মিলন পূর্ণিমা। খৃষ্টান ভক্ত মিশ্র এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীঠাকুরের কাছে। মিশ্র যুক্তকরে দীন নিবেদনে জানান নিজের সব সমর্পণের কথা। ভাববিহ্বল শ্রীঠাকুর তখন ঈশার সঙ্গে অভিন্ন, সমাধির নিথর সারা দেহে—আর সর্বভূতহিতে রত তাঁর শ্রীহস্ত দেন বাড়িয়ে পাশ্চাত্য প্রথায়। এই শ্যামপুকুরে, রোগাহত দেহে, এই স্বল্পপরিসর গৃহে তাঁকে ভক্ত সঙ্গে প্রায় তিন মাসাধিক কাল থাকতে হয়। শ্যামপুকুরের লীলা-বৈচিত্র্যের, ভবতারিণীর সঙ্গে নিজের অভেদ দর্শনেই হয়েছিল তাঁর শেষ প্রকাশ।

কাশীপুর উদ্যানবাটীর বিষাদ পরিবেশ ভক্তচক্ষে চিরদিনই হয়ে আছে বেদনা নিবিড়। কর্কট রোগের জর্জর ব্যথায় ভগবানের আর্তি হরণে অক্ষম ভক্তচক্ষে শুধুই ঝরেছে শ্রাবণের ধারা। সেদিন দেওভোগের দুর্গাচরণ নাগ এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রীঠাকুরের শয্যা পার্শ্বে। নয়নে দীন আর্তির সঙ্গে মিশেছে অসহায়ের বহ্নি-বিক্ষোভ ;—জ্বলবার মন্ত্র নিয়ে বলেন,—খান খান আমারে খান…

অতি ত্রস্তে শ্রীঠাকুর বলেন,—সরিয়ে দে ওকে সরিয়ে দে! নাগমশায়ের

গোপন সঙ্কল্প তখন পড়ে ধরা—তিনি চেয়েছিলেন শ্রীঠাকুরের সব আধি-ব্যাধি নিজের দেহে টেনে নিতে।

বিরাট পুরুষের বিরাট দাহ সহ্য করবার শক্তি নাগমহাশয়ের ছিল। দেবতা আসেন ধরণীর দাবদাহে চিরদিনই উর্দ্ধশিখায় জ্বলতে। ক্ষুদিরামের স্বেচ্ছাধৃত দারিদ্র জ্বালায় জ্বলেছেন বাল্যে, কিন্তু লীলাঞ্চনে মুছে দিয়েছেন সে জ্বালা। মধ্যপথে তপস্যার খাণ্ডবদহনে জ্বলেছেন বিশ্বের দাহখণ্ডনে। ভগবান বুদ্ধের মত বলেছেন,—

যৎ কিঞ্চিৎ জগতাং দুঃখং
তৎ সর্ব্বং ময়ি পচ্যতাম্
বোধিসত্ত্বৈঃ শুভৈঃ পুণ্যৈঃ জগৎশান্তিং অবাপ্নতু।

পুরবীর মীড়ে আবার বেজে ওঠে সেই পরিচিত সুর—জীবন সন্ধ্যায় অসহ এই জ্বালায় সেদিন শ্রীঠাকুর নাগমহাশয়ের শান্তশীতল শরীর স্পর্শে নিজেকে চেয়েছিলেন জুড়াতে—

প্রসাদবিভ্রাটের অঘটনও এই কাশীপুরেই ঘটে। একাদশীর সে এক তিথি। নাগমহাশয় গেছেন উদ্যানবাটীতে। ইদানীং তিনি কদাচিৎ যেতেন সে বেদনার তীর্থে। বলেছেন,—ভগবান স্বেচ্ছায় যখন নিয়েছেন জরাতুর দেহ, আর তার শান্তির কোন উপায়ই যখন হবার নয়, তখন সে স্থানের প্রয়োজন হয়ে গেছে শেষ। শ্রীঠাকুর নাগমহাশয়কে সেদিন প্রসাদ দিতে বলেন স্বামিপাদ রামকৃষ্ণানন্দজীকে—তখনও মঠের শশী ভাই।

শ্রীঠাকুর বোঝেন বিপদ—শেষে আদেশ দেন নীচে যেতে, যেখানে রয়েছে আহারের ব্যবস্থা—যন্ত্রীর হাতে যন্ত্র, গিয়ে বসেন নাগ মহাশয় সম্মুখে প্রসাদ পরমান্ন কিন্তু প্রসাদ গ্রহণের নাই কোন চেষ্টা। নিস্পৃহ নেত্রে আছেন বসে— অন্তর্য্যামীর স্পর্শ-প্রসাদে হয়ে যায় শেষ মীমাংসা। নাগ মহাশয় পণ করেছিলেন একাদশীর পুণ্য তিথিতে শ্রীঠাকুরের সত্যকার প্রসাদেই করবেন তাঁর ব্রতভঙ্গ— মহানন্দে ভূমিষ্ঠ প্রণামে প্রসাদ গ্রহণ হয় শেষ—শেষে ত্রস্ত চকিত দৃষ্টির সমক্ষে ঘটে যায় ভক্তিরাজ্যের এক অঘটন—শুষ্ক শালপাতায় দেওয়া প্রসাদ—প্রভুর স্পর্শধন্য সেই শুষ্ক পত্রগুলিও হয়ে যায় শেষ। শত বাধাতেও হয় না বিরতি।

শ্রীঠাকুরের এই ভক্তটি যেন বিদুরের অবতার—বাল্যেই পরম ভক্ত বিদুরের দর্শনধন্য এঁর জীবন। তপস্যার মূর্ত্তরূপ এই দীন ভক্তটির কথা বলতে গিয়ে

স্বামিপাদ, 'স্বামী শিষ্য সংবাদ' প্রণেতাকে বলেছিলেন,– লিখে দিও—'মধুকর ত্বং খলু কৃতী'—আর বলেছিলেন,—এত দেশ দেখলুম কিন্তু নাগমহাশয়ের মত এমন একটি চোখে পড়ল না

কাশীপুরের উদ্যানে ধরণীর ত্রিতাপে তখন শ্রীঠাকুর শবশয্যালীন। সহসা কমলালেবুর অভিলাষ জানান সেবক লাটুকে। অতি অপ্রত্যাশে নাগমহাশয় সেই সময়ে সেই ফলই নিয়ে আসেন শ্রীপ্রভুর প্রয়োজনে ; একি ভক্তের আর্তি, না ভগবানের তৃষ্ণা – কে জানে। তবে কৃতার্থ নাগমহাশয়ের শুষ্ক হৃদয় যে পরম আস্পদে গিয়েছিল ভরে, একথা বেশী করে না বললেও চলে।

আর একদিনের কথা। শ্রীঠাকুরের শ্রীমুখ থেকে উচ্চারিত হল,– মুখটা কেমন করছে, পাকা আমলকী খাব। দীনধন্য নাগমহাশয় ছিলেন যুক্তকরে দাঁড়িয়ে ধীর শান্ত তপোজ্জ্বল বুকে এই বেদবাণী হারায় না তার দিশা। ধীর নিস্তব্ধ সঞ্চারে চলে যান দুর্গাচরণ – তিন দিন অনাহারে অতন্দ্র চেষ্টায় খুঁজে পান পাকা আমলকী—পরম যত্নে পরম আনন্দে নিয়ে আসেন শ্রীঠাকুরের শয্যাপাশে—সেটা ছিল পাকা আমলকীর অসময়। শ্রীঠাকুর প্রসন্ন হাসিতে গৃহকোণ উচ্ছ্বসিত করে বললেন আহা।—এমন পাকা আমলকী কোথায় পেলে দুর্গাচরণ ?—দীনভক্ত লুণ্ঠিত বুক পেতে গ্রহণ করেন সে প্রসন্ন হাসির অন্তরেখ।

শ্রীঠাকুরের ভক্তদের কাছে এই দীন ভক্তের পরিচয় ছিল অতি ক্ষীণ - তিনি অতি অগোচরে, অতি অপরিচয়ে যেতেন দেবসান্নিধ্যে—গৃহকোণে দেখা যেতো—শুষ্ক মলিন জীর্ণবাসে, যুক্ত করে আছেন বসে সকলের পশ্চাতে। শুধু দীপ্ত নয়নে জেগে থাকত তপস্যার শিখাঞ্জন।

লীলাপোষ্টাইয়ের হাজরা সেদিন দক্ষিণেশ্বরে আছেন বসে—মধ্যমণি হবার সাধ তাঁর চিরদিনই ছিল। দীনবেশে নাগমহাশয় গেছেন দক্ষিণেশ্বর-ধামে—বহুবঞ্চিত বহুবাঞ্ছিত আশা আকাঙ্খার অরুণিমা নিয়ে। প্রথম দর্শনের সেই অতি গহিনক্ষণে অভাগ্যে দেখা হয় হাজরা মহাশয়ের সঙ্গে—তিনি দেন না কোন দিশা, বলেন,—পরমহংসমশায় এখানে নাই। নাগমহাশয় আশাভঙ্গে হয়ে পড়েন শেলাহত—সহসা দীনের ঠাকুর দেন দর্শন—ভাবমাত্র আবরণ, অর্ধবাহ্যে ডেকে নেন দিব্য অতি পবিত্র এই সন্তানকে। নাগমহাশয় বলতেন—ফুট তাঁর হাতে, ধরা না দিলে কি ধরা যায় ? শ্রীঠাকুরও গাইতেন,—ওরে কুশী-লব, কি কারস গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে—নাগমহাশয় সেই একদিনেই ধরতে

পেরেছিলেন শ্রীঠাকুরকে, আর জীবনে কখনো ভুল হয় নি তাঁর এই জানাজানি অধরাকে ধরতে পারা ...

দীনহীন এই ভক্তটির আর একটি দিক ছিল। সেখানে তিনি বজ্রাদপি কঠোর হতে পারতেন। সেবার দেওভোগে প্রতিপত্তিশালী দুইজন সাহেব শিকারে যান। এঁরা সেকালের কর্ত্তা বিশেষ। কারো কোন আপত্তি শুনবার প্রবৃত্তি এঁদের কোন দিনই ছিল না। যাই হোক এরা যখন শিকারে উদ্যত, তখন নাগমশায়ের চোখে পড়ে তাঁদের এই নিষ্ঠুর চেষ্টা। তিনি যুক্তকরে তাঁর সহজ সুলভ দীনতায়, নিষেধ করেন তাঁদের এই হত্যালীলা। তাঁরা দৃকপাতহীন কৃপা দৃষ্টিতে তুলে ধরেন অগ্নিঅস্ত্র। সহসা অনাহারে খিন্নশরীর নাগমহাশয়ের দেহে জাগে একটা প্রবল বিক্রম। তিনি সাহেবের হাত থেকে আগ্নেয় অস্ত্রটি নেন কেড়ে। সাহেবেরা এই অপ্রত্যাশিত আক্রমণে হয়ে পড়েন হতবুদ্ধি—কিন্তু সম্বিৎ ফিরে পেয়ে নাগ মহাশয়ের বিষয় জেনে আর কিছু উচ্চবাচ্য করেননি।

আর একবারের কথা, নাগমহাশয়ের কাছে গ্রামের জমিদার শ্রীঠাকুরের নামে কিছু কটু বলেন। নাগমহাশয় ত্রস্ত দীনতায় তাঁকে নিরস্ত হতে বলেন। তিনি কিন্তু ভুলবার পাত্র ছিলেন না। সহসা এক অভাবনীয় ঘটনা যায় ঘটে। নাগমহাশয় তখন উদ্যত রোষে তাঁকে প্রহারে উদ্যত হন। এতে কিন্তু বিপাত্তর সম্ভাবনা ছিল। জলে থেকে কুমীরের সঙ্গে এই বিবাদের সাহস কঠিন কথা। নাগমহাশয় গুরুনিন্দা শ্রবণে জ্ঞানহারা হয়ে তাকে তাঁরই পাদুকা দিয়ে প্রহার করেন। পরে সেই জমিদার ক্ষমা প্রার্থনা করে তাঁকে সন্তুষ্ট করেন। গিরীশ ঘোষ মহাশয় এই ঘটনায় বলেন,—নাগমহাশয় সত্যই ফণাধারী নাগ। দক্ষিণেশ্বরের ভাঙ্গা মেলায় এরপর চোখ মেলে দেখেন নি—সে যে কানুহারা বৃন্দাবন।

মনে পড়ে পদকর্ত্তা বাসুদেবের কথা—ঘোষঠাকুর যাচ্ছিলেন তমলুকের পথ বেয়ে। মধ্যপথে পেলেন আষাঢ় আকাশের বজ্র—নীলাচল শূন্য করে নীলমাধব গেছেন চলে—চিরদিনের সে যাত্রা...পদকর্ত্তা বলেন,—আমারও আর জীবনের নাই প্রয়োজন—জীবন্ত সমাধির জন্যে হলেন প্রস্তুত—দিব্য সে যুগ—মহাপ্রভু সূক্ষ্মদেহে এসে দিলেন সান্ত্বনা। সেই দুর্দ্দিনে দুর্গাচরণও আহার নিদ্রা দেহ প্রয়োজনের সব ছেড়ে নিলেন প্রায়োপবেশনের শয্যা—বিবেকস্বামী গিয়ে দাঁড়ালেন সে-সংকটে! ভক্তের রক্ষা যে ঠাকুরের দেওয়া দায়—অতিথি সন্ন্যাসীর অনুরোধে সে যাত্রা জীবনের চেষ্টায় আসেন ফিরে।

ছেচল্লিশ

দক্ষিণাপুরের সারঙ্গে কল্যাণের ছায়া এসে পড়ে। গৃহীভক্তরা শ্রীঠাকুরকে কাছে পাওয়ার এই পরমলগ্নটীকে পরমানন্দে নিয়েছিল বরণ করে। তারা ধরে নেয় শ্রীঠাকুর এই ব্যাধির ছলেই সরে এসেছেন তাদের হৃদয়তীর্থের তীরে আর শ্রীঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা ভেবেছিল হয়ত শ্রীঠাকুর এই ব্যাধির বিপাকে অন্তরঙ্গের পরীক্ষা করেছেন আর তাদের মিলনমাল্যে রচনা করেছেন এক প্রেমের অমৃত বন্ধন।

ত্যাগী সন্তানদের তখন প্রথম অনুরাগের বন্যায় ভেসে চলার পালা। একদিকে যেমন বহ্নিমুখে নিজেদের নিঃশেষ আহুতিতে চলেছে সমিদ্ধ তপস্যা, অন্যদিকে তেমনি চলেছে বালখিল্য চাপল্য। শীতার্ত্ত রজনী যায় কেটে তপস্যায় আর স্বাধ্যায়ে, এরি মাঝে জেগে থাকে প্রেমবৈচিত্র্যের নর্মলীলা।

সেদিন কাশীপুরের বাগানে নেমে এসেছে পলকহীন রজনী। সহসা জননী সারদেশ্বরী দেখেন শ্রীঠাকুর বেগে যাচ্ছেন প্রাঙ্গন বেয়ে। অবুঝ বিস্ময়ে জননী থাকেন চেয়ে, দেখেন—শ্রীঠাকুর তেমনি ভাবেই আসেন ফিরে। ছুটে যান শয্যা পার্শ্বে—দেখেন শ্রীঠাকুর অক্ষম শয়নে নিষন্ন। প্রশ্নে বলেন,—ছেলেরা খেজুরের রস খেতে গাছে উঠবে, সেখানে বিষধর সর্প ছিল তাই গিয়েছিলাম। এই বিষমবিপদে সন্তানদের রক্ষা করতেই যে ছুটে গিয়েছিলেন অধরা শরীরে!

জননী সারদেশ্বরীকে প্রথমে আনার সাহস হয়নি কারো—স্থানের অপ্রশস্ততায়। শেষে সেবার ত্রুটিতে শ্রীমাকে নিয়ে আসতেই হয়। এই শ্যামপুকুরেই শ্রীমা একবার পড়ে যান। তাঁর এই আঘাতে শ্রীঠাকুর রসোচ্ছলে বলেন,—তাঁকে কেউ যদি ঝুড়িতে বসিয়ে আনতে পারিস ভালই হয়। শ্রীমা নিত্য আহার্য্য নিয়ে যেতেন তাই শ্রীঠাকুরের এই রহস্য। গোধূলির রঙ্গের মতই ছড়িয়ে পড়ে ক্ষণিকের রঙ্গোচ্ছ্বাস—দিকচক্রবালে...

তারকেশ্বরের মন্দির—বহু ভক্তের বেদনার্তিতে নিত্যদিনই থাকে ভারী হয়ে। সেদিন সহসা গভীর রজনীর বুক চিরে জেগে ওঠে এক ঝন্ঝনা। জননী

সারদেশ্বরী শ্রীঠাকুরের কুশলে ছিলেন পড়ে। অন্তর মথিত করে শোনেন এক মহাবাণী—শুনেই আসেন ফিরে। মুহূর্ত্তে তাঁর বুকে জাগে এক পরম সত্য, দীপ্ত হয়ে জেগে ওঠে মৃত্যুর অমৃতময় রূপ—ফিরে আসেন জননী পূর্ণতার ব্যর্থতা নিয়ে। শ্রীঠাকুব বলেন—বিদায় গহীন হাসি হেসে, —কিগো, কি হল ? কিছুই না ..জীবনের যবনিকা ধীরে আসে নেমে—গৃহান্তরের সে বাণী।

কাশীপুর উদ্যান বাটীতেই দ্বাদশ অঙ্গদেবতার মিলনমালা হয়েছিল রচিত। এই বেদনার বেদীমূলেই প্রতিষ্ঠা হয় অনাগত দিনের শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ।···

একদিনের কথা। সেদিন রামদত্ত মহাশয় আর ডাক্তার কৈলাস বসু গেছেন শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে। বসুজা শ্রীঠাকুরের প্রতি বিরূপ ছিলেন। দুইজনে উদ্যান-বাটীব জলের ধারে আছেন বসে। সহসা শ্রীঠাকুর ডেকে পাঠান ডাক্তারকে। দুইজনেই ডাক্তার, কাজেই কাকে শ্রীঠাকুরের প্রয়োজন বুঝা যায় না। শ্রীঠাকুর বলে পাঠান, —যে আমাকে শিক্ষা দিতে এসেছে তাকেই ডাক। তড়িতাহত কৈলাস বসু দেখেন, একথা যে তাঁরই উক্তি। এই কৈলাস বসু মহাশয় শ্রীঠাকুরের কৃপায় আর একবার ধন্য হন। বাড়ীতে অসুস্থ রোগী আঙ্গুরের জন্যে আকুল। সেটি আঙ্গুরের সময় নয়। সহসা পরিচিত এক ব্যক্তি আঙ্গুর দিয়ে যায়। তার কাছে বর্ণনা শুনে স্তম্ভিত হন ডাক্তার—শ্রীঠাকুরের লীলামূর্ত্তি সেই ভক্তটিকে দর্শন দিয়ে জানিয়ে দেন আঙ্গুরের কথা। ডাক্তার শ্রীঠাকুরের কাছেই জানিয়ে ছিলেন আঙ্গুরের আর্ত্তি। •

মেঘমেদুর দিনে সপ্তবর্ণ রামধনু ক্ষণিকে উঠে ক্ষণিকে যায় মিলিয়ে—ক্ষণিকের বিলাসে সৃষ্টি হয় স্বর্গমর্ত্তের সেতু। অবতার পুরুষের আগমন যেমনি রহস্যময়—তেমনি ক্ষণিক। তাঁদের জীবনও রচনা করে স্বর্গ মর্ত্তের অমৃত সেতু ক্ষণভঙ্গে চির অসঙ্গ।

হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্ত বংশের সুরেশবাবুর সঙ্গে নাগমহাশয়ের গতায়াত ছিল শ্রীঠাকুরের কাছে। সুরেশ দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে নাগমহাশয়ের বহুদিনের অন্তরঙ্গতা—একদিন দীক্ষা বিষয়ে নাগমহাশয়ের সঙ্গে দত্ত মহাশয়ের কিছু কথান্তর হয়। দুইজনে যান দক্ষিণেশ্বরে মীমাংসার শেষ কথা শুনতে। শ্রীঠাকুর দীক্ষার প্রয়োজন বলেন বুঝিয়ে,—হবে হবে কালে হবে—এর পর দত্ত মহাশয়কে কার্য্যান্তরে কোয়েটায় যেতে হয়। সেখানে শুরু হয় এক অনাস্বাদিত আকুলতা, দীক্ষার ক্ষুধা জাগে দূর প্রবাসে—ছুটে আসেন জন্মভূমির শ্যাম কোলে, কিন্তু

দখিণাপুরে তখন ভাঙ্গামেলা—চাঁদের হাট গেছে ভেঙ্গে—নিরাশ নিষণ্ণ সে পুরী—

পতিতোদ্ধারিণীর উছল কূলে সেদিন শতচন্দ্রের উদয়—ক্ষণিকে সুরেশচন্দ্রের বিচ্ছেদ বিক্ষুব্ধ নয়নতীরে জাগে নন্দনের আনন্দকুঞ্জ—শত তৃষাতুর আঁখি মেলে দেখেন দখিণাপুরের শ্যাম-গদাধর এসে দাঁড়িয়েছেন মর্ত্তের মাটিতে অমর্ত্তের হাসি হেসে—আকুল প্রাণের কানে কানে শোনেন—পরমপাবন মন্ত্র—তারপর চকিতে যায় মিলিয়ে, স্পর্শ লোভাতুর সুরেশের ধরা ছোঁয়ার বাইরে—তবু ভক্ত ভগবানের মিলন মাঙ্গলিকে রচনা হয় যে মালা, সে যে চির অম্লান—নিত্য বৃন্দাবনের সে যে অশ্রুমণিহার —এক স্বপ্ন —না স্বপ্নচ্ছলে নিত্যলীলার এক পর্ব্ব।

সাতচল্লিশ

ক্রন্দসী কাশীপুরধামে শ্রীঠাকুরের একটি অস্ফুট প্রকাশ দেখা যায়, মহা প্রয়াণের লগ্ন যত ঘনিয়ে আসে তত ভক্তদের কাছে টেনে নিতে যেন দিয়েছেন সরিয়ে। স্বামিপাদের তপস্যাকুল মনে জাগিয়েছেন দিক্‌চক্রবালের দূরাভিসার, মৃগতৃষার হাতছানি—গৌরীমায়ের তাপস মনেও জেগেছে অধীরতা—সরিয়ে দিতে বলেছেন,—তোর যে একটা কাজ বাকী ছিল সেটা সেরে এলে হয় না? গৃহ-বৈরাগী মাষ্টারমশায়ও এই সময় ছুটে গেছেন তীর্থরাজ কামারপুকুরে—শ্রীঠাকুরের স্মৃতি সুরভিত লীলার দেউল দর্শনে স্পর্শনে মুহুর্মুহু হয়েছেন রোমাঞ্চিত —দেববাঞ্ছিত মুক্তিরজে নিজেকে করেছেন রঞ্জিত—পথের বিভীষিকা পারেনি নিবৃত্ত করতে। তৈর্থিকের মতই গেছেন পদব্রজে সজল ব্যাকুল নয়ন মেলে। সেই দেবভূমিকে বার্দ্ধক্যের বারাণসী করে নেবার ইচ্ছাও ছিল নিগূঢ় হয়ে মনের একটি কোণায়। কেবল শ্রীমার অনিচ্ছায় তিনি নিরস্ত হন সে চেষ্টায়। দক্ষিণেশ্বরে লীলায় শ্রীম ছিলেন ব্যাসকল্প গোপন ঋষি—শান্তসৌম্য, মৌন মধুর তাঁর জীবন যেন রামকৃষ্ণ রসাভিষেকে ছিল চির অমৃত মেদুর। শ্রীচৈতন্য চরিতকারদের মধ্যে হয়ত তিনি একজন ছিলেন। শ্রীঠাকুরের দিব্য দর্শনেও তাই হয়েছিল প্রকাশিত। বলেছিলেন —গৌরাঙ্গদেবের সাঙ্গোপাঙ্গদের দেখেছিলাম, তার মধ্যে তোমায়ও যেন দেখেছিলাম। আবার বলেছিলেন,—তোমায় চিনেছি চৈতন্য-ভাগবত পড়া শুনে। এই যেনর মধ্যেই রয়ে গেছে গুপ্ত-নটের গুপ্ত-নাট্যকার শ্রীম।

কথামৃত-ভাগবৎ এ যুগে পরমশাস্ত্র—শ্রীঠাকুরেরই কথা,–ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান তিনে এক একে তিন—কথামৃত এ যুগের পঞ্চমবেদ। কথামৃতের কল্পলতায় আজ ধরণী অমৃতান্বিত—আজও দিকে দিকে, দেশে দেশে, নানা ভাষায়, নানা ছন্দে, শ্রীঠাকুর মূর্ত্ত হয়ে উঠেছেন কথামৃতের রসায়ণে। কথামৃত আজও ভক্ত হৃদয়ে হৃদয়ের ধন, শ্রীঠাকুবে মূর্ত্ত রূপ পূজার পূজ্য কথামৃতকারকে জানাই অন্তরের অকুণ্ঠ প্রণতি। যখন স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ তখনকার শশী মহারাজ, কথামৃতের মত অনুলেখন নিতে সুরু করলেন, শ্রী শ্রীঠাকুরই জানান আপত্তি। হয়ত মনে হবে মহারাজের লিখিত পুস্তকে শ্রীঠাকুরের জীবনাদর্শ নূতন ছন্দে করতো আত্ম-প্রকাশ, হয়ত নূতন বর্ণ লেখায় প্রকাশিত হত দক্ষিণেশ্বরের নব-পুরুষোত্তম। কিন্তু পরমপাবন ভাগবৎ গ্রন্থ একটিই হয়, গীতার ভাষ্য বহু হতে পারে কিন্তু শ্রীমদ্ভগবদগীতার অবদান খণ্ডিত হওয়া চলে না। বহু কথামৃত হলে অমৃতের অনবদ্যতা যেত চলে, দ্বন্দ্ব সংঘাতে সংশয়াকুল হতে হত প্রতি ছত্রে। শ্রীঠাকুর মাষ্টার মশায়কে পরে নিজে বলেছেন—তুমি আপনার জন, এক সত্ত্বা—যেমন পিতা আর পুত্র। মাষ্টার মহাশয়ও শ্রীঠাকুরকে নিতে পেরেছিলেন জীবনের ধ্রুবতারা করে…তাই পরীক্ষাচ্ছলে শ্রীঠাকুর যখন বলেন,—আমায় কি মনে হয় বল দেখি? মাষ্টার মহাশয় উত্তর দেন,—যীশুখৃষ্ট, চৈতন্য ও আপনি এক। শ্রীঠাকুরের কথায় —এঁদের থাক আলাদা, এদের জানবার প্রয়োজন আমি কে আর এরা কে—বলা বাহুল্য মাষ্টার বা শ্রীম বা মণি, এঁরা সকলেই এক ব্যক্তি–রামকৃষ্ণ ভক্ত-পরিবারে আপনজন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ভক্তগোষ্ঠির আদরের ছেলেধরা মাষ্টার।

আচার্য্য শঙ্করের কুশাগ্রবুদ্ধির উত্তরাধিকার পেয়েছিলেন তিনটি শিষ্য – সুরেশ্বর পদ্মপাদ, আর হস্তামলক। ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্রে ত্রিরত্নের শরণমন্ত্র প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন পাঁচটি অর্হৎ—কৌণ্ডিন্য, ভদ্রজিৎ, বাষ্প মহানাম ও অশ্বজিৎ। আর শ্রীঠাকুরের বাণীবার্ত্তাবহ ছিলেন চতুর্দ্দশ দিকপাল—নরেন্দ্র, রাখাল যোগীন, বাবুরাম নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, কালী, লাটু, হরি, তারক আর গঙ্গাধর, গোপাল, হরিপ্রসন্ন—এঁদের মধ্যে শশীভূষণ ছিলেন সেবা-মূর্ত্তি। স্বামিপাদ বিবেকানন্দ পরে যেমন বলেছিলেন, শশীকে জানবি মঠের কেন্দ্রস্বরূপ। শ্রীঠাকুরের সেবাধিকারে শান্ত এই পুরুষ, সেবাই ছিল তাঁর জীবনবেদ—একবারের কথা, শ্রীঠাকুরের একান্ত প্রিয়বস্তু জেনে তিনি একটুকরো বরফ গামছা মুড়ে নিয়ে

আসেন কলকাতা থেকে দক্ষিণেশ্বরে—রৌদ্র দগ্ধ দিনের দ্বিতীয় প্রহরে ভক্তির হিমে জমা বরফের টুকরো যথাযথই এসে পৌঁছয় শ্রীঠাকুরের কাছে। সেদিন শ্রীঠাকুরও বিশেষ প্রীত হয়েছিলেন সেবানুরাগে।

এই কাশীপুরেই একবার শ্রীঠাকুরের সাধ হয় জামরুল খেতে। ভক্তির পরীক্ষা না আকুতি জাগান - কে জানে ? সেবকের সন্ধানী দৃষ্টি কিন্তু সেবার অসময়ের অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলেছিল। এইসব ভক্তদের সেবা-সাধনায় শ্রীঠাকুর বলেছিলেন কাশীপুরের উদ্যানে—তোরা সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস। এরপরও বরাহনগর আর আলমবাজার মঠে শশীমহারাজেরই ছিল মঠের সেবাধিকার। শ্রীঠাকুরের স্থূল দেহের অদর্শনেও শশীমহারাজের সেবানিষ্ঠা ছিল অক্ষুণ্ণ। সেবার আলমবাজার মঠে এই নিয়ে ঘটে এক অঘটন। নরেন স্বামীকে শ্রীঠাকুর দিয়েছিলেন বেদান্তে দীক্ষা তিনি মেলে ধরতে চেয়েছিলেন উচ্চ ধ্যান ধারণার আদর্শ, সংঘের সামনে শিবশঙ্করের চিরন্তনীতে...সেদিনের আলমবাজার মঠ. তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ আবেগে মূর্ত্তিপূজার অসারতা বুঝাতে চান—সেবাসিদ্ধ শশীমহারাজ তখন একান্ত অনন্যতায় খুঁজে ফিরছেন গুরু-ইষ্টের সেবা সৌকার্য—কেমন করে দুটি বাতাসা, দুটি পুষ্পান্ন করবেন নিবেদন। সেবার অসারতা প্রতিপন্নে অগ্নিমূর্ত্তি শশীমহারাজ স্বামিপাদকে চুলের মুঠি ধরে পূজার ঘর থেকে দেন সরিয়ে। শিব-রামের যুদ্ধের পটক্ষেপ এক অঙ্কেই হয়েছিল আর এই অঙ্কেই হয়ত ভক্তির কাছে জ্ঞানের পরাজয় ঘটেছিল ; একথা ইতিহাসের পাতায় স্বাক্ষরিত হয়ে আছে। স্বামিপাদের বেদান্তের দৃষ্টিভঙ্গীতে পূজার প্রতিকূল চেষ্টা আলমোড়া অদ্বৈত-আশ্রমেও হয়নি সফল। যেমন বলেছেন লীলা চাপল্যে,—মনে করেছিলেন অন্ততঃ একজায়গাতে মুর্ত্তিপূজা থাকবেনা- তা দেখছি সেখানেও আসন করে নিয়েছে।

ব্রহ্মের সিসৃক্ষা ব্রহ্মেরই·আনন্দমন্থন ..জগতের রম্য সমাবেশ যে জগন্নাথেরই পূজারই উপকরণ, একথা বারবার হয়ে যায় ভুল। ধরণীর পরমান্ন অলকার কড়ার ডালে অরুচি জাগায়—এযে তাঁরি কথা।

মাদ্রাজ মঠে নিদাঘ নিথরিত একরাত্রি—সেবকের চোখে নাই নিদ্রা। দেখা গেল পাখা হাতে চলেছেন শ্রীঠাকুরের মন্দিরে—প্রত্যক্ষ দেবতার সেবার আকুলতা নিয়ে—বর্ষণ-ক্লিন্ন আর এক রাত্রি—দেখা যায় শ্রীঠাকুরের মন্দিরে ছত্র হাতে অনলস নয়নে আছেন দাঁড়িয়ে—ভগ্নছাদের জলরোধ চেষ্টায়। স্থানান্তরে

ঠাকুরকে নিয়ে যাওয়ার প্রশ্ন ওঠেনি মনে--প্রভু যে বিশ্রান্তিতে মগ্ন। এমনও দেখা গেছে অষ্টপ্রহরাধিক পূজায় সেবক রয়েছেন মগ্ন - উপচারের হয়েছে অঘটন, স্বামীপাদ মন্দিরের পটবিগ্রহে জানাচ্ছেন ছলভরা রোষরুদ্ধ প্রার্থনা,—যদি ভোগের বস্তু না আসে সমুদ্রের বালি এনে দেব খাবে, আমিও খাব —বলা বাহুল্য সমুদ্রের বালু দিয়ে মিটাতে হয় নাই অনশন—ভক্তের দেওয়া পর্য্যাপ্ত উপচার স্বাগত হয়েছে এসেছে দেবঅঙ্গনে—মনে পড়ে গৌরলালায় ভক্ত ভগবানের দ্বন্দ্ব জগদানন্দ আর মহাপ্রভুর কাহিনী, পদ-সম্বাহন করবেন ভক্ত—তাঁকে লঙ্ঘন করে গেলেন বিনা দ্বিধায়। শশী মহারাজও পদস্পৃষ্ঠ পাত্রের জল দিয়েছেন ধরে, ভগবানের আশু প্রয়োজনে। সুগন্ধি তৈল দিয়েছেন এনে, মহাপ্রভুর অনিচ্ছায় রোষে করছেন অনশন - লীলা একই··

. মরুপথে পথহারাকে ডেকে নিতেই ত অবতারের নেমে আসা—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ যখন প্রথম জীবনে দিশাহারা হয়ে ফিরেছেন—দিশারী সেদিন তাকে ডেকে নিতই বলেন,—দেখ তুই যাকে খুঁজছিস সে এই—এই···। এ যেন বৃন্দারণ্যে বেণুবনের দিশারী বাঁশী--শশী মহারাজের সে পথ-চাওয়া আর ভুল হয়নি কখনও···রামকৃষ্ণানন্দ নামও করেছিলেন সার্থক।

আটচল্লিশ

ব্যথার বারাণসী কাশীপুরের অন্যতম ব্রতধারী ছিলেন গঙ্গাধর মহারাজ। অতি শৈশবেই শ্রীঠাকুরের দৃষ্টি-প্রসাদ পেয়েছিলেন এই চিহ্নিত পার্ষদটি। শিশু-সুলভ চাপল্যে কখন দেখা যেত শ্রীঠাকুরের চরণে ঘসে ঘসে রক্তিম করে তুলেছেন ললাটদেশ – কখন বা শ্রীগুরু নির্দ্দেশে দেখেছেন ভবতারিণীর চরণে মহেশের নিশ্বাস-স্পন্দিত জীবন্ত দেহ—কোনদিন বা নির্ব্বাক নিস্পন্দে দেখেছেন শ্রীঠাকুরের নটভঙ্গরূপ—জগজ্জননীর চরণে প্রার্থনারত বিরাট শিশুর অসীম কাঁদনি—শ্রীঠাকুরের সেই আকুল কাঁদনই সূত্র হয়ে দাঁড়ায় সেবাব্রতী স্বামী অখণ্ডানন্দের জীবনে। সেদিন খেতড়ী-রাজধানীতে ঘনিয়ে এসেছে একটি রূপরম্য মধ্যাহ্ন—খেতড়ী প্রাসাদ সংলগ্ন সরোবর কুলে জমে উঠেছে রাখীবন্ধনের রাজ-সমারোহ—উৎসবে এসেছেন রাজা অজিত সিংহ আর তাঁর অমাত্যবৃন্দ। সহসা এসে দাঁড়ান স্বামিপাদ, পরিব্রাজকের বেশে, তিনি তখন খেতড়ীর অতিথি—নয়নে

বেদনোদ্বেল অশ্রুধারা—মহারাজকে জানান দুঃখের কাহিনী—তাঁর বহু আয়াসে গড়ে তোলা গোলাবালকদের বিদ্যাপীঠটি মহারাজের আদেশেই নাকি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে আর তাই সন্ন্যাসী খেতে খেতেই এসেছেন ছুটে প্রতিকার। মানসে। দুর্ভিক্ষের মাঝে মহুলার অন্নদান ব্রতের মূলেও ছিল অন্তরের এই আকুল ক্রন্দন···সারগাছির অনাথ আশ্রমও এই অন্তরের আবেদনে আজও হয়ে আছে প্রাণময়। আর তাঁর সেই সেবামূর্তিই প্রকাশিত হয়েছিল আলামবাজার মঠে যেদিন শ্রীঠাকুর দেখা দেন, নব-নীল-নীরদ-কান্তি গোপাল মূর্তিতে আর নিজের স্বরূপ প্রকাশিত হয় যশোদার মাতৃমূর্তিতে। ঘটে ঘটে এই বালগেপোলের সেবাকেই বুকে করে নিয়েছিলেন জীবন ভোর।

শ্রীঠাকুরের দ্বাদশ দিকপালদের মধ্যে খোকা মহারাজ ছিলেন সবচেয়ে ছোট। কাশীপুরের সেবায়তনে সরল প্রাণের আকুলতায় ঔষধ হিসাবে চায়ের ব্যবস্থা ইনিই দেন। রাখাল মহারাজের নিষেধে শ্রীঠাকুরের সেটির আর প্রয়োজন হয়নি।

দুইজনের জীবনে ঈশ্বর দর্শনের প্রশ্নটি পরম প্রশ্ন হয়েই প্রকাশ পেয়েছিল প্রভুর চরণে। একজন শিবাবতার বিবেকস্বামী আর একজন এই সুবোধানন্দজী। শ্রীঠাকুর দিয়েছেন সেই একই উত্তর—দুইজনে একসঙ্গে থাকলে যেমন দেখা যায় সেই রকম সহজ দর্শনেই সাধক হন ধন্য তবে তার জন্যে চাই কান্না—ছেলে যেমন বুক ফাটা কান্না কাঁদে মার জন্যে।

লুপ্তধারা ফল্গুর বুকে সেদিন হঠাৎ জাগে মুক্তির উচ্ছ্বাস। সুবোধ মহারাজ চলেছেন অপর পারে। সহসা অসহায় দুটি হাতে প্রণতি ওঠে জেগে আসন্ন সলিল সমাধিতে তখন তিনি পরপারের যাত্রী—তবে সে ডাক তাঁর তখনও আসেনি। কে যেন তাঁকে তুলে ধরে তরঙ্গের ওপরে। অশরণের শরণ শ্রীঠাকুরই হয়ত ধরেছিলেন সেই শেষ শরণের দুটি হাত। অসময়ে সে প্রণাম ঠাকুর দিয়েছিলেন ফিরিয়ে।

শ্রীহরির প্রবেশমুখ হরিদ্বারে সেবার বেদনা জর্জর দেহে ধরেছেন তৃষ্ণার পূর্ণ-পাত্র কমণ্ডুল, কম্পিতহাত থেকে স্খলিত হয়ে পড়ে যায় সে জলপাত্র অন্তর মথিত অভিমানে জানান শ্রীঠাকুরকে। নিমিলিত নয়নসমক্ষে স্নিগ্ধ বেশে এসে দেখা দেন শ্রীঠাকুর—জুড়িয়ে যায় সব ব্যথা—মৌন মন্থরে দুটি কথা ওঠে জেগে — আর ত কিছুই চাই না ঠাকুর, তোমায় যেন না ভুলি! অন্তর্যামীর কাছে অন্তরের এই প্রার্থনা হারায়নি কোনদিন।

কাশীপুরের সেবাযজ্ঞে বাবুরাম মহারাজ ছিলেন শ্রীঠাকুরের দরদী—একান্ত আপন। ভাবমুখে শ্রীঠাকুর একবার বাবুরাম মহারাজকে দেখেন দেবীমূর্ত্তিতে, গলায় হার- তাই বলতেন, ওর হাড় শুদ্ধ নৈকষ্য কুলীন। তাই দেখি ব্রজেশ্বরী শ্রীমতির জন্মস্থান বর্ষাণায় তিনি তপস্যা নিরত—ব্রজরমণীগণকে করেছেন ভূলুণ্ঠ প্রণাম।

শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ এই প্রেমিক পুরুষের সবার সঙ্গে মৈত্রীই ছিল জীবনবেদ। পরবর্ত্তীকালে একবার এক শিক্ষিতম্মন্য ভক্ত মঠে আসেন উদ্দেশ্য মঠের মহন্তদের বৃথা অন্নধ্বংসে দিবেন বাধা। প্রেমানন্দজী তখন মঠের পুরানোমন্দিরে —ভক্তটি সেখানেই এক লাঠি হাতে গিয়ে উপস্থিত। প্রেমানন্দ মহারাজ শান্ত ধীর ইঙ্গিতে তাকে নিয়ে আসেন পবিত্র গঙ্গাকূলে. প্রহারের পরমস্থানের দেন নির্দ্দেশ। দুষ্ট ভক্তটির নয়নাশ্রুতে সুরধুনী বুকে প্রহার ও প্রহরণ দুয়েরি হয় চিরনির্ব্বাণ। প্রসাদ আর প্রেমালিঙ্গন এই ছিল প্রেমানন্দের জীবন-মাঙ্গলিক। জ্ঞান আর প্রেমের মিলনমোহনা রচিত হয়েছিল তাঁর জীবনে কি এক সীমাহীন রহস্যে। তাঁর প্রেমাভক্তির কাতর নিবেদন—শ্রীঠাকুর মার কাছে দেন পৌঁছে —চিররহস্যময়ী দেন উত্তর ওর প্রেম হবে না, জ্ঞান হবে। এদিকে মার নর্ম সহচরী রূপেই শ্রীঠাকুর দেখেন তাকে; হয়ত জ্ঞান-ভক্তির সঙ্গমে সীমার কলঙ্করেখা যায় হারিয়ে।

তরঙ্গছন্দিত দক্ষিণেশ্বর—শ্রীঠাকুরের মন্দিরে সেদিন বাবুরাম মহারাজ আছেন শুয়ে। শ্রীঠাকুর অর্দ্ধবাহ্যে অশান্ত শিশুর মত স্খলিত চরণে বলে চলেছেন, দিসনে মা দিসনি—সদ্য নিদ্রাতুর নয়নে এই স্পর্শ যে চিরন্তনী হয়েছিল সেকথা তাঁর সারা জীবনায়নে সহজেই যায় ধরা। স্মৃতির সঙ্গে নিদ্রার সম্বন্ধ যে নিগূঢ়, মনো-বিজ্ঞানের ধারায় আর দিব্যজীবনের রস সিঞ্চনে তার প্রয়োগ রহস্য, যেন এক নূতন আলো এনে দিয়েছে শ্রীঠাকুরের এই নিশীথ লীলা। এরই প্রতিধ্বনি দিব্য-মুখেই একদিন তিনি শুনেন যেদিন লীলা পোষ্টাইএর নটুয়া হাজরা তাঁকে দেখান সিদ্ধাই-এর প্রলোভন। তাই, সহজ সরল জীবন নিয়ে চিরটি দিন দেন কাটিয়ে— জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সাধনে। শেষজীবনে পূর্ববঙ্গে ম্যালেরিয়া-ত্রস্ত গ্রামে কচুরীপানা উদ্ধার কার্যে মরণব্যাধি নেন টেনে।—শ্রীঠাকুরকে বেশ মনে আছে ত বাবুরাম দাদা—শেষের প্রশ্ন করেন ব্রহ্মানন্দজী—প্রসাদ প্রসন্ন ইঙ্গিতেই আসে শেষের উত্তর।

কাশীপুরের সেবাব্রতীদের মধ্যে নিরঞ্জন-স্বামীও ছিলেন আর একজন দিকপাল ঈশ্বরকোটীর থাকের - শ্রীঠাকুর প্রথম দর্শনেই দেন এক পরমশিক্ষা,—ওরে ভূত ভূত করলে ভূত হয়ে যায়, আর ভগবান ভগবান করলে ভগবান হয়ে যাবি। মনোবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে ঠাকুর ধরে দেন তার মহৎজীবনের ইঙ্গিত—বলাবাহুল্য ভাগবৎ সত্তার প্রথম পাঠ এই দিনই পেয়েছিলেন স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

স্বামিপাদ নিরঞ্জনের সরল সহজ ছন্দের জীবন শ্রীঠাকুরের অজস্র প্রশংসায় পেয়েছিল নান্দী। কাশীপুরে একদিন ঠাকুর বলেন—নিরঞ্জন তুই আমার বাপ, তোর কোলে বসব। অনন্ত ভাবময় ঠাকুর কোন ভাবরাজ্য থেকে বলেছিলেন একথা, আজ তার দিশা পাওয়া ভার। তবে বোধ হয় স্বামিজীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ শরীর মন যে গভীর গম্ভীর ভাব দিত এনে এ তারই ইঙ্গিত।

সহজ সরল উচ্ছলতায় একবার তিনি চেয়ে বসেন অজপাসিদ্ধি। বহু আয়াসের সাধন এই অজপা, জপময় করে তোলে সাধকের সারাজীবন—হরিময় হয়ে যায় তনুমন—আর জীবন হয়ে যায় অমৃতায়িত।

শ্রীঠাকুরও লীলাচাতুর্য্যে লিখে দেন বীজমন্ত্র—তিনটি দিন-রাত্রের অজপায় নিরঞ্জন মহারাজ হয়ে পড়েন দিশাহারা, পলকহীন নিদ্রাহীন নয়নে নয়নময় হয়ে থাকে জপছন্দ, শেষে অতিষ্ঠ হয়ে ছুটে যান শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে ; বলেন,—ফিরিয়ে নাও তোমার জপ—শ্রীঠাকুর বলেন,—তখনই ত বলেছিলাম পারবিনা। নিরঞ্জন-স্বামী বলেন—তখন কি জানি যে ভূতের মত ঘাড়ে চেপে বসবে—সত্যই ভূতাবেশ সহ্য করা সহজ কিন্তু ভূত-ভাবনকে আপন করা যুগে যুগে যুগেই বিরল।

শ্রীঠাকুরের প্রীতিতে চিরদিনই ছিল রুদ্র মধুরের আলোছায়া। নিরঞ্জন মহারাজের দৃঢ় শরীর মনে একটা সহজ তেজের বিদ্যুদ্বিলাস দেখা দিত। ভাগীরথী বুকে পবনবক্ষে একখানি চলতি নৌকায় সেদিন পড়ে গেছে সাড়া। ভীত চকিত আরোহীদের মধ্যে দেখা গেল নিরঞ্জন স্বামী রোষরুদ্র মূর্ত্তিতে আছেন দাঁড়িয়ে, নৌকার তখন পাতাল প্রবেশের দশা। সেবার বহু আয়াসে শান্ত হন স্বামিপাদ। আরোহীদের মধ্যে কারো মুখে শ্রীগুরুর প্রতি কিছু অযথা উক্তিতে এই তাঁর অনুশাসন,—শ্রীঠাকুর শুনেই হন বিরক্ত। বলেন,—ক্রোধ চণ্ডাল, সতের রাগ, যেন জলের দাগ—আর লোক না পোক, ওদের উপেক্ষা করবি।

শ্রীঠাকুর ভাবে দেখেন—রাখাল, নিরঞ্জন, নরেন এদের পুরুষালিভাব। এই পুরুষকারের অগ্নিমন্ত্র চিরদিন ছিল তাঁর ললাটে লেখা।

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তিনি তপস্যায় গেছেন কাটিয়ে। শেষ পর্য্যাঙ্কে দেখি—হরিদ্বারে গঙ্গাগর্ভে নিঃশঙ্কে আছেন শুয়ে—সেবককে দিয়েছেন সরিয়ে··· মহাপ্রস্থানের যাত্রাপথে জ্যোতির শৈলোত্থিত তনু জ্যোতির সমুদ্রে যায় হারিয়ে, শ্রীঠাকুরের দিব্য দর্শনেও ছিল এর নিরিখ।

উনপঞ্চাশ

কাশীপুরে জলবার মন্ত্র যাঁরা পেয়েছেন দেহমনে তাঁদের মধ্যে সারদা-মহারাজ ছিলেন একজন—শ্যামপুকুর, কাশীপুর তীর্থের এঁরাই ছিলেন তৈথিক—গৃহে শাসন-তন্ত্রের জীবন সত্ত্বেও। সারদাপ্রসন্নের নীড় বৈরাগী মন গৃহবন্ধনকে কোনদিনই নিতে পারেনি মেনে। শ্রীঠাকুরের অসুস্থতাতেই দিকহারা খেয়ার মত ছুটে গেছেন অনির্দ্দেশের দিশায় ভয়ে শ্রীঠাকুরকেও দেননি জানতে। পুরীর পথে, এই যাত্রায় ঘটে এক পুণ্যদর্শন। চলার পথে প্রথম পাথেয় বৈরাগ্যের আকুলতা—সেই সম্বল করে চলেছেল ক্ষুৎ-পিপাসাতুর সারদাপ্রসন্ন—অবসন্ন নয়নে নেমে এসেছে অরণ্যের আর্ত্তরাত্রি—নিরুপায়ে উঠে পড়েন বৃক্ষে—শ্রান্ত স্মরণে জেগে থাকেন শ্রীঠাকুর। নিদ্রানিমিল নয়নে সহসা শোনেন কার অতি প্রার্থিত বাণী,—সন্ন্যাসী ঠাকুর, ক্ষিদে পেয়েছে? এই বাতাসা নিয়ে খাও—সঙ্গে এক ঘটি জলও দিল ধরে—কিন্তু এই অসময়ের পরম অচেনা বন্ধুকে কিছুতেই পারেন নি ধরতে—ভোরের আলোতেও। সারা বিশ্বকে যিনি আছেন ধরে তাঁকে ধরা বিশ্বাতীত কাহিনা।

শ্রীমার সেবায় সেদিন সেবকপ্রাণে ঘটাল এক অঘটন—সেদিন রাত্রে মা চলেছেন জয়রামবাটী—প্রহরায় চলেছেন সারদা মহারাজ। সহসা চৈতন্যময়ীর হল নিদ্রাভঙ্গ। তিনি চেয়ে দেখেন ত্রিগুণাতীত নাই সঙ্গে—অদূরে খাদের মধ্যে আছেন শুয়ে—মার কষ্ট হবে খাদে যদি গাড়ী যায় পড়ে—উঠিয়ে নিয়ে আসেন অবুঝ সন্তানকে···মা চেয়েছেন ঝাল লঙ্কা—আর একবারের কথা—শ্রীঠাকুরের কথা ছিল, মা আমায় শুক্নো সাধু করিস্ না··তাই খাবার ব্যঞ্জনে সম্বরা এ

সব দেবার কথায় বলতেন,—ওটা বাদ দিও নি ওই খেতেই ত দক্ষিণেশ্বর থেকে আসছি। যাই হোক ঝাল লঙ্কার সন্ধানে চলেছেন সন্তান সারদা—বাগবাজার থেকে ঝাল চেখে দেখতে দেখতে, পছন্দ করতে করতে এসে পড়েছেন বড বাজারে তখন রসনায় আর রস পাবার মত অবস্থা নাই—পুরীর আনন্দবাজারে প্রসাদ চাখতে চাখতে পেট ওঠে পুরে—সারদাপ্রসাদের কিন্তু জিভই গিয়েছিল পুড়ে। অভয় মন্ত্রের আমন্ত্রণে একবার ভূত দেখার বাসনা হয়ে উঠে তুম্পুর - একটি পুরানো বাড়ীর সন্ধানও যায় পাওয়া—অন্ধকার না হলে এইসব অন্ধকারের অধিবাসীদের দর্শন তুর্লভ—তাই রাত্রির অপেক্ষা করেছেন দর্শন রহস্যাতুর সারদা-প্রসাদ - দ্বিতীয় যামে এক ক্ষীণ আলোর মণ্ডলে প্রকাণ্ড চক্ষু তাঁর দিকে ছুটে আসতে থাকে—সাহস তখন অসহ হয়েই পড়েছে—সহসা শ্রীঠাকুর প্রকাশ হয়ে বলেন—নিশ্চিত মৃত্যুকে বরণ করা মূর্খের কাজ—পরমরহস্যকে ছেড়ে রহস্য করার পিছনে থাকে অনেক অঘটন - এইটাই হয়ে যায় ভূল।

সেবার কৈলাস মানসের পথচারী স্বামীপাদ—সঙ্গে সম্বল শ্রীঠাকুরের অভয় মন্ত্র। চলতি পথে নেমে এসেছে ভীতিনিমিল সন্ধ্যা—সামনে স্রোতোচ্ছল পাহাড়ী পল্লল। অদিশার এক সর্বনাশা মোহ আছে, নিশির ডাকের মত। এর ডাকে কত ঘরছাড়া, কত আভিন, ম্যালোরি দিয়েছে সাড়া জীবনান্ত পণে, তার নেই ইয়ত্তা। উপলছন্দা নির্ঝরিণীর উপর ম্লান সন্ধ্যার পূরবীতে সৃষ্টি হয়েছে এমন এক মরণ-মোহ যাকে ঠেকিয়ে রাখা দায়—এই মোহই ত জীবন, আবার এই মোহই এনে দেয় মৃত্যু! ছুটে চলেন স্বামিপাদ—উপরে ভগ্ন সেতু, নীচে নিঝরিণীর স্বপ্নভঙ্গ রঙ্গ—ভাঙ্গা ভাঙ্গা সেতুপথে পায়ে পায়ে চলেছেন এগিয়ে—সহসা মেঘের অন্তরালে মলিন চাঁদের আলোও যায় হারিয়ে—থমকিত পায়ে দাঁড়ান সারদা-প্রসাদ—সামনে মৃত্যু—পিছনেও মৃত্যুর আবর্ত্তনৃত্য। সহসা অমর্ত্তের দিশার মত উর্দ্ধ হতে আসে অমৃতের বাণী;—আমার অনুসরণ কর। ভয়ার্ত্ত পার্থের কানেও এমনই অভয়বাণী দিয়েছেন, পার্থ-সারথী,—মাম্ অনুস্মর -যুগে যুগে পার্থ সারথিই ত দাঁড়ান জীবনের ভগ্ন সেতুর পুরোভাগে, অভয় ইঙ্গিতে।

বরানগর মঠে আর একবার শ্রীঠাকুরের কৃপার সাগর উঠেছিল উথলে। বরানগর মঠে তপস্যার আগুনে তখন সমিধ হয়ে জলছেন সব কটি দিকপাল—সহসা নিদ্রামথিত কণ্ঠে চীৎকার করে ওঠেন শ্রীঠাকুরের মানসপুত্র রাখাল,- ওরে

সারদা যাস্‌নি যাস্‌নি—নিরুদ্ধ বেগ নিয়ে ফিরে আসেন সারদা—শ্মশানের ভয়াল্ক সাধনে সেদিন ছিল তাঁর অভিসার রাত্রি – আর ঠাকুরই জানান নিষেধ।

চির-ভয়াতীত এই ত্রিগুণাতীতই হাসিমুখে নিজের মৃত্যুর দিন দিয়েছিলেন নির্দিষ্ট করে, বিবেকস্বামীর জন্মতিথি পার করে। যুক্তরাষ্ট্রের জনৈক উন্মত্তের বোমার আঘাতে সেদিন শায়িত ছিলেন বেদনার বেদীতে—কর্মবীরের উপযুক্ত মৃত্যুই তিনি পেয়েছিলেন। ধর্মের ইতিহাসে এঁরাই শহিদ—প্রেমের সমিধে আহুতি হয়ে এঁরাই যুগে যুগে নিত্যানন্দ, দয়ানন্দ, বিজয়কৃষ্ণ।

পঞ্চাশ

কাশীপুরের সেবা-সম্পুট যাঁরা করেছেন রচনা, স্বামী ব্রহ্মানন্দ ছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্রীঠাকুরের একান্ত আপন। প্রথম দর্শনেই ঠাকুর তাঁকে নিয়েছিলেন চিনে, মানসপুত্র বলেই।

বিষয়ীর সঙ্গ শ্রীঠাকুরকে বিশেষ কষ্ট দিত, দিত জ্বালা। বলতেন,—মা বিষয়ীদের হাওয়া আর সহ্য করতে পারি না, জিভ পুড়ে গেল—বিষয়ীদের হাওয়া পাছে লাগে বলে গায়ে পুরু কাপড় জড়িয়ে থাকতেন।

দার্শনিক হোয়াইটহেড্ বলেন,—জগৎটাই সহানুভূতিময়—জড়, জীব সবাই এক অসীম স্নেহরসসিক্ত···একথা শ্রীঠাকুরের কথার প্রতিধ্বনি,—জগৎটা যেন তাঁতে জরে রয়েছে—তাঁর প্রেমে বিভোর—এই অনুভূতির কথায় দার্শনিক বলেন,—এক বস্তু আর এক বস্তুর প্রতি একটা আকর্ষণ বোধ করে, একটা প্রিহেন্‌শন্‌ই তাকে অন্য বস্তুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত, তাই দেখি—ভোরের সুরে পাখীর কুলায় সুর জাগে ঋষি সত্রে ঝঙ্কার ওঠে···সহনাববতু—সহনৌ ভুনক্তু···তাই শুনি ঈশামসির কণ্ঠে,—নিষ্পাপ শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, স্বর্গরাজ্য তাদেরই। শ্রীঠাকুর ডাকছেন কুটীর ছাদে, আর্ত্ত তৃষ্ণায়,—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়, আমি যে আর থাকতে পারি না। তাই একদিন দেখেন পঞ্চবটীর কল্পমূলে দাঁড়িয়ে আছে এক কিশোর সুন্দর—আর একদিন দেখেন ভবতারিণী সেই কিশোর কুমারকেই দিলেন কোলে; বললেন,—এইটি তোমার পুত্র···আরও একদিন দেখেন সুরধুনী আলো করে ফুটেছে এক আলোর শতদল, আর তারি বুকে দলমল রূপে দাঁড়িয়েছেন আলোর দুলাল

ব্রজরাজ স্বয়ং আর হাত ধরে নূপুর সিঞ্জিত চরণে দাঁড়িয়েছেন রাখাল-সখা—রূপে রূপময়…

এই দিনেই রাখাল মহারাজ এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে, আর এসেই চিনেছিলেন নব-ব্রজেশ্বরকে সুরধুনী কূলে।

ব্রজলীলায় সুবল সখারা এসেছিলেন প্রারম্ভলগ্নে—তাই কৈশোর লীলাই হয়েছিল রসপুষ্ট।…মহাপ্রভুর গম্ভীরা আর নদীয়ার লীলা পুষ্ট করতে যে সব পার্ষদরা এসেছিলেন তাঁরাও ছিলেন সমকালের। এবার কিন্তু পার্ষদরা এলেন বিদায় গোধূলীতে—লীলাপাটের শেষ পটক্ষেপে ; মাত্র বছর পাঁচের মধ্যেই পার্ষদরা চিরবাঞ্ছিত থেকে হলেন চিরবঞ্চিত। বোধ হয় কর্মপদ্ধতির জয়শ্রীতে এবার পুরুষার্থের প্রয়োজন ছিল বেশী তাই পার্ষদদের হয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়াতে। ভক্তবীর গিরীশ ঘোষ যেমন বলতেন,—এবার বুঝি জগৎ উদ্ধার। পার্থের এবার সত্যকার বিশ্বরূপ দেখার পালা, আত্মনোমোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়—তাই পার্থসারথী গেলেন সরে। সরাতে হয়েছে সখ্যমধুর প্রকাশ ব্রজের রাখালের সঙ্গে। এবার লীলার ছন্দে এসেছিল অন্যরূপ—ব্রজরাজ এবার মাতৃরূপে নিলেন ব্রজের রাখালকে। তাই দেখি রাখাল মহারাজ যখন তখন বসে পড়েন শ্রীঠাকুরের কোলে—সুরু করে দেন দুধ খেতে। শ্রীঠাকুরও ক্ষীর, সর, ননী ধরে দেন তাঁর মুখে—সংকোচের কোন বালাই নাই কারো। শ্রীঠাকুরের মানসপুত্রের জন্য হতেন আকুল, বলতেন,—মা রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে আর ওদিকে রাখাল মহারাজও গৃহকোণে হতেন সারা—ছুটে আসতেন আর্তশিশুর আকুলতায়—এই বাৎসল্যের টানেই গঙ্গার কূলে ঠাকুর ডেকেছেন,—ও গৌরদাসী আয় না, রাখালের খিদে পেয়েছে। গৌরীমাও রসগোল্লা হাতে এসে নেমেছেন নৌকা থেকে।

…যখন মন উর্দ্ধভূমিতে উঠতে হয়েছে অক্ষম, যখনই মনে ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার শ্রীঠাকুর তখনই অমৃত স্পর্শে এনে দিয়েছেন এগিয়ে যাবার আনন্দ—যুগে যুগে চরৈবেতি মন্ত্র যে তাঁরই দান।

শ্রীঠাকুর তাঁর মানসপুত্রকে শব্দব্রহ্মের মহিমা শুনিয়েছিলেন বিহ্বল কণ্ঠের বেদ গাথায়। আবার যোগৈশ্বর্য্যের প্রকাশে রাখাল মহারাজের স্বচ্ছদৃষ্টি নির্বাধে অন্যের অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করতে পেরেও অক্ষম হয়েছিল শ্রীঠাকুরেরই কৃপায়। শ্যামপুকুরের শ্যামা পূজার রাত্রি তাঁর কাছে এনেছিল নবরাত্রির ছন্দ—

সেদিন শ্রীঠাকুরের মাতৃমূর্ত্তিতে দর্শন করেছিলেন বিশ্বমাতৃকার বিরাট রূপ। এই মহামাতৃকার পূজাই তিনি করেছিলেন ঘটে ঘটে সারা জীবন। এই কাশীপুরেই শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতেই স্বামিজী তাঁকে রাজা আখ্যা দেন—ভাবী সঙ্ঘনায়কের এই প্রতিষ্ঠা শ্রীঠাকুরেরই ইঙ্গিত।

শেষের সুরে মিলেছে প্রথম দিনের সুর। শেষ পর্য্যায়ে বলছেন,—এই যে পূর্ণচন্দ্র—রামকৃষ্ণ, রাখাল কৃষ্ণ—আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দাও, আমি নাচবো, কৃষ্ণের হাত ধরে নাচবো...নাচতে নাচতেই গেছেন চলে—রাখালরাজের কাছে।

একাত্ম

কাশীপুরের সেবা-শতদল তখনও অফুট কুঁড়ি—তখনও সবে দখিণ হাওয়ার নাচন হয়েছে সুরু। আজকের আনন্দছন্দ তখন শিব-জটায় আপনহারা জাহ্নবা। স্বামীপাদ যোগানন্দ সেই সুখের সত্রেই দিয়েছিলেন যোগ।

সাবর্ণি চৌধুরী বাড়ীর ছেলে—দীর্ঘায়ত সুগৌর দেহছন্দে, শান্ত করুণার্দ্র চোখে, এমন একটা সুষমা ছিল—এমন একটা মহিমা ছিল যাতে সাধারণ মনে একটা সম্ভ্রম না জাগিয়েই পারত না। বংশের গৌরবে শ্রীঠাকুর বলতেন,—এরা এককালে জাত দিতে নিতে পারতো। কলিকাতা এককালে এদের ইজারা ছিল।

বেদনামুদিত নয়ন মেলে সেদিন শ্রীঠাকুর জানান,—পালো দেওয়া ক্ষীর খাবো। প্রয়োজন যে কার সেকথা বুঝা কঠিন।...মনে পড়ে দখিণাপুরে সে এক তমসার রাত্রি—সহসা শ্রীঠাকুর জানান,—ওরে রামলাল! আমার যে খিদে পেয়েছে, কি হবে? শ্রীমা ছিলেন নহবতের নর্মকোণে—সংবাদ গেল সেখানে। কাঠকুটো জ্বেলে সুরু হয় অন্নপূর্ণার অন্নদান ব্রত। বড় একবাটী হালুয়া হল তৈরী। গোলাপমাও ছিলেন উপস্থিত। তিনি ধরে দেন সেই সম্পুট শ্রীঠাকুরের সামনে। ভয়ার্ত্ত চোখেই দেখেন—ঠাকুরের আহার না কুণ্ডলিনীকে নিবেদন। আরো মনে পড়ে মহাপ্রভুর মধ্যলীলা, অদ্বৈতগৃহে—

আচার্য্য কহে নীলাচলে খাও চুয়ান্নবার।
এক বারে অন্ন খাও শত শত ভার॥ চরিতামৃত

আবার মনে পড়ে যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণীর ব্যবস্থায় শ্রীঠাকুরের বিরাট ক্ষুধার

বিরাট আয়োজন। মনে পড়ে কামারপুরে নিশীথ নিরালায় এক রেক চালের অন্নগ্রহণ। বাহান্নপর্ব ভোগেও যে হয় না জগন্নাথের তৃপ্তি!

সেদিন যোগীন ছুটে যায় কলিকাতায় পালো ক্ষীরের প্রয়োজন মিটাতে। যোগীন মহারাজের বিচারশীল মনে জাগে এক চিন্তা—বিশেষ রোগখিন্ন দেহে বাজারের মিষ্টে হয়ত দেবদেহ হবে কুপিত। দেবদেহের ক্ষুণ্ণতা তখন সকলেরই অন্তরের অন্তরকে করছে ব্যথিত। তাই মহারাজ বলরাম মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হন। ত্যাগে, বৈরাগ্যে, ভক্তিপ্রীতিতে এইটি ঠাকুরের আড্ডা—তাঁর বৈঠকখানা।

যাই হোক ভক্তগৃহে সানন্দে এই সংবাদ গৃহীত হল, কিন্তু ক্ষীর প্রস্তুতে হয়ে যায় বেলা। স্বামিপাদও বেলা চারটার সময় সেই ক্ষীর কাশীপুরে উপস্থিত করেন। শ্রীঠাকুরের কিন্তু সে ক্ষীর আর গ্রহণ করা হয় নাই। হয়ত গুরুবাক্য লঙ্ঘনের এই ফল—হয়ত গোপালের মার মহিমাকে করতে চেয়েছিলেন আরো উজ্জ্বল। কারণ সে ক্ষীর শ্রীঠাকুর গোপালের মাকে দেন গ্রহণ করতে—বলেন,—ওর অন্তরে গোপালই ভরে আছে।

স্বামিপাদের বিচারশীল মন একাধিকবার শ্রীঠাকুরের পরীক্ষায় হয়েছিল উদগ্র। দক্ষিণেশ্বরে তখন যাতায়াত সদ্য হয়েছে সুরু। বয়স অল্পাধিক পনেরো। পঞ্চবটী মূলে সাধুদের যোগাদি ক্রিয়ায় মুগ্ধ হয়ে শ্রীঠাকুরের কাছে গেছেন ছুটে—শরীরের প্রক্রিয়ায় মনকে শুচি সুন্দর যদি বা যায় করা। শ্রীঠাকুর অকৈতবে হরিনামের মাহাত্ম্যই দেন ধরে। নিজের বুদ্ধি সম্বন্ধে চিরদিনই সজাগ ছিলেন স্বামিপাদ। তিনি ভাবলেন হয়ত শ্রীঠাকুরের ওসব ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে নাই কোন পরিচয়—তাই সহজ পথেই চান নিয়ে যেতে। তবু ইচ্ছায় অনিচ্ছায় সন্দেহ দোলায় নামই যান করে, গুরুবাক্য অলঙ্ঘ্য ভেবে। অল্পদিনেই হরি নামের অমোঘ ফলে হলেন পরিতৃপ্ত।···নিশির ডাকে না নিশার ডাকে যোগীন মহারাজ আছেন দাঁড়িয়ে, দৃষ্টিতে ফুটে উঠেছে গভীর সংশয়। করুণাবতারের নাই কৃপার পার—তিনি স্নিগ্ধ হাসিতে তুলে নেন সব কাঁটা। বলেন,—সাধুকে দিনে দেখবি, সাধুকে রাত্রে দেখবি, তবে সাধুকে বিশ্বাস করবি।

সেবার কবিরাজের বিধানে লেবুর হল প্রয়োজন। নিয়ে আসেন যোগীন মহারাজ নিত্য। একদিন কিন্তু শ্রীঠাকুরের হাত আর ওঠে না। সংবাদে জানা গেল ফলটি বাগানের মালিকের অগোচরেই হয়েছে আনা।

শ্রীঠাকুরকে কুশাগ্র বুদ্ধি দিয়ে বিচারে আর একবার যোগানন্দ মহারাজ পড়েন বিপাকে। সেদিন মার মন্দিরের বরাদ্দ প্রসাদ ঠাকুরের ঘরে এসে পৌঁছয়নি। ঠাকুর হয়ে পড়েন চঞ্চল। যোগানন্দজী ভাবেন হয়ত ঠাকুরের চালকলা বাঁধা অভ্যাস তাই এমনই ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। নিজে ত নিতেনই না ওসব কিছু। যাই হোক ভুল ভাঙ্গলো যখন ঠাকুর বুঝিয়ে দেন ধর্মের গূঢ়গহন রহস্য। বলেন,—রাণী রাসমণি-মার দেওয়া জিনিষ ভক্তরা খেলে সার্থক হবে তাঁর দান। ভাগবৎ, ভক্ত, ভগবান ; যে তিনে এক, একে তিন।

কাশীপুরে সেবার অত্যধিক সৌকর্য করতে গিয়ে যোগীন মহারাজ অসুস্থই হয়ে পড়েন। ঠাকুরও বিশেষ দুঃখিত হন সেবকদের অসুস্থতায়। সময়ে খাওয়া এই পর্য্যায়েই হয় সুরু।

ঠাকুরের কাছে স্বামিপাদের হয়নি দীক্ষা। এরও প্রয়োজন ছিল। মার এমন একনিষ্ঠ সেবক আর ত দুটি ছিল না। মার বাড়ীতে জগদ্ধাত্রী পূজায় বাসনমাজার কাজ মা নিয়েছিলেন নিজে—বিবেকস্বামী তাই বলতেন,—জগজ্জননী সাধ করে বাসন মাজছেন, ঘর নিকুচ্ছেন। ভাবতে সত্যই বিস্ময় লাগে, তিব্বত থেকে হলিউড পর্য্যন্ত যার পূজার ব্যবস্থা—তাঁকে কি-না করতে হয়েছে। যোগেনস্বামীর এটি সহ্য হয়নি। তিনি কাঠের বাসন করে দিয়েছিলেন যাতে মার কষ্ট না হয়। আরো, পূজার জন্য কয়েক বিঘে জমি দিয়েছিলেন করে। মার প্রয়োজন হবে বলে একটি পয়সাও বৃথা খরচ করতেন না, রেখে দিতেন জমা করে। মনে হয় ঠাকুর মাকে একান্ত আপন করে দেবার জন্যই নিজে দেননি দীক্ষা আর দীক্ষার আদেশ তিনবার তিনি পেয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে। রামকৃষ্ণ-সারদাগত এমন একটি প্রাণ যুগে যুগেই একা।

বাহান্ন

ভক্তভগবানের লীলা বিচিত্র। তার চেয়েও বিচিত্র ভগবানের নরলীলা··· মহাপ্রভুর দন্তে তৃণ নিয়ে দ্বারে দ্বারে দাস্যভক্তির ভিক্ষা আমরা আকুল হয়ে শুনি ···দক্ষিণেশ্বর লীলায় দেখি ভগবান কত দীন হতে পারেন—সাবর্ণি চৌধুরীদের ছেলে যোগেনস্বামী—সহজেই বংশ-গৌরবে আকাশ দেউল—সহজেই দক্ষিণেশ্বরে আসা যাওয়া কম। সেদিন গর্বগতি নিয়ে পাদচারণ করছেন

দক্ষিণেশ্বর উদ্যানে, এই অবস্থায় ঈশ্বর সম্বন্ধে ধারণার কথায় ঠাকুর বলতেন,—হাতে ষ্টিক নিয়ে বাবু পাইচারী করতে করতে বলছেন,—ঈশ্বর কি বিউটিফুল ফুল করেছেন। যাই হোক দিনান্তের আতপ্ত বেলায় যোগেন মহারাজ দেখেন—দীন বেশে, আপনহারা চলেছেন শ্রীঠাকুর—একান্ত আপন করার উদভ্রান্তের সে চলা—সব দিয়ে সব নিয়ে নেবার সে চলা,—শ্রীঠাকুরের হল রূপায়ণ, ধরলেন মালীর বেশ, দিব্যতম এক মালী।

যোগেন স্বামী পারেন না ধরতে ঠাকুরকে - চেয়ে বসেন ফুলের তোড়া। শ্রীঠাকুরও পরম শিষ্টের মত দিয়েছিলেন হাতে তুলে সেই ফুল—শ্রীঠাকুরের মুখের কথা,—ওরে কুশী লব, কি করিস গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে—ধরা দিতে এসেও অধরা হওয়ার এই লীলা, না অহংটুকু নিলেন কেড়ে—কে জানে ?

আরো একটি দিনের কথা, যোগেন স্বামী গেছেন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের দ্বারে দ্বিধা দ্বন্দ্বের দোলায় আছেন দাঁড়িয়ে সহসা ডেকে পাঠান দ্বন্দ্বহারী শ্রীঠাকুর,—বাইরে যারা আছে তাদের নিয়ে এসো ডেকে ··অতি-পরিচয়ের মাঝে থাকে অতি অভিমানের রহস্য। তাই কি সে বাধা ভেঙ্গে দিলেন এক মুহূর্তে। ডেকে বলেন,—তবে ত তুমি আমাদের চেনা ঘর গো—তোমাদের বাড়ীতে তখন কত যেতুম - কত ভাগবৎ পুরাণ পাঠ হত - বেশ আধার, খুব হবে।

শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরই এই চিহ্নিত পার্ষদটি নেন শ্রীমার সেবাধিকার। সেবার বৃন্দাবনের পথে হল বিষম জ্বর বিকার—তিনি তখন ট্রেনের কামরায়। ভাবছেন শ্রীমা আর তাঁর গোষ্ঠীবর্গকে কেমন করে শ্রীধামে দেবেন পৌঁছে। সহসা এক দিব্য দর্শনে ভেঙ্গে যায় সব ভয়, সব ভাবনা। দেখেন শ্রীঠাকুর দিব্যরূপে আলো করে আছেন বসে আর সঙ্গে আছেন এক মাতৃমূর্ত্তি আর এক বিকট পুরুষ। বলেন তিনি,—তোকে দেখে নিতাম ; তবে শ্রীঠাকুরের জন্যই কিছুই করা হোলনা। তবে এই বেটাকে কিছু রসগোল্লা দিস্।—এরপর তাঁরা জয়পুরে এই শীতলা দেবীরই পান দেখা কোন এক মন্দিরে, আর নিকটেই রসগোল্লারও এক দোকান দেখেন...দিব্যলীলার পূর্ব্বাপর সব যেন ঠিক করাই থাকে।

জীবন-মরণের ব্যূহমুখে সেদিন দাঁড়িয়েছেন জীবন্মুক্ত এই পুরুষ। পিতা-মাতাকে জানান অন্তরের আশীর্ব্বাদ মুক্তানন্দে,—সামাজিক সব বাধাই গেছে

ছুটে। শিবানন্দ মহারাজ যখন বলেন,—শ্রীঠাকুরের কথা মনে আছে ত যোগেন ভাই ? ব্যাধির সহস্র-শর জর্জর দেহে সেদিন উত্তর দেন, - আরো বেশী আরো বেশী করেই মনে আছে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের দেবদেহে ব্যাধির সঞ্চারে প্রথম ক্ষণে যাঁরা তাঁর পার্শ্বে এসে দাঁড়ান, তাদের মধ্যে যাঁরা প্রধান অংশ নিয়েছিলেন স্বামী অভেদানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম ! আঠারশত পঁচাশির এপ্রিলের তখন প্রথম মুখ শ্রীঠাকুরের অসুস্থতার প্রথম সঞ্চার স্বামিপাদ সেদিনও কালীপ্রসাদ ! দুর্গাচরণ ডাক্তারের চিকিৎসাধীনে তিনিই শ্রীঠাকুরকে নিয়ে আসেন, লাটু মহারাজও ছিলেন সঙ্গী-সহায়। পানিহাটী মহোৎসবে কালীপ্রসাদও শ্রীঠাকুরের লীলাসঙ্গে হননি বঞ্চিত। কারণে বা অকারণেই তাঁর প্রকাশ কথামৃতে দুর্লভ হয়েই আছে। পরবর্ত্তীকালে রহস্য করে যেমন বলতেন, আমরা ইত্যাদির দলে পড়ে গেছি। শ্যামপুকুরের বিষাদ-নাট্যেও গৃহমেধা মন বিসর্জন দিয়ে, কালীপ্রসাদ ছিলেন উপস্থিত। নরেন-স্বামীর নির্দেশে তাঁর সেবাধিকার ছিল চার ঘণ্টা, দিনেরাত্রে মিলে—কাশীপুরের দ্বিতলে গাড়ীবারান্দায় শ্রীঠাকুরের স্নান পুণ্যে হতেন সহায় আতপতাপে করতেন দেহের পরিচর্য্যা।

কৃপায় না অকৃপায় সেবার দেবতার কাছে থেকে কালীপ্রসাদকে নিতে হলো বিদায়। জননী নয়নতারা তখন পুত্রের অদর্শনে একান্ত আকুল—মার বুক নিঙড়ে চোখে নেমেছে অশ্রুর প্লাবন পিতা বহন করে আনেন সে বার্ত্তা—শ্রীঠাকুর স্বামিপাদকে দেন গৃহে পাঠিয়ে। প্রতিকূল আবেষ্টনীও প্রয়োজন সাধন রহস্যে। গুরুবাক্যে স্বামিবাদও যান জননীর সান্ত্বনায়—সহসা মাতৃগৃহে শরাহত মন নিয়েই ছুটে আসেন—পড়েন শান্তিময়ের চরণে, নয়নে ভয়ার্ত্ত আকুতি- পরমানন্দের গৃহ, সে যে তাঁর কাছে ভয়ের অরণ্য হয়েছিল।

মাস্তুলের পাখী হয়ে একবার কাশীপুর থেকেই স্বামিপাদ ছুটে যান অতৃপ্ত তৃষ্ণা নিয়ে গয়ার আকাশগঙ্গা পাহাড়ে ইচ্ছা হঠযোগের কিছু প্রক্রিয়া নেবেন শিখে—আজন্ম যোগী যে নিজে। শ্রীঠাকুর বলতেন,—ও আর জন্মে একজন বড় যোগী ছিল—তাইত ওকে বেঁধে পাঠাতে হয়েছে—তাইত জন্মের সঙ্গেই গায়ে দাগ দেখা গিয়েছিল, দড়ি দিয়ে যেন বাঁধার দাগ। হঠযোগীর কাছে এদিকে তাঁর 'কম্‌লী ছোড়তী নঁহীর' অবস্থা হয়েছিল। যাই হোক জল আনার ছল করে পালিয়ে আসেন সে যাত্রা। শীত শীর্ণ চন্দ্রলেখার মত ঠাকুরের দিব্য অধরে জাগে

এক টুকরো হাসি বলেন,—চার খুঁট ঘুরে আয় দেখবি কোথাও কিছু নাই। যার হেথায় আছে তার সেথায় আছে—যার হেথায় নেই তার সেথায়ও নেই –

এই দেব অঙ্গনেই শ্রীশ্রীঠাকুর একবার তাঁকে বেদান্তের সর্বত্র ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি কি তা দেখিয়ে দেন। সহসা সেদিন অসহ যন্ত্রণায় শ্রীঠাকুর বলেন,—দেখ দেখ বাইরে ঘাসের উপর কে যেন চলে যাচ্ছে—আমার বুকের ওপর দিয়ে যেন যাচ্ছে—বারণ কর! দক্ষিণেশ্বরের পুণ্য তীর্থেও এমনি অনুভূতির কথা আমরা জানি—

ভবনদীতেই যেন সেদিন মাছ ধরছেন দুই স্বামিপাদ, অভেদস্বামী আর বিবেকস্বামী। কাশীপুরের দিব্য উদ্যানের কাকচক্ষু পুকুরে বসেছেন দুই দিব্য শিকারী। প্রাণে গীতার মন্ত্র তখন অনুরণিত হচ্ছে - ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে; শ্রীঠাকুরের দৃষ্টি এড়ায় না—ডেকে পাঠান তিনি—অনাগত দিনের আচার্য্য যে তাঁরা—জগৎগুরু বলেন গুরু গম্ভীরস্বরে,—দেখ, বঁড়শিতে টোপ দেওয়া বিশ্বাস-ঘাতকতা—এ যেন বন্ধুদের ডেকে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া—সহজে শুনতে চান না দিক্‌-পালরা—শেষে পরাজ্ঞানের পরম পথই দেন ধরে—বলেন,—ধ্যান কর—বুঝতে পারবি—তিন দিন ধ্যানের পর বুঝতে পারেন তাঁরা শ্রীঠাকুরের বেদবাণীর স্বরূপ।

মনে পড়ে দর্শনের একমতে সমস্ত জ্ঞান আমাদের অন্তরেরই ধন—সে যুগের শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী সক্রেটীস্ এই তত্ত্বের দিয়েছিলেন প্রমাণ নিরক্ষর এক অনার্য্য বালকের মুখে জ্যামিতির এক দুরূহ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন উদ্‌ঘাটিত।

এই দিব্যধামেই বিবেকস্বামিপাদ এক অদ্ভুত অনুভূতির প্রকাশ দেখান কালীমহারাজকে। সেদিন বিবেকস্বামীর দক্ষিণ জানু স্পর্শে কালীমহারাজের এক দিব্য কম্পন হয় উপস্থিত—পরবর্তীকালে যে দিব্যশক্তি বীরসন্ন্যাসীর দেহমন হতে বিচ্ছুরিত হত সেই শক্তির প্রথম প্রকাশ এং ভাবেই হয়ত হয়েছিল- আর সে শক্তির প্রথম ধারক হয়েছিলেন দেবসঙ্গী কালীমহারাজ।

শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পরও তাঁর দিব্যসঙ্গ হতে তিনি বিচ্যুত হননি কোন দিনই। মধ্য কলিকাতার এক গৃহে তখন অস্থায়ী আশ্রমের কর্মচক্র প্রসারমুখে চলেছে এগিয়ে। দিবামধ্যে স্বামিপাদ আছেন বসে সমাগত ভক্ত সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপে—নিজের জীবনবেদ বলতে গিয়ে বলেন,—দেখ্, শ্রীঠাকুরের কৃপা—সেদিন এই টেবিলে মাথা রেখে ভাবছি—ঠাকুর বোধ হয় আমাদের গেছেন ভুলে,

আর তেমন দেখা পাই না কেন—সহসা দিব্যমূর্ত্তিতে শ্রীঠাকুর এসে দাঁড়িয়েছেন, বলেন,—কালী, মনে আছে সেই নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনতে যাওয়া—লোক জমেনি, তাই যাত্রাও তেমন জমতে পায়নি, মনে আছে?—চমক যায় ভেঙ্গে, চকিতে ফিরে আসি বাস্তবে—দর্শন এই ভাবে ভাবলোকেই হয়।

অন্তরঙ্গদের কথায় শ্রীঠাকুর বলতেন,—দেখ্, তোদের সঙ্গে আমার জন্ম-জন্মের সম্বন্ধ। তোরা যেন কলমিলতার দল—তাই বিবেকস্বামীর হাত ধরে নিত্যসঙ্গীরূপে শ্রীঠাকুর কতদিনই চলেছেন মার্কিণের পথে,—তাই লুসিটেনিয়া জাহাজে অভেদপাদ আরোহণে উদ্যত—দুই দুইবার শোনেন শ্রীঠাকুরের কাছে প্রত্যাবর্ত্তনের বাণী—লুসিটেনিয়ার সলিল-সমাধির বিধিলিপি সেইবারেরই ঘটনা। ঝুসীর শৈল-শিখরে সেবার শ্রীঠাকুরের কৃপার নিরিখ পান অভেদপাদ। সেবারের পরিক্রমার সঙ্গী ছিলেন জনৈক নানকপন্থী সন্ত। সেই সঙ্গী সাধকের কূর্মদেবতা দিনান্তে হয়ে পড়েছে একান্ত ক্ষুব্ধ। ভিক্ষান্নের সন্ধানে তিনি তখন উদগ্রীব, পরামর্শও দেন শ্রীপাদকে। স্বামিপাদের অন্তরে তখন গীতার মহাবাণী স্ফুরিত হয়ে উঠেছে—যোগক্ষেমং বহাম্যহম্—তাই তিনি অটল আসনে গীতা আলোচনায় হলেন মগ্ন—সেদিন বর্ষণখিন্ন দিনান্তে ভক্ত ভগবানের লীলার এক পর্য্যায় হল সুরু। ভক্তের কাছে বারে বারেই দিতে হয় ভগবানকে পরীক্ষা—সব সমর্পণের মন্ত্রে তারা যে নিয়েছে দীক্ষা…। সান্দ্র বর্ষণক্ষান্ত দিনের শেষ আলো যায় মিলিয়ে। সাধুদের অন্তর তখন পাঠসুখে আপনহারা। সহসা উচকিত কণ্ঠস্বরে দুই সন্তহৃদয় হয়ে উঠে স্পন্দিত—চেয়ে দেখেন জনৈক ভক্ত একটি ঝুড়িতে প্রচুর উপচার বহন করে এসেছেন সাধু সন্দর্শনে। নানকপন্থী সন্তটীর অন্তর তখন পলকে উচ্ছল।

সেবার শ্যামপুকুরের লীলাপীঠেই শ্রীঠাকুরের এক দিব্য প্রকাশ হয় মহাষ্টমীর সন্ধিলগ্নে। জগজ্জননী ক্ষণিকের করুণান্বিত দৃষ্টিতে যেন চেয়ে দেখেন আর্ত্তধরণীর দিকে—ঘরে ঘরে মার আবাহনের আর্ত্তি মিলিয়ে যায় ঊর্দ্ধগগনে—ভক্তসুরেন্দ্রের গৃহপ্রাঙ্গণেও উঠেছে সে আর্ত্তি অশ্রুর অভিষেকে—সহসা শ্যামপুকুরপীঠে ঠাকুর হয়ে পড়েন সমাধিস্থ। নরেন্দ্রনাথ, কালীপ্রসাদ, এইসব ভক্তেরা মার আবির্ভাবের এই শুভলগ্নকে হেলায় চাননি হারাতে—পুষ্পসম্ভারে চরণনিকষ হয়ে উঠে সমৃদ্ধ—অনুলোমমুখে বলেন ঠাকুর,—এখান থেকে জ্যোতির পথরেখায় দেখলুম পূজা-মণ্ডপে মার পাশে অশ্রুপল্লল নেত্রে দাঁড়িয়ে আছে সুরেন্দ্র—তোমরা যাও তাকে

আশ্বস্ত করে এস। নিভৃত প্রাণের ব্যাকুলতা দিয়ে সেদিন সুরেন্দ্রনাথের মাকে ডাকা সার্থক হয়েছিল। মা-ই তাকে ঠাকুরের রূপে দেখা দিয়েছিলেন—মহাসন্ধিক্ষণের পুণ্যলগ্নে ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গদের নিত্যসম্বন্ধের আরও কত কথাই না জানা গেছে।

সেবার উনিশশত বাইশের এপ্রিল, তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় স্বামিপাদ দেখেন—স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভীষণ অসুস্থ—স্বামিপাদের চারিপার্শ্বে সাধুসন্তেরা আছেন বসে—উদ্বেল উদগ্রীব, আর ঠাকুরও উপস্থিত আছেন শয্যা পার্শ্বে বলা বাহুল্য এ দৃশ্য, দীপ নির্ব্বাণেরই দৃশ্য।

পংচারীর রুক্ষ বেশে অভেদস্বামী অনেকদিনই দিয়েছেন কাটিয়ে। সে সব কাহিনী ইতিহাসের পাতায় পাওয়া সম্ভব নয়। বলতেন,—আমি কি লিখে রাখতে তপস্যা করতুম -সেবার প্রব্রজ্যাক্রমে মিরাটের বাগানে এসে আসন করেছেন। স্বামিপাদ বসেছেন একা একটি দেয়াল ঘেসে—ব্যাবৃত চক্ষুঃ সমাধিমুখী—সহসা কে যেন বলে,—সরে বস সরে বসেন অভেদপাদ—সহসা সেই দেযালপাট দমকা হাওয়ায় যায় পড়ে। এ সতর্কবাণী আর কারও নয় ঠাকুরেরই।

আর একদিনের কথা তখন স্বামিজী নিউইয়র্কের কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক মহিলার গৃহে অতিথি। সন্ধ্যায় ঘরে ফিরছেন, সহসা জনৈক অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা, আলাপে কিছু দেরী হয়ে যায়—ফিরেই দেখেন গৃহের ছাদ গেছে পড়ে। নিশ্চিত মৃত্যুর ললাটলিপি শ্রীঠাকুরই মুছে দেন অভয় হাতে। দয়াবতী মহিলাটি সমস্ত শুনে যুক্তকরে অশ্রুলচক্ষে প্রার্থনা করে বলেন, নিশ্চয়ই আপনার জন্য কেউ প্রার্থনা করেছিল। তিনি জানতেন না যে স্বয়ং ঠাকুরই তাঁর সন্তানদের অভয় ইঙ্গিতের দেবদূত, (guardian angel) অতন্দ্রে নিয়ে চলেছেন জীবনের পথে পথে। পরের একদিনের কথা···সুইসআল্পসের তুষার ধূসর পথে চলেছেন মগ্নমনে—প্রকৃতির পরমোৎসব দৃশ্যে আপনহারা—সহসা কে যেন হাতে ধরে সরিয়ে নিয়ে যায় অনেক দূরে—আর সঙ্গে সঙ্গে এক প্রকাণ্ড পাথরের চাঙড় পড়ে গড়িয়ে—এইটি গায়ে পড়লে শৈলসানুতে নিতে হত চিরসমাধি—চির-আশ্রিতদের, চিরদাসানুদাসদের রক্ষাকবচ তিনিই ত বেঁধে দেন অভয় হাতে।

ঊনবিংশ শতকের পঁচাশী সালের শেষের দিকে একদিনের কথা—বেদনার্ত্তি নিয়ে শ্রীঠাকুর কাশীপুরের অন্তর্লীলায় আছেন শুয়ে—সহসা গিরীশ চক্রবর্ত্তী আর

প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্মোহন তর্কালঙ্কার এসে উপস্থিত—তর্কালঙ্কার মহাশয় সাধারণের মত 'ভাগাডদর্শী' ছিলেন না, ছিলেন সত্যসন্ধী, যাবার সময়ে শ্রীঠাকুরের দিব্য অবস্থার কথাই বলে যান।

গিরীশবাবু ছিলেন সারদানন্দ মহারাজের পিতা আর তাঁর গোপন ইচ্ছা ছিল প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের তুলনায় শ্রীঠাকুরের দৈন্য প্রকাশ পেলে পুত্রের মনের পরিবর্তনই হবে কিন্তু বিধাতার বাদে ঘটনা অন্য পথই নেয় সে যাত্রা।

এই কাশীপুরের শেষ আশ্রয়েই শরৎ মহারাজের তিতিক্ষার পরীক্ষা হয় একদিন। সেদিন ভিক্ষান্নের পবিত্রতা প্রসঙ্গে সন্তানদেব দেন পাঠিয়ে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে। শরৎ মহারাজের 'নারায়ণ হরির' বিনিময়ে প্রথম ভিক্ষাপাত্র পূর্ণ হয়েছিল রিক্ত তিরস্কারেই। এই তিতিক্ষার দীক্ষা প্রথম জীবনেই শান্ত রসাস্পদে হয়েছিল স্নিগ্ধ। তাই দেখা যায় জীবন মৃত্যুর সীমান্তেও কি তাঁর সমাহিত শান্তি। নিরানব্বই সালের কথা, অধ্যাপক ওকাকুরা এসেছেন জাপান থেকে ভারতের প্রতি অসীম শ্রদ্ধাঞ্জলি নিয়ে। সারদানন্দ হলেন সঙ্গী বুদ্ধগয়ার তীর্থপথে। ফিরে আসার পর বিবেক স্বামিজীকে দেখতে যান কাশ্মীরের ভূস্বর্গে—সহসা অশ্বযানের গতি হয়ে উঠে শিথিল। পাশ-কাটাবার চেষ্টায় গাড়ীটি পাহাড়ী খাদে যায় পড়ে আর পিছনে পড়তে থাকে একটি বড় পাথরের চাঙড়। নিশ্চিত মৃত্যুর হাতছানিতে স্বামিপাদ রইলেন বসে নিস্পলক শান্তিতে। শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতেই গাড়ীটি একটি গাছে আটকে যাওয়াতে সে যাত্রা সারদানন্দজী পান নিষ্কৃতি।

আর এক বারের ঘটনা—মহারাজ চলেছেন বিলেতে, জলপথে—সহসা সারাসমুদ্র মথিত করে নেমে আসে মৃত্যু তুফান। সহযাত্রীরা সকলেই সলিল সমাধির ভয়ে বড় উদ্বিগ্ন তাঁর সেদিন নিরুদ্ধ নিস্পন্দে বসে থাকা সকলের মনেই জাগিয়ে তুলেছিল বিরক্তির সংঘাত—অন্য বারের কথা ব্রহ্মানন্দ মহারাজের প্রয়োজনে ডাক্তার কাঞ্জিলাল আর শরৎ মহারাজ চলেছেন বেলুড়মঠে, গঙ্গাপথে—সহসা কালবৈশাখীর ঝড়-তুফানে পড়ে যায় তাঁদের নৌকা—অবস্থা হয়ে পড়ে এখন তখন—সারদানন্দজী কিন্তু নির্ব্বাক নিশ্চিন্তে ধূমপান রত—মৃত্যুর মুখে এ নিশ্চেষ্টতা ডাক্তারকে করে ফেলে বিষম অসহিষ্ণু—ত্বরিতে ধূমপানের সরঞ্জাম পায় গঙ্গাগর্ভে স্থান। আর একটি ঘটনা, পাহাড়ী চড়াই-এ চলেছেন সারদানন্দজী,

সঙ্গে কয়েকজন সহযাত্রী—এদের মধ্যে জনৈকা বৃদ্ধার হাতে কোন যষ্ঠি ছিলনা—এই অভাবে তার চলার কষ্ট দেখে স্বামিপাদ পথের সম্বল লাঠিটি-নিশ্চিন্তে ধরে দেন তার হাতে এর ফলে কিন্তু পার্ব্বত্য পল্বলে যান পড়ে। আবার দুর্গম জনমানবহীন পথেও পথহারা সারদানন্দ ধ্যানানন্দে গেছেন ডুবে, স্থান কালের বিস্মৃতিতে—সন্ধানরত তুরীয়ানন্দজী এসে দেখেন তুষার-মৌলী আছেন বসে নির্জ্জন গিরি-শৃঙ্গে—শান্ত সমাহিত।

শরৎ মহারাজকে শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছিলেন ঋষি-কৃষ্ণের দলে। শ্রীঠাকুরের এই দর্শনের সঙ্গে পাই পরবর্ত্তীকালের পূর্ণ সমর্থন। তিনি তখন সেণ্টজেভিয়ার্সের স্নাতক,—বাইবেল অধ্যয়নে অভিনিবিষ্ট—ফাদার লা ফ্রণ্ট প্রসন্নাত্তিতে দিচ্ছেন সে পাঠ। আবার রোম নগরীতে সেণ্টপিটারের গীর্জ্জায়, পিটারের মূর্ত্তির সম্মুখে হয়ে পড়েন সমাধিতে আপনহারা···হয়ত পূর্ব্ব স্মৃতি পথেই হারিয়ে গিয়েছিলেন ঋষিকৃষ্ণের দলের এই প্রাচীন ভক্তটি—

মঠের কর্ম্মসচিব হিসাবে স্বামিপাদের উপর ছিল বিরাট ভার, আবার অন্য দিকে শ্রীমার সমস্ত ভারই ছিল এই সন্তানের হাতে—সার্থক-নামা শ্রীপাদ ছিলেন মার দ্বারী আর ভারী দুই···সেবার শ্রীমার চরণে ব্রণ হয়েছে, অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন · শরৎ মহারাজ ডাক্তার আনেন ডেকে, কি জানি কেন আর্ত্ত লীলায় শ্রীমা হয়ে পড়েন অবুঝ—মায়ের ভয় দেখে গোলাপমা হন বিরক্ত—তখন ধীর শান্ত মুখে মহারাজ বলেন,—অভয়া যদি ভয় পান মা, তবে সে দোষ কি শরতের?—শ্রীমার উদ্বোধন গৃহনির্মাণের সব ভার ছিল তাঁর এই ভক্তটির উপর—শ্রীমার সব ভারই ছিল শরতের।

···দীনের আর্ত্তিতে বাল্যেই স্বামিপাদের চিত্ত যেত গলে। প্রতিবেশীর অসহায় পরিচারিকার বিসূচিকা—সেবার ভার নিজের হাতেই নেন স্বামিপাদ। অপ্রবাসী কারও অসুস্থতায় স্বামিপাদই যেতেন এগিয়ে। কাশী সেবাশ্রমের কর্মী, দীননারায়ণের অন্নদান ব্রতে অনিচ্ছুক,—সারদানন্দজী নিজেই তুলে নেন তার ঝুলি।—সেবার গৌরীমা, বসন্তরোগে অসহায়ে আছেন পড়ে—ছুটে গেছেন স্বামিপাদ সেবার আগ্রহে – এমনি কত!

কল্পবৃক্ষের তলায় ভীড় করেছে ভক্তের নানা প্রার্থনা। ঠাকুর জিজ্ঞাসা করেন,—কিরে তুই যে কিছু চাইলি না। শরৎ মহারাজ বলেন,—কি আর চাইবো, আমি যেন সর্ব্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করি এই করে দিন। শ্রীঠাকুর বলেন,—

তা তোর হয়ে যাবে। আমরা দেখেছি এই সাধনার সিদ্ধ হতেই তিনি তান্ত্রিক পূর্ণাভিষিক্ত হন।

কাশীপুরে সেবক সঙ্ঘে শরৎও দিয়েছিলেন যোগ। কিন্তু শ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পর মন দিতে হয় পড়াশুনায়। কিন্তু নরেনস্বামীর প্রেরণায় আবার এঁর মঠে যাওয়া-আসা সুরু হয়। পিতা পেলেন ভয়, বাড়ীতে চাবি বন্ধ করে রাখার ব্যবস্থা করলেন। শেষে ছোট ভাই গোপনে চাবি খুলে দেন, আর তিনিও সুযোগ বুঝে পিঞ্জরাহত পাখীর মত দক্ষিণেশ্বরে ছুটে চলে গেলেন। এঁর পিতা বৃথা চেষ্টা ছেড়ে তাঁর অঙ্কুশহীন যাত্রা পথই কামনা করেছিলেন।

শ্রীঠাকুরের অন্তর্ধানের পর সুরু হল অগ্নি তপস্যা। তারপর সুরু হল দুর্গম তৈর্থিকের জীবন। সময়ে সময়ে গিরিশৃঙ্গে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে নিশ্চল ধ্যানে ডুবে গেছেন এমনও দেখা গেছে। আবার শ্রীঠাকুরকে পরীক্ষা করাও চলেছে এরি মধ্যে। নিঃসঙ্গ পথে মনে মনে ভাবছেন এই সময় যদি গরম হালুয়া লুচি পাই তবেই জানবো শ্রীঠাকুর আমাদের সঙ্গী হয়েই আছেন। অঘটনের ঠাকুর তেমনি সবই জুটিয়ে দেন সেই উপলারণ্যে।

প্রব্রজ্যার পর বিবেকস্বামীর আহ্বান আসে, তিনিও লণ্ডন যাত্রা করেন। এটি ১৮৯৬ সালের এপ্রিলের ঘটনা। এর পর জুন মাসে তিনি মার্কিনের কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৯৮ এর জানুয়ারীতে তিনি ভারতে ফিরে আসেন স্বামিজীর নির্দেশে। পরবর্ত্তী জীবনে স্বামিজী প্রদত্ত মঠ মিশনের কর্মসচীবের পদে থেকে কাজ করে গেছেন। লীলা প্রসঙ্গ, গীতা তত্ত্ব, শক্তিতত্ত্ব, এই সব বইও এই সময়ে লিখে ফেলেন।

তাঁর ধীর স্থির নিবাত নিষ্কম্প জীবন তার স্থিত প্রজ্ঞতার পরিচয়ই দেয়। শ্রীনগরের পথে একবার ঘোড়ার গাড়ী খাদে গড়িয়ে পড়তে থাকে, তিনি কিন্তু অচঞ্চল মনেই বসেছিলেন। পরে সুবিধামত লাফিয়ে পড়েন। আর একবার ভূমধ্যসাগরে ঝড়ে পড়ে যায় তাঁদের জাহাজ। তিনি নিথরিত চিত্তে বসেছিলেন। আরও একবার গঙ্গার বুকে তাঁদের নৌকা ঝড়ে পড়ে! তিনি তখন সাক্ষীস্বরূপ বসে একটি গড়গড়া টানছিলেন। সহযাত্রী এরূপ নিস্পৃহতা সহ্য না করতে পেরে তামাকের কল্কেটি গঙ্গায় ফেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বামিপাদ বলেছিলেন—তামাক খাব না তো গঙ্গায় ঝাঁপিয়ে পড়ব নাকি? এরপর শ্রীমার সমস্ত ভার, কলিকাতায় তাঁর আবাসবাটী, জয়রামবাটীর মন্দির

এ সব নির্ম্মাণের কাজ নিয়ে নিজেকে মার দ্বারী করে নিয়েছিলেন। ১৯শে আগষ্ট ১৯১৭ অব্দে এই মহাদীপশিখা রামকৃষ্ণ লোকে মিশে যায়।

শ্রীঠাকুর তাঁকে শিবের আদর্শ নিতে বলেছিলেন, নরনারায়ণের দুঃখ আর্ত্তি আকণ্ঠ পান করে নীলকণ্ঠই তিনি হয়েছিলেন। গৃহের পর পর বিপদ, আশ্রমের কর্মগহনপথের অশান্তি, দেহের অস্বাচ্ছন্দ্য সমস্ত মিলে শ্রীঠাকুরের দেওয়া হেমলক্ পাত্র পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই পূর্ণতা নিয়েই ধীরে এসেছেন সরে এমনি ধীর নীরব আয়নপথেই গেছেন সব পথের পারে…

তিন

ভগবান ঈশামসি ক্রুশার্ত্ত হয়ে প্রভুর চরণে চেয়ে নিয়েছিলেন ক্ষমা, দুষ্কৃতকারীদের জন্য—আর এই যুগে শ্রীঠাকুর হাসিমুখে তুলে নিয়েছিলেন ভক্ত অভক্ত সবারই আর্ত্তি, পরম গোপনেই রয়ে গেছে সে কথা, - শুধু একবার মাত্র আমরা পাই তাঁর শ্রীমুখে - মা দেখিয়ে দিচ্ছেন, আত্মা দেহ হতে বেরিয়ে এসেছে দেখি পিঠময় ঘা হয়েছে—মা দেখিয়ে দিচ্ছেন, লোকে কামনা বাসনা নিয়ে ছোঁয়, তাদের পাপ তাপ নিতে হয় তাই এই ব্যাধি—কিন্তু দুরপনেয় এই ব্যাধির যন্ত্রণা সইতে গিয়ে রহস্যময় গোপনতায় দেখিয়েছেন কতই আর্ত্তি—সাধারণের মতই হয়েছেন অধীর—সেদিন হরিনাথ এসেছেন কাশীপুরের বেদনার দেউলে। জিজ্ঞাসা করেন শ্রীঠাকুরকে, কেমন আছেন এখন? লীলার-সায়র-বিহারী বিরসে দেন উত্তর,—বড জ্বালা, বড যন্ত্রণা, খেতে পারিনা। হরি মহারাজ উত্তর দেন,—যাই বলুন না মশায়, আপনি শান্তির সমুদ্র—আর গোপন করা হয় না - অন্তরাগে শ্রীমুখ হয়ে ওঠে উচ্ছল, বলেন,—ধরে ফেলেছে · বলা নয়, অমনি সমাধির সপ্তলোকে হয়ে যান উধাও। শিষ্য দেখেন স্বয়ং নারায়ণই শরীরী হয়ে আছেন বসে।

হরিনাথই পরবর্ত্তী প্রসঙ্গে স্বামী তুরীয়ানন্দজী নামে রামকৃষ্ণ ধর্মচক্রে হয়েছিলেন প্রসিদ্ধ। প্রাচীনপন্থী সাধুর জীবনে তাঁর ছিল আবাল্য অভ্যাস। পবিত্র ব্রাহ্মণ বংশের উপযুক্ত নিষ্ঠায় বাল্যেই নিয়েছিলেন দীক্ষা। তপস্যার দীপ্তশিখায় চির অমলিনই ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ। প্রথম জীবনেই দেখি গঙ্গাগর্ভে কুমীরের মুখে পড়ে আচার্য্য শঙ্করের মত নির্ভয় বিচারে রত—তীরস্থ

স্নানার্থীর সতর্ক বাণীতেও হন না অবহিত। বেদান্তের ব্রহ্মসত্য, জগন্মিথ্য'—এই অভীমন্ত্রে সাক্ষাৎ মৃত্যুও সেদিন তাঁকে পারে নাই স্পর্শ করতে।

শ্রীঠাকুর বলতেন—গুরুমুখে শাস্ত্র কথা শুনতে হয়—তখন হরিমহারাজ বেদান্ত চর্চায় খুবই অভ্যস্ত। একদিন শ্রীঠাকুরের কাছে গেছেন। শ্রীঠাকুর বলেন.—কি হে তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্ত চর্চা করছ—তা বেশ বেশ—তবে বেদান্ত বিচার ত এই, ব্রহ্মসত্য,—জগন্মিথ্যা · না আর কিছু···স্বামিপাদ বলেন, সেই দিনই শ্রীমুখের কথায় তাঁর গ্রন্থের গ্রন্থি চিরতরেই যায় খুলে আর অনুভূতির তৃষ্ণায় মন হয়ে ওঠে আকুল। এমনি একদিনের কথা - বলরাম মন্দিরে ভক্ত-ভগবানের মিলন মেলায়, কথামৃতের গঙ্গা যমুনা যাচ্ছে বয়ে। হরিনাথ মহারাজ দ্বিধামথিত মন নিয়ে এসে উপস্থিত। শ্রীঠাকুর দিব্যকণ্ঠে ধরেছেন গান—

ওরে কুশি-লব কি করিস্ গৌরব
ধরা না দিলে কি পারিস ধরিতে।

গানের সঙ্গে নামে প্রেমের অলকানন্দা—আর মহারাজের নয়নেও সেই ব্যথার বাদল—দুঁহুঁ মুখ হেরি দুঁহুঁ আজি কান্দে—

স্বামিপাদের মনের সব দ্বন্দ্ব, বাদল ধোওয়া দিনের মত হয়ে ওঠে স্বচ্ছ, মধুর।

আরো একদিনের কথা কথা হচ্ছে বেদান্ত নিয়ে। পণ্ডিত বেদান্তের ব্যাখ্যা করে চলেছেন—উপযুক্ত শ্রোতা পেয়ে ব্যাখ্যা উঠেছে বেশ জমে—এমন সময় শ্রীঠাকুর বলেন—আমার কিন্তু অতশত ভাল লাগে না বাবু—আমার মা আছে আর আমি আছি—বেদান্তী হরিনাথের কাছে সেদিন বেদান্তের পারের তত্ত্বই হয়ে উঠেছিল মূর্ত্ত—মাতৃতত্ত্ব বেদান্তের পারের কথাই যে।

শ্রীঠাকুরের অদর্শনের পরও তুরীয়ানন্দজী একাধিকবার পরম অনুভূতিতে তাঁর কৃপালাভে বঞ্চিত হননি। উত্তর ভারতের বিবিক্ত সেবী সাধুর মত নগ্নপায়ে ঘুরেছেন স্বামিপাদ। উজ্জয়িনীর এক বৃক্ষতলে সেদিন ছিলেন সুপ্তিনিষণ্ণ—সহসা কে যেন দেয় জাগিয়ে—জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সেই বৃক্ষের একটি ডাল পড়ে ভেঙ্গে। শ্রীঠাকুরই তাঁর সন্তানকে এই আশু বিপত্তি থেকে দেন নিষ্কৃতি।

যুক্তরাষ্ট্রের বিদায় আসন্ন রাত্রে সহসা মা ভবতারিণীর দর্শনে হয়েছিলেন ধন্য - মা-ই জানিয়েছিলেন চলে আসার নিষেধ···তবে সেবার বিবেকস্বামিজীর দর্শনোৎকণ্ঠায় জগজ্জননীর সে নিষেধ নেননি মেনে; বোধ হয় বিবেকস্বামিজীর মহাপ্রয়াণের পূর্ব্বাভাসই তাঁকে করে তুলেছিল অধীর। আর একবারের কথা

—ঘটনাটি শ্রীধাম পুরীতে ঘটে, অরুণস্তম্ভের সোপানে ; সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন—সহসা দেখেন মন্দির আলো করে আসছেন শ্রীঠাকুর—প্রাণের পরম প্রণতি জানাতে গিয়ে ভুল হয়ে যায় সব—মাথা তুলে দেখেন ঠাকুর গেছেন সরে - সম্বিত আসে ফিরে। কিন্তু অতি অসময়ের সে সম্বিত। অদ্বৈত বিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হয়েও শেষমুহূর্ত্তে দেখি অক্ষম দুটী হাত তুলে ধরেছেন সমাপ্তির প্রণাম মন্ত্রে,—জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ—সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ... অনির্ব্বাণ শিখা যায় মিলিয়ে সন্ধ্যার শেষ তোমিরে···

শ্যামপুকুরে প্রথম সেবারামে লাটু মহারাজ দিয়েছেন যোগ · পরম নিষ্ঠায়। প্রথম দর্শনের দিন থেকেই শ্রীঠাকুরের সাথে যে সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল সে সম্বন্ধ সেবার সম্বন্ধ—ভক্ত রামদত্তের সেবাসম্ভার শ্রীযুক্ত লাটুই আনতেন বয়ে। শুধু সেবা যে এক পরম তপস্যা লাটু মহারাজই তার প্রমাণ। শ্যামপুকুরে প্রভুর সেবার মাঝেও গভীর ভাবস্থ হয়েছেন। সে ভাব ভাঙ্গাতে আবার শ্রীঠাকুরকেই আসতে হত। সেবারে স্থান-মাহাত্ম্যের কথা শোনেন ঠাকুরের মুখে—শুনেই জাগে তীর্থ তৃষ্ণা—শ্রীগুরুর চরণ যে সর্বতীর্থসার একথা সেদিনও লাটুমহারাজ পারেননি বুঝতে—শ্রীঠাকুর দূরে দূরেই রাখেন শিষ্যকে এই ভুল বোঝায়—শেষে শ্রীমার শরণে উদ্ধারপান সে যাত্রা—ভগবান শ্রীগুরুরূপে এই শিক্ষাই দিয়েছেন দ্বাপরলীলায়—

আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্বদেবময়ো গুরুঃ।—ভাগবৎ ১১।১৭।২৭

উচ্চ ধ্যান-ধারণাই ছিল মহারাজের প্রাণ, জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত আর এই ধ্যান চিন্তার ফলে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা শাস্ত্র মুখে সহজেই পারতেন ধরতে। তাঁর উচ্চ ধ্যান সমাহিত অবস্থায় অনেক সময়ই শ্রীঠাকুরকে বলতে হয়েছে,—লেটো চড়েই আছে. ক্রমে লীন হবার যো—এই অদ্ভুত জীবন-বেদ তাঁর অদ্ভুতানন্দ নামেরই পরিচয়।

কাশীপুরের সেবাসত্রে সেবক লাটুর প্রয়োজন ছিল সবচেয়ে বেশী। শ্রীঠাকুরকে একদিন বলেছিলেন,—হামনে তো আপনার মেস্তর আছে। ভক্তবীর গিরীশ এসেছেন, শ্রীঠাকুরের আদেশ হল,—তামাক সেজে খাওয়া, ফাগুর দোকানের কচুরী নিয়ে আয়।

আর একদিনের কথায় লাটু মহারাজের দিব্য আর সূক্ষ্ম বোধের কথা আমরা পাই। কাশীপুর থেকে স্বামিজীরা গেছেন বুদ্ধগয়ায়। মনে হবে কি নিষ্ঠুরই না ছিলেন তাঁরা; ঠাকুরকে এমনি অবস্থায় ফেলে সব চলে গেছেন! লাটু মহারাজ কিন্তু বলেন,—তোমরা বুঝবে তাঁর ভারি কষ্ট হোত—তোমরা দেহকে বোঝ, বাকী তিনি তো বুঝতেন না। তা না হলে যাঁরা তাঁকে এত ভালবাসতে তাঁরা কি তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারতো?

দুর ছাপরার ছেলে দীন সেবক হিসাবে এসে হয়ে দাঁড়ালেন ব্রহ্মবিৎ—শ্রীঠাকুরের একজন দিকপাল। প্রথম জীবনে রামদত্তের বাড়ী নেন চাকরী। পরে শ্রীঠাকুরের কাছে কিছু কিছু ভোগের রসদ আনতে আনতে তিনি শ্রীঠাকুরের কাছেই রয়ে গেলেন। শ্যামপুকুরে একদিন তাঁর গভীর ভাবাবেশ হয়। ভাবে গায়ের জামা ছিঁড়তে থাকেন। ঠাকুর তাড়াতাড়ি দেন জামাটি খুলে আর—বুকভ'রে শ্রীহস্ত স্পর্শে দেন জুড়িয়ে। চরিতামৃতে আমরা পাই ভক্ত পুণ্ডরীকের কথা—শ্রীভাগবত সঙ্গীত গদাধর মুকুন্দের মুখে শুনে সমস্ত সজ্জা ছিঁড়ে ধুলায় দিয়েছিলেন গড়াগড়ি।

আর একদিনের কথা—হিসেব জমা নিয়ে গৃহী ভক্তদের মধ্যে একটা কথা ওঠে। শ্রীনরেনের মনে তখন কৌপীনবন্তের বৈরাগ্য, কাজেই একটু মেঘ ঘনিয়ে আছে দুই তীরেই। মীমাংসা ক'রে দিলেন লাটু মহারাজই, বলেন—হিসাব রাখা ভাল। বলেন,—হাঁমার কথা রাখাল ভাই মেনে নিলো।

শ্যামপুকুরেও লাটু ছিলেন ঠাকুরের সঙ্গী। বলেন,—সেখানে হামাদের খাওয়া পরার কোন কষ্ট হোত না। ভক্তরা চাংড়া চাংড়া খাবার আনতো সঙ্গে ক'রে। লাটু সে সবের বেশী ভাগই গরীবদের বিলিয়ে দিতেন। গরীবের ছেলের এই উদারতা দেখবার মত। তাঁর মন্ত্র ছিল,—আস্‌লি উপাসনা সেবায়।

দক্ষিণেশ্বরে তাঁর একদিন নির্বিকল্প সমাধি হয়েছিল। সেদিন ঠাকুর লাটুকে মাথায় হাত বুলাতে বললেন। কিছু পরেই তাঁর গভীর সমাধি। গাত্র স্পর্শেও কোন সাড়া পাওয়া যায় না। শ্রীঠাকুর বলেন,—ওকে আর বিরক্ত করিসনি, ওর মন কি এ জগতে আছে?

ঠাকুর একদিন শশীভাইকে বড় আদর করলেন, বললেন,—দ্যাখ্! তোরা এই সেবা দিয়ে আমায় বেঁধে রেখেছিস, তোরা যদি বলিস্ তাহলে একবার সেখানকে দেখে আসি। একথা শ্রীশ্রীমার কানে গেল। তিনি যোগীন-ভাইকে দিয়ে

হামাদের বলে পাঠালেন,—আজ বাহিরের কাউকে যেন ঠাকুরের সঙ্গে দেখা করতে না দেওয়া হয়। এটি ঠাকুরের জীবনের একটি বিশেষ ঘটনা, এটি আমরা লাটু মহারাজের কাছেই পাই।

বিভিন্ন ব্যক্তি নানা ভাবে কালীতপস্বীকে নানাকথা বলায় লাটু মহারাজ বলেন—যাকে যেমন তিনি বুঝিয়েছেন, সে তেমনি ত বলবে। কালীভাইকে তিনি যেমন বুঝিয়েছেন, কালীভাই তেমনি বলেছে। সে কি দোষ করেছে যে আপনারা তাকে হামবডিয়া বলছেন।

জ্ঞানসিদ্ধ ঠাকুরের কাছে থেকে লাটু মহারাজের বুদ্ধি যে কত কুশাগ্র হয়েছিল তার পরিচয় আমরা পাই তাঁর একটি কথায়—জনৈক ভক্ত যখন বলেছেন—ঈশ্বর ন্যায়াধীশ। তখন শ্রীযুক্ত লাটু মহারাজ উত্তর দিয়েছেন—বাকী তিনি রাশিয়ার স্বেচ্ছাচারী 'জার'কেও চালাচ্ছেন।

মাঝে মাঝে তাঁর সারসিক বাংলা শেখার পরিচয় আমাদের মুগ্ধ করে যেমন —মাসতুতো ভাই এর বিহারী রূপান্তর। এই নিরক্ষর বিহারী বালকটির রহস্যময় জীবন বুঝতে গেলে মনে রাখতে হবে শ্রীধর স্বামীর সার্থক বাণী—মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লংঘয়তে গিরীম্ যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্।

শ্যামপুকুরে বেদন-মন্দিরে গোলাপমাও ছিলেন একজন পূজারিণী—সেবা সহায়ে তিনি ছিলেন মার সঙ্গী। এই গোলাপমা আর যোগীনমা ছিলেন রামকৃষ্ণ লীলার মেরী আর মার্থা। এঁদের বাগবাজারের গৃহে শ্রীঠাকুর কত আনন্দ করে এসেছেন। এই গোলাপমা দক্ষিণেশ্বরে শ্রীঠাকুরের সম্মুখে ধরে দিয়েছেন ভোগের থালা আর বিমুগ্ধ বিস্ময়ে দেখেছেন কুলকুণ্ডলিনীকে নিবেদন। শ্রীঠাকুর এই গোলাপমার জন্য মাকে বলেছেন,—এই মেয়েটির যত্ন করো, এ বরাবর তোমার সঙ্গে থাকবে—ঘটেছিলও তাই, গোলাপমা যেন শ্রীমার জীবনে নায়িকা শক্তি— ভক্তদের অযথা ভক্তিতে ইনিই আনতেন বাধা...

বেলুড়ে সেদিন পঞ্চতপার আগুন উঠেছে জ্বলে—অঙ্গদেবী যোগীনমা বলেন, —এস মা ঢুকে পড়ি—এই বলে অভয়াকে দেন সাহস। এই যোগীনমাকে ঠাকুর বলতেন,—সহস্রদল পদ্ম—শেষের দিন সহস্রদল বিকশিত হবে। তপস্যা সমাহিত জীবন সত্যিই সহস্রদলে পড়েছিল ঝরে শ্রীঠাকুরের চরণমূলে ..

চুয়ান্ন

কাশীপুরের সেবাসত্রে গোপাল দাদা ছিলেন এক যুক্ত যোগী। শ্রীঠাকুরের বেদনা-মুদিত দেহে সৌকর্যের ভার নিয়েছিলেন বুড়ো গোপাল অদ্বৈতানন্দজী নিজে।

সে একদিনের কথা, গোপালজী শ্রীঠাকুরের সেবায় নিবিষ্ট - সহসা সে দেব-বিগ্রহে লাগে আঘাত। তাঁর কাতরতায় গোপাল মহারাজের কোমল প্রাণে লাগে ব্যথা। নিজেকে এই কাজে অক্ষমই মনে করে হাত নেন গুটিয়ে। শ্রীঠাকুরও তাঁর অন্তরের আকুতি বুঝতে পারেন—বলেন,—আমি—মন গুটিয়ে নিচ্ছি,—রোগ জর্জ্জর দেহ নিয়ে সাতদেউড়িতে দৌড়ান সেই সপ্তলোকের দেবতাতেই সম্ভব।

আর একদিনের কথা ভক্ত ভগবানের দ্বন্দ্বতে পড়েছেন নেমে অদ্বৈতানন্দজী। শ্রীযুত লাটু সেদিন শ্রীঠাকুরকে ধরেছেন তাঁর স্বরূপ বুঝিয়ে দিতে। আর শ্রীঠাকুর মধ্যস্থ মানেন মুরুব্বি বুড়ো গোপালকে। বলেন,—এখানকার কথা কি বলা যায়? গোপালজী কিন্তু লাটুর পক্ষ নেন। তবে ঠাকুরের কথাই ছিল,—ওরে কুশী-লব কি করিস্ গৌরব, ধরা না দিলে কি পারিস ধারতে? এই অধরা ঠাকুরকে ধরা যে কি কঠিন তার নিরিখ পাই পরের ঘটনায়···শ্রীঠাকুর বলেন,—কিগো, তোমার কি ইচ্ছা তীর্থ যাওয়া? উত্তরে গোপালজী বলেন,—আজ্ঞে হ্যাঁ, একটু ঘুরে ঘেরে আস- যুগে যুগে ঘোরার ফেরেই তিনি ভক্তদের দেন ফেলে—ধরা দিতে হয়েই যান অধরা···এই বুড়ো মহারাজের হাত দিয়েই শ্রীঠাকুর তাঁর এগারজন ত্যাগী ভক্তদের কাষায় বস্ত্র দেন—শ্রীমার কথায় সাধুর বগ্ লস্।

প্রথম জীবনে শ্রীঠাকুরের জন্য নতজানু হয়ে সজল চোখে শুধু কৃপা করেছেন প্রার্থনা—সে প্রার্থনার ফল শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিল বজায়। কি সরল অনাড়ম্বরই না ছিল তাঁর জীবন। ব্রহ্মচারীদের সুবিধার জন্য মঠের বাগানের তরি-তরকারী ফলানর কাজে শেষ দিন পর্য্যন্ত ছিলেন তৎপর। আবার শ্রীমাকেও পাঠাতে হতনা ভুল। অবশ্য জপ, ধ্যান, তীর্থ ভ্রমণ এসবও ছিল। বিবেকস্বামিপাদ নির্বিকল্পসমাধি লাভের দিন ছিলেন তাঁরই পাশে—আর স্বামিজীর তাঁকে লক্ষ্য করেই প্রথম আত্মপ্রকাশ,—গোপালদা, গোপালদা আমার শরীর কই? অশীতিপর হয়েও শরীর স্বাস্থ্য ছিল শেষ পর্য্যন্ত অটুট। শেষের দিকে পেটের

অসুস্থতায় যখন দেখেন মহাপ্রস্থানের আর দেরী নাই, যুক্ত করে শ্রীমাকে জানান মিনতি—চির বিদায়ের মিনতি। শ্রীঠাকুর তাঁর পুরাতন সেবককে দেন দেখা গদাধর বেশে—মৃত্যুর দুয়ারে অমৃতময় রূপে—ভক্তার্ত্তিহারীরূপে·· এই কি তাঁর অভীষ্ট দেবতার রূপ—কে জানে! আমরা শুধু দেখি মৃত্যুর মুখে ফুটে উঠেছে বিদায়ী পূর্বাশার হাসি ··রামকৃষ্ণ লোকযাত্রীর শেষ সম্বল ··

কাশীপুরের লীলাপীঠে হাসিকান্নার সঙ্গে যাঁরা জড়িয়ে আছেন তাঁদের মধ্যে গৃহীভক্ত বলরামবাবুর একটি প্রয়োজনীয় স্থান ছিল। শ্রীঠাকুরের পথ্যের সমস্ত ব্যয়ভার বসুজামহাশয় নিজেই নিয়েছিলেন হাসিমুখে—শ্রীঠাকুর চাঁদায় খাওয়া পছন্দ করতেন না তাই। ভগবানকে চাঁদায় খাওয়ান কার অদৃষ্টলিপি কে জানে।

বলরামবাবুর গৃহকে শ্রীঠাকুর বলতেন,·মা কালীর দ্বিতীয় কেল্লা। এই বলরামকেই ঠাকুর দেখেছিলেন বটতলা থেকে বকুলতলা পর্য্যন্ত সংকীর্ত্তনের পথে —বলতেন,—বলরামকে দেখলাম গৌরাঙ্গের দলে, না হলে মিছরী এই সব যোগাবে কে? তাইত তিনি শ্রীঠাকুরের অবর্ত্তমানেও তাঁর ত্যাগী ছেলেদের রসদ যুগিয়েছেন নিত্য অকুণ্ঠে।

এই বলরাম গোষ্ঠিকে শ্রীঠাকুর এত আপন বোধ করতেন—সেবার বলরাম গৃহিণী অসুস্থ—ঠাকুর শ্রীমাকেই পাঠান কুশল প্রশ্ন নিয়ে দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজারে—যাত্রার মুখে কোন গাড়ী যায় না পাওয়া। মায়ের যাওয়া যেন হয় না,—শ্রীঠাকুর বলেন,—আমার বলরামের ঘর ভেসে যাচ্ছে, আর তুমি গাড়ি অভাবে যাবে না—সেবার অবশ্য পাল্কী করেই মার যাওয়া হয়েছিল। এই ভাগ্যবানের বৈঠকখানায় শ্রীঠাকুর রথাগ্রে কত নৃত্য করেছেন—এই গৃহে শ্রীঠাকুরের কতবার শুভাগমন হয়েছে—আর কত না নৃত্য-কীর্ত্তনে মুখর হয়ে উঠেছে এই ভক্তগৃহ। আজ এই ভক্ত গৃহের অর্দ্ধাংশ, বলরাম মন্দির—ভক্তজনের এক পরম আনন্দের, পরম কল্যাণের তীর্থ!

বাগবাজার অঞ্চলের এই মন্দিরে—সেদিন পূজার লগ্ন যায় বয়ে, মন্দির আর খোলে না—সন্দেহ জাগে সবার মনে, চোখে চোখে নানা ইঙ্গিত—শেষে আর অপেক্ষা না করে দরজা ফাঁক করে দেখা যায় গৌরী মা সংজ্ঞাহীন হয়ে আছেন পড়ে—পূজার ঠাকুর শ্রীদামোদর শিলা ধূলায় নিষণ্ণ। প্রকাশে জানা যায়— দামোদরের সিংহাসনে দুটি জীবন্ত চরণ দিয়েছে দেখা—নিবেদনের তুলসীও

ছড়িয়ে পড়ে সেই চরণে - বুকের তলে কিসের যেন টান—অসহ মধুর সে টানে চেতনে থাকা যে দুরূহ···

বন্ধু পরিবারের সঙ্গে দক্ষিণেশ্বর এসে দেখেন সেই জীবন্ত চরণ – লুটিয়ে পড়েন শ্রীঠাকুরের চরণে—শ্রীঠাকুরও সেদিন সুতো গুটিয়ে রাখছিলেন টেকোয় ভরে। এই সুতোর টানেই গৌরীমা হয়েছিলেন আপনহারা। গৌরীমাকে দেখে আকুল আনন্দে শ্রীমার কাছে যান নিয়ে—বলেন,—ওগো ব্রহ্মময়ী, একজন সঙ্গিনী চেয়েছিলে—দেখ কে এসেছে। লীলারসোচ্ছল দক্ষিণেশ্বরে ভক্ত-ভগবানের মিলনে সেদিন হঠাৎ জাগা এক আনন্দের জোয়ারে দুকূলই যেন ভেঙ্গে পড়ে। উপলছন্দা গিরি-নির্ঝরিণী যেন এসে পড়ে সাগর সৈকতে—দীর্ঘ দিনের পথ পরিক্রমায় ···বৃন্দাবনের বাঁশরীতে থাকত মিলনের সুর—গৃহকোণে ভক্তের প্রাণ হত আকুল। এবার টেকো গুটিরে সুতোর টানে করেছেন উন্মত্ত—এই সুতোর টানে, আকুলতায় ছুটে এসেছিলেন মত্ত গিরিশ তাঁর পাঁচসিকে পাঁচআনা ভক্তির মন্দাকিনী নিয়ে· আর গৌরীমাও এই দূর রহস্যের টানেই চলে গেছেন রামকৃষ্ণ-লোকে, ধরা-ব্রজের মায়া ছেড়ে···রামকৃষ্ণ-লোকেও কি তাঁর হাতে এই টেকোর আবর্তন চলেছে··কে জানে !

আর একদিনের রসমেদুর দক্ষিণেশ্বর—গৌরীমা আছেন দাড়িয়ে। সেদিন বকুলগন্ধী খাটে আছড়ে পড়ছে ভৈরবীর মাঙ্গলিক ভক্ত-ভগবানকে ঘিরে. শ্রীঠাকুর ডেকে বলেন,—ওগো গৌরদাসী আমি জল ঢালি তুই কাদা চটকা—গৌরীমা বলেন,—এখানে কাদা কোথা যে চটকাবো ? দূর দিকচক্রবালে করুণার্দ্র দুটি আঁখি মেলে শ্রীঠাকুর বলেন,—আমি কি বললুম আর তুই কি বুঝলি ?—এদেশের মায়েদের জন্য তোকে কাজ করতে হবে। তাদের যে বড় দুঃখু। সহজে নত হওয়া গৌরীমা জানতেন না কোনদিনই। বলেন,—হৈ হৈ করা আমার ধাতে সয়না—আমায় কয়েকটি মেয়ে দাও, আমি তাদের হিমালয়ে নিয়ে মানুষ করে দিচ্ছি···রহস্য গহিন নয়নে ফেনিয়ে ওঠে দূরের স্বপ্ন – শ্রীঠাকুর বলেন, —না গো, এই টাউনে বসেই কাজ করতে হবে --তপস্যা যথেষ্ট হয়েছে···

আজ - গৌরীমার স্নেহসিঞ্চনে যে বিরাট পাস্থপাদপ মাতৃজাতির কল্যাণকল্পে বেড়ে উঠেছে · শ্রীসারদেশ্বরী আশ্রম ও শাখাগুলিতে—সে তো শ্রীশ্রীঠাকুরের রহস্যময় ইঙ্গিতেরই সামান্য প্রকাশমাত্র।

যোগ্যপাত্রেই শ্রীঠাকুর দিয়েছিলেন ভার।···আর একদিনের কথা, স্বামিপাদ

তখন আদরের নরেন্দ্রনাথ। শ্রীঠাকুর বলেন,—তোকে আমার কাজ করতে হবে – সেদিনও সপ্তর্ষি মণ্ডলের সমাধি-নিষণ্ণ নয়নে জেগেছিল এমনি দ্বন্দ্ব—এমনি সেদিন শ্রীঠাকুরকে বলতে হয়েছিল,—তোর হাড় করবে—আমি মনে করেছিলাম কালে বটবৃক্ষের মত ছায়া দিবি—তা-না তোর মুখে এই কথা…পার্থ আর পার্থ-সারথীর মাঝে যুগে যুগেই এই লীলা সংঘাত।

হোমা পাখীর গগন-ছোঁওয়া প্রাণ নিয়ে গৌরীমা অল্প বয়সেই একা একা ছুটে গেছেন তীর্থ হতে তীর্থান্তরে—জ্বলবার মন্ত্র নিয়ে বেড়িয়েছেন পথে পথে—কত দুর্দৈব গেছে কেটে মাথার ওপর দিয়ে কালবোশেখার ঝড়ের মত—কত দীর্ঘ দিন-রজনী গেছে বলে—অনশনে, অর্দ্ধাশনে—কত কৃপা পড়েছে ঝড়ে জীবনের মরু-বুকে, শত ফুলের স্নিগ্ধতা নিয়ে—তার কতখানিই বা আছে ধরা…

সেবারের কথা—কেদার বদরীর ঊষর তুষার রেখায় দিকহারা নক্ষত্রের মত চলেছেন গৌরীমা—নিঃসহায়, নিঃসম্বল। পথশ্রান্তিতে ভেঙ্গে পড়ে তনুমন—চোখে ঢলে পড়ে আঁধারের এভালান্স। সহসা দিশারীর মত এসে দাঁড়ায় এক পাহাড়ী মেয়ে—অনিন্দ্য তার রূপ, তরল জ্যোৎস্নার মত দুকূলে পড়ছে আছড়ে—মধুরে বলে,—এ লালী তু কিধার যাওগী?—স্নেহকণ্ঠে সব ব্যথা নেয় কুড়িয়ে, আর সহজেই পৌঁছে দেয় কেদারের পদতলে। নিমেষে মুছে যায় মোহের অঞ্জন—জননী বুঝতে পারেন—এ সেই উমা-মহেশ্বরী, এ তারই রহস্যঘন মঙ্গল-লীলা…না হলে এই গহিন দূরের পথে কে হবে আর্ত্ত-দিশারী?

আর একবার দ্বারকার রণছোড়জীর মন্দিরে ভোগারতি দর্শনান্তে আছেন দাঁড়িয়ে। দেখেন এক শোভনসুন্দর কিশোরকুমার, মন্দিরে ভোজনরত…ক্ষণিকের মোহ যায় সরে…দেখেন কুমার কিশোর সিংহাসনে… অশ্রুর অভিষেকে জানান অন্তরের অপূর্ণতার আর্ত্তি…

শেষের কথা—শিবচতুর্দ্দশীর রাত্রে শ্রীঠাকুরের শেষটানে শেষ সজ্জায় সেজেছেন গৌরীমা—শেষবারের মত টেনে নিয়েছেন অভীষ্টদেবকে—আকুল আবেগে—আর ধরার মঙ্গলদীপ, গৌরীকেদারের শেষ প্রদীপের মতই উঠেছে জ্বলে অনির্বাণ শিখায়।

পঞ্চান্ন

সন্ধ্যার আসরে—তারার মিতালী—একফালি দ্বিতীয়ার চাঁদ ক্ষণভঙ্গে যায় সরে, রেখে যায় শুধু গগনজোড়া শূন্যতার ব্যথা···দখিণাপুরে গদাধর চন্দ্রও অস্তমিত, বেদনার পাণ্ডু-রেখা যায় মুছে শ্রাবণের কাঁদনীতে—জলভরা সে চোখে সান্ত্বনার কোন বার্ণাই পায় না ঠাঁই। যুগে যুগে অমৃতের পশরা নিয়ে যাঁর আসা তাঁর বিদায় অচলে মিলিয়ে যাওয়া—ভক্তের কাছে চিরদিনই অসহ—চিরদিনই তীব্র···

শ্রীমা হয়ে পড়েন তড়িতাহতা—মৃত্যু কামনায় অধীব,—স্বামিপাদেরাও জীবন্মৃত—দিশাহারা—ভক্তেরা মুহ্যমান সেদিনের এক বিষাদ সন্ধ্যায়—নরেন্দ্রনাথের বুক নিঙরেই জেগে উঠেছে...

হরি গেও মধুপুরী হাম কুলবালা
বিপথে পড়ল সখি মালতীক মালা।

বেদনার ঝাড়ে রন্ধ্রে রন্ধ্রে জেগে ওঠে কানুহারা ব্রজপুরীর আর্ত্তি—নয়ন কোণে অশ্রুর শিশির পড়ে গলে—গেয়ে চলেন স্বামিপাদ—

নয়নক নিদ গেও বয়ানক হাস
সুখ গেও পিয়া সাথ—দুখ মঝু পাশ—

অসহ দুঃখই নেমে এসেছিল সেদিন ধরণীর বুকে। অসীম থেকে এদের আসা তারাঝরা পথে...আবার অসীমেই যায় হারিয়ে—মৃত্যুর যবনিকা—তার দুইতীরেই এই গহীন রহস্য...

...তারা ছড়ান অসীম আকাশের কি যেন এক রহস্য আছে। এই নীলাঞ্জনে চোখ রেখে ধরার সব ব্যথাই যায় জুড়িয়ে। এ যেন সব পেয়েছির দেশ। সব কল্যাণই যেন সেখানে রয়েছে—বাইবেল সে পরম পাওয়ার কথায় বলে—নয়ন হেরে নাই, শ্রবণে না শুনি, অন্তরে তার নাহি অনুরণি—ভগবান রেখেছেন ধরে তাদেরই তরে যারা তাঁরে ভালবাসে—ঈশামসি যখন নেমে এলেন বেথলেহেমে, সেই পরম আবির্ভাব লগ্ন কয়েকজন প্রাচ্যের পণ্ডিতদের চোখেই দিয়েছিল ধরা—এক দিকদর্শী তারা রূপে। আর যখন শ্রীঠাকুর স্বামিপাদকে নামিয়ে আনেন বিলোমভূমিতে তখনও হয়েছিল এই জ্যোতির অবতরণ...তারা পশিল যে ধরা

পর—গ্রীসের ঋষি প্লেটোর ধ্যান নেত্রে ফুটে উঠেছিল রহস্যময় এক দ্যুলোক—এই তারায় তারায় আপনহারা জীবন, সত্য শিব-সুন্দরের ধ্যানে চিরনিরত—সে জীবনইত আমরা হারিয়েছি—চিরদিনের তরে! আবার দেখি আধুনিক মনস্তত্ত্বে প্রথম সৃষ্টির উষায় যে ধূলা (ডাষ্ট ক্লাউড্), অনন্ত আকাশে ছিল তারার স্বপ্ন বুকে এঁকে, তাদের মধ্যেই ছিল মাইণ্ড-ডাষ্ট্, ধূলারূপে চেতনায় প্রথম প্রকাশ—পিথাগোরাসের আকাশের ছন্দ—তারার নৃত্যপথেই হয়েছিল প্রকাশ—উপনিষদের ঋষিরা এই অনন্তের মাঝেই পেয়েছেন সৃষ্টির বিলাস—

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন
যস্মিন দেবা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ।
—শ্বেতা ৪।৮

যুগে যুগে শ্রীঠাকুর আসেন, যুগে যুগেই তাঁর চরণ চিহ্ন বুকে ধরে ধূলার ধরণী সোনা হয়ে যায়, বারে বারেই তিনি আসেন বেদনার ক্রুশ বুকে নিতে—বুকভাঙ্গা দুঃখে ধরণীর সঙ্গে এক হতে… কিন্তু কেন এ আসা—মনে হয় অকারণেই এ ভালবাসা, শুধু খেলার ছলেই এ আসা। বাধার এত বোঝা আমাদের কোনদিনই হবে না, যাতে শ্রীভগবানের আসন যাবে টলে…এমন গ্লানি ধর্মরাজ্যে হতে পারে না যাতে শ্রীঠাকুরকে তার পরমস্থান থেকে করবে বিচ্যুত। আর বর্ত্তমান বিজ্ঞানের কার্য্যকারণবাদ অতি স্থূল আর অতি সূক্ষ্ম এই দুই রাজ্য থেকেই যাচ্ছে উঠে। সে বিশ্বাতীত রাজ্যে আমাদের কার্য্য-কারণ-বাদের প্রবেশই নিষেধ। মহামতি কান্টেরও এই মত—নুমেনার রাজ্যের খবর ফেনোমেনার রাজ্য থেকে যায় না পাওয়া।

তবে তাতে সবই সম্ভবে,—নিজমুখে একথা দক্ষিণেশ্বর লীলাতেই গেছেন বলে। বলেছেন,—তাঁর ইতি করিস না। তাই সাধুদের পরিত্রাণ করতে আর দুষ্কৃতকারাদের বিনাশ করতে তাঁর আসা সম্ভব—গীতামুখে এই আশ্বাস তিনি গেছেন দিয়ে। আর এযুগে বলে গেলেন,—অবতার আসেন তারণ করতে, জীবকে প্রেম, ভক্তি শিক্ষা দিতে…

এই সীমাহীন, এই নিত্য বর্দ্ধমান বিরাট বিশ্বের তুলনায়, আমাদের বুদ্ধি যে কত নগণ্য তার ধারণা হয় না। তাই কারণ যদি থাকে—তা অতি সামান্য হলেও তার জন্য করুণার্দ্র হয়ে তাঁর আসা এ আমরা আশা করতে পারি। তিনি যে আপনার মা-গো,—নিজেই সে কথা গেলেন বলে।

এবারের অবতার—বিশ্বের অবতার। সমস্ত বিশ্ব বৃংহন মুখে চলেছে—একস্প্যানডিং ইউনিভার্স। ব্রহ্মের অর্থইত বৃংহন। অবতার তত্ত্বও তাই বেড়ে চলেছে। পূর্বে যিনি রামরূপে এসেছেন, কৃষ্ণরূপে এসেছেন, তিনিই এবার বিশ্বের ঠাকুর হয়ে দাঁড়িয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড, ফরাসী, জার্মাণী প্রভৃতি দেশে শ্রীঠাকুর পড়েছেন ছড়িয়ে সে দেশের ঠাকুর হয়ে—ভারতের ত কথাই নাই। যাই হোক - বিশ্বের কণ্ঠে তখন তাঁর অবতরণের জন্য কি করুণ ডাক উঠেছিল জেগে, সে কথা বিশ্বের ইতিহাসেই রয়েছে ধরা—

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে দেখি ফরাসীদেশে বিপ্লবের সূচনা। দেশের জনসাধারণ নিরন্ন। অত্যাচারের শেষ পর্য্যায়ে আর্ত্তনারায়ণ উঠেছেন জেগে—যার ফলে বাস্তিল-দুর্গ ধ্বংস—রাজা ও রাণীকে গিলোটিনে দিতে হয় আত্মাহুতি। সন্ত্রাসবাদের পর্য্যায় হয় সুরু, আর সে বহ্নিমুখে নিজেরাও হয়ে পড়ে সমিধ। এই ফরাসী বিপ্লব দেশে দেশে ছড়িয়ে দেয় বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ।

ফ্রান্সের সঙ্গে ইংলণ্ডের যুদ্ধ প্রায় এই সময়েই হয়, আর এর সঙ্গে জড়িয়ে ছিল প্রাসিয়া, স্পেন, রাশিয়া—সার্ডিনিয়া আর অষ্ট্রিয়া।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্র ইংলণ্ডের অধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করতে দৃঢ় সংকল্প করে। আর দাসত্ব প্রথার বিরুদ্ধে গৃহবিবাদ প্রায় এই সময়ই হয় সুরু। আবার দেখি আঠারশত আটচল্লিশে অষ্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সব সম্বন্ধ ছিন্ন করতে ইতালীর সংগ্রাম—প্রায় ঐ সময় অষ্ট্রিয়া প্রাসিয়ার যুদ্ধ সুরু হয়ে যায়। আর প্রায় ঐ সময়েই চীন-জাপানের সংঘর্ষ ওঠে জেগে। সামাজিক দৃষ্টি কোণ থেকে দেখি ঊনবিংশ শতকের চিন্তা রাজ্যে ঘনিয়ে এসেছে জটিল মেঘভার। চিন্তা রাজ্যের পরিধি এই সময় গেছে বেড়ে। মার্কিন ও রুশীয় চিন্তাধারা এসে মিলেছে ইয়োরোপের ভাবস্রোতে। প্রাচ্যের চিন্তাধারাও তার পুরাতন কাহিনী নূতন বেগ প্রবাহে এসে ইউরোপকে আরও বেশী রকম দরদী করে তুলেছিল প্রাচ্যের চিন্তাধারার প্রতি। এই যুগ ইংলণ্ডের রেনেসাঁসের যুগ। যন্ত্র-শিল্পের বিশেষ অগ্রগতিতে এই যুগে উৎপাদন ক্ষমতা গিয়েছিল অত্যধিক বেড়ে আর তার ফলে মানুষের সামাজিক পরিস্থিতি গিয়েছিল বদলে। ভোগাসক্তির বৃদ্ধি এরই ফল। আরও মানুষের মনে তার পারিপার্শিকের প্রতি বিশেষ শক্তি সচেতনতা দিয়েছিল এনে। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা এর সঙ্গে পাতায় মিতালী যার ফলে মানুষের মনে জাগে অহংএর বিরাট ঔদ্ধত্য। ভগবৎ বিশ্বাস, পরলোক এসব থেকে মুক্তির

দিশায় সে যেন উঠেছিল পাগল হয়ে। আঠারশতক একদিকে এনে দিয়েছিল লক, হিউমের নাস্তিক মতবাদ, অন্যদিকে কাণ্ট প্রভৃতির সংশয় বাদ ; আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল চিন্তাশীল মন। কাণ্ট, হেগেলের র‍্যাসনালিজ্‌মের সুরে যে বিদ্রোহ ছিল, যে সংশয় ও বিচার ছিল, তারই একদিকের গতিভঙ্গী রূপ পেল মার্ক্সবাদ আর রাশিয়ার বলসেভিক সাম্যবাদে। চার্চের পুরোহিত সম্প্রদায় এতদিন ঈশার নামে যে কলঙ্ক লেপন করছিল রাজশক্তির সহযোগিতায়, আজ জনশক্তির অভ্যুদয়ে রক্তের স্রোতে সে কলঙ্ক মুছে যেতে বসল। ফলে ধর্মকেও দেশান্তরী হতে হল সোভিয়েট রাশিয়া থেকে। আবার আঠারশতকের শেষে রোমান্টিসিজ্‌মের উদ্ভব। যার ফলে দর্শনে, শিল্পে, রাষ্ট্রে ভাবের বিলাস বিভ্রম হয়েছিল সৃষ্টি। কবি বায়রন, সোপেনহায়ার, মুসোলিনী, হিটলার, এই সব বিপ্লবীদের আবির্ভাব এই যুগেই।

ছাপান্ন

ভারতের ভাগ্যলিপিও তখন ভারাক্রান্ত। বহুধা বিভক্ত পরাধীনতায় শৃঙ্খলিত হতে গিয়ে ভারত-লক্ষ্মী তখন বিত্রস্ত, বিপর্যস্ত। ভাগ্যলক্ষ্মী কোন পক্ষ অবলম্বন করবেন তার স্থিরতা হচ্ছেনা। খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাজ্য একদিকে, আর অন্যদিকে বৃটিশ সিংহের দৃপ্ত চেষ্টা—ভারতকে পরাধীনতার শৃঙ্খলে নিষ্পেষিত করতে। মারাঠাদের স্বাধীনতা সূর্য্য তখন দীর্ঘতর ছায়া রচনা করেছে। পাঞ্জাব কেশরীর দুর্দ্ধর্ষ খালসা সৈন্যদের আত্মরক্ষায় জীবন মরণ পণে তখন চলেছে একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহ। এর পরই আসে সিপাহী বিদ্রোহ, রক্তের অক্ষরে লিখে যায় বিভীষিকার লিপি। এই ছিল ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক আকাশের ঘনঘটা।

অন্যদিকে সামাজিক জীবনে সুরু হয়েছে নব বিপর্য্যয়। এর মধ্যে ইংরাজী শিক্ষা নিয়ে এলো এক নব বৈদেশিক উন্মাদনা। দেশব্যাপী উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোত যায় বয়ে। মিশনারীরা এর সঙ্গে করে অকুণ্ঠ মিতালি। ফলে দেশে সনাতন ধর্মপদ্ধতিতে ধরে ভাঙ্গন। একদিকে ডিরোজিও প্রভৃতি পাশ্চাত্যের স্বাধীন চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে রামমোহন, শশধর তর্কচুড়ামণি, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সনাতন পন্থীদের ভাবধারা—উপলবিক্ষুব্ধ গঙ্গা-প্রবাহের মত চঞ্চলতা করেছিল সৃষ্টি ভারতের চিন্তায়।

এদিকে ইনডাসট্রিয়াল রেভোলিউশন-এর ঢেউ এসে লেগেছে ভারতের প্রাণতটে—প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পরে। কল কারখানার উদ্ভব সুরু হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভোগবাদের হয়েছে পরিপুষ্টি। আর ভোগের বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভাগবৎ পন্থা থেকে মানুষের মন সরে যেতে সুরু করে।

ভাবধারার একটা ঘাত-প্রতিঘাত আছে। বৈদিক যুগে এদেশের দার্শনিক ও অন্যান্য ভাবধারা ওদেশের প্রাণতটে করেছে আঘাত। বাণিজ্য পথ বেয়ে সে তরঙ্গ আরব, আসিরিয়া, ও গ্রীকসভ্যতাকে করেছে অভিভূত। সক্রেটিস, প্লেটোর দার্শনিক চিন্তায় রয়ে গেছে তার ছাপ।

তখন ভারত সমুদ্রের ছিল দীপ্তি ছিল অমৃত। বর্ত্তমান যুগে ওদেশে রোম্যানটিসিজ্‌ম্ অথবা র‍্যাশন্যালিজ্‌ম, ইনডাসট্রিয়াল ইভোলিউশন্ এসেছে ভারতের তীর্থতীরে। প্রায় অর্দ্ধশতাব্দীতে জাগে সাড়া এই তরঙ্গাভিঘাতের। দার্শনিক চিন্তায় প্রধানতঃ দুটি স্রোতাবর্ত্ত ভাসিয়ে নিয়ে গেছে চিন্তাজগৎকে। একদিকে কান্ট, হেগেল সোপেনহাওয়ার, বার্গশ, আইনষ্টাইন, হোয়াইট্ হেড, আরবান ক্রোচে, ম্যাকগ্রেগার্ট, এদের আস্তিকাবাদ; অন্যদিকে মার্কস, এঙ্গেলস্, ক্রপট্‌কিন প্রভৃতির জড়বাদ। কিন্তু এই সব মতাবলম্বীদের মধ্যে ভাববাদীদের মধ্যেই শ্রেষ্ঠতর মণীষী বর্ত্তমান। ভাবরাজ্যের রাজা শ্রীঠাকুর—শ্রীশ্রীভবতারিণীর কাছে এই ভাববাদের নির্দ্দেশই পেয়েছিলেন একাধিকবার,—তুই ভাবমুখে থাক। তাইত এই স্রোতের হয়েছে পরিবর্ত্তন। তাই দেখি ধর্মরাজ্যে আবার ভারতকেন্দ্র থেকে এক প্রবল তরঙ্গ ছুটে চলেছে ইউরোপ, আমেরিকার অভিভূতিতে। এই প্রেরণার প্রাণপুরুষ ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ—হিন্দু, মুসলমান, ক্রিশ্চান সব মতের সব পথের দিশারী—প্রফেট। অন্যদিকে দেখি যে শ্রীঠাকুরের আগমনের পূর্বাশার প্রস্তুতি হিসাবে ধর্মরাজ্যে এসেছেন কয়েকজন মহারথী। বাংলায় সিদ্ধ ভগবান দাস, সিদ্ধ চৈতন্যদাস, রাজারামমোহন, চরণদাস, লোকনাথ ব্রহ্মচারী, উত্তর ভারতে ত্রৈলঙ্গস্বামী, ভাস্করানন্দ, বালানন্দ, ভোলানন্দ দয়ানন্দ, বিশুদ্ধানন্দ, প্রভৃতি ধর্মগোপ্তাদের আবির্ভাবে ধর্মের গতি একেবারে ব্যাহত হতে পারছিল না। এঁরা যেন প্রভাতী তারার মত নব-যুগের সূচনাই করছিলেন...

জাগ্রত ভগবান ..যার আসায় যুগে যুগেই ভারত বেদমাতা—ধর্মে-রাষ্ট্রে-শিল্পের সর্বদিকেই রবীন্দ্রনাথের ভারত, বিবেকানন্দের ভারত, অরবিন্দের ভারত, গান্ধীর ভারত, অমর ভারত – যুগে যুগেই দেব-মাতৃকা।

পরিশিষ্ট-ক

কথামৃতের কল্পলতা

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথামৃতে যে গল্পের কল্পলতা আছে ইংরাজীতে সে-গুলিকে প্যারাবল্ বলা হয়। জগতের ঐতিহ্যে এই প্যারাবল্‌গুলির বিশেষ স্থান আছে—ধর্মরাজ্যে বিশেষ করে! এই প্যারাবল্ বা নীতি কল্পলতাগুলির ধাতুগত অর্থ, একটিকে আর একটির পাশে রেখে তুলনা করা—আরিস্ততল বলেছেন, অন্যকে সমতে আনার জন্যই এদের উদ্ভব (রেট ২।২০)

বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে এই কল্পলতাগুলির ব্যবহার রয়েছে। আমরা সেগুলির আলোচনায় দেখি ভগবান ঈশামসি এই নীতি-গল্পগুলির প্রচুর ব্যবহার করেছেন আর পাশ্চাত্যদের মতে তিনি এবিষয়ে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। তবে ভগবান ঈশার নীতি-গল্পগুলির মধ্যে কিছু কিছু অব্যবস্থা দেখা যায়। জুলিচার (Julicher) বলেন,—নির্দোষ নীতি-গল্পগুলি হওয়া চাই সহজ, তাতে থাকবে একটি মাত্র শিক্ষার কথা, আর এগুলি হবে বাস্তববিষয়ক কথা। কিন্তু ঈশামশির নীতি-কাহিনী-গুলিতে অনেক সময় একাধিক তত্ত্ব কথার দ্যোতনা থাকত অথবা সেগুলির অর্থ একটু গভীরভাবে থাকত ঢাকা। যেমন,—প্যারাবল্ অফ দি কিংডাম এর গল্প বলতে গিয়ে বলেছেন,—সাধু ইসাইয়াস (Esaias) বলেছেন,—তোমরা শুনেও শুনতে পাবে না, দেখেও দেখতে পাবে না, তাই তিনি প্যারাবল অফ দি কিংডামকে দুরবগাহ করে তুলে ধরেছেন। আর অনেক সময় তিনি এর মধ্যে একাধিক দ্যোতনা রাখতেন গূঢ় করে।

গল্প বলা আর গল্প শোনা সব জাতির মধ্যেই অতি প্রাচীন প্রথা। যেমন আমরা ওমাহা ইণ্ডিয়ানদের দেখি গল্পের আসর এদের শীতের সন্ধ্যাকে করতো আনন্দ মন্থর। এই সময় গ্রাম্য-বৃদ্ধেরা তাদের স্মৃতি-সঞ্চয় থেকে ভূতপ্রেতাদির গল্প করত পরিবেশন। এই গল্পগুলি সাগা (Saga) ও মারচেন (Marchen) নামে খ্যাত। এই সাগা ও মারচেনগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি ছিল। কোন কোন স্থলে, কোন কোন ক্ষেত্রে উপদেশ সম্বলিতও হত। এই সব শিব-গল্পগাথা বর্তমানের অনেক লেখকদের অনার্য্যজুষ্ট লেখনীতে আর দেখতে পাওয়া যায় না। বর্তমানের লেখকদের সম্বন্ধে নিউইয়র্কের অধ্যাপক কোলম্যান (Coleman)

লিখেছেন, – বর্ত্তমানে অল্প শিক্ষাপ্রাপ্ত লেখকেরা এক বিপদের সৃষ্টি করেছেন। ভাল নভেল লেখায় যে অর্থ পাওয়া যায় তাতে দায়িত্বজ্ঞানহীন লেখকরা তাঁদের শক্তির অপব্যবহার করেন। আর তাঁরা ঐ পুরস্কার লাভ করেন সাধারণ পাঠকদের অমার্জিত অথবা হীন রুচির খোরাক জুগিয়েই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—রিয়ালিজমের দোহাই দিয়ে একরকম সস্তা কবিত্ব অত্যন্ত বেশি চলতি হয়েছে। আর্ট এত সস্তা নয়। যে সাহিত্য সমাজ-দেহে আর সমাজ-মনে পুষ্টি, বুদ্ধি, ধৃতি, শান্তি আর আনন্দ সৃষ্টি করতে পারে না সে সাহিত্য সমাজ-অঙ্গে দুষ্ট ব্রণই সৃষ্টি করে।

বৌদ্ধধর্মে ভগবান তথাগতের জীবনীতে জাতক কল্পলতাগুলি উচ্চ তত্ত্বের নীতিগল্পের সমষ্টি; কিন্তু বৌদ্ধ নীতি-গল্পগুলির মালমশলা রাজা-মহারাজদের কাহিনী, চাষাদের জীবনী, জীবজন্তুদের আর গাছপালার কথায় ভরপুর আর কথামৃতের গল্পে রাজা মহারাজের কথা নাই বল্লেই হয়। এতে আছে—নানা প্রাণীর কথা বহুরূপী, হাতী, মাছমুখে চিল, হোমাপাখী, ফোঁসছাড়া সাপ, নিভরশীল ব্যাং আর আছে সাধারণ মানুষের কথা যেমন এগিয়ে পড়া কাঠুরিয়া, খানদানী চাষ, ভক্ত সাজা স্বর্ণবণিক, সত্য বাজীকর, ভক্ত তাঁতী, ভক্ত দ্বারবান, মেছুনী, জহুরী আর বেগুনওয়ালা প্রভৃতি। সমস্ত মিলে প্রায় শতাধিক গল্পের স্থান রয়েছে এই কথামৃতে। তাও-ধর্মের, কনফুসিয় ধর্মের লেখকদের মধ্যেও এক রকম কথা-শিল্পের পরিচয় পাওয়া যায়। পবিত্র কোরাণেও নীতিগল্পগুলিকে ভগবানেরই সৃষ্টি বলে বর্ণনা আছে। একই গল্প বিভিন্ন ধর্মসাহিত্যে পাওয়া যায় যেমন—বাজীকরের গল্প রয়েছে কথামৃতে, বুদ্ধ নীতি-কথায়, আবার অন্ধের দর্শনের কথা—কথামৃতে বৌদ্ধধর্মে আছে। 'প্যারাবল অফ্ দি সাওয়ার' নামক বাইবেলের গল্পটি সংযুক্তনিকায়ে আছে। এতে মনে হয় নীতিগল্পগুলির একটি বিশ্বজনীনতা আছে।

মনস্বী হেভেট (Havet) এর মতে ঈশামসির নীতিগল্পগুলি ভারত থেকে নেওয়া (L Christianisme et ses origines) পণ্ডিত বেন্‌ফে (J. Benfey) সমস্ত নীতি-গল্পগুলিকেই বৌদ্ধধর্মের কাছে ধার করে নেওয়া বলে মনে করেন। হয়ত ভারতের চিন্তা, ঋষিদের চিন্তা, ভূমায় পরিণত হয়েছিল। ছোট ছোট কথা দিয়ে, ছোট ছোট গল্পের এক প্রাণধর্ম আছে। Short wave কম্পনের শক্তি যেমন বহুদূর বিসারী, তেমনি এই ছোট ছোট কথায় গাথা ছোট ছোট গল্পগুলির

দ্যোতনা অমোঘ। যার জন্য বাইবেল এত আদৃত। কথামৃত আজ বিশ্বের বাইবেল বলে গণ্য হতে চলেছে। বিশেষ এতে প্রধান প্রধান সব জাতির, সব ধর্মের কথাই ত রয়েছে। অনুবাদ সাহিত্য হিসাবে আজ প্রায় সব প্রধান প্রধান ভাষায় এর স্থান অবিসংবাদী।

আরো কথামৃতের ভাষায় এক অনবদ্যতা—এক নূতন কথা সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে। কত নূতন উপমা রয়েছে এর ভিতর। যেমন—'গম্ভীর জল' 'একঘেযে হব না', 'খাল জমিতে জল', 'আঁস চুপড়ীর গন্ধ,' 'ছেলে-মা যাব বলে', 'পৌগণ্ড অবস্থা', 'গলায় মটর গিড গিড করে', 'শুঁটকে সাধু', 'বুকে বিল্লি আঁচড়াচ্ছে', 'ভস্ করে ওঠা তুবড়ী,' এমনি কত মিষ্টি চলতি উপমা নেওয়া হয়েছে। সে যুগে তখনও দিব্য অথচ চলতি ভাষার ব্যবহার সুরু হয়নি। হয় 'আলালী, হুতোমী' ভাষা, না হয় শুদ্ধ 'বঙ্কিমী' ভাষার যুগ সেটা। কথা শেষ করে আবার তার একটু খেই টেনে নেওয়া কথা সাহিত্যের একটি মধুর বিশেষত্ব। যেমন,—এখনও ভগবতীর পূজা, মেলার সময় হয়—বারুণীর দিনে; বাহিরের কর্ম কখন কখন সাধ কোরে করে—লোকশিক্ষার জন্য।

কথামৃতের ভাষা ভাব-বাহী আর জ্ঞানবাহী দুই-ই। যেমন 'চাউনিতে যেন জগৎটা নড়চে''জগতের সব গম্ভীর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন' আবার সেটি ভাব তান্ত্রিক, বস্তু-তান্ত্রিক দুই-ই বটে। যেমন—যদু মল্লিকের ঐশ্বর্য্য দেখে সবাই, বাবুকে খোঁজে কজন। আবার মাঝে মাঝে লঘু পরিবেশের সৃষ্টিও করেছেন, —স্বামিজীকে বলেছেন,—তুমি ত 'খ'—তবে যদি টেক্স (বাড়ীর খাজনা) না থাকত। কিছু কিছু খেউরও কথা-সাহিত্যে প্রয়োজন। যেমন আমড়া কেবল আঁঠি আর চামড়া—খেলে হয় অম্লশূল; যাত্রাওয়ালারা প্রায় ঐ রকম হয়, গাল তোবড়া, পেট মোটা, হাতে তাগা; সর্বদা ভাবে থাকতেন অথচ কি গভীর দৃষ্টি, রস সাহিত্যিকের দৃষ্টি—এমন কত আছে। বলতেন,—আমি আঁস জল দি। বিশেষ ঐ থাকের ভক্তও আসত। কথামৃত শুধু সাধুদের জন্যই ত নয়, সব নিয়ে কথামৃত একটি কাব্যবিশেষ। তিনি যে কবি—যুগে যুগেই।

মানবতার এই বাইবেলে রয়েছে ধর্মের কত না গূঢ় তত্ত্ব; যেমন সাংখ্য দর্শনের পুরুষের নিশ্চেষ্টতা আর প্রকৃতির প্রসবধর্মী স্বভাবের সঙ্গে বিবাহ-উৎসবে নিশ্চেষ্ট গৃহ কর্ত্তার আর চঞ্চল গৃহকর্ত্রীর তুলনা। মার্থা-মেরীর অনুরাগের কথা— মহামহিম আল্লার কথা, ভগবান বুদ্ধের কথা, কি যে নাই! আরো রয়েছে

সমসাময়িক ভক্ত মহাপুরুষদের সঙ্গে শ্রীঠাকুরের আলাপ-সংলাপ। এঁদের মধ্যে রয়েছেন দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর, সাহিত্য-সম্রাট বঙ্কিম, কবি মাইকেল, ব্রহ্মানন্দ কেশব, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আরো কত না জীবনাদর্শ ধরা এর পত্রে। ধার্মিক তাঁতীর রামের ইচ্ছায় জীবনায়ন, ফোঁস না করা সাপের চরিত্র। এমনি কত তত্ত্বমণিই যে ছড়ান রয়েছে কথামৃতের পাতায় পাতায়। আর আছে মিষ্টকথায় নিজের লীলাঙ্কন, নানা ভক্তসঙ্গে, নানা পরিবেশে, রঙ্গিন তার পর্ণপুট আর তারই সঙ্গে সঙ্গে ছন্দিত হয়ে-রয়েছে কত মধুর কণ্ঠের সাধন সঙ্গীত·· সমস্ত মিলিয়ে কথামৃত যেন এক সব পেয়েছির স্বর্গ—মর্তের বুকে অমরার অবদান—নিত্য বৃন্দাবনে নিত্য ভগবানের সঙ্গ।

পরিশিষ্ট—খ

দর্শন ও মনোবিজ্ঞানে শ্রীঠাকুর

শ্রীঠাকুরের জীবন বেদে আমরা দর্শন ও মনোবিজ্ঞানের অনেক তথ্যই পাই। অনেকের প্রশ্ন থাকে, শ্রীঠাকুরের কথায় আবার এসব আনা কেন? সে হিসাবে বলা যায় ভগবান ঈশামসির মনোবিজ্ঞানের কথা সেদেশে আলোচিত হয়েছে। (জিসাস্ ক্রাইষ্ট ইন দি লাইট অফ সাইকোলজি—জি. এস, হল) আর আচার্য্য শঙ্কর প্রভৃতি ধর্মরাজ্যের মহাপুরুষদের দর্শনও আলোচিত হয় এদেশে ওদেশে।

প্রথমেই দেখি শ্রীঠাকুর জ্ঞানলাভের এক অভূতপূর্ব্ব উপায় করেছেন আবিষ্কার। জ্ঞানের উৎসের কাছে চেয়েছেন জ্ঞান পিপাসার শান্তি। না খেয়ে পড়েছিলেন.—মা বেদে পুরাণে তোকে যে ভাবে জেনেছে আমায় জানিয়ে দে। সে প্রার্থনা মা শুনেছেন। কথামৃত আজ বিশ্বের ধর্মগ্রন্থ। ডাঃ রাধাকৃষ্ণন জ্ঞানের তিনটি উপায় দিয়েছেন—ইন্দ্রিয়জ জ্ঞান, বৈচারিক জ্ঞান আর প্রজ্ঞাজনিত জ্ঞান। এঁদের মতে অন্য দুটী জ্ঞান সত্যতত্ত্বকে বুঝবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। (আইডিয়ালিষ্ট ভিউ অফ্ লাইফ্) আমাদের দেশে আচার্য্যশঙ্কর, আর পাশ্চাত্যে প্লেটো, দেকার্ত্তে, স্পিনোজা প্রভৃতির কতকটা এই মত।

দর্শন বিষয়ে তিনটি তত্ত্ব আলোচিত হয়—ঈশতত্ত্ব, জ্ঞানতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব। ঈশ্বর-জ্ঞানের সম্বন্ধে মনস্বী কান্ট বলেছেন—তাঁকে সীমায়িত মনের দ্বারা জানা যায় না। ন্যুমেনা ও ফেনোমেনা—জগতের দুটি ভাগ তিনি করেছেন। ফেনোমেনার রাজ্য এই জগৎ, আর পারের জগৎ ন্যুমেনা। ভগবান এই পারের জগতে আছেন। আর সে জগতের সংবাদ আমাদের এই ফেনোমেনার মন দিয়ে পাওয়া অসম্ভব। তবে শ্রীঠাকুর বলেছেন,—শুদ্ধ মন, বুদ্ধি দিয়ে তাঁকে ধরা যায়। বলেছেন,—তাঁকে এই ইন্দ্রিয় দ্বারা বা মনের দ্বারা জানা যায় না। কিন্তু যে মনে বিষয় বুদ্ধি নাই, সেই শুদ্ধ মনের দ্বারা তাঁকে জানা যায়। আর ঠিক কে জানবে? আমাদের যতটুকু দরকার ততটুকু হলেই হল। ডেঁয়ো পিঁপড়ে আর চিনির পাহাড়ের উপমা দিয়েছেন এই বিষয়ে। ঈশ্বর সম্বন্ধে তিনি ইতি করতে বারণ করতেন। তাঁর ইতি করা যায় না। তিনি নিরাকার সাকার আবার আরো কত কি; ভক্তের জন্যে তিনি সাকার। (শ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত) জ্ঞানসূর্য্য

উঠলে তখন আর ব্যক্তি বলে বোধ হয় না—এখানে তিনি সচ্চিদানন্দ সমুদ্রের উপমা দিয়েছেন কূলকিনারা নাই, ভক্তি হিমে স্থানে স্থানে বরফ হয়ে যায়। জ্ঞান-সূর্যের তাপে সাকার বরফ গলে যায়—তবে তিনি, ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ বলেছেন। আবার তাঁর ব্রহ্ম জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তির পারে—বিদ্যা অবিদ্যার পারে—সত্ত্ব, রজঃ তমের পারে। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ—তিন দেহের পার—প্রকৃতির পার—জ্ঞান অজ্ঞানের পার। এসব বৈদান্তিক বিচার সত্ত্বেও তিনি বলেছেন, আমি সবই লই। ব্রহ্ম জীবজগৎ বিশিষ্ট, এইটি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ। তাঁর কাছে ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ। কালী ব্রহ্ম, ব্রহ্মই কালী। সচ্চিদানন্দ ভক্তি হিমে জমে যান—আবার জ্ঞানসূর্য্য উঠলে গলে যান। ঈশ্বরই কর্তা, তিনিই সৎ তিনিই বিভুরূপে সকলের ভিতর আছেন। তিনি মায়াকে বলেছেন যেন পানা, আর সচ্চিদানন্দ যেন জল। মায়ার যে দুটি শক্তি আছে আবরণী আর বিক্ষেপণী—পানাতে এ দুটির বেশ প্রকাশ। জীব সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, মায়াতে এই উপাধি। তত্ত্বজ্ঞান অর্থে জীবাত্মা আর পরমাত্মার এক জ্ঞান। বেদান্তের সার তিনি এক কথায় বলেছেন,—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। শ্রীঠাকুরের মতে এক জ্ঞানই জ্ঞান, বহু জ্ঞান অজ্ঞান। জ্ঞানীর পথ—বিচার পথ। জ্ঞানীর ভিতর একটানা বইতে থাকে অর্থাৎ জ্ঞান পথে চিত্ত নিরোধ বৃত্তি প্রাপ্ত হয়। ভক্তিতে জোয়ার ভাটা খেলে। জ্ঞানের দুটি লক্ষণ। অভিমান থাকবে না—আর শান্ত স্বভাব। আবার বলেছেন, জ্ঞানীর অনুরাগ থাকবে আর কুণ্ডলিনীর জাগরণ হবে। জ্ঞানী স্ব-স্বরূপকে চিন্তা করে। বিজ্ঞানী দেখে যিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান। বিজ্ঞানী নিত্য হতে লীলায় আবার লীলা হতে নিত্যে যায়। জ্ঞানী তাঁকে জেনেছে, বিজ্ঞানী তাঁকে নিয়ে সম্ভোগ করেছে। আচার্য্য শঙ্কর বিজ্ঞানীর লক্ষণে বলেছেন, যিনি উপলব্ধি করেছেন।

জগৎ যেন ঝাড়ের মত। জীব—ঝাড়ের দীপ—শ্রীঠাকুর এই কথাটি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উক্তি বলে বলেছেন। এখানে অর্থ এই যে দীপ না থাকলে ঝাড়কে দেখা যায় না, তেমনি জীব না থাকলে ঈশ্বরকে কে দেখাবে? জড়ে চৈতন্যে ভেদ, শ্রীঠাকুর মানেন নাই। তিনি বলেছেন,—জড়ের সত্ত্বা চৈতন্যে লয়, আর চৈতন্যের সত্ত্বা জড়ে লয়। বর্ত্তমানে বিজ্ঞানে ম্যাদাম কুরী প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা জড়ে ও শক্তিতে প্রভেদ দূর করেছেন, তবে শক্তিতে ও চৈতন্যে পার্থক্য তাঁরা দূর করতে সক্ষম হন নাই। আবার অন্যত্র শ্রীঠাকুর শরীরকে

সরা বলেছেন। মন রূপ জল, তাতে চৈতন্যের প্রতিবিম্ব পড়ে। এতে জড় ও চৈতন্যের একটা সম্বন্ধ পাওয়া যায়। মাটির সরায় জল আছে। তবে দুটি এক নয়। দেহ মন চৈতন্যের আধার। দেহ মনের প্রয়োজন এইজন্যে। কিন্তু লাইবনিজ্ প্রভৃতির মতে দেহ ও মনের কোন বাইরের যোগ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না। এরা দেহ-মনে, ভগবানের দেওয়া সামঞ্জস্যবাদী [প্রিএসটাব্লিষ্ট হারমনি]। আবার ডেকার্টে প্রভৃতি মনস্বীরা দেহ মনেয় মধ্যে চির পার্থক্য স্বীকার করেন। স্কোলাষ্টিক দার্শনিকরা মনে করতেন, এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু শ্রীঠাকুর যে ভাবে তাঁর দেহ মনের সম্বন্ধটি দিলেন সেটি সকল মতের পরিপোষকও বটে আবার তাদের ছাড়িয়েও গেছে। এক চৈতন্য সর্ব্বত্র থাকায় সবই মূলতঃ এক, আবার এই উদাহরণের মধ্যে সাংখ্যের চিচ্ছায়া আছে, বেদান্তের সচ্চিদানন্দ আছে।

শ্রীঠাকুর বলেন,—আম খেতে এসেছো—আম খেয়ে যাও—কত ডালপালা, অত হিসাবে কি হবে—বাবুর সঙ্গে যো সো করে আলাপ কর—বাবুর কখানা বাড়ী. কত ঐশ্বর্য্য এসবে কি হবে—পাশ্চাত্য দর্শনে আমরা এই তত্ত্ব পাই—এটি প্রাগমাটিজ্‌ম। আচার্য্য উইলিয়াম জেমস্, এর একজন প্রবর্ত্তক। তাঁর মতে ব্যবহারিক উপযোগিতাই জগতের সত্যকার রূপ। আর আমাদের জ্ঞানের নিরিখ হচ্ছে তার কার্য্যে প্রয়োজন। এই মতে আমাদের জ্ঞানের পরিধি দিন দিন যায় বেড়ে [প্রাগমাটিজম—ডব্লিউ জেমস] শ্রীঠাকুরও বলতেন,—এগিয়ে পড়। কাঠুরের গল্পে বলেছেন এগিয়ে যেতে। কাঠের বন, তামার খনি, রূপার খনি, সোনার খনি। মনস্বী ডিউইর জগৎও এমনি পরিবর্ধনশীল। শ্রীঠাকুর বলেছেন,—জগৎটা যেন জ্বরে রয়েছে, বর্ষায় যেমন জ্বরে থাকে। হেনরি বার্গসঁর মতে, জগৎ চৈতন্যময় [ইলান্-ভাইট্যাল্] তাঁর মতে জগৎকে জানতে হবে প্রজ্ঞার নেত্রে। শ্রীঠাকুর বলতেন—পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দেখা ভাল। বার্গসঁ তুবড়ীর উপমা দিয়েছেন তাঁর ম্যাটার ও মাইণ্ড এর পার্থক্য বুঝাতে [বেসিক টিচিংস—ডাঃ ফ্রষ্ট। কথামৃত]

বর্তমান দর্শন মানুষের অন্তরের পরিচয় বাদ দিতে পারে না। হিউম্যান ভ্যালু]। আবার বিজ্ঞানকেও নিয়েছে আদর করে—জর্জ্জ সান্তায়ানা প্রভৃতি এই দলের। শ্রীঠাকুরের জীবনবেদে আমরা এদুটি দিকেরই পরিচয় পাই। বাজিয়ে নেওয়া, যাচিয়ে নেওয়া তিনি কোন দিনই দেন নি ছেড়ে [সায়েন্টিফিক্ মেথড] আবার সত্য-শিব-সুন্দরের তিনি ছিলেন মূর্ত্ত বিগ্রহ।

নবগতিবাদের প্রবর্ত্তক লয়েড মরগান। এঁর মত জড় ও দেশকাল থেকে ক্রমে দেবতাদের উদ্ভব হয়। এই গতির মাঝে একটা নূতনত্ব দেখা যায়। জড় থেকে চেতনা, চেতনা থেকে মনের উদ্ভব নবগতিবাদের সূচনা করে। আলেকজাণ্ডার ও লয়েড মরগানের নব-গতিবাদের কথা [ইমার্জেণ্ট এভলিউস্ন্] শ্রীঠাকুরের বাণীতেও আমরা পাই। তিনি বলেন,—মায়ার কাজের ভিতর অনেক গোলমাল, কিছু বোঝা যায় না। এই বলা হল যে, বাজ উঁচু জায়গায় প'ড়ে কিন্তু দেখা গেছে বড় বাড়ীর পাশে চালা ঘরে এসে বাজ পড়ল। হাউইএর তুবড়ী খানিকটা ফুল কেটে ভেঙ্গে যায়—অর্থাৎ ঈশ্বর দর্শনের পর দেহ পড়ে যায় আর বিজ্ঞানী নারদাদির তুবড়ী একবার ফুল কাটে আবার বন্ধ হয়, আবার ফুল কাটে—অর্থাৎ প্রেম বিলাস চলে। তিনি আরো বলেছেন মহাবায়ুর কথা। এই মহাবায়ুর গতি কুণ্ডলিনীর গতি—ইনি একে একে চক্র পার হয়ে সহস্রারে গেলে দেবমানব সৃষ্টি হয়। তবে কুণ্ডলিনী চৈতন্যময়ী জড়বৎ থাকেন, জড় দেশকালের থেকে চৈতন্য সৃষ্টি হয় না।
[শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত]

মন সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের বাণী,—মনকে যদি ভক্ত সঙ্গে রাখো ঈশ্বরচিন্তা, হরি কথা এই সব হবে। মনটি যদি কুসঙ্গে রাখো সেইরকম কথাবার্ত্তা চিন্তা হয়ে যাবে। মনটা ছুধের মত। এই সব তত্ত্বে আমরা পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞান তত্ত্বের মিল পাই। 'মিল্' প্রভৃতি দার্শনিকদের এসোসিয়েসনিষ্ট বলা হয়। এদের মতে মনে যা কিছু জ্ঞান সমস্তই বহির্বিষয়ের সঙ্গে মনের সম্বন্ধেই গড়ে ওঠে। এদের মতে মন যন্ত্র-স্বরূপ। শ্রীঠাকুরও বলেছেন,—আমি যন্ত্র।
[ফ্লুগেল—হানড্রেড ইয়ারস্ অফ সাইকোলজি]

শ্রীঠাকুর আবার বলেছেন,—মনের বাস আজ্ঞাচক্রে। পাশ্চাত্য দেশে কোন কোন মনিষীদের [ডেকার্টে—দি প্যাসনস্ অফ্ দি. সোল ; ষ্টাউট—ম্যানুয়াল অফ সাইকোলজি] এই মতে মনের বা আত্মার বাস পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড-এ।
[penial gland] এই গ্ল্যাণ্ডই যে দ্বিদল চক্র একথা বলা বাহুল্য মাত্র। উপনিষদেও ব্রহ্মরন্ধ্রে আত্মার বাস উল্লিখিত আছে। [কেন. উপ.]

শ্রীঠাকুর বলেছেন,—কর্ম করতে গেলে একটি বিশ্বাস চাই, সেই সঙ্গে জিনিষটি মনে করে আনন্দ হয়। এই কথাটি মনোবিজ্ঞান সম্মত। উইল [will] বিলিফের [belief] মধ্যে একটি পারস্পরিকতা আছে [টু ফোল্ড

রিলেশন] আর আনন্দ হওয়াটাও মনোবৈজ্ঞানিকের দ্বারা সম্মত। আরো বলেছেন বিশ্বাস যত বাড়বে জ্ঞান তত বাড়বে। এও মনোবিজ্ঞান সম্মত কথা, সমস্ত জ্ঞানের পিছনে একটা বিশ্বাস প্রয়োজন। মনোবিজ্ঞানে জ্ঞান বলতে বুঝায় কতকগুলি চিন্তাধারা, সত্য বস্তুর সঙ্গে এদের সম্বন্ধ, আর এই সম্বন্ধে আমাদের বিশ্বাস। শ্রীঠাকুর বলেছেন—ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। অগ্নি বল্লেই দাহিকা শক্তি বুঝা যায়। সাবস্ট্যান্স ও এট্রিবিউটএর অদ্বয়ত্ব শ্রীঠাকুর এই ভাবে প্রতিপাদিত করলেন। সাধারণতঃ এ দুটি তত্ত্বে ভেদ আছে। কিন্তু শ্রীঠাকুরের মতে এদের মধ্যে নিত্য অভেদত্ব রয়েছে।

শ্রীঠাকুর বলেছেন,—দেহ যেন সরা, মন যেন জল, সেই জলে চিৎ সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পড়েছে অর্থাৎ দেহমন যেন চৈতন্যের আধার—চৈতন্য প্রতিফলিত হবার জন্যই তাদের প্রয়োজন। দেহ ও মন সেই হিসাবে পৃথক হলেও যুক্তভাবে আছে। পাশ্চাত্য মতে এটি ইন্টারএকসনিস্‌ম্ [interactionism] প্রফেসর বুসের (Prof. Busse) মতবাদও এই প্রকার। এঁর মতে চৈতন্যের আধারই দেহ ও মন। দেহের পুষ্টির সঙ্গে মনের পুষ্টির যোগ আছে। দেহ ও মন যুক্তসত্বা (এনসাইক্লোপিডিয়া অফ রিলিজিয়ন এণ্ড এথিকস্। (পৃঃ ৭০৮) পাশ্চাত্যে বিভিন্ন মনের মধ্যে এই মতই বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

বর্ত্তমানে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যায়। শ্রীঠাকুর এর কারণ দিলেন,—যে মায়েরই খেলা। উপমা দিয়ে বলেছেন,—চোর, চোর খেলা দেখ নাই—বুড়ির ইচ্ছা খেলাটা চলে—অর্থাৎ কর্ম্ম চলুক—মহামায়ার এই বিরাট ইচ্ছা। গীতার ভগবানও অতন্দ্রিত কর্ম্মী। (৩।২৩)

ওয়্যারদিমার, কফ্‌কা প্রভৃতির মতে জ্ঞান সামগ্রিক (Gestalt) শ্রীঠাকুরের ভিতরেও দেখি এই সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। তাঁর কথায়—কানার হাতী দেখা খণ্ড জ্ঞান, পূর্ণ জ্ঞান নয়। আরো একটি গল্পে এটি বিশদ করে তুলেছেন—সে গল্পটি গিরগিটী দেখার গল্প। আরো কফ্‌কা প্রভৃতির মতে জ্ঞান প্রজ্ঞা-দৃষ্টির দ্বারা লভ্য। শ্রীঠাকুরের বাণীতে তারই পরিপোষক অর্থ পাই।

কথামৃতে আছে কতকগুলো কানা, হাতীর কাছে এসে পড়েছিল।...হাত বুলিয়ে যে যেখানটা পেলে দেখে এসে কেউ বল্লে জালার মত, কেউ বললে থামের মত মহা-বিবাদ। বহুরূপীকে জানাও এমনি, যে গাছতলায় থাকে ঠিক সেই জানে। কলার, কফ্‌কা প্রভৃতি জেসটালটবাদীদের মতে জ্ঞান অর্জনের

পিছনে আছে একটি প্রজ্ঞা দৃষ্টি (Instinct), আমরা সামগ্রিক ভাবে দেখে তবেই জ্ঞান অর্জন করি (It is total reaction to a total response—Basic teachings) আর এই জ্ঞানার্জন সহসাই এসে উপস্থিত হয়। বার্গশঁ প্রভৃতিও এইরূপ কেটে কেটে নিয়ে জানার পক্ষপাতী নন, বৌদ্ধিক দৃষ্টির পক্ষপাতী, প্রজ্ঞাদৃষ্টিই সত্য দৃষ্টি। হেগেলেও সমগ্রকেই প্রধান স্থান দিয়েছেন। খণ্ড দৃষ্টি তাঁর কাছে ভ্রান্ত দৃষ্টি।

আচার্য্য জেম্স্ ল্যাঞ্জ প্রভৃতির মনে সেন্‌সেসান্ বা সংবিত্তি হতেই ভয়, দুঃখ প্রভৃতি অনুভূতি জাগে। শ্রীঠাকুর কিন্তু বললেন,—চোরেরা ক্ষেতে ফসল চুরি করতে আসে। তাই ভয় দেখাবার জন্যে মানুষের চেহারা করে খড়ের ছবি রেখে দিয়েছে। একজন দেখে এসে বললে ভয় নাই। তবু বুক দুড় দুড় করছে। অর্থ এই ভয় জাগাতে যে সেন্‌সেসান্ হয়েছিল সেটা না থাকাতেও ভয় থেকে যাচ্ছে। আরো বলেছেন,—স্বপ্নে ভয় দেখে জেগে উঠলেও বুক দুড় দুড় করে অর্থাৎ সেন্‌সেসান্ না থাকলেও ভয় হতে পারে।

শ্রীঠাকুর বলেছেন,—উদ্দীপন হয়...শ্রীমতীর সেইরূপ হত—মেঘ দেখলেই কৃষ্ণকে মনে পড়তো।...শোলার আতা দেখলে আসল আতা মনে পড়ে। মাটির কালী দেখলে ভক্তের মনে আসল মা-কালী, মা-আনন্দময়ীর উদয় হয়। বাপের ফটোগ্রাফ দেখলে বাপকে মনে পড়ে। মনোবিজ্ঞানের মতে এগুলি ল অফ এসোসিয়েসন্-এর মধ্যে পড়ে। ল অফ এসোসিয়েসন্-এর তিনটি রূপ আছে তন্মধ্যে ল অফ সিমিলারিটির মধ্যে এগুলি পড়ে। শ্রীঠাকুর আরো বলেছেন,—মেড়গাঁ দিয়ে চৈতন্যদেব যাচ্ছিলেন—শুনলেন এ-গাঁয়ের মাটিতে খোল তৈরী হয়, অমনি ভাবে বিহ্বল হলেন—হরিনাম কীর্ত্তনের সময় খোল বাজে—এগুলি ল অফ্ এসোসিয়েসনের মধ্যে পড়ে তবে ল অফ কন্‌টিগুইটির উদাহরণ, ল অফ কনট্রাষ্ট-এর উদাহরণও কথামৃতে আছে। দুইবন্ধুর গল্প—একজন সৎস্থানে গেছে কিন্তু তার অসৎ স্থানের চিন্তা মনে উঠেছে।

ফিজিওগন্‌মি সম্বন্ধে শ্রীঠাকুরের জ্ঞান অদ্ভুত ছিল। বলেছেন,—চলনেতে লক্ষণ ভালমন্দ টের পাওয়া যায়—উনপাঁজুরে, বিড়ালচক্ষু, টেপা নাক—অসরল হয়। ভারী হাত, হাড় পেকে, কনুয়ের গাঁট মোটা, ঠোঁট ডোমের মত হলে নীচ বুদ্ধি হয়। ট্যারা ভারি খল ও দুষ্ট হয়—বিড়াল চোখ, বাছুড়ে গালও।

চিকিৎসাবিদ্যার জ্ঞানও শ্রীঠাকুরের কিছু ছিল। সময় না হলে কিন্তু হয় না, বলে বলেছেন,—যখন খুব জ্বর তখন কুইনাইন দিলে কি হবে—ফিবার মিকচার দিয়ে, বাহে টাহে হয়ে একটু কম পড়লে তখন কুইনাইন দিতে হয়। আবার কারু কারু অমনি সেরে যায়, কুইনাইন দিতে হয় না। দেহেতে রস অনেক রয়েছে, কুইনাইনে কি কাজ হবে। আবার বলেছেন,—বৈদ্যের কাছে না থাকলে নাড়ীজ্ঞান হয় না। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরতে হয় তবে কোন্‌টি কফের নাড়ী, কোন্‌টি পিত্তের নাড়ী বোঝা যায়।

শ্রীঠাকুরের চিত্রকলার জ্ঞানও ছিল। নিজেই বলেছেন,—দেখ আমি ছেলেবেলায় চিত্র আঁকতে বেশ পারতুম। দেওয়ালে যশোদার ছবি দেখে বলেছেন,—ছবি ভাল হয় নাই, ঠিক যেন মেলেনী মাসী হয়েছে।

উপরে আমরা দর্শন-মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রের তত্ত্বের কথা উদ্ধৃত করলাম। কথামৃতের প্রতি ছত্রে এসব গ্রথিত আছে। শ্রীঠাকুরের বাণীর মধ্যে, বীজাকারে যে সব বর্ত্তমান যুগের প্রধান প্রধান দার্শনিক ও মনোবিজ্ঞানীদের তত্ত্ব উপরে দেওয়া হল, এগুলি দেবার উদ্দেশ্য এই যে, শ্রীঠাকুর আজ বিশ্বের মন্দিরে পূজার্হ হয়েছেন। কাজেই তাঁর জীবনায়নে বিশ্বের ভাবধারার কিছু কিছু নির্দ্দেশ আমরা পেতে পারি। তাঁকে বিশ্বদেব বলে মানলে, বিশ্বের বাণীবার্ত্তাবহ বলে মানতেই হবে।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

যুগাচার্য্য

প্রকাশকের নিবেদন

শ্রুতিতে আছে ব্রহ্মবিৎ পুরুষের সুকৃত তার সুহৃদগণের উপর অর্পিত হয়। (বেদান্ত পরিভাষা—৮ম অধ্যায়) তাঁদের কথার আলোচনা করা, তাঁদের চিন্তা করা এও সুহৃদের লক্ষণ। উপনিষদের শিক্ষা প্রকরণেও পাই 'আচার্য্য দেবো ভব'। এই আচার্য্য পর্য্যায়ে স্বামিপাদ বাদ পড়েন না। আবার অন্যদিকে **Lives of great men all remind us and we can make our lives sublime—** মহাপুরুষদের জীবনকাহিনী পাঠ করে আমরাও মহৎ হতে পারি। শ্রীমদ্ভাগবতেও রয়েছে 'কথামৃতের' কুশলতা।

'স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের এ জীবনকাহিনীর মূলকথাগুলি আনন্দমঙ্গলে যাতে পরিবেশিত হয় তার চেষ্টা হয়েছে এই পুস্তকে। মহাপুরুষদের কৃপা সকলের উপর বর্ষিত হোক এই প্রার্থনা—

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণম্

॥ স্বীকৃতি ॥

আমরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করেছি যে নিম্নলিখিত পুস্তকগুলির সাহায্য অপরিহার্য্য হয়েছিল।

স্বামী অভেদানন্দ লিখিত 'আমার জীবনকথা', ও Leaves from my Diary, স্বামী শঙ্করানন্দ লিখিত 'জীবনকথা', স্বামী প্রজ্ঞানন্দ লিখিত 'মন ও মানুষ', Lepage লিখিত Apostle of Monism, W. Jamesএর Pragmatism ও H. W. Schneiderএর American philosophy প্রভৃতি পুস্তক।

যুগাচার্য্য

উপরে নীল ঢালা নিথর আকাশ, আর নীচে নীল ধারার অনন্ত উচ্ছ্বাস, আর তাদের বেঁধেছে স্বপ্ননীল এক রামধনু, সাতরঙ্গা তার মন—দুই অসীমের অব্যক্তকে বাঁধতেই ত এই সপ্তপর্ণের সেতু—মর্ত্যের মনে স্বর্গের অভীপ্সা—স্বর্গের হাসিতে মর্ত্যের বিলাস—অসীম নেমে আসে সীমায় আবার সীমা ছুটে চলে অসীমায়—ধারা আছড়ে পড়ে কূলে আবার কূল ভেঙ্গে পড়ে ধারায়—জীবন ভেঙ্গে পড়ে মৃত্যুর কোলে আবার মৃত্যু হেসে ওঠে জীবনের অমৃতে। মহাকালের নেমিপথে এই দ্বন্দ্ব নিত্য। এই ইন্দ্রধনু অবতার, আর পার্ষদেরা তাঁর সাতরঙ্গের সাথী······

নীলধারার চপলতা নিয়ে ছুটে চলেছে এক সুন্দর কিশোর উপল ভাঙ্গা চরণে—পথের নাই দিশা—মহাসাগরের আবছা ডাক তবু যেন ভেসে আসে তার কানে...সব হারান সে সুর—সে যেন কোন্ স্বপ্নের মাঝেই ফেলেছে হারিয়ে, তবু সাত সায়রের হাতছানিতে ছড়িয়ে ঠিকরে পড়ে তার মন—আঁধার নিশির ডাকেই, বাঁধন যায় খুলে...অজানার ডাক যে অমোঘ। সে ভাবে—

ছায়া নামা নেমি পথে
রিক্ত আমি
আর্ত্ত আমি বড় আর্ত্ত
যুগ-ভগবান;

চঞ্চরিত জীবনের পথে
দিশাহীনে নিয়ে যাবে
হে দয়িত যুগন্ধর
পুরুষ প্রধান।

কুরু রণে রথ-চক্র মুখে
আর্ত্ত-জনে দিয়েছ অভয়
চির প্রেমময়
সারথি যে তুমি
চিরসাথী মম
হে বরণীয়
আজি তব হোক অভ্যুদয়।

পাশে সুরধুনী—গৈরিক শঙ্খের ডাক—কিশোর হারায় পথ—ফেরার পথে মিলে দিশা—প্রচ্ছায় শীতল পঞ্চবটী তাকে ডেকে নেয় নিবিড় স্নিগ্ধতায়—তার বুক জুড়ান ছায়ায় মন ভরে যায় পরম আশ্বাসে—কিন্তু দেবতা কই? দখিনাপুর যে শূন্য···শ্রীঠাকুর তখন কলিকাতা নগরীতে। কিশোরের চোখে নেমে এসেছে মধ্যাহ্নের আঁধার—পিছনে ফেলে এসেছে সে সুখের নীড়, প্রিয় সমারোহ—সম্মুখে নির্বান্ধব দখিনাপুরী, আশাহত মন পায় না কোন দিশা—সহসা দোসর সাথীর মেলে সন্ধান—ভাই, পরমহংসদেব কোথায়?—প্রশ্ন করে আর এক কিশোর, আশার শিখা জ্বেলে নেয় তার নয়ন থেকে···এ প্রশ্ন পরম আত্মীয়ের বহু বাঞ্ছিতেরি এক প্রশ্ন···এই প্রথম প্রশ্নের জন্যেই সে যেন এসে পড়েছে জীবনের এই মহাতীর্থে—

রহস্যময়ী জননীর নয়নে সেদিন হয়ত জেগেছিল এক মিলন মাঙ্গলিক—ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী······

সুরধুনীর স্নানপুণ্যোদকে স্নিগ্ধ তনু দুই কিশোর পেলেন মা'র প্রসাদ—জীবনের প্রথম দিনের ছায়া দীর্ঘ হয়ে আসে—শ্রান্ত পক্ষে নেমে আসে অজানা সন্ধ্যা···

ভবতারিণী ভবভয়হারিণীর প্রসাদ অমৃতে দুই বন্ধু হলেন তৃপ্ত—রাত্রি ঘন হয়ে আসে, পঞ্চবটীতে রাত্রির পক্ষধ্বনি যেন রহস্যনিবিড় করে তোলে দুই কিশোরের প্রাণ······

সহসা রাত্রির তোরণে উদয়াভিসারের ডাক শোনা যায়,—কালী কালী; একি! অর্গল বিলুপ্তির ডাক—না অর্গলার আহ্বান—কে দেবে দিশা?—

কিশোরের পরিচয়ে প্রভু বলেন—তুই আর জন্মে একজন বড় যোগী ছিলি—আশা-আকাঙ্খার রজনীতে ধীরে নেমে আসে উষসী—আলোর ডানা মেলে··· কিশোর প্রস্তুত হয়েই এসেছে; দখিনাপুরের সাতরঙ্গা রাখিতে তখন ললিতের

আলাপ—উত্তরের অলিন্দে শ্রীঠাকুরের স্পর্শ মন্ত্রে কিশোর নিথর টানে যায় ডুবে—অতলের অগাধ জলে। এমন ডুব দিয়েই ত প্রেম-মণি কুড়িয়ে যায় পাওয়া... এই কিশোরই বিশ্বপথের পথিক অভেদানন্দ—

সে এক বোধন-নবমীর পুণ্য-তিথি—নবদুর্গার আবাহন মন্ত্র উদার ছন্দে উঠেছে জেগে দুর্গত ধরণীর বুকে, ওদিকে পঞ্চবটীর শঙ্খে ডাক পড়ে—ওরে তোরা কে কোথায় আছিস আয়। সপ্ত-লোকের মন নিয়ে মা'র প্রসাদ তখন আছেন বসে, ধরা ছোঁওয়ার বাইরে—দেরী হয়ে গেছে—ডাক যেন পৌঁছায় না—সমাধির নিথরে কি বোধনমন্ত্র নাই—জোর করেই নামিয়ে আনতে হয়—বেঁধেই বুঝি বা আনতে হয় নীড়হারা মনকে। বেদনার বোধনেই বুঝি জমে ওঠে মা'র চোখে এক ফোঁটা জল—আর তারই শতদলে গড়ে ওঠে মুক্তা—নিটোল মুক্তির সে মুক্তা। আঠারোশো সাতষট্টির পুণ্যতিথির এই লগ্ন, স্বামী অভেদানন্দের আবির্ভাব-লগ্ন—ঘরে ঘরে তখন শারদীয়া মহোৎসবের নান্দীপাঠ হয়ে গেছে সুরু—যে কল্যাণকল্প দীর্ঘ তিয়াত্তর বৎসর ধরে ধরণীর বুকে মহামহোৎসব করেছিল জড়ো তার বোধনের এই পর্ব্বে সেদিন ঘরে ঘরে তখন ছন্দিত হচ্ছে—'দেবিচণ্ডাত্মিকে চণ্ডি—চণ্ড বিগ্রহকারিণি বিল্বশাখাং সমাশ্রিত্য তিষ্ঠ দেবি যথা সুখং'—আর্ত্তধরণীর বোধন মাঙ্গলিক।

সুন্দর সুকান্ত শিশু যেন যোগমায়া সমাবৃত হয়ে জন্মেছিল পদ্মাসনে আর মহামায়া নিজের হাতের রাখীর চিহ্ন রাখলেন সারা গায়ে। মা'র প্রসাদী ফুল তাই নাম হল কালীপ্রসাদ। পিতৃ পরিচয়—রসিকলাল চন্দ্র, আর মাতা ছিলেন নয়নতারা। পিতা ছিলেন তখনকার নামকরা শিক্ষক, বিদ্যাপীঠের নাম ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী। রসিকলালের গৃহ ছিল তখনকার অভিজাতকুল অধ্যুষিত আহিরীটোলায়—গান-বাজনা, কুস্তি, যাত্রা, ব্যবসা-বাণিজ্যে উত্তর কলিকাতার এই স্থানটি সমাজ জীবনের চঞ্চলতা নিয়ে ছিল যেন সেদিনের মধ্যমণি। কালীপ্রসাদের জন্মের দুটি সুন্দর কাহিনী আছে। বৈমাত্র দাদা বিহারীলাল ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য সংসার ত্যাগ করলে পিতা গঙ্গার জলে আত্মহত্যায় উদ্যত হন। কিন্তু দৈববাণী:হয়, পুনরায় বিবাহ কর। উঠে আসেন রসিকলাল। কালীঘাটে মা'র দোর ধরা ছেলে এই কালীপ্রসাদ।

শরতের শান্ত শোভায় বেড়ে ওঠে কালীকাপ্রসাদ—ধীর মন্থর জীবনপ্রবাহে ছিল এমন এক দিব্য সুষমা এমন এক মমতাভরা সৌন্দর্য্য যে সকলে তাকে

ভাল না বেসে পারতো না। ওরিয়েন্ট্যাল বিদ্যাপীঠে প্রসাদ ছিল তার শ্রেণীর সেরা ছাত্র—শিক্ষকদের আশা আকাঙ্ক্ষার ধন। এদিকে হেরম্ব পণ্ডিতের টোলে সংস্কৃত পড়াও হয়ে গেছে সুরু। প্রধান শিক্ষক ছাত্রের মেধা দেখে আদর করে দিলেন একটি ছোট সংস্কৃত বই—ছন্দ মঞ্জরী—তিনি হয়ত জানতেন না দুর দিকৃরেখায় কি পাদপাদপের সৃষ্টি হল—এরই ফল আমরা পেয়েছি স্বামিপাদের সংস্কৃত স্তোত্রসম্পুট, স্তোত্ররত্নাকর।

ওদেশে একটি প্রবচন আছে "Like unto like" সমানে সমানে একটা মাখামাখি থাকে। দেবভাষার উপর যেন জন্মজ-ন্মান্তরের একটা টান প্রসাদের দেবমনের ছিল। পরে যেমন 'শিক্ষার আদর্শ' পুস্তকে বলেছেন,—সংস্কৃত ভাষা ইংরাজী ভাষার জনক ; এই ভাষার অনুশীলনে আমাদের মস্তিষ্কের কোষসমূহ গড়ে উঠেছে। তাই সংস্কৃতকে অবহেলা করলে আমরা মূলকে অবহেলা করব। তাইতো দেখি প্রথম জীবনে মুগ্ধবোধ, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, ভট্টি এই সব সংস্কৃত কাব্যের তিনি ছিলেন দরদী ছাত্র "আর তোমার কণ্ঠে সরস্বতী বসুক" —শ্রীমার এই আশীষ জীবনের দক্ষিণামেঘের মত হয়েছিল অমোঘ। এই শাস্ত্র প্রশস্তি নিয়েই কালীপ্রসাদ গীতার অনুশীলন করেন সুরু। পিতা রসিকলালের পাঠসংগ্রহের গীতাখানি তাঁর জীবনে যেন প্রথম অরুণোদয় দিয়েছিল বিছিয়ে। গীতায় তাঁর নিষ্ঠা দেখে পিতা হলেন শঙ্কিত। গীতাখানি তাঁর হাত থেকে নিলেন সরিয়ে—কালীপ্রসাদের অন্তর্দাহ যেন আরো যায় বেড়ে। হৈম নিশীথের শিশিরের মত গোপনে কর্মযোগীর প্রথমপাঠ হতে লাগল সঞ্চয়। এই আলোচনার ফল তাঁর গীতার অমূল্য ব্যাখ্যা—এই অমূল্য পুস্তক আজ প্রকাশমুখে আছে।

কালীপ্রসাদ সেদিন ধ্যানের গভীরে গেছেন হারিয়ে। সহসা আয়ত অসীম এক দিব্য চক্ষু ভেসে উঠে তাঁর সমাধি নিথর মনে। এই কি সেই বিরাটের চক্ষু— দ্রষ্টার বাণীতে যাকে,—

সদা পশ্যন্তি সূরয়ঃ দিবীব চক্ষুরাততম্।

দেবগুরুর সন্ধানের পর তাঁর অন্তরের ফল্গুধারা দুকূল ভেঙ্গে চলেছিল বয়ে— শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্য তাঁকে যেন জোয়ারের বেগে চলেছিল ভাসিয়ে নিয়ে—আর জন্মান্তরের যোগনিষ্ঠার ফলে ঐ সব দর্শন তখন তাঁর জীবনে একে একে ছায়াচিত্রের মত নূতন পটভূমি করছিল রচনা...আর একদিনের কথা—শ্রীঠাকুরের

পদসম্বাহনে রত কালীপ্রসাদ। পরশমণির স্পর্শে তাঁর তখন সোনা হয়ে যাবার পালা। যাঁর কথাই ছিল,—এবার একটু ছুঁয়ে দিলে হয়ে যাবে...যাঁর স্পর্শে মত্তগিরীশ সত্ত্বগুণের আধারে পরিণত হয়েছিল, তাঁর স্পর্শে পার্ষদের যে আকাশ-দেউল ছোঁওয়া দর্শন হবে এতো অসম্ভব নয়। তামসী-গভীর রাত্রি, প্রসাদের নিদ্রা নিমিল দুই চোখ—এক দিব্যলোকে এসে দাঁড়িয়ে হতচকিত দৃষ্টি মেলে দেখে– শ্রীঠাকুর নয়, তাঁর পরম আপনজন পরমহংস মশায় নয়, সাক্ষাৎ ভবতারিণী ভবভয়হারিণী এসেছেন তাঁর প্রসাদীফুলকে কোলে নিতে আর তাঁর সর্ব-তৃষ্ণা-হরা স্তন্য দিয়ে করেছেন তৃপ্ত—সে সময় এমনি কত দর্শনই না হয়েছে—লেখায় কজ্জলিত করতে পারেনি তার অনেকখানিই...নিশাময় ক্ষণে কালীপ্রসাদ নিবাত নিথর—শিখাময় মন আছে ধ্যান সজাগ। মুক্ত বিহঙ্গের মত তাঁর বিদেহ আত্মা ছুটে চলে অসীমের দিশায়—এসে পড়ে জ্যোতিগড়া এক প্রাসাদে—বিহ্বল বিস্ময়ে দেখেন সেখানে ধর্মসমন্বয়ের এক বিরাট প্রকাশ অসীম আনন্দে আরো দেখেন সব দেবদেবী, অবতার মহাপুরুষের বিরাট এক সম্মেলনে স্থানটি হয়ে উঠেছে রূপরম্য—আর তাঁদের মাঝে মধ্যমণি দাঁড়িয়েছেন শ্রীঠাকুর স্বয়ং—চকিতে প্রভুর বিরাট দেহে সব চিন্ময় সত্ত্বার হয় অনন্ত নির্ব্বাণ—প্রসাদও যায় হারিয়ে—এই দর্শনই তাঁর বৈকুণ্ঠ দর্শন—শ্রীঠাকুরের কথায় খণ্ডের ঘরের শেষ পৈঠা আর এই দর্শনে হারিয়েই কি প্রশস্তি লিখেছিলেন—,

হরিহর বিধিদেবা মূর্ত্তিভেদাস্তবৈতে
নিরুপম বহুমূর্ত্তির্মায়য়া কল্পয়ন্তম্।
অমিতগুণচরিত্রং দীনবন্ধুং দয়ালুং
বিমলপরমহংসং রামকৃষ্ণং ভজামঃ॥

(স্তোত্ররত্নাকর)

দশমীর এক স্নিগ্ধ তিথি। আষাঢ়ের পুনর্যাত্রায় বলরাম মন্দির আনন্দমুখর। চিদাকাশে সেদিন গদাধর চন্দ্রের উদয়। চারিদিক ভক্তগ্রহদলে ঝলমল করছে। সঙ্গে আছেন কালীপ্রসাদ। আর আছেন ভৈরবের অবতার গিরীশ, শশধর তর্কচূড়ামণি,বলরাম বসুর পিতা।

ভাবগঙ্গায় দুকূলভাঙ্গা জোয়ার এনে বলেন ঠাকুর,—দেখ, যে সমন্বয় করেছে সেই লোক। স্মৃতিচারণে বলেন—সেবার বৈষ্ণবচরণকে অনেকে সুখ্যাত করে সেজবাবুর কাছে আনলুম, সেজবাবু খুব যত্ন খাতির করলে, রূপোর বাসন বার

করে জল খাওয়ান পর্য্যন্ত। তারপর সেজবাবুর সামনে বলে বসলে—আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। বাংলার বাঘের মত ছিলেন সেকালের জমিদাররা—জমিদার সেজবাবু ভগবতীর উপাসক, মুখ রাঙা হয়ে উঠলো··· বৈষ্ণব শাক্তদের বিতর্কের কথা পেড়ে বলেন, বৈষ্ণবরা বলে—কৃষ্ণ ভবনদীর কাণ্ডারী, পার করে দেন। শাক্তরা উত্তরে বলেন—তাত বটেই, মা যে রাজ রাজেশ্বরী তিনি কি আপনি পার করবেন—ঐ কৃষ্ণকেই রেখেছেন পার কারবার জন্য। স্মৃতির পাতা উলটে আবার বলছেন,—ফুলুই শ্যামবাজারে বৈষ্ণব তাঁতীদের অহংকার কত। ওদেশে শ্যামবাজারে এইসব জায়গায় তাঁতীরা আছে, অনেকে বৈষ্ণব, তাদের লম্বা লম্বা কথা, বলে ইনি কোন বিষ্ণু মানেন। পাতা বিষ্ণু ও আমরা ছুঁই না—কোন শিব—আত্মারাম শিব, আমরা রামেশ্বর শিব মানি······এদিকে তাঁত বোনে। আবার এইসব লম্বা লম্বা কথা। স্বামিপাদ এইসব শোনেন প্রাণের গভীর আকুতি নিয়ে। প্রথম দর্শনের নিবিড়তায় এই সমন্বয়ের বাণী রেখে যায় তাদের গভীর ছন্দরেখা। পরবর্ত্তী জীবনে তাইত আমরা পাই সমন্বয়াচার্য্যরূপে কালীপ্রসাদকে, অতলস্নেহে সবাইকে নিচ্ছেন টেনে।

কাঁকুড়গাছি সুরেন্দ্রের বাগানে সেবার শ্রীঠাকুরকে নিয়ে মহোৎসবের ধূম লেগেছে। আঠারোশো চুরাশি সালের জুন মাস—ঠাকুর সকাল নটায় এসে পড়েছেন। কালীপ্রসাদও উপস্থিত। এদিন মাথুর গানে শ্রীঠাকুরের মুহুর্মুহু ভাবসমাধি আর অর্দ্ধবাহ্য কথা কইতে কথা যাচ্ছে হারিয়ে। বলছেন,—কিষ্ট কিষ্ট···কি মিষ্ট সে আধাফোটা কথা।

সেদিন নিরঞ্জন মহারাজও উপস্থিত ছিলেন! ঠাকুর তাঁর সরলতার প্রশংসা করে বলেছেন তুই মা'র জন্য এ চাকুরী না করে যদি ছেলের জন্যে চাকুরী করতিস্ তবে বলতুম,—ধিক্ ধিক্ শতধিক্। এমনি করে সেদিন গড়ে তুলছিলেন ভবিষ্যতের মহাজনদের। সেদিনও ঠাকুর শ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গোপী প্রেমের কথা বলতে গিয়ে ভাবে ভালভাবে বলতে পারছেন না। বলছেন—যদি পাগল হতে হয় ঈশ্বরের জন্য পাগল হও··। কি জানি এইকি পাগল হয়ে পাগল করে দেওয়ার ছল...শ্রীধাম বৃন্দাবনে যার প্রকাশ। ভগবান দাসের কথাও হল। ব্যাসকল্প মাষ্টার মহাশয় বললেন,—আপনার কথা শুনে বললেন আপনাদের আর ভাবনা কি—রাত্রে দেখা হয়েছিল, কাঁথায় শুয়েছিলেন, খাইয়ে দিতে হয়, চেঁচিয়ে বললে শুনতে পান। বিলেতের কথাও ঠাকুর শুনলেন, প্রতাপ মজুমদারের

কাছে—বিলেতের লোকেরা কাঞ্চনের পূজা করে আগাগোড়া রজোগুণের কাণ্ড। আমেরিকাতেও তাই। লোকেরা কেবল কর্ম করে। শুনে ঠাকুর বলেন,—এই জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ। কর্ম তো আদি কাণ্ড। কাঠুরে আর ব্রহ্মচারীর গল্পে এগিয়ে পড়ার কথা বলে বলেন,—আরো এগোলে নিষ্কাম কর্ম করতে পারবে। ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর—হে ঈশ্বর তোমার পাদপদ্মে ভক্তি দাও, আর কর্ম কমিয়ে দাও, আর যেটুকু রাখবে সেটুকু কর্ম যেন নিষ্কাম হয়ে করতে পারি। এই প্রসঙ্গেই শিক্ষা দেন,—আমি আমার—এটির নাম অজ্ঞান। তুমি কর্ত্তা আমি অকর্ত্তা—এটির নাম জ্ঞান। আমার জিনিষে ভালবাসার নাম মায়া আর সবাইকে ভালবাসার নাম দয়া। এই শিক্ষাই কি পরবর্ত্তীকালে তাঁর 'ডিভাইন হেরিটেজ অব ম্যান' বইতে দিয়েছেন স্বামিপাদ—বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া বলে মায়ার দুটি বিভাব করে।

সেদিনের সিমলাপল্লী সে ছিল যেন নারায়ণের মঙ্গলপীঠ। স্বামিজীর গৃহ, রামদত্তের গৃহ, শ্রীঠাকুরের একাধিকবার শুভাগমনে হয়েছে ধন্য। বিশেষ রামদত্ত মহাশয়ের গৃহ সে যেন শ্রীবাস অঙ্গনের মতই ভক্ত-মিলন মহোৎসবে উচ্ছল হয়ে উঠত বার বার।

সেদিন শ্রীঠাকুরও এসেছেন কালীপ্রসাদের সঙ্গে ভক্ত দত্তজার গৃহে। পঁচাশি সালের জ্যৈষ্ঠের শুক্লাদশমীর সে এক মঙ্গলতিথি। বেলা তখন পাঁচটা—ভবনাথ, পল্টু, নিত্যগোপাল, হরমোহন এঁরা সব আকুল আগ্রহে এতক্ষণ ছিলেন প্রতীক্ষায়। শ্রীঠাকুর এসেই ভক্তদের সংবাদ নিলেন। উৎকণ্ঠিত হয়ে প্রশ্ন করলেন,—গিরীশ ঘোষ আসবে না,—নরেন্দ্র আসবে না? কালীপ্রসাদকে পাঠালেন নরেন্দ্রনাথকে আনতে। কাছেই শ্রীপাদের গৃহ। কালীপ্রসাদ দেখেন নরেন্দ্র মাথার যন্ত্রণায় আকুল—মাথায় ভিজে গামছা জড়ান, একটি তক্তাপোষে শুয়ে আছেন, দরজা জানালা সব বন্ধ। সন্ধ্যার প্রশান্তির মত কালীমহারাজ নিয়ে এলেন শ্রীঠাকুরের আহ্বানের আর্ত্তি। স্বামিজী বলেন,—পরমহংস মহাশয়কে আমার প্রণাম দিয়ে বলবে, আমার মাথায় বড় যন্ত্রণা হচ্ছে, আমি চোখ খুলতে পারছি না, আমি যাব কেমন করে? প্রসাদ বলেন, পরমহংস মশায় তোমায় দেখতে ব্যাকুল—আমরা তোমায় নিয়ে যাবই।

শেষে ভিজে গামছা মাথায় নিলেন স্বামিজী। কালীপ্রসাদ আর নিরঞ্জন মহারাজের হাত ধরে কোনরকমে গিয়ে উপস্থিত রামবাবুর গৃহে। শতদল

শোভায় শ্রীঠাকুর আছেন বসে। শ্রীপাদ গিয়ে বসেন সামনে। উদ্বেল স্নেহে বলেন ঠাকুর—কিরে, তোর কি হয়েছে ? আর সঙ্গে সঙ্গে মাথায় দেন তাঁর পদ্মহস্তের পরশ ; জুড়িয়ে দেওয়া সেই স্পর্শে সব জ্বালা, সব যন্ত্রণা যায় মিটে, চকিত আস্বস্তিতে চোখ মেলে ধরেন সপ্তর্ষির ঋষি। এর পরই নরেন্দ্রনাথকে একখানি গান করতে আদেশ দেন শ্রীঠাকুর। কিন্নর কণ্ঠে নরেন্দ্রনাথ ধরেন গান—শ্রীঠাকুরের সারা তনুমন নিঙড়ে নামে উজানের ভাব-গঙ্গা। এর পরের পালা নরেন্দ্রনাথের সেই ধ্যান ডুবান ঘণ্টা তিনের গান। এইদিন শ্রীঠাকুর বললেন,—নিত্য থেকে লীলা, লীলা থেকে নিত্য—যাঁরই লীলা তাঁরই নিত্য...কেউ সাত তলার উপরে উঠে আর নামতে পারেনা আবার কেউ উঠে নীচে আনাগোনা করতে পারে—এর পর জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা। শ্রীঠাকুর বলছেন,—ঈশ্বর আছেন এটি বোধে বোধ করে তাকে বিশেষ রূপে জানতে হয়, তাঁর সঙ্গে বিশেষ রূপে আলাপ করতে হয়,—এরই নাম বিজ্ঞান। কান পেতে শোনেন কিশোরপ্রসাদ। কলিকোটা মনে তখন সত্ত্ব মধু সঞ্চয়ের পালা।

শ্রীঠাকুর বলতেন—প্রথম আকুলতায় কিছু ঠিক থাকে না। প্রথম ঝড়ে কোন্‌টা তেঁতুল গাছ কোন্‌টা আম গাছ চেনা যায় না। প্রথম আকুলতা যেন জোয়ারের বাঁধভাঙ্গা জল, ভাল-মন্দ বিচারের দুকূল সে নিয়ে যায় ভাসিয়ে। প্রথম অনুরাগে কালীপ্রসাদ বার বার ছুটে গেছেন দখিণাপুরে আকুল তৃষ্ণায়, ফিরে আসতেন কত তত্ত্ব-মণি কুড়িয়ে, আর গৃহে এসে ডুব দিতেন সমাধির অগাধ জলে। কত ত্রিযামা রজনী, এমনি কেটে গেছে সেই শব সাধনায়। সহসা আঁধার সন্ধ্যা নেমে আসে ছোট সেই হোমা পাখীর ডানা ঘিরে। দখিনাপুরে এসে দেখেন দেবদেহ অসুস্থ। সেদিন দক্ষিণেশ্বরে বিশ্বনাথ উপাধ্যায়, নরেন্দ্রনাথ আছেন। শ্রীঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত। শ্রীঠাকুর বলেন,—আমারও বাপু গরম পড়ে বড় কষ্ট হয়েছে, গরমেতে 'কুল্পি' এই সব বেশী খাওয়া হয়েছিল, তাই গলায় বীচি হয়েছে- মাকে বলেছি, মা ভাল করে দাও—আর কুল্পি খাব না। তারপর আবার বলছেন—বরফও খাব না। এই দিনই শ্রীমুখে পুনরাবৃত্ত হয়েছিল সেই পরম প্রার্থনা, যেন অলকানন্দের স্বচ্ছ ধারা—মা'র:পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম তখন বলতে লাগলাম,—মা, এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি, এই লও তোমার ধর্ম্ম, এই লও তোমার অধর্ম্ম ; এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য ; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার

মন্দ ; আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও। এই লও তোমার সত্য, এই লও তোমার মিথ্যা বলতে পারলাম না—তিনিই যে সত্যস্বরূপ।

অন্তরঙ্গদের সম্বন্ধে ঠাকুর বলতেন, আর এক থাক আছে তাদের শুধু জানলেই হবে, তারা কে আর আমার সঙ্গে সম্বন্ধ কি। আর বলতেন,—ওগো প্রথম প্রথম আসতে যেতে হয়। তাই কালীপ্রসাদকেও শ্রীঠাকুর বলতেন,—তুই না এলে প্রাণ ব্যাকুল হয়। আর বলতেন—যদি নৌকাভাড়া না পাস তবে এখান থেকে নিয়ে যাবি। এদুটি কথার এক গভীর অর্থ আছে। অন্তরঙ্গ ভক্তদের যারা নিত্যজীবের থাক তাদের তপস্যার প্রয়োজন নাই, তারা যখনই বুঝতে পারবে তাদের সম্বন্ধ তখনই তাদের সিদ্ধি। আর এরি জন্যে প্রয়োজন বার বার শ্রীঠাকুরের দিব্য সঙ্গ।

পুরুষোত্তমের শিক্ষা, আদর্শ শিক্ষা। সাধারণ ভাবে পিতামাতাকে দেবতা জ্ঞান করতে বলতেন। কিন্তু ঈশ্বরের পথে বাধা দিলে পিতামাতার কথাও অবহেলা করতে বলতেন। পাশ্চাত্য নীতি শাস্ত্রেও দেখি কর্ত্তব্যের একটা বিশেষ নির্দ্দেশিকা আছে। মনস্বী কার্লাইল বলেন,—যে কর্ত্তব্য তোমার অতি সন্নিকটে সেইটিই কর। ধর্ম্মাচরণ যখন আমাদের জীবনে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ায়, তখন সেই কর্ত্তব্যকে উপেক্ষা করে অন্য কর্ত্তব্যের দিকে ছুটে যাওয়া ঠিক হয় না। আর যখন সংসার আমাদের নিকটতম হয় তখন পিতামাতার মতে চলাই প্রথম কাজ। শ্রীঠাকুরের বাণী সর্ব্বসময়ের, সর্ব্বকালের পথের নিরিখ।

রামকৃষ্ণ সংঘে গোলাপ মার স্থান অনেক উঁচুতে, আর মনের দৃঢ়তার জন্যে তিনি অনেকের কাছে অম্লমধুরে পরিচিত। তিনি সেদিন এক প্রস্তাব করলেন যে দুর্গাপদ ডাক্তারের হাতে শ্রীঠাকুরের চিকিৎসা ভার দিতে হবে। কলিকাতায় তার তখন নাম ছিল। তখন সকলে একটি গহনার নৌকায় কুমারটুলী ঘাটে যাওয়া স্থির ছিল। আসবার পথে বিডন উদ্যানে নামবার কথাও ছিল। সেদিন কালীপ্রসাদও শ্রীঠাকুরের সঙ্গী হলেন। কলমীলতার দলে দখিণা বাতাসের সমারোহ তখন যে সুরু হয়ে গেছে।

ভবনদীর কাণ্ডারী সেদিন ভক্তদের নিয়ে ফিরে আসছেন দক্ষিণেশ্বরে। নৌকা আসছে আহিরীটোলা থেকে। বেলায় তখন দিনান্তের পাড়ি।

কিশোরপ্রসাদ আর লাটু ক্ষুধায় একান্ত আর্ত্ত। বরাহনগরের পরামাণিক ঘাটের কাছে এসে পড়েছেন এমন সময় শ্রীঠাকুর জানান আর্ত্তি। এ আর্ত্তি শ্যামা মেয়ের বিশ্ব-ক্ষুধা আর্ত্তি।

জিজ্ঞেসা করেন,—সঙ্গে কিছু আছে? প্রসাদের সঙ্গে মাত্র চার পয়সা সম্বল। নৌকা ভিড়ানো হল, সেই চার-পয়সা মুড়কি আনাও হল। রহস্যগহিন মুখে ঠাকুর সব কটি মুড়কি করেন গ্রহণ। দেখা গেল সঙ্গে সঙ্গে কিশোর সেবক-দলের সব ক্ষুধা গেছে মিটে। দুর্বাসার দুর্বার ক্ষুধার ইন্ধন যিনি জুগিয়েছেন সেই বিশ্বার্ত্তিহারীর এই লীলাঙ্কন।

একদিকে হরি কীর্ত্তন বিগলিত গঙ্গা আর অন্য দিকে ভক্ত-গুঞ্জন মুখর দক্ষিণেশ্বর। শ্রীঠাকুর গরগর হয়ে পড়েছেন গৌর কথায়। সহসা বলে ওঠেন, তুমি দেখেছ পানিহাটীর চিঁড়ার মহোৎসব। সঙ্গে সঙ্গে রামদত্তকে ব্যবস্থার দেন নির্দ্দেশ। দত্তজা নিবেদন করেন, এখন দেবদেহ ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে, সেখানে কেমন করে যাওয়া হবে? শ্রীঠাকুরের তখন বালখিল্য রূপ। ঝোঁক ধরেন যাবার জন্যে। উৎসব লগ্নে চারটী পান্‌সী এসে দাঁড়ায় বকুলতলার ঘাটে। সেদিনের আনন্দ সংবাদ,—

সেদিন ভেসেছে সুরধুনী নীরে
দীর্ঘ কাঠের ভেলা
হতে ত' পারতো সোনাময় সেহ
চরণ পরশ মেলা ॥
চলেছেন প্রভু ভক্ত সঙ্গে
দূর পানিহাটী গ্রামে
মুখর তরণী শত কণ্ঠের
আনন্দ কলতানে
গগনে ভাসিছে মুখরিয়া দিশা
কলহংসের কেকা
ভাঙ্গা ভাঙ্গা মেঘ তারাও মেলেছে
পুষ্প পেলব মাখা॥

(শ্রীরামকৃষ্ণ মঙ্গলকাব্য)

নৌকায় চলেছেন শ্রীঠাকুর—সঙ্গে মধুচক্রের ভক্তদল। হরিকথায় যেন ফেনিয়ে ওঠে গঙ্গার তরঙ্গ। ওদিকে সুরধুনীর অপর কূল উন্মত্ত উদ্দামে হরি-ধ্বনির জোয়ারে যেন ভেঙ্গে পড়ে। কাছে এসে দেখা যায় তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন নবদ্বীপ গোস্বামী, আবেগে আকুল; যেন গঙ্গার একটি তরঙ্গ আছড়ে পড়তে চায় শ্রীঠাকুরের চরণে।

শ্রীঠাকুর ত্বরিতে তীরে উঠেই তাঁকে করেন আশ্বস্ত। কাছে মণি সেনের গৌরাঙ্গ মন্দির। তিনি জানালেন পদধূলির নিমন্ত্রণ। শ্রীঠাকুরের সম্মতিতে সযত্নে নিয়ে গেলেন তাঁর গৃহে। ঠাকুরবাড়ীতে মহাপ্রভুর দর্শনলগ্নে দেবদেহে সম্বিত আর যায়না পাওয়া। আর সমবেতদের মধ্যে পড়ে যায় দর্শনের অবুঝ মত্ততা। জনারণ্যে সে যেন বাঁধভাঙ্গা জোয়ার। সকলে শ্রীঠাকুরের কীর্ত্তন বিলাস দেখার প্রয়াসী ; স্থান সঙ্কীর্ণ। তার ওপর কীর্ত্তনে হয়েছে যেন গৌর-চন্দ্রের মত্ত আবির্ভাব। বহু চেষ্টায় প্রায় আধঘণ্টা সমাধির পর ভক্তের আর্ত্তি দেখে শ্রীঠাকুর বাহ্যদশায় আসেন নেমে। মনে পড়ে গৌর লীলায়—

কোলাহল নাহি প্রভুর কিছু বাহ্য হইল
তবে নিত্যানন্দ সবার শ্রম জানাইল ॥
ভক্ত শ্রম জানি কৈল কীর্ত্তন সমাধান
সবা লইয়া আসি কৈল সমুদ্রেতে স্নান ॥
(শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত)

মণি সেন শ্রীঠাকুর ও ভক্তদের জলযোগের ব্যবস্থাও করেন এই যাত্রায়। এরপর মহাপ্রভুর পার্ষদ রাঘব পণ্ডিতের মন্দিরে হল যাত্রা। কীর্ত্তনে একটি ভাবের ছোঁয়া আছে। জনমনে একটি সংক্রামতা আছে। ভাল হোক মন্দ হোক অবুঝ বেগে ভাবের সংক্রামতা যায় জেগে। এতক্ষণ কীর্ত্তনীয়ারা যে কীর্ত্তনের রসোচ্ছল আনন্দ ভোগ করছিল সেটি যেন আর ছাড়তেই তারা চায় না। রাঘব মন্দিরের পথেও তারা নেয় শ্রীঠাকুরের সঙ্গ। মহাজনপদ তখন তাদের কণ্ঠে স্ফূর্ত্ত হয়ে উঠেছে,—

সুরধুনী তীরে হরি ব'লে কেরে
বুঝি প্রেমদাতা নিতাই এসেছে রে।

কীর্ত্তনে সেদিন শ্রীঠাকুরের পরম প্রেমরূপেরই হয়েছিল প্রকাশ। মহাপ্রভুর যেমন দেবশরীরে নানা দিব্য বিকার হত তেমনি শ্রীঠাকুরের দেহ সন্ধিগুলি যেন শিথিল হয়ে দীর্ঘছন্দে দেখাচ্ছিল—দেহের চারিদিক ঘিরে এসেছে দিব্য এক চন্দ্র মণ্ডল। ঐ জনস্রোতে ধীর গমনে চলতে প্রায় তিনঘণ্টা লাগে। রাঘব মন্দিরে কিছু সময় বিশ্রামের পর শ্রীঠাকুর নৌকায় এসে ওঠেন। কোন্নগরের নবচৈতন্যের কৃপা লাভের লগ্নও ত এই। তিনি উৎসাহে শ্রীঠাকুরের কাছে ছুটে আসেন, ঠাকুর তখন নৌকায়—অসীম ক্রন্দনে তার সারা হৃদয় উঠেছে ভরে। শ্রীঠাকুরও

তাঁকে ভাবাবেশে স্পর্শ করেন আর নবচৈতন্যের তনুমনে ভাবউল্লাসে, নামে ভরা ভাদরের বন্যা—সে বন্যা পরিণত হয় উদ্দাম নৃত্যে। শ্রীঠাকুরের শ্রীহস্তের ক্ষণ পরশে তার সে আর্ত্তি রসঘন রূপে হয় পরিণত। ইনি পরবর্ত্তী কালে সর্বত্যাগী পর্ণকুটীর-বাসী হয়েছিলেন।

এক এক করে নিঃশব্দে ঝরে যায় শিউলীর মত মধুঝরা দিনগুলি। দক্ষিণেশ্বরের মধুমেলার দিন আসে ফুরিয়ে। দেবদেহে অসাধ্য অসুস্থতা নিয়ে মা'র দুলাল পরমতীর্থকে জানালেন শেষ বিদায়...পিছনে পড়ে থাকেন জননী সারদেশ্বরী আর রহস্যময়ী ভবতারিণী। ঠাকুর এলেন শ্যামপুকুরে, অতি ক্ষুদ্র সে গৃহ। চিকিৎসার সুবিধার জন্য এলেন কালীমহারাজ আর লাটু। এঁরাই তখন শ্রীঠাকুরের সেবাব্রতী সন্তান। এঁরাই তখন শ্রীমার কাছে নিয়ে যেতেন ঠাকুরের কুশলবার্ত্তা দক্ষিণেশ্বরের নহবতে।

শ্যামপুকুরের শরশয্যায় সেদিন শ্রীঠাকুর আর্ত্ত। মহামায়ার আবাহন লগ্নে তখন দিকে দিকে হর্ষোচ্ছ্বাসের বোধন উঠেছে জেগে। মহাষ্টমীর সন্ধি-পূজা লগ্নে শ্রীঠাকুর সহসা দাঁড়িয়ে উঠলেন—ভাবে আপনহারা। স্বামিপাদেরা জনে জনে সেই ভাবমথিত তনুতে দিলেন পুষ্পাঞ্জলি। ধীরে ভাব উপশমে শ্রীঠাকুর জানালেন সব কথা। লঘুপক্ষের মন নিয়ে ঠাকুর সেদিন দেখেন—এক জ্যোতির্ম্ময় পথ, সুরেন্দ্রের বাড়ী থেকে দক্ষিণেশ্বর পর্য্যন্ত। দেখেন ভক্ত সুরেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছে পূজামণ্ডপে আর শ্লথ দুই চক্ষে নেমেছে গঙ্গা যমুনার ধারা। এরপর শ্রীঠাকুর স্বামিপাদদের সুরেন্দ্রের গৃহে দেন পাঠিয়ে। সুরেন্দ্রনাথের কাছেও তাঁরা ঐ কথা শুনেন। আর আপনহারা ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ দেখেন শ্রীঠাকুর প্রতিমার পাশে দাঁড়িয়ে—আনন্দ জ্যোতিতে ডুব ডুব সে তনু।

ধীরে শারদীয়া অমাবস্যা এসে পড়ে। শ্রীঠাকুর বলেছিলেন,—দীপান্বিতায় মা'র আবাহন করতে হবে। তাই এদিনে ভক্তরা পূজার উপকরণ দিয়েছেন সাজিয়ে। কিন্তু সকলেই ভাবেন মূর্ত্তি ত আনা হয় নি। সকলেই শ্রীঠাকুরের দিকে চেয়ে আছেন। দুই পাশে দুইটী সেজ দেওয়া, ধূপসুরভিত গৃহ যেন দিব্য আবির্ভাবে থমথম করছে। শ্রীঠাকুর সমাধিস্থ, বসে আছেন, পূজার কথা যেন মনেই নাই।

সহসা ঠাকুর বললেন,—ধূনা আন। কিছুপরে পুষ্প, চন্দন, বিল্বপত্র, জবা, ভোগের সবকিছু নিবেদন করলেন। শরৎ, শশী, রাখাল, নিরঞ্জন, রাম, গিরীশ,

মাষ্টার এঁরা সব ঘিরে আছেন শ্রীঠাকুরকে। মাষ্টারের দিকে চেয়ে ঠাকুর বলেন,—সবাই একটু ধ্যান কর। সহসা গিরীশ ঘোষজার পাঁচসিকা পাঁচ আনা বিশ্বাসে, বুঝতে পারেন যে, এ পূজা ভক্তদের—ভগবানের নয়। তিনি তখনি বিশ্বাসের মহামন্ত্রে জবা-বিল্ব চরণে দিলেন অর্ঘ্য, মাষ্টারও সেইমত অর্ঘ্য দিলেন। এর পর রাখাল রাম এঁরা সব এগিয়ে এলেন পূজাঞ্জলি নিয়ে। নিরঞ্জন স্বামীও ফুল দিয়ে 'ব্রহ্মময়ী ব্রহ্মময়ী' বলে ভূলুণ্ঠিত প্রণাম জানালেন। ভক্তেরা 'জয় মা', 'জয় মা' ধ্বনিতে শ্যামপুকুর পল্লীটী করে তোলেন মুখর। আর শ্রীঠাকুর তখন সমাধিস্থ—দুহাতে বরাভয়, মুখে চন্দ্রমথিত জ্যোতি বিচ্ছুরিত—বিসর্পিত। সহজেই ভক্তদের বুক নিঙড়ে জাগে স্তবগাথা—

"কে রে নিবিড় নীল"......

সেদিন ভক্তেরা একে একে ঠাকুরের প্রিয় কালীকীর্ত্তনগুলি নিবেদন করেন। শরীরের পক্ষে অনুচিত হলেও একটু পায়সান্ন ঠাকুর ভক্তদের জন্যে মুখে দেন। ভক্তেরা সেই প্রসাদ গ্রহণান্তে ঠাকুরের নির্দ্দেশে সুরেন্দ্রের গৃহে পূজার নিমন্ত্রণে যোগ দিতে যান।

মনে পড়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অষ্টপ্রহরিয়া—

আবেশিত চিত্ত, মহাপ্রভুর গৌর রায়।
পরম ঐশ্বর্য্য করি চতুর্দ্দিকে চায়॥

... ...

সাষ্টাঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ জয় জয় বলি
প্রভুর শ্রীশিরে জল দিয়া কুতূহলী—

... ...

মুকুন্দাদি গায় অভিষেক সুমঙ্গল
কেহো গায়, কেহ নাচে—আনন্দে বিহ্বল
অদ্যপীহ চৈতন্য এ সব লীলা করে
যখন যাহারে করে দৃষ্টি অধিকারে।

(চৈঃ ভাঃ ১০ম)

শ্যামপুকুরের লীলায় সেদিন অস্ত-পূরবীর সুর। শ্রীঠাকুরের সুস্থতার কোন লক্ষণই নাই যেন। ভক্তের প্রাণান্তিত চেষ্টা বাধা হত স্রোতে দুকূল ওঠে উচ্ছসি। অনেক চেষ্টায় গোপাল ঘোষের প্রশস্ত বাগান বাড়িটী আশি টাকায় পাওয়া যায়।

এই খরচের ভার নিলেন ঠাকুরের রসদ্দার সুরেশ মিত্র, ঠাকুরেরই ইঙ্গিতে। আর 'আনন্দবাজারের' ভোগের সব ভার নিলেন ভক্তবীর বলরাম বসু। ভগবানের জন্যে চাঁদার খাতা খোলা কত যে অনুচিত সেকথা সেদিন শ্রীঠাকুরকেই দিতে হয় বলে। সুরেশ মিত্র আর বলরামের মত রসদ্দারের প্রয়োজন যুগে যুগেই। শিবানন্দ সেন এর প্রমাণ। এটি লীলার পর্য্যায়ের ১৮৮৫-এর শেষের দিক। এই পর্য্যায়ে সঙ্গে ছিলেন শ্রীশ্রীমা, লাটু মহারাজ, নিরঞ্জন, কালীপ্রসাদ আর গোপাল মা। আলোর দুলাল, শ্যামাপ্রকৃতির কোলে ফিরে এসে যেন কিছু সুস্থই হয়ে উঠেন। লীলার দীপে নির্ব্বাণের শিখায় নামে আলোর ঢল।

একদিন নীচের শ্যামল ছায়ে বেড়াচ্ছেন ঠাকুর, কিন্তু উত্তর হাওয়া বয়ে আনে অসুস্থতা। স্বাস্থ্যের যেটুকু কুশলতা এই কারণে সেটি নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমে সেবার জন্যে নরেন্দ্রনাথ, শশী, কালী, বুড়ো গোপাল, হুটকো গোপাল, প্রভৃতি ভক্তেরা এসে দেন যোগ। বারো জন সেবক পালাক্রমে শ্রীঠাকুরের সেবার নেন ভার। কালীপ্রসাদের ভার পড়েছিল দিনে দুই ঘণ্টা আর রাত্রে দুই ঘণ্টা। ঠাকুরের পরিচর্য্যায় আর এই সেবা সৌকর্য্যে শ্রীঠাকুরের উপদেশ বয়ে যেত গোমুখী ধারায়। দিনে দিনে কল্পতরুর দিন এসে পড়ে। সেদিন বৎসরের প্রথম দিন। অন্য দিনের তুলনায় সেদিন ঠাকুর একটু ভাল বোধ করছিলেন। তাই নীচে এসে প্রবৃত্ত হলেন ধীর চারণে। ভক্তেরা শ্রীঠাকুরকে কিছু ভাল দেখে জয়গানে মুখর করে তোলে কাশীপুরের বাগান। এই জয়বাণীতে শ্রীঠাকুরও সমাধিস্থ হয়ে পড়েন। সমাধি ভঙ্গে শ্রীমান গিরিশকে বলেন,—গিরিশ তুমি কি দেখেছ যে লোককে বলে বেড়াচ্ছ—আমি অবতার। ঘোষজা বলেন,—যার কথা বলতে গিয়ে ব্যাস বাল্মিকী শব্দারণ্যে গিয়েছেন হারিয়ে সেখানে আমি তো সামান্য। ঘোষজা মশায় তখন পরম শরণাগতির ভাবে যুক্ত করে নতজানু। ভক্তদের সেদিন শ্রীঠাকুর আশীষ দেন,—তোদের চৈতন্য হোক। ভক্তদের মধ্যে সহসা নানা-ভাববৈচিত্র্য পড়ে ছড়িয়ে। কেউ জ্যোতির্ম্ময় ইষ্ট-মূর্ত্তির দর্শনে ধন্য হয়, কারো-বা বহুদিনের চেয়ে না পাওয়ার এক পরম তত্ত্বের প্রথম প্রকাশ।...... ১লা জানুয়ারী ১৮৮৬ খৃঃ অব্দের এই ঘটনা।

কাশীপুরের উদ্যান—প্রভুপাদ তখন শেষ শয্যালীন। নরেন স্বামী, কালী মহারাজ এঁরা তখন সেবাব্রতে রয়েছেন কাছে। শ্রীঠাকুরের গলরোগে সকলেই ক্লিষ্ট। সেবাসত্রে দিবারাত্রি চলেছে গঙ্গাধারার একটানা স্রোত বয়ে।

কিছুক্ষণের জন্যে আনমনা হতে তাঁরা সুরু করেন মাছধরা—পুকুর ছিল ভিতরেই। শ্রীঠাকুর শুনতে পেলেন আর ডেকে পাঠালেন দুইজনকে, জিজ্ঞেসা করলেন,—হ্যাঁরে তোরা নাকি মাছ ধরিস। বেদান্তের ছাত্র তাঁরা উত্তর দিলেন,—হ্যাঁ ধরি, তা কি অন্যায়। প্রভুদেব বোঝাবার করেন চেষ্টা,—ন্যেথ নেমন্তন্ন করে বিষ দেওয়াও যা, আর মাছের সামনে টোপ ফেলে মাছ ধরাও তাই। তারা উত্তর দিলেন,—গীতায় সে কথা নাই। সেখানে আছে—ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে—শরীরের মৃত্যুতে আত্মার মৃত্যু নাই। শ্রীঠাকুর অনেক বোঝান। শেষে গলা দিয়ে রক্ত পড়তে সুরু করে। স্বামিপাদরা হয়ে পড়েন ভীত। স্বামিজীদের শেষে বলেন,—তোমরা ধ্যান কর, সবই বুঝতে পারবে। তিনদিন ধ্যানের পর স্বামিপাদেরা নিজেদের ত্রুটি পারেন বুঝতে। বুদ্ধিতে যার মীমাংসা নাই, বোধিতে তারই প্রকাশ।

কাশীপুরের ধূলিমলিন পথ ফাল্গুনের গৈরিকে ঝলমল করছে। সহসা এসে দাঁড়ালেন নরেন্দ্রনাথ ও তাঁর সঙ্গীরা, আজ যাঁদের লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নিত্য উন্মুক্ত—দিক্‌চক্রে অন্নং বহুকুর্বীত মন্ত্র, সেই পথিকৃতদের হাতে ছিল ভিক্ষাপাত্র—বেরিয়েছেন শ্রীশ্রীঠাকুরকে ভিক্ষান্নে করবেন পরিতৃপ্ত। প্রথম পাত্র এগিয়ে এল অন্নপূর্ণার সম্মুখে ; মুখে বলেন,—অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্কর প্রাণবল্লভে, জ্ঞান বিজ্ঞান সিদ্ধার্থং ভিক্ষাং দেহি মে পার্বতী। এই অন্নব্রতই আজ সেবার অচলায়তন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শ্রীঠাকুর বলতেন—ভিক্ষান্ন বড় শুদ্ধ—তাই আজ তাঁরা মাধুকরী করে আনবেন সেই অন্ন প্রভুর সেবায়।

বাংলার সাধুদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব সেদিনও ছিল। স্বামিপাদেরাও এর ব্যতিক্রম হননি। নিন্দা প্রশংসায় জড়ান সেই মালা বৈজয়ন্তী হয়ে উঠেছিল তাঁদের গলায়। আজও আমরা দেখি দৃষ্টি ফিরিয়ে, নবব্রতীদের চোখের কোণে জড়িয়ে আছে শ্রাবণ মেঘের একটুকরো আঁধার। পালোয়ান স্বামী নিরঞ্জন সাজলেন হিন্দুস্থানী সাধু, অন্য স্বামিপাদেরা স্বরূপেই বেড়িয়ে পড়লেন। গোধূলির শেষ সঙ্গীতের মত সেদিন সেই ভিক্ষান্ন গ্রহণে শ্রীঠাকুরের মুখেও ফুটে উঠেছিল দূরাগত এক রহস্য……

ধীর পথিকের পদে শিবরাত্রির দিন আসে এগিয়ে। কাশীপুর সেদিন অন্নপূর্ণারই কাশীপুর হয়ে উঠেছিল চতুর্দ্দশীর ব্রত-মহোৎসবে। নরেন্দ্রনাথ কালী-

প্রসাদ, শরৎ, নিরঞ্জন—এরা সেদিন নিরম্বু উপবাসে বসেছিল পূজাদিতে—নীচে সমাধির নিথরতা, উপরে শিবমৌলীর একটুকরো চন্দ্রলেখা—বিবেক—শিবপাদের দেহে উচ্ছ্বসিত হল অপূর্ব এক শক্তি...দেহ কম্পন কলয়িত, হাত দিয়ে কালীপ্রসাদ দেখেন বিদ্যুৎ বিক্ষোভের মত এক প্রকাশ, মুক্তিদান ব্রতের প্রথম পরিচয়। শিবের সেই তিথিতে স্বামিপাদের ভাব গঙ্গাও স্ফুরিত হয়ে ওঠে—সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে পড়ে সেই অপূর্ব সঙ্গীত...'তাথৈয়া তাথৈয়া নাচে ভোলা, বম্‌বম্ বাজে গাল'—শিবনৃত্যে চতুর্দ্দশীর সেই ভরা তিথি আরো ওঠে ভরে।

পাশ্চাত্যে এখন হঠযোগের প্রতি বেশ একটা মোহ মদিরতা দেখা দিয়েছে। কালীপ্রসাদের জীবনে এমনি ঝরা চৈত্রের লগ্ন নেমে এসেছিল। সেদিন গোস্বামীপাদ এসেছেন কাশীপুর উদ্যান-বাটীতে নামময় গৈরিকবস্ত। এসেই তিনি গয়ার এক হঠযোগীর দিলেন সন্ধান। সে সময় 'বিবেকানন্দ সেতু' তৈরী হয়নি। স্বামিপাদ দিনের খেয়ায় গঙ্গা পার হয়ে বেরিয়ে পড়লেন বালিতে। সেখান হতে গয়া পথে করলেন যাত্রা। গয়া ষ্টেশনে পৌঁছে তিনি চারক্রোশ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে বরাবর পাহাড়ের পাদপীঠে একটি শিব মন্দির—সেইখানে নিলেন আশ্রয়। সেই মন্দির চাতালে তাঁর সঙ্গে একজন পুরী সন্ন্যাসীর আলাপ হয়। এঁরই কাছে বিরজা সন্ন্যাসের মন্ত্রগুলি তিনি লিখে নেন। নূতনের আবেদন স্বামিপাদের জীবনে নূতন নয়।—স্বর্গের অগ্নি তিনি প্রমিথিয়াসের মত বহন করে এনেছেন মানব কল্যাণে।

গ্রামবাসীদের কাছে জানতে চান হঠযোগীর নিরিখ। তারা দেয় বাধা—শেষে নিজেই করে নেন পথ—উপলিত গঙ্গা-ধারার মত।

নিরুদ্ধ বেগে এসে পড়েন হঠযোগীর গুহার কাছে। রুষ্ট যোগীর শিষ্যের প্রথম আলাপ পাথরের রূপ নিল। তিনি উদ্যত হস্তে এলেন এগিয়ে। স্বামিপাদ 'নমো নারায়ণায়' বলে দিলেন পরিচয়। এর পর আসে সত্যিকারের পরিচয়ের পালা। সব জেনে শুনে যোগী কালীপ্রসাদকে বহু আদরেই দেন স্থান নিজগুহায়। গুহাটি ছিল বেশ প্রশস্ত—আর তাতে ছিল প্রচুর আহার সামগ্রী, নিষিদ্ধ ও অনিষিদ্ধ দুইই।

সব দেখে স্বামিপাদের যোগের ক্ষুধা গেছে মিটে—পলায়নের পথ পেতে অস্থির। শেষে জল আনার ছলে যাত্রা করেন কাশীপুর মুখে···। হরিচরণ-বিচ্যুত গঙ্গা আবিল চরণে ফিরলেন সপ্তসিন্ধুতীরে······

উপলিত সুরধুনী শত বাহু মেলি
কারে চায় জানে না সে—
তবু ধেয়ে চলে উছলিত অশান্ত অবুঝ।
নিশিতারা স্পন্দিত সে বুকে
জাগে আশা আলেয়ার মত
ভাঙ্গে কুল ভাঙ্গে বুক—
তবু চলে—শ্রাবণ চন্দ্রিম
রাত কভু কাঁদে কভু জাগে
শারদ সুষমা, মরু মন্থ বুক—
কভু বিষাদে বিধুর দূরে···
কত দূরে রহিবে গো—
হে অচিন—
হে মোর ঠাকুর।

কালী তপস্বীকে ফিরে পেয়ে আশ্রমের সমিধ-শিখা যেন আবার ওঠে জ্বলে।

শ্রীঠাকুর এর আগেই বলেছিলেন,—কোথায় যাবে সে, চারখুঁট ঘুরে আসুক দেখবে কোথাও কিছু নাই···দিনান্তের কমলে যেন লুটিয়ে পড়ে একটুকরো হাসি। বললেন,—এতদিন না বলে কোথায় গিয়েছিলি? স্বামিপাদ দেন উত্তর সমস্ত ঘটনা জানিয়ে। আবার শ্রীঠাকুর জিজ্ঞাসা করলেন,—হঠযোগীকে কেমন দেখলি? উত্তরে প্রসাদ বলেন,—আপনার তুলনায় সে কিছুই নয়। স্বাতীর তৃষ্ণা নিয়ে তাই এই ফিরে আসা...

রাত্রি গভীর—আরো গভীরতর রাত্রি নেমেছে উদ্যান-বাটীর চারিপাশে। সহসা কে যেন মত্ত ছন্দে গেয়ে চলে শ্রীরাম নাম। উদ্যানপথ, চাঁদনী হয়ে ওঠে স্বপ্নাতুর।—এ আর কেউ নয় নরেন্দ্রনাথ নিজে শ্রীঠাকুরকে রক্ষা করতে সারারাত্রি জপ করে চলেছেন শ্রীরামচন্দ্রের নাম।

আর একদিনের কথা স্বামিপাদেরা তখন সারারাত্রি শ্রীঠাকুরের সেবায় নিযুক্ত। শ্রীযুত গিরিশচন্দ্রের ভাই অতুল বাবুর ইচ্ছা একদিন রাত্রে প্রভুর সেবায় দেন যোগ। একদণ্ড রাত্রি। তিনি বেরিয়ে পড়লেন কাশীপুরের বেদন-তীর্থপথে—এসে দেখেন নিদ্রানিসন্ন সে পুরী, ডেকেও পান না কোন সাড়া। সহসা দেখেন একটি কুকুর পাশ দিয়ে ভিতরে করল প্রবেশ।

শতকান্না যেন ভিড়ে আসে নয়ন মনে। ভাবেন,—অধম জীবও প্রবেশপথ পায় আর তিনি—তিনি কি তাদের চেয়েও হীন। চকিতে ভিতরে জ্বলে ওঠে একটি দীপ। শেষবারের ডাকে ছুটে আসেন হুটকো গোপাল—খুলে দেন গৃহদ্বার। উপরে গিয়ে দেখেন, লাটু মহারাজ নিদ্রিত আর শ্রীঠাকুরকে ব্যজন করছেন, শশী মহারাজ। অতুলকে দেখে তিনি পাখাটি তার হাতে দিয়ে আসেন নেমে। চোখে তাঁর ভেঙ্গে পড়েছে—নিদ্রা আর ক্লান্তি। অতুলবাবু ব্যজনরত। সহসা দেখেন শ্রীঠাকুরের খিন্নদেহ যেন ঝলমল করছে দিব্য-জ্যোতিতে...আর তারই ভিতর শ্রীঠাকুরের এক অঙ্গে শ্রীমতী আর অঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং·· রূপ যেন ধরে না। নিজের ওপর আর বিশ্বাস রাখা দায় হয়ে ওঠে ঘোষজার। বলেন,—

মনি মন্থ করি মম
অন্ধ আঁখি তুটি
সহসা কি অরোরার দীপ্ত কজ্জলেতে
রূপায়ণ হয় নব—সহসা বা কোন্
রশ্মিকেন্দ্র হতে—বার বার এস তুমি
কভু নর, কভু নারী—অৰ্দ্ধ
নারীশ্বর—অরূপের
রূপায়ণ—দলমল নীল কাঁতি
অৰ্দ্ধ স্বর্ণছড়া—মঞ্জু
আধো তাও—
স্বর্ণিম হয় বুঝি
প্রভাত নিলীম।

স্বামিপাদ বলতেন এই বিশ্বের কিছুই হারায় না। মহাশূন্যে সব ঘটনাই থাকে। বদরী-কেদারের পথে সেখানে ধীরেন্দ্রনাথ রায় বৈদিক মন্ত্রধ্বনি বার বারই শুনেছেন, তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে আমরা পাই। বিবেকানন্দ স্বামীও দেখেন এক সোনা ছড়ান সন্ধ্যা—গভীর গম্ভীর এক বৈদিক ঋষি উৰ্দ্ধমুখে পাঠ করছেন,—আয়াহি বরদে দেবি ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি—গায়ত্রি ছন্দসাং মাতব্রর্হ্মময়ি নমোঽস্তুতে। পূরবীর সেই রিক্ত ছন্দ যেন বিবেকপাদের মনে একবারে গেঁথে যায় আর আমাদের স্বামিপাদও সেটি তাঁর কাছে শিখে নেন।

পাঠকালে বিবেক-স্বামিপাদ একদিন দেখেন ভগবান বুদ্ধদেব তার দিকে আসছেন এগিয়ে—গম্ভীর করুণাঘন—মৌনমুখর সে মূর্ত্তি। স্বামিপাদ সহসা ভীত হয়ে পড়েন আর সে স্থান ত্যাগে কোন বিলম্ব হয়নি। হয়ত ভগবান বুদ্ধের নৈরঞ্জনাধারা সেদিন নরেন্দ্রনাথের ভাবগঙ্গায় এমনি করেই এসে মিলিয়ে গিয়েছিল। যাই হোক এই সময় ক্রমাগত বৌদ্ধশাস্ত্র পাঠ ও বুদ্ধদেবের কথাকল্পমূলে নিজেদের দিয়েছেন বিলিয়ে দুই জনেই।

ভগবান বুদ্ধদেবের কথা তখন স্বামিপাদদের খুবই আলোচনার বিষয় ছিল। 'ললিত বিস্তর' তখন তাঁদের বহু আদরের বই। বিরাট পুরুষদের অবচেতনে হয়ত একটা সমন্বয়ভূমি আছে। স্বামিপাদদের আর ভগবান বুদ্ধের জীবনবৃত্তে যেন একটা সমকেন্দ্রের প্রকাশ দেখা যায়।

সেদিন পথ বেয়ে চলেছেন তিনটি দিব্যপথিক নরেন্দ্রনাথ, তারকনাথ, কালীপ্রসাদ। ললিত-বিস্তরের কবিতার চরণগুলি সেদিন তাদের কাছে কথা কয়ে উঠছে। 'ইহাসনে শুষ্যতুমে শরীরং ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু অপ্রাপ্য বোধি বহু কল্প দুর্লভাং নৈবাসনাৎ কায়মত চলিষ্যতে।'

তথাগতের চরণপীঠে যাত্রার জন্য সকলেই হয়ে ওঠেন আকুল। তখনি তাঁরা কিছু ভাড়ার টাকা যোগাড় করে কুঠিঘাটের খেয়া পার হয়ে বালি থেকে রেলযোগে এসে পৌঁছুলেন বোধিদ্রুম মূলে।

সিদ্ধপীঠ বোধিমূলে স্বামিপাদ তিনজনে সেদিন বসে আছেন নিবাত ধ্যানে। নরেন-স্বামী তথাগতের বজ্রাসনে নিয়েছেন আসন, আর কালী মহারাজ ও তারক মহারাজ তার নীচেই নিলেন স্থান করে। ত্রিযামা রজনী কখন যে এসে গেছে চলে, সম্বিতহারা তিনজনে, কেউ তার রাখেনি হিসাব। ভোরে মন্দিরে গিয়ে আবার তাঁরা বসে পড়েন ধ্যানে। ধ্যানের রেশ দুই নয়নপ্রান্তে কি অমৃতের তুলি বুলিয়েছিল কে জানে! এবার বিবেকপাদের হল অপূর্ব্ব অনুভূতি—তিনি দেখলেন তথাগতের দেহ হতে স্বচ্ছ জ্যোতির ধারা ফল্গুধারার মতই বয়ে গেল অভেদ ও তারক স্বামিদের পাশ দিয়ে। বোধহয় ভগবান বুদ্ধের বোধির একটি ফুট সেদিনও ধরা ছিল স্বামিপাদের জন্যে—দেবলীলা যে নিত্য ...স্মৃতির অরণ্যে আমরা খুঁজে পাই শ্রীঠাকুরের দেবদেহ হতে এমনি একটি জ্যোতির ধারা জেগে উঠেছে কতবার...

এরপর তাঁরা জনকতনয়ার স্নানপুণ্যোদক ফল্গু নদীতে করলেন স্নান—ভগবান বুদ্ধদেবের চরম উপলব্ধির এই তীর্থ নীর...

জনকনন্দিনী আপন হস্তে পিণ্ড দিয়ে যে মুক্তি এনে ছিলেন তাঁর পূর্ব্ব পুরুষদের, সেই মুক্তিই কি ভগবান বুদ্ধদেবকে এই তীর্থতীরে প্রলুব্ধ করে এনেছিল—কে জানে···

নবীন সন্ন্যাসীদের তখন বৈরাগ্যের প্রবল আকুলতা। মধুকরের বৃত্তি নিয়ে গৃহ হতে গৃহান্তরে ভিক্ষা করে যা পেতেন তাতেই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন তবে সেই মড়ুয়ার রুটি আহারে নরেন ও স্বামিপাদের হল উদরাময়।

ব্যথা পেলেই চিরদিনের ব্যথাহারীকে পড়ে মনে···মনে পড়ে শ্রীঠাকুরের আদরের কথা,—চার খুঁট দেখে আয়—কোথাও কিছু নাই।

দাবদগ্ধ দিন—এপ্রিলের মাঝামাঝি। তবু ভোরের হিমশীতল বালির উপর দিয়ে ধীরে নগ্ন পদে চলতে চলতে অভেদস্বামীর ও আর দুই জনের কষ্ট হচ্ছিল বেশ। ওপারে ঘন সবুজের রেখা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট ছোট পাহাড়—ঝলমল করছে হীরাপান্না ধোওয়া রোদ্দুর—দেখে সে কষ্ট যেন ভুলেই গেলেন তাঁরা। শুনলেন ফল্গুর তটান্তশোভী এক দেবারামের কথা। জনৈক সদাশয় মঠাধীশ আছেন সেখানে। পাথেয়র ব্যবস্থা সেখানে হতে পারে এই আশায় করলেন যাত্রা সেই দিকে।

সেখানে পৌঁছে মঠে বিরাট চাষ-আবাদের ব্যবস্থা দেখে হয়ত ভবিষ্যত রামকৃষ্ণ মঠের স্বপ্ন নবীন সন্ন্যাসীদের মনে উদয় হয়েছিল। যাই হোক আহারের সময় উপস্থিত দেখে মঠের সাধুরা বাইরের ক্ষেতের কর্ম্মরত সাধুদের আহ্বান জানালেন,—'পঙ্গতকা হরিহর মহাপুরুখো।' এই 'আহ্বান' গৃহহারা অতিথিদের কর্ণে কি অমৃত বহন করে এনেছিল তার পরিচয় দেওয়া অসম্ভব। এর পর মঠাধীশের সঙ্গে নবীন সন্ন্যাসীরা করেন দেখা। সঙ্গীতপ্রিয় মঠাধীশ স্বামিজীর কণ্ঠে দেবসঙ্গীত শুনে পরম আনন্দ লাভ করেন। আর পাথেয় হিসাবে কিছু অর্থপ্রদান করেন স্বামিপাদদের।

প্রীতির একটি সহজ আবেদন আছে। তাই দেখি কুড়িয়ে পাওয়া মাণিকের মত ফল্গুতীরের মঠে স্বামিজীরা যে ডাক শুনেছিলেন,—'পঙ্গতকা হরিহর মহাপুরুখো'—সে ডাক তাঁরা সহজে পারেননি ভুলতে। সে অমৃত নিমন্ত্রণ তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন কাশীপুরের তীর্থে।

এর পর তাঁরা অতিথি হন উমেশবাবুর বাড়ী। প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে একটি অকৃত্রিম হৃদ্যতা দেখা যায়। গয়া প্রবাসী উমেশবাবুও স্বামিপাদদের অতি আদরেই করেন গ্রহণ। এখানেও বসে সঙ্গীতের আসর আর মোহমূর্চ্ছনায় ভরে যায় দিক। উমেশবাবু অতিথিদের বাকী পাথেয় অতি আদরেই দেন ধরে। নীড় বিরাগীর দল আবার ফিরে আসেন কাশীপুরে...সর্বতীর্থসার শ্রীঠাকুরের চরণতলে···চারখুঁট ঘুরে মাস্তলের পাখী এল ফিরে। আর ঠাকুরের—কলমীলতার দলকে পেয়ে আনন্দ যেন ধরে না—এযে "বহুদিন সঞ্চিত বহুদিন বঞ্চিত তিয়াসা..."

শ্রীঠাকুর শয়ন-নিমগ্ন—কালীপ্রসাদ সেবানিবিষ্ট—সহসা প্রভু বলেন,—দেখ তোর দুটো চোখ আর কপাল দেখে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দীপন হয়—আর আমার ভেতর শ্রীরাধার ভাব হয়ে যায়। তোর ভিতর শ্রীকৃষ্ণের অংশ আছে...এর পর কৃষ্ণ-কথায় রাত্রি হয়ে ওঠে ঘন—এই রহস্য কথা একমাত্র কালীপ্রসাদের জন্যই রাখা ছিল। মনে পড়ে ভগবান গীতামুখে যে কথা বলেছেন—"তদ্‌বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।" সেবা—বিশেষ গুরুসেবায় তত্ত্বের উন্মেষ হয় এই ঘটনা তার একটা বিশেষ প্রমাণ।

কাশীপুরের আর একটি ঘটনায় কালীপ্রসাদের বিশেষ পরীক্ষা হয়। পিতা রসিক মোহন শ্রীঠাকুরের সান্নিধ্যে এসেছেন। উদ্দেশ্য পুত্রকে গৃহে ফিরিয়ে নেবেন। ঠাকুর বলেন,—তোমার পুত্র যুগে যুগে আমার সঙ্গে এসেছে আর যুগে যুগে সে আমার পার্ষদ।

সেদিন পিতার মোহমুক্তি হয়ত বা হয়েছিল তবে কালীপ্রসাদের চলার পথ যে নিরঙ্কুশই হয়েছিল একথা ভবিষ্যতের দিকচক্রে যেন ফুটেই উঠেছিল।

কাশীপুর সেবাসত্রে একসঙ্গে বিদ্যাচর্চ্চা আর সেবাপর্য্যায় নিয়ে পড়েছিলেন কালীপ্রসাদ। যেটুকু সময় সেবার অন্তরালে তিনি পেতেন সেটুকু মিল, বেন প্রভৃতি বিদেশীদের শাস্ত্র পাঠে হতেন নিবিষ্ট।

একদিন লণ্ঠনের কাঁচে বসিয়ে দিয়েছেন একটুকরো কাগজ, পাছে প্রভুর বিশ্রান্তির ঘটে ব্যাঘাত আর নিজে করে চলেছেন তত্ত্ব জিজ্ঞাসা—ঠাকুর বলেছিলেন ছেলেদের মধ্যে তুই বুদ্ধিমান, নরেনের নীচেই তোর বুদ্ধি। নরেন যেমন একটা মত চালাবে, তুইও তেমনি একটা চালাতে পারবি।

সহসা নেমে এলো বজ্র যোগিনীর জ্বালাময়ী খড়্গ। কানুহারা বৃন্দাবনের মত পড়ে থাকে কাশীপুর। ঠাকুরের অবর্তমানে স্বামিপাদেরা নিজেদের খুবই অসহায় মনে করছেন এমন সময় একদিন সুরেশবাবু বললেন যে,—ছেলেরা যেমন আছে তেমনি থাকবে। আমাদের একটা জুড়াবার ঠাঁই যে চাই। আমি ঠাকুরের জন্য যা দিতাম তাই দেব। গিরিশবাবু আর সব গৃহী ভক্তদেরও সেই মত দেখে স্বামিপাদেরাও দিলেন সম্মতি। মুন্সীদের ভাঙ্গা কুটীর হল মঠের প্রথম পর্য্যায়। ভূতের বাড়ীতে দেবদূতের প্রকাশ।···

গৃহী আর ত্যাগীদের দুটি থাক ছিল ঠাকুরের লীলা পর্য্যায়ে। দেহাবসানেও এই দুই দলের মধ্যে একটি প্রেমের বিরোধ ওঠে জেগে। ভক্ত রামদত্তদের মত গৃহস্থেরা চাইলেন শ্রীঠাকুরের সমাধি মন্দির হবে কাঁকুড়গাছি উদ্যানে, রাম দত্তের এই উদ্যানে শ্রীঠাকুর গেছেন কত না দিন। আর স্বামিপাদেরা চাইলেন নিজেদের মধ্যে ভস্মাস্থিগুলি রেখে দিতে ভবিষ্যত কল্পনায়। বিরোধ বেধে ওঠে। শেষে বুদ্ধিমান বিবেকস্বামী দেন পথের নিরিখ, বলেন আমরা প্রত্যেকে তাঁর সমাধি-মন্দির এই দেহেই করবো রচনা। এস আমরা এর কিছু খেয়ে ফেলি। আর কিছু অংশ রাখা যাক ভবিষ্যত মঠের জন্য। বাকী অংশটুকু এঁরা রামবাবুকেই দিতে মনস্থ করলেন। ১২৯৩-এর ভাদ্রমাসে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ভস্মাস্থির কলস তুলে নিলেন মাথায় আর কালীপ্রসাদের মত ত্যাগী সন্তানের দল হলেন অনুগামী যোগোদ্যানের পথে।

কীর্ত্তন কললিত কলিকাতার রাস্তা সেদিন এক আনন্দ-বিধুর রূপ নিয়েছিল।

শ্রীমা তখন শ্রীঠাকুরের বিরহে একান্ত অবসন্ন। লীলার স্বর্গ বৃন্দাবনের শান্তির পীঠে যাত্রার হল সিদ্ধান্ত। হরিময় সে ধামে নিশ্চয়ই মা'র শোকের উপশম হবে এই ধারণা সকলের মনে তখন বড় হয়ে উঠেছিল। সঙ্গ নিলেন গোলাপমা আর যোগীন মা, মা'র দুই সখী—আর ছিলেন লক্ষ্মীমণি দেবী। পথে তাঁরা দেওঘরে নেমে তীর্থকৃত্য শেষ করেন। কাশীতে শ্রীমা বিশ্বনাথের অপূর্ব্ব আরতি দর্শন করেন।

অর্দ্ধবৃত্তের মন্দিরউপলিত কাশী, শিবস্বর্ণিম কাশী—মা'র বুকে এনে দেয় পরম প্রশান্তি। নানা মন্দিরের দর্শন পূজাদি শেষে মা এসে দাঁড়িয়েছেন বিশ্বনাথের মন্দিরে। মহামায়ার আগমনে মন্দিরে যেন নব আবাহনী হয় সুরু। মা হয়ে পড়েন সমাধিস্থ; বিশ্বনাথের সম্মুখে জ্বলে ওঠে একটি নিবাত স্বর্ণপ্রদীপ...

ভাবাবসানে মা বিপুল পদক্ষেপে চলেছেন কাশীর পথে। স্বর্ণকাশী সেদিন সত্যই যেন স্বর্ণসুন্দর হয়ে উঠেছিল মাতৃচরণ ছন্দে।

সেদিনের সেই বেপথু চঞ্চল চলা—মা'র এক দিব্য দর্শনের ফল। মা আবিষ্ট হয়ে যখন বিশ্বনাথের আরতি করছিলেন দর্শন তখন শ্রীঠাকুরই তাঁকে হাতে ধরে ধরে এনে দেন মন্দিরের বাইরে। এর পরই মা বিপুল ছন্দে আসেন গৃহে ফিরে।

কাশী থেকে অযোধ্যা হয়ে এলেন বৃন্দাবনে—সঙ্গে কালী মহারাজ ও আর সব ভক্তের দল। শ্রীঠাকুর মহারাজকে একবার বলেছিলেন—তোর ভ্রুদ্বয় দেখলে আমার কৃষ্ণের কথা মনে পড়ে যায়। এই সময় এই শ্রীবৃন্দাবনেই আমরা দেখি তাঁর কৃষ্ণভক্তির পহিলাহি।

প্রথম দেখার দিন থেকেই কিশোর কালীপ্রসাদের মনে হয়েছিলো বৃন্দাবন তাঁর অতি আদরের। চৌরাশী ক্রোশী বৃন্দারণ্যের পরিক্রমা বৈষ্ণবদের অতি কর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে। ব্রজের ধূলি—ধূলি নয়। এ যে গোপীপদ রেণু! কালীপ্রসাদও আকুল হয়ে ওঠেন সেই ধূলিতে লুটিয়ে পড়তে। শ্রীমার নির্দ্দেশ নিয়ে সুরু করেন তাঁর পরিক্রমা। সঙ্গে সম্বল মাত্র একটুকরা কৌপীন আর বহির্বাসও মাত্র দুইখানা।

ভেকধারণ না করা শ্রীবৃন্দাবনে এক মহা অপরাধ বিশেষ বৈষ্ণব সমাজের কাছে। স্বামিপাদেরও হল সেই দুর্দশা। পরিক্রমা কালে তাই তিনি হয়ে রইলেন একান্ত অপাংক্তেয়, শুনা যায় সৎগুরু শ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুও তাঁর গৈরিক বেশের জন্যে এমনি অপদস্থ হয়েছিলেন এই বৃন্দাবনেই।

সন্ধ্যাঘন শ্রীধাম যেন একটি বিরহের সুর—এই নিত্য লীলার ভূমিতে নিত্য বিরহের সুরে গোপী গীতা যেন আজও ছন্দিত।

ব্রজ যে ধন্য তব-জনমে হে দয়িত,
ইন্দিরা বিরাজিত নিত্য যেই ধামে
আনন্দিত সবে হেথা—তোমার
শ্রীমুখ চাহি জীবন ধরে গো যারা
অন্বেষিছে আজি দেখ তোমারেই
তারা সখা—নলিন নেত্র
তব শরৎ কান্তি হরে—
ব্রজ যে রক্ষিত কত না—

তবু করে—তবে কেন
উপেক্ষিছ আজি হে আমাদের।
যশোদা নন্দন নহ তো শুধু নাথ
তুমি যে বিশ্বের অন্তরযামী হরি
বিশ্ব রক্ষায় উদিত যদুকুলে ;
সংসার ভয়ে ভীত—চরণ শরণে যারা
অভয়দান ব্রতী—
কমলার কর ধৃত শ্রীকর শিয়রে,
রাখো হে আজি তবে
দয়িত আমাদের ॥

(গোপী গীতা)

সুললিত সেই পদগুলি দিনান্তের কৃষ্ণছায়ে স্বামিপাদ মধুর কণ্ঠে করে চলেন আবৃত্তি—আর নিত্যধামে যেন ফিরে আসে সেই স্বপ্নময় ফেলে আসা বিরহী দিনগুলি—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের হল চৈতন্য—তাঁরা বুঝলেন যে এই ব্যবহার বৈষ্ণব অপবাদের চরম রূপ—কালীপ্রসাদকে তখন তাঁরা আপনাদের মধ্যে দুহাতেই নেন টেনে। আর নিজেদের মাধুকরী থেকে তাঁকে দিতে থাকেন প্রসাদ মাধুরী। কবির ভাষায় এর সার্থতা পাই—

ক্ষণমিহসজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।

দিন যায় রাত্রি আসে—বিরহনিবিড় মন নিয়ে স্বামিপাদ বসেন ধ্যানে যদি বা সেই শ্যামল অধরাকে যায় ধরা···বৃক্ষের নীচে ব্রজের রজেই হয়ে যায় রাত্রি ভোর। ধ্যানে আবেশে কখন কখন হয়ে যেতেন কৃষ্ণময়। এ যে কৃষ্ণলীলারই নবায়ন—

একুশ দিনের পরিক্রমা এমনি প্রেমার্তিতে হয় শেষ। এর পর লাটু আর তারকনাথের সঙ্গে কালাবাবুর কুঞ্জে কালীপ্রসাদের কিছুদিন কাটে।

সহসা এল বরাহনগরের হাতছানি। কিন্তু এক বিপদ এসে দেখা দিল। মা-র আদেশ মাষ্টার মহাশয়ের অসুস্থ সহধর্ম্মিণীকে নিয়ে যেতে হবে কলকাতায়। মথুরার ষ্টেশন মাষ্টারের হলেন শরণাপন্ন। তিনি একটি চাবি দেন গাড়ীর দরজা বন্ধ করবার জন্যে। বড় বড় ষ্টেশনে নেমে গাড়ীর দরজা যেন বন্ধ করে দেওয়া হয় এই তাঁর সঙ্কেত।

মুন্সীদের মাঠে তখন প্রথম মঠ—ভূতের বাড়ী বলে তখন এই বাড়িটার খ্যাতি বেশই ছড়িয়ে পড়েছিল। বহুদিনের পরিত্যক্ত এই শতজীর্ণ কুটীরে হয় প্রথম মঠের পরিকল্পনা। তবে সার্থকতা এই যে এই শতজীর্ণ কুটীরে পূর্ব্ব প্রতিষ্ঠিত এক দেবতা ছিলেন। শ্রীঠাকুর যেন প্রেতলোক আর দেবলোকের মাঝখানে করলেন নিজের প্রথম প্রতিষ্ঠা।

কালীমহারাজ বাংলায় এসেছেন ফিরে—বরানগরের মঠ তখন পাঁচ ছয় মাসের শিশু। সেদিন শ্রীযুক্ত রামবাবুর গৃহে একটি বৈঠক বসে—মধু রায়ের গলিতে এই ঘটনা। কালীমহারাজ বলেন,—শ্রীঠাকুরকে আদর্শ করে জপ ধ্যান, আর সাধনার সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত, উপনিষদ, দেশ বিদেশের শাস্ত্রসব পাঠ করতে হবে। দত্তজার মত হল ষড়দর্শনে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। তাঁর দর্শন যখন পাওয়া গেছে তখন এতেই সব হবে। এই নিয়ে বেশ একটা মতান্তর জেগে ওঠে। আবার এই সময়ে গুপ্তমহারাজ হলেন মঠে উপস্থিত। গৃহী ভক্তদের কারো কারো মত হ'ল নরেন আবার শিষ্য করতে ধরেছে। শ্রীঠাকুরের সময়কার লোক ছাড়া আর কাকেও মঠে নেওয়া হবে না। কিন্তু শরৎ মহারাজ আর কালীস্বামী এঁরা গুপ্ত মহারাজকে পরম হৃদ্যতার সঙ্গে দিলেন ঠাঁই। এঁদের এই প্রীতির বন্ধন শেষ দিন পর্য্যন্তই নিবিড় ছিল। আর এই স্নেহের কথা গুপ্ত মহারাজ শেষের দিনও উল্লেখ করেছিলেন—ইংরাজ কবির কথা—One touch of nature makes the whole world akin.

বরানগর মঠের প্রথম পাতাগুলির সবটাতেই ছিল শীতের তীব্রতা। মঠের প্রথম দিকের দিনগুলি শুনলে মন অবসন্ন হয়ে পড়ে। তবু মনে হয় নিটোল মণি মুক্তার জন্ম ব্যথার বাহুবেষ্টনেই।

ভিক্ষার চাল কাঁড়া আকাঁড়া সমান। সেগুলি সিদ্ধ করে একটা কাপড়ের ওপর ঢেলে খাওয়াই ছিল তখন মঠের পদ্ধতি। আর থাকত লঙ্কার ঝোল একটা বাটিতে—সঙ্গে থাকত কিছু নুন। সকলে এক সঙ্গে বসে ঐ ভাত তুলে নিয়ে খেতে সুরু করতেন। মাঝে মাঝে নুন ও লঙ্কার ঝোল দিয়ে মুখ বদলানও হত। এই হল তখনকার প্রসাদের পশরা। পরণের কাপড়ও থাকত একটি। যার বাইরে যাবার দরকার তিনি সেটি দড়ি থেকে পেড়ে নিয়ে পরতেন। এমনি আঁধারেই সেইসব দিন গিয়েছে কেটে।

তপস্যার কি তোড়ই যে তখন বয়ে গিয়েছিল ভূতের বাড়ীতে। তার কথা অনেক সময় আষাঢ়ের গল্প বলেই মনে হয়।—সেদিন শনিবার। বেলা তখন পড়ে আসছে। দেখা গেল কালী মহারাজ কৌপীনবস্ত হয়ে বারান্দায় লম্বা হয়ে পড়ে আছেন। স্বামীজীর ভাই মহেন্দ্র দত্ত মশায় উপস্থিত হয়ে দেখেন, পুরু হয়ে ধূলো জমে উঠেছে আর কালী মহারাজ নিস্পন্দে পড়ে আছেন তার ওপর। দত্তজা ভয় পেয়ে ছুটে যান যোগেন মহারাজের ঘরে—অসহ কষ্টে কালী মহারাজের হয়ত শেষ অবস্থাই ঘটেছে। জানা গেল কালী মহারাজের ধ্যানের নিয়মই এই।

আর এক দিন। আষাঢ় সন্ধ্যা—মৃদু বর্ষণের রিমঝিম মল্লার সুরু হয়ে গেছে। শিবানন্দ ও শরৎ মহারাজ অর্দ্ধ শায়িত। মহাপুরুষ মহারাজের মনেও নেমেছে বিরহের সন্ধ্যা। জলভরা চোখে তিনি বললেন, শরৎ বাঁয়াটা ধরতো। দেওয়ালের তাকে বাঁয়াটি রাখা ছিল। ধীরে শরৎ মহারাজ ঠেকা দিতে সুরু করেন—ভাবে বেপথু সমস্ত তনু মন। স্নিগ্ধস্বরে তারক মহারাজ গান ধরলেন,—

"হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা
বিপথে পড়ল যৈছে মালতীকী মালা।"

গগনে সেদিন শত শাওন আর দুই মহারাজের দুই চোখেও নেমেছে শাওনের ঘনবরিষণ—গেয়ে চলেন তারকনাথ,—

"নয়নক ইন্দু সখি বয়নক হাস
সুখ গেয় প্রিয় সাথ দুখ মঝুপাশ।"

হরি বিরহের বৃন্দাবন যেন আবার নেমে এসেছে—প্রিয় বিরহবিধুর দুই ফল্গু বুকে—তাদের গদাধরচন্দ্রও আজ অস্তমিত—তাদের মালাও আজ বিপথে পথহারা······

বরানগরের আর একটি দিনের কথা। যোগেন স্বামী বৃন্দাবন থেকে এসেছেন ফিরে। কিছু মালা, তিলকমাটি, এসব এনেছেন সঙ্গে করে। স্বামিপাদ নরেন বলেন,—"দে আমায় সাজিয়ে দে।" রঙ্গ করে নাম করতে করতে হঠাৎ বিরহ উন্মত্ততায় সুরু করলেন কীর্ত্তন। ঠাকুর ঘর থেকে খোল আনা হোল। দেখতে দেখতে স্থানটী জনারণ্যে ভরে গেল। খোলের বাজনায় সেদিন বহু জন সমাগমে মনের আগলগুলি গিয়েছিল খুলে।

আরো এক দিনের কথা—সেদিন শীতের সন্ধ্যা। ১৮৮৫ সাল। কালীপ্রসাদ আর নরেন্দ্রনাথ গেলেন সিমলার বাড়ীতে। একাদশী তিথি আর নরেন্দ্রনাথের

বাড়ীর দুরবস্থায় কারো কিছু খাওয়াও হয়নি। তামাক খাওয়া, আর সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত বিচার চলছে। কিন্তু শীত আর ক্ষুধা দু'এরই চলেছে পাল্লা। স্বামী বিবেকানন্দ, কালী মহারাজের জন্যে কিছু চায়ের জোগাড়ে গেলেন। কালী তপস্বী চায়ের আশায় বসে আছেন চাতকের মত। বিবেকস্বামী কোন রকমে রাত সাড়ে চারটার সময় এসে হাজির চা নিয়ে—সেদিনের সেই মরুতৃষ্ণার চায়ের কথা বোধ হয় স্বামিপাদেরা কোন দিনই ভুলতে পারেন নি। মনে রাখতে হবে এ চা একেবারে নিরাভরণ।

একবার একটি তর্কের বিষয় এসে পড়ে। সাধু হবে শুষ্ক মুখ, নিতান্ত কৃশ দেহ, জীর্ণ ছিন্ন বসনের মানুষ। কালী মহারাজ বলেন সাধুর কাজ জগৎকে শিক্ষা দেওয়া। সাধুর হবে আদর্শ জীবন। শুকনো সাধু হওয়া জীবনের উদ্দেশ্য কখনই হতে পারে না।

প্রসঙ্গতঃ দয়ানন্দজীর কথা এসে পড়ে। কালী তপস্বী বলেন দয়ানন্দ দীন-হীন বেশেই থাকতেন। কিন্তু যখন দেখলেন তাতে কাজ হয় না তখন মস্ত এক পাগড়ী মাথায় নিলেন। লম্বা এক আলখাল্লায় সমস্ত দেহ ঢাকলেন। এতেই, তাঁর কথায়, এক বিশেষ শক্তি এল। লোকের সঙ্গে মিশতে হলে ভেক রাখতে হয়। এইটি কালী মহারাজের শিক্ষা ছিল। এই মত স্বামিপাদের বরাবরই ছিল। সেবার ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কে কালী মহারাজের কি কাজ ছিল। যথারীতি বেশেই ব্যাঙ্কে গেছেন, কাজও হয়ে গিয়েছিল। ব্যাঙ্কের প্রধান বেশ সম্ভ্রম করেই কাজ দেন করে। প্রসঙ্গতঃ স্বামিজী বলেন, এই সেদিন সারদা গিয়েছিল কিছু কাজ নিয়ে। প্রধান ঐ বেশভূষা দেখে বাইরে গিয়ে বসতে বলেন। সারদা ফিরে এসে অন্য একজনকে পাঠায়। কাজ করতে হলে তার কৌশল জানতে হবে। এই সঙ্গে স্বামী দয়ানন্দের মহত্ত্বের কথাও তিনি বলেছিলেন। স্বামী দয়ানন্দকে জনৈক স্ত্রীলোক বিষ প্রয়োগ করে। আর তাতেই স্বামিজীর দেহান্ত হয়। কিন্তু তিনি তাঁকে অভিসম্পাত করা তো দূরের কথা, ব্রহ্মাবগাহী মন নিয়ে দেহটি দেন ছেড়ে।

১৮৮৯ সালে একদিন দর্শনের একটা প্রসঙ্গ এসে পড়ে। পূজনীয় মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় প্লেটোর বইয়ে এক জায়গায় গেছিলেন আটকে। বুঝতে পারছেন না কিভাবে contrary produces contrary কথাটি সিদ্ধ হয়। তিনি কালী বেদান্তীর কাছে বিষয়টী উপস্থিত করলেন। কালী মহারাজ তখন পাশ্চাত্য

দর্শনের এক মনোযোগী ছাত্র। তিনি তখন Uberweg দর্শনের ইতিহাসখানি আরম্ভ করেছেন। তিনিও ঐ বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলেন না। তখন বিবেকস্বামীর কাছে বিষয়টী ধরে দেওয়া হয়। সেদিন স্বামিজীর মুখে দর্শনের এক অদ্ভুত বিচার-স্ফুরণ হয়েছিল—ভবিষ্যত দার্শনিক ও মনস্বী বিবেকানন্দের সে এক স্তোক প্রকাশ।

সেদিন কালীমহারাজ, যোগেন মহারাজ, শরৎ মহারাজ আর মহেন্দ্র দত্তজী গেছেন গিরীশমন্দিরে। বাগবাজারের এই বাড়ী এখন স্মৃতিমন্দির হয়েছে। নাট্যসম্রাট সদরের উপরের ঘরে দেয়ালে হেলান দিয়ে বসেছিলেন। স্বামিপাদেরা পশ্চিমের দিকে গিয়ে বসলেন। ঘোষজা তখন বেশ খুশীতে ছিলেন। তিনি তাঁর সহজ ভঙ্গীতে সেদিন বলে চল্লেন কি করে প্রসাদ বলে মাছের ডিম খাইয়ে ছিলেন নাগমহাশয়কে। শ্রদ্ধা কাকে বলে এই কথা তিনি সেদিন নাগমহাশয়ের জীবন দীপায়নে দেখান। ঘোষজা তাঁকে একখানি কম্বল দেন। কিন্তু নাগমহাশয় ছিলেন সত্যিকার ফণাধারী নাগ। তিনি সেই কম্বল মাথায় করে নিয়ে বেড়াতে সুরু করলেন। কি শীত কি গ্রীষ্ম সকল অবস্থায় তিনি সেই কম্বল মাথায় করে বেড়াতেন। স্বামিজী সত্যই বলেছেন,—বয়ং তত্ত্বান্বেষাং হতাঃ মধুকর ত্বং খলুকৃতিঃ।

এই সব কথার মাঝে দেখা গেল নাগ মহারাজ হাঁটুর ওপর হাঁটু রেখে বসেছিলেন। আরক্তিম জলে ভরা অথচ কি দীপ্ত সে চোখ। ক্ষীণ দেহ ঈষৎ কাঁপছিল। কালীমহারাজ ও আর সকলে একটি জাজিমের ওপর বসেছিলেন। পাছে তাতে নাগ মহাশয়ের পাদস্পর্শ হয় তাই তাঁর এমনি ত্রিশঙ্কুর অবস্থায় বসা হয়েছিল। এ সময় মুখে দাড়ি ছিল।

আর একবার আমরা কাশীপুরের লীলায় ফিরে যাই। স্বামিজী তাঁর জীবন কথায় বলেছেন,—আমি কাশীপুরে দিনে দুই ঘণ্টা ও রাত্রিতে দুই ঘণ্টা সেবা করতুম। শ্রীঠাকুরের গায়ে তেল মাখিয়ে গাড়ীবারান্দার ছাদের উপর জল-চৌকিতে বসিয়ে স্নান করাতুম। স্নানের সময় ও স্নানের পর কত কথা বলতেন, কত আধ্যাত্মিক আলোচনা হত। সে কথা আজ নিস্তরঙ্গেই ডুবে গেছে। একদিন একটি ছোট কাঠি নিয়ে দেওয়ালের বালির উপর একটি পাখী আঁকলেন। পাখীটী দেখে মনে হয়েছিল যেন জীবন্ত। ঠাকুর বললেন,—আমি ছেলেবেলায় সব পোটোদের ছবি এঁকে অবাক করে দিতুম।

ঠাকুর কেন যে পাখী এঁকে ছিলেন আজ সে কথা কে বলবে ? তবে লীলার স্মরণে মনে হয় স্বামিপাদদের কথা চিন্তা করে ঠাকুরের হোমাপাখীর কথাই কি মনে ভেসে উঠেছিল ?

ঠাকুরকে দেখাশোনার সময় স্বামিজী গভীর রাত পর্য্যন্ত জেগে থাকতেন। কাশীপুরের বেদনসত্রের কথা বেশী করে বলা আরও বেদনাদায়ক। তবে দু' একটি কথা স্বামিজীর সম্বন্ধে না বললে মন ভরে না। স্বামিজী আইন পরীক্ষা দেবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। কাশীপুরের বাগান বাড়ীতে বইগুলি সব নিয়ে এসেছেন, অবসর সময় পড়বেন। এমনি পড়ার ব্যস্ততায় স্বামিজী কয়েকদিন ঠাকুরকে দেখতে যেতে পারেন নি। মহামায়ার কি লীলা! সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষিও যাচ্ছেন মাঝে মাঝে ভেসে, আপনহারা স্রোতে। একদিন অবসর মত স্বামিজী ঠাকুরকে প্রণাম করে, বসলেন। ঠাকুর সস্নেহে জিজ্ঞাসা করলেন,··· এতদিন কোথায় ছিলি ? স্বামিজী উত্তর দেন আমি আইনের পড়া নিয়ে একটু ব্যস্ত আছি। ঠাকুর বললেন,—দেখ তুই যদি উকিল হস আমি তোর হাতে খেতে পারবো না।—স্বামিজীর মনে তখন আইন পড়ার জন্যে সাগরমুখী ঢল নেমেছে। তীব্র সে ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঠাকুর যদি অন্য ভাবে বাধা দিতেন তাহলে হয়ত কাজ হত না। কিন্তু প্রেমের যাদুর স্পর্শে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত চেষ্টা যেন তুষার তীর্থের মত স্তব্ধ হয়ে গেল। স্বামিজী কালীমহারাজকে বললেন,—আমার আইন পড়া আর হবে না। এর পরে কাশীপুরের অশ্রুতীর্থ জপে ধ্যানে, পূজাপাঠে, সেবায় হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ। দ্বাদশ এ্যাপসল্‌দের চলে প্রস্তুতি।

আর একদিনের কথা, স্বামিপাদেরা হতাশ হয়ে পড়েছেন ঠাকুরের জীবন নিয়ে। বাগানের এক গাছতলায় বসে আছেন স্বামিপাদেরা। সেদিন পৌষ মাস। হিমঝরা রাত্রি, গাত্রাবরণ নাই বললেই হয়। সহসা সকলের মনে হল ধুনি জ্বালার কথা, সাধুদের প্রাচীন প্রথায়। শুকনো গাছের ডাল-পালা জোগাড় করে সেদিন থেকে ধুনি জ্বালার ব্যবস্থা সুরু হয়ে গেল। এই ধুনির পাশে বসে শাস্ত্রালোচনা ধ্যান ইত্যাদি করে সারারাত্রি কেটে যেতো পরমানন্দে। গীতার ব্রহ্মাগ্নিতে বাসনা সমূহের আহুতি এইরূপে তাঁরা করলেন সুরু। জপধ্যান, অষ্টাবক্র সংহিতা, গীতা এই সব পাঠে এই সময় যেত কেটে। শুকনো পাতার মত ঝরে গেছে সে সব দিন।

শাস্ত্র আর সদাচার, এদের প্রতিষ্ঠা করতেই তো অবতার আর অবতারকল্প পুরুষদের আসা। তাই একদিন নরেন্দ্রনাথের মনে শাস্ত্র-সম্মত সন্ন্যাসের কথা যেন দিব্য প্রেরণাতেই উঠে পড়ে। কথাটা শুনেই কালী মহারাজের মনে জাগে সংকল্প। তিনি জানান যে প্রেষাদি সব মন্ত্র তাঁর কাছে লেখা রয়েছে। স্বামিপাদ আরো বলেন বরাবর পাহাড়ে যাবার রাস্তায় দেখা হয় দশনামী সম্প্রদায়ের এক সাধুর সঙ্গে, আর তাঁর কাছেই পান এই সব বিরজাহোমের মন্ত্রাদি। ভাল একটা দিনও স্থির হল।

বারশত নিরানব্বই-এর এক পবিত্র ক্ষণে সমিদ্ধ অগ্নি সাক্ষী করে কৃতস্নান ও কৃতশ্রাদ্ধ লীলাপার্ষদেরা এসে বসেন শ্রীঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে—পবিত্র সন্ন্যাসমন্ত্রে হবেন দীক্ষিত। নামগোত্র পরিত্যাগের পর গুরুদত্ত নামে ভূষিত হবার কথা। কিন্তু সে অভাবে শ্রীঠাকুরের পাদুকা সাক্ষী করে নাম নিলেন নিজেরাই। নরেন্দ্রনাথ হলেন বিবিদিষানন্দ, রাখাল মহারাজ হলেন ব্রহ্মানন্দ, শ্রীঠাকুরের পূজায় একনিষ্ঠ সেবাধিকারে শশী মহারাজ হলেন রামকৃষ্ণানন্দ। অদ্ভুত জীবন ছিল লাটু মহারাজের তাই তাঁর নাম স্বামিজী দিলেন অদ্ভুতানন্দ। তারক মহারাজ প্রায়ই শিব-মহেশ্বরের মত ধ্যান করতেন শবাসনে, তিনি হলেন শিবানন্দ। ইনি অবশ্য বিরজা হোম পরেই করেছিলেন। যোগীন মহারাজের নাম হয় যোগানন্দ। কালী মহারাজ ছিলেন বৈদান্তিক, তাই স্বামিজী তাঁর নাম দিলেন অভেদানন্দ। এসব দিব্য কর্ম্মের ঋত্বিক যে অভেদ মহারাজ নিজেই ছিলেন—একথা বলাই বাহুল্য।

শাস্ত্রমতে এই সন্ন্যাস—পরমহংস সন্ন্যাস। সমস্ত কাম্য কর্ম্মের নিঃশেষ আহুতিই এর পরিণতি। কিন্তু শশীমহারাজ পূজাদি কোন দিনই পারেননি ছাড়তে। কিন্তু স্বামিজী চিরদিনই মন মুখ এক করার ছিলেন পক্ষপাতী। একদিন এই নিয়ে কিছু কথান্তর হয়। পূজার কথায় স্বামিজীও শুনবেন না আর শশী মহারাজও ছাড়বেন না। শেষে শশী মহারাজ চুলের মুঠি ধরে নরেন্দ্র নাথকে ঠাকুর ঘরের বাইরে নিয়ে যান। নরেন্দ্রনাথের তখন বেশ বড় বড় চুল ছিল। শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত ছিল নরেন্দ্রনাথই সব ছেলেদের দেখবে। এই ঘটনায় নরেন্দ্রনাথের নেতা হবার যোগ্যতার পরিচয় বিশেষ ভাবেই পাওয়া যায়। তিনি বলতেন,—শিরদার ত সর্দ্দার। তাই এমন অপমানিত হয়েও হাসিমুখে শশী মহারাজের করেন প্রশংসা—গুরু নিষ্ঠার জীবন্ত বিগ্রহের এই তো পরিচয়।

অবশ্য শশী মহারাজ এর জন্যে অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন নেতা নরেন্দ্রের কাছ থেকে। এ যেন শিব রামের যুদ্ধের বালখিল্য রূপ।

জীবন আর্টে আহিতাগ্নিক ছিলেন বিবেকস্বামী। স্বামিজী ছিলেন যথার্থই আর্টিষ্ট। আর্টের কথায় তিনি সময়ে সময়ে মত্ত হয়ে পড়তেন। কুরুক্ষেত্রের ভগবান কৃষ্ণের মূর্ত্তি আঁকবার কথায় যে ভাব দিয়েছেন তাই শুনে তখনকার নামকরা শিল্পী রণদাচরণ বাবু যেন নিথরই হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর আর্টের আদর্শের কথা আজো অমর হয়ে আছেন নানা লেখায়।

কালী বেদান্তীও আর্টের অনুরাগী ছিলেন এই সময়। ধ্রুপদের সঙ্গে পাখোয়াজ বাজাবার লোক পাওয়া ভার হত। তাই আমাদের মহারাজের তবলা শেখার হল প্রচেষ্টা। তখনকার কলকাতায় গোপাল মল্লিক একজন নামকরা পাখোয়াজী। চরৈবেতি মন্ত্রের ঋষি সুরু করলেন মল্লিক মহাশয়ের কাছে সঙ্গত শিক্ষা। তবলার বোল আর পরণ নিয়ে এসে আশ্রমে চলত তার রেওয়াজ। কিছুদিনের মধ্যে পাখোয়াজ বাজানো বেশ রপ্ত হয়ে গেল। এরপর বিবেকপাদের সঙ্গে পাখোয়াজের সঙ্গতকারার অভাব আর বড় হত না। সেদিন রামদত্তজার বাড়ীতে এক জলসার আসর বসেছে। গোপাল মল্লিককেও আনা হয়েছে, সঙ্গত করবেন স্বামিজীর সঙ্গে। আমাদের স্বামিপাদও নিমন্ত্রিত। তাঁকেও ভার দেওয়া হয়েছে যেখানে গোপাল মল্লিকের চৌতাল ধামারের তাল ভুল হবে সেখানে হাতে তাল রাখবেন কালীপ্রসাদ। সে জলসায় আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল দুই স্বামিপাদ—সুরেরও আগুন আছে.... বিশ্বজয়ী নরেন্দ্র নাথের জীবন সঙ্গতে বুঝি একমাত্র অধিকারী ছিলেন কালীপ্রসাদ ......

আলমবাজার মঠের কথা, বেদনরম্যতা নিয়ে আজও জেগে আছে পুরাণো পাতায়। চায়ের আসর—চা বলতে কেবল লাল জলই থাকত অন্য উপাদান বিশেষ থাকত না। এই চায়ের আসরে হরি মহারাজ আর কালী মহারাজ উচ্চ কথায় মোড় ফিরিয়ে দিতেন কথা প্রসঙ্গের। সে সব দিনের দিনলিপি চিরদিনের জন্য আমরা হারিয়েছি, কিশোর কালীপ্রসাদের স্ফুরোন্মুখ মনীষার কত পরিচয়ই না ছিল। হাসি শুভ্রতার মাঝে মাঝে এই দার্শনিক চিন্তাগুলি নিটোল মুক্তার মতোই উচ্ছলিত হয়ে উঠত; কত দিনই না আমেরিকা থেকে মাঝে মাঝে প্রেরিত স্বামিজীর পত্রগুলি পড়ে এঁরা আনন্দ করতেন। শুচি শুভ্র সেই

আলমবাজারের দিনগুলি কি বরণীয়ই না ছিল। কিছু আগেকার কথা—কালী মহারাজ এসেছেন মাদ্রাজ হতে জাহাজে করে, তুলসী মহারাজও এসেছেন উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হতে। মঠে আনন্দের হাট বাজার বসে গেছে। ভাঙ্গা ভূতের বাড়ীতে নেমে এসেছে জড়ো করা ফাগুন। সেদিন হঠাৎ একটি ছোট চৌকি আর পড়বার আলো এসে পড়েছে। স্বামিপাদ চির পাঠনিরত মন নিয়ে জিনিষ দুটিকে দুহাতে জড়িয়ে আপন করে নিলেন। রাখাল মহারাজ প্রায় ঐ সময়েই এসেছেন ফিরে। হরি মহারাজ স্বামিজীর কথা বলতে বলতে যেন উচ্ছল হয়ে উঠছেন। বলছেন,—বোম্বাইয়ে স্বামিজীকে দেখলাম যেন নূতন মানুষ। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, জগতের আচার্য্যের পদবী নিয়ে দাঁড়াবার মুহূর্ত্ত আসন্ন; বলছেন,—হরি ভাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম কিছু বুঝলাম না, বুকটা গেছে বেড়ে—বুকের ভেতর ভালবাসা এসে গেছে...এই প্রেমের সপ্তস্বর্গ থেকেই স্বামিজী সমস্ত জগৎটাকে আপন করে নিতেই এসেছিলেন। রাখাল মহারাজ এই সময় মঠে আসেন ফিরে। সেদিনের বিষণ্ণ মেঘ গেছে কেটে। আসন্ন পূর্ব্বাশার হৃদয় নিয়ে রাখাল মহারাজ তখন ভবিষ্যতের কর্ণধার রূপে তৈরী হচ্ছেন। সর্ব্বদা জপ করছেন পায়চারী করতে করতে। ধীর, স্থির, বিনয়ী, স্বল্প ভাষী রাখাল রাজা যেন তখন থেকে সবারই রাজা। এই সময় যোগেন মহারাজও আলমবাজার মঠে এসে যোগ দেন। অজীর্ণ রোগে তখন থেকে তাঁর শরীর ক্ষীণ হতে সুরু হয়। স্বাস্থ্যের জন্য দার্জ্জিলিংও যান কিন্তু কোন ফল হয়নি। তখন ডাক্তারী চিকিৎসা ছেড়ে তিনি গঙ্গাধর কবিরাজের চিকিৎসা করান। রোগ কিছু স্তিমিত হলেও সম্পূর্ণ আরোগ্য হয়নি। অজীর্ণ রোগে সাধারণ লোক একটু রুক্ষ স্বভাবের হয়ে যায়। এটি আমাদের জানা আছে, কিন্তু যোগীন মহারাজকে কখনও কেউ বিষণ্ণ কি রুক্ষ হতে দেখেনি। নরেন, গিরীশ ঘোষ সহজ্জ সম্মানেই তাঁর কথা নিতেন! বরাহনগর মঠের অস্বচ্ছলতা আলমবাজারেও এসে পড়ে, কিন্তু এক বছরের জন্যে। এরপর অজস্র সুবিধা কিশোর সাধুদের জীবন ধারায় এসে করে সঙ্গম সৃষ্টি। ভক্তেরা অকৃপণ হাতে মঠের পরিচর্য্যা সুরু করেন। পুরাণো স্মৃতি কেন এত ভালো লাগে তা জানা নাই। তবে ভাল লাগে এ নিশ্চিত। সুখের স্মৃতি তো ভাল লাগেই—দুঃখের স্মৃতিগুলিও পুরাণো দিনের রামধনু মাখা হয়ে আকুল হয়ে নেয় জড়িয়ে···বোধহয় যা হারিয়ে গেছে—যাকে ফিরে পাবার উপায় নাই, তাকে নিয়েই তো :জীবনের আর্ট। যাই

হোক আমাদের স্মৃতি মন্থন করে আলমবাজারের আরও দু একটি কথা এখানে লেখা মন্দ হবে না। চিকাগোর জয়বার্ত্তা প্রকাশ হবার পর আলমবাজার মঠেই কিছু গোলমালের সৃষ্টি হয়। স্বামিজীর গুরুভাইদের কেউ কেউ একটা বিরোধী দলই সৃষ্টি করে ফেলেন। স্বামিজীর প্রথম প্রথম বক্তৃতাগুলিতে ঠাকুরের কোন নামই থাকত না। এর কারণ পরে জানা যায়। ওদেশে ঠাকুরকে প্রচার করার চেয়েও আমাদের বেদান্তের বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের প্রচার করা সুবিধাজনক হবে এটি স্বামিজী দেখেছিলেন, কাজেই স্বামিজী ঠাকুরের কথা চেপে রেখেছিলেন। হরমোহন মিত্র প্রভৃতি তো একটি ছোট পুস্তিকা ছাপিয়ে ফেলেছিলেন। তাতে স্বামিজীর নাম ছিল ছোট ছোট হরফে আর ওপরে বড় হরফে ঠাকুরের নাম ছিল। উদ্দেশ্য ছিল স্বামিজী যে ঠাকুরের শিষ্য সেইটিই বড় করে জানান। এমন সময় আলমবাজার মঠে স্বামিজীর দুটী পত্র এসে পড়ে, স্বামিজী লেখেন,—ঠাকুরের নাম করা হচ্ছে না বলে কেউ যেন মনে কিছু না করেন। প্রথম প্রথম ঠাকুরের নাম করলে তেমন জমবে না। এখনও একটু দাঁড়াবার জায়গা পাইনি। একটু দাঁড়াবার জায়গা হলে তখন ঠাকুরের কথা বলা হবে। এখন বক্তৃতায় বেদান্তের কথা বলা হচ্ছে। স্বামিজীর এই সব লেখা পড়ে এদের মনের মেঘ যায় কেটে আর বুঝতে পারেন যে স্বামিজীর এখন এমন শক্তি হয়েছে যে ওখান থেকে কলকাতায় তাঁর নামে কি সবাই বলছে সেটা জানতে পারছেন।

পুরণো কথায় আবার ফিরে আসি, দেখি—সেদিন দক্ষিণেশ্বরে সংবাদ আসে যে বিবেকস্বামীর বিবাহ সব ঠিক। শ্রীঠাকুরের সহসা কি হল • তিনি একখানি গাড়ী করে সিমলায় যাত্রা করলেন। সঙ্গে স্বামিপাদ। বাড়ীর কাছে আসার পর নরেন্দ্রনাথকে পাঠালেন ডেকে। সে এলে তাঁকে প্রশ্ন করেন—তোর নাকি বিবাহের সব ঠিক। নত মস্তকে নরেন্দ্রনাথ সে কথা করেন স্বীকার। শ্রীঠাকুরের কি ভাবান্তর হল কে জানে। তিনি স্বামিজির হাতের পেশী একটু টিপে বললেন, —যা, তোর বিয়ে হবে না। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ী করে দক্ষিণেশ্বর করলেন যাত্রা। ঘটনা যে সত্য হয়েছিল একথা আমরা সকলেই জানি। তবে এর মধ্যে কি রহস্য ছিল তার সব কথা আমাদের জানা নাই। সত্যই কি বিবেকস্বামী বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হতেন, না ঠাকুর একটা ছল করে দর্শন করে গেলেন প্রধান পার্ষদকে —কে জানে? অভেদ মহারাজের বিবৃতিতে পাই যে বৃন্দাবন বাসের পর শ্রীমা,

যোগীন মহারাজ, লাটু, গোলাপ মা ও যোগেন মার সঙ্গে ফিরে অসেন। বলরাম-বাবুর বাড়ীতে কয়েকদিন থাকার পর—কামারপুকুরে ফিরে যান। স্বামী যোগানন্দ শ্রীমাকে কামারপুকুরে রেখে ফিরে আসেন কলকাতায়। এবার তাঁদের সন্ন্যাসদীক্ষার পালা। এই ঘটনার পর সাধনার অনুকূল স্থান হিসাবে স্বামী যোগানন্দ প্রয়াগে যাত্রা করেন। এই সময় শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে আটমাস বাসের পর বেলুড়ে রাজুগোমস্তার ভাঙ্গা বাড়ীতে এসে কিছুদিন থাকেন। এর পর দেশের বাড়ীতে কিছুদিন থেকে গয়া যাত্রা করেন। উদ্দেশ্য শ্যামাসুন্দরীর ঊর্দ্ধদৈহিক পিণ্ড দান। সঙ্গে চললেন বুড়ো গোপালদাদা। বুদ্ধগয়ায় মঠ দর্শনে মার ভাবান্তর উপস্থিত। ব্যাকুল হয়ে তিনি প্রার্থনা করেন,—ঠাকুর ছেলেদের যেন একটি থাকবার ঠাঁই হয়।…জগজ্জননীর এই ব্যাকুল প্রার্থনায় যেন মঠের ভিত্তি স্থাপিত হল। ভগবান বুদ্ধদেবের তপস্যায় জেগে উঠেছিল অসংখ্য সংঘারাম, আর মার একফোঁটা চোখের জলের ভিত্তিতে গড়ে উঠল অসংখ্য দেবারাম। শ্রীমা যখন বেলুড়ে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে থাকেন তখন কালী মহারাজ বরাহনগর মঠে তীব্র তপস্যায় দিন কাটাচ্ছেন। সেই তপস্যার ফলেই না আমরা পেয়েছি দিব্য স্তোত্রগুলি। মা সেগুলি শুনে বলেছিলেন,—তোমার মুখে সরস্বতী বসুক…মার এ বাণী যে সার্থক হয়েছিল স্তোত্রগুলি পাঠেই আমরা তা বুঝতে পারি। শ্রীমার শ্রীহস্তের রুদ্রাক্ষের মালাও এই সময়ে স্বামিপাদ পান মার প্রসাদস্বরূপ।

এর পর অভেদ মহারাজ—একবার মার সঙ্গে আঁটপুরে গিয়েছিলেন। এই আঁটপুর গ্রাম ধন্য হয়েছিল বাবুরাম মহারাজের জন্মভূমি হিসাবে, বর্ত্তমানে এখানে একটি মঠ নির্ম্মিত হয়েছে। এবার শ্রীমার সঙ্গে আরও অনেকে ছিলেন, যোগানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, তুলসী মহারাজ ও আরও কেউ কেউ।

কামারপুকুরে স্বামিপাদ পরিব্রাজক জীবনের জন্য হলেন প্রস্তুত। শ্রীমার আশিস-মঙ্গল মাথায় নিয়ে তুলসী মহারাজকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন তীর্থপথে। গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে—কৌপীনবন্ত দুইজনে কক্ষচ্যুত দুটি তারার মত চললেন—সাঁওতাল পরগণার মধ্য দিয়ে। পথটা একটু ঘোরা পথ হল। আমাদের পরে বলেছেন,—বীরভূমের পাশ দিয়ে মহুয়া কুড়িয়ে খেতে খেতে চলেছিলাম দুই সন্ন্যাসী……ব্রত ছিল টাকা পয়সা কারো কাছে নেবো না, জামা জুতো পরবো না, অনিকেত হয়ে চলবো, আর তিন বা পাঁচ বাড়ীতে একবার ভিক্ষান্নে মধুকর ব্রত নিয়ে চলবো, 'কৌপীনবন্ত খলু ভাগ্যবন্তের মত'।

এমনি করে দিন ২৫।৩০ মাইল করে এঁদের পরিব্রাজন হত।—এমনি ভাবে চলে গাজীপুরে তাঁরা পৌঁছালেন—সেখানে পওহারী বাবার সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। হরিপ্রসন্নবাবু ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গেও এখানে তাঁদের সখ্যতা হয়—ইনি জেলা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন। পরে মঠে যোগদান করে—বিজ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন। এখানে এক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, স্বামিপাদের কাছে শাস্ত্র যুদ্ধে পরাজিত হন—ভবিষ্যৎ পরাজয়ের অগ্রস্থুরী স্বরূপ। এই গাজীপুরেই তাঁর Memories of Sri Ramakrishna গ্রন্থের প্রথম পদক্ষেপ হয়। গিরীশচন্দ্র বসু ও ঈশান মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যে শ্রীঠাকুরের বাণীর ইংরাজী অনুবাদ করেন। গিরীশবাবু পাণিনি ও ঈশোপনিষদের ইংরাজী অনুবাদ করেছিলেন, এ বিষয়েও তিনি তাঁর সাহায্য করেন।

দূর থেকে অযোধ্যা দর্শন হোল। আর সরযূ...সীতা নয়ন কজ্জলিত সরযূ ...বিশাল...বিপুল...তীরে কূর্ম্মসঙ্কুল জলরাশি...মঞ্চে মঞ্চে সাধুদের ধ্যান স্তিমিত মূর্ত্তি—আর শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির ভাষা খুঁজে না পেয়ে বেদন যেন জটাহারা জাহ্নবীর মতই কল কল করে ওঠে.... ...

মনে পড়ে—

রামায়ণ নিচোরিত সরযূর জল
আজো কয় কথা
আজো যেন কাঁদে ছল ছল।
আজো যেন লুটাইয়া নীল নর্ম্ম সাথী
কাঁদে সে—সীতা কোথা
কোথা সীতা
কোথা স্বর্ণ কাঁতি।

মনে পড়ে—

তিলে তিলে হোমশিখা সম
আপনারে আহুতি প্রদান,
নিঃশেষিত নয় তবু
শেষ নীলজলে
তবু অনির্ব্বাণ।

অযোধ্যা পেরিয়ে এঁরা এলেন লক্ষ্ণৌ-এ। এখানে জনৈক হিন্দুস্থানী ভক্ত রেলের ভাড়া দিতে চাইলেন। কিন্তু তখন তাঁরা অর্থ স্পর্শ করতেন না, কাজেই

ভক্তটি টিকিট ও কিছু খাদ্যদ্রব্য সঙ্গে দিলেন। মহৎকে চিনতে পারাই মহত্ত্ব। দীন হলেও তারা দীন নয়।

হরিদ্বার হয়ে এর পর হৃষিকেশে যাওয়া হল। লছমনঝোলা তখন ঝোলা মাত্র। বিপজ্জনক দড়ির পুল ধরে গঙ্গা পার হন। এর পর ধীরে ধীরে উত্তরকাশী, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি হিমকান্তার তীর্থগুলি দর্শন করে বদরিকাশ্রমে এসে পৌছান। 'চরৈবৈতী' মন্ত্রের ঋষির বুকে তখনও অনির্ব্বাণ তৃষা। এগিয়ে চলেন মন্দাকিনীর বন্ধুর বিপদসঙ্কুল পথ ধরে কেদারনাথে। তখন কেদারের পথ এখনকার মত সুগম হয়নি। সেখানে চৌদ্দহাজার ফিট উর্দ্ধে একস্থানে গুহায়িত হয়ে তপস্যামগ্ন হয়েছিলেন। আমাদের মনে পড়ে এ যুগের Ulyssis-এর কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল To knowledge like a sinking star beyond the utmost bound of human thought to strive, to search, to find and not to yield.

এবার স্বামিজীর লক্ষ্য গোমুখ গঙ্গোত্রী। গঙ্গার ধারে ধারে পথ। পথ তাকে বলা চলে না। দুর্গম উপলছাওয়া পথ, পদপ্রদর্শকদের হাত ধরেই পার হতে হয় অনেক জায়গায়। গঙ্গোত্রী যাবার পথে উত্তরকাশী পড়ে—সেখান হতে ভাটমারী চটী যেতে হয়। পথে বন্য গাছের সমারোহ। স্বামিপাদ বদরিকাশ্রম থেকে ফিরে ত্রিযুগীনারায়ণ হয়ে এই দুর্গম পথে চলা করলেন সুরু। কয়েকদিনেই উত্তরকাশী এসে পৌছুলেন। উত্তরকাশী সাধু সন্তদের বারাণসী। এখানে দ্বিতীয়াশ্রমীদের থাকার ব্যবস্থা ছিল না। এখন ভাটমারী চটী থেকে দুটী সর্পিল পথ গিয়েছে দুই দিকে। একটি যমুনোত্রীতে—অন্যটি গঙ্গোত্রীর দিকে। এখন অবশ্য যমুনোত্রীর কোন চলাচলের পথ নেই ··একটি পথ আছে কেদারনাথের দিকে। তাঁরা গঙ্গোত্রীর পথ ধরে এগিয়ে চললেন। চারিদিকে ঝোপ ঝোপ সিদ্ধির গাছ। শিশুসুলভ চপলতায় স্বামিপাদেরা সেই সিদ্ধির পাতা মুঠো মুঠো খেতে সুরু করলেন। শীতার্ত্ত সাধুদের বোধ হয় এই পাতার প্রয়োজন, তাই প্রকৃতির এই আয়োজন। গঙ্গার পাশ দিয়ে পথ, সে পথ দেখে স্বতঃই ব্যাসকৃত স্তোত্র মনে পড়ে, গঙ্গাতরঙ্গরমণীয়জটাকলাপম গৌরীনিরন্তর বিভূষিত বামভাগং। নারায়ণবারাণসী পুরপতিং ভজবিশ্বনাথং। এই একটানা উপলভাঙ্গা শব্দ যেন শঙ্করের ডমরু নিনাদই মনে হয়। স্বামিপাদরা গঙ্গোত্রী পার হয়ে গঙ্গার উৎপত্তিস্থল গোমুখীর পথ ধরলেন। গঙ্গোত্রী মানুষের অধ্যুষিত শেষ পৈঠা। গঙ্গোত্রী ও

গোমুখীর মাঝখানে তপোবন, প্রকৃতির নিজের হাতে বিন্যস্ত ফুলের দেশ। গোমুখীর পথরেখা গঙ্গার কোল ঘেঁষে চলে গেছে। পথের সঙ্গে তার যেন অবাধ মিতালী, ডানদিকে রডেনড্রন, আর লম্বা লম্বা পাহাড়ী গোলাপ গাছ, বনভূমি যেন মায়াপুরী। মন আপনা হতেই হয়ে পড়ে ধ্যান নিষণ্ণ...... প্রকৃতির সঙ্গে মনের এক অপরূপ মিতালী! বরফের নদী থেকে সপ্তধারাময়ী এই গোমুখী। এই গোমুখী কিছু চিরচঞ্চলা, কালের প্রবাহের মত এখান থেকে গঙ্গার উৎপত্তি। স্বামিপাদেরা সেখানে একরাত্রি বাস করেন। শীতার্ত্ত সাধুদের সম্বল কাঠ লতাপাতা আর ভূর্জ্জপত্র! ধুনি জ্বালিয়ে কাটলো ধ্যানময়ী সে রাত্রি। এক নানকপন্থী উদাসী সাধু তাঁদের সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ও খুব যত্ন করেছিলেন। মনে পড়ে উত্তর কাশীতে আচার্য্য শঙ্কর যখন বেদান্তর ভাষ্য লিখেছিলেন তখন এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে বিচারে প্রবৃত্ত হন। সাতদিন ধরে বিচার চলেছিল। বিচার যখন বিতণ্ডায় পরিণত হয় তখন পদ্মপাদকে মধ্যস্থ মানা হয়। পদ্মপাদ কিন্তু বৃদ্ধকে চিনতে পারেন আর যুক্ত করে মীমাংসায় প্রতিনিবৃত্ত হয়ে বলেন,—"শঙ্করঃ শঙ্করঃস্বয়ং ব্যাসো নারায়ণঃ হরিঃ।" এঁদের দুয়ের দ্বন্দে আমি কি করবো...... মীমাংসা এইখানেই হয়ে যায়। এর পর বৃদ্ধরূপী ব্যাসদেব আচার্য্যদেবকে আশীর্ব্বাদ করে অদৃশ্য হন, এমনি কিংবদন্তী আছে। পূর্ব্ব কাশীর মত বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দির আছে গঙ্গার পশ্চিম তীরে। মা গঙ্গা এখানে উত্তরবাহিনী।

স্বামিপাদেরা গঙ্গোত্রীর পবিত্র তীর্থ ত্যাগ করে আবার ভাটমারী চটীতে ফিরে এলেন—সাগরপন্থী গঙ্গার ধারার মত স্বামিপাদের ছিল চির তৈর্থিক মন। সেখানে এসে দেখেন সাধুরা যমুনোত্তরী যাবার জন্য প্রস্তুত। যাত্রা করলেন যমুনোত্তরীর বনবিন্যস্ত পথে। দুই বেলা করে পথ চলে যমুনোত্তরীতে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে তপ্তকুণ্ড আছে। কিছু আটা ও চাল ভিক্ষা করে একটি কাপড়ে বেঁধে সেটি তপ্তকুণ্ডে ফেলে দিলেন। এমনি সিদ্ধ ভাত সেখানে সাধুরা গ্রহণ করেন। অসহায় পথিকদের এমনি পরিচর্য্যাই করে থাকেন প্রকৃতি দেবী... স্বামিপাদেরা দারুণ শীতে একটি গুহাতে ডালপাতা জ্বেলে জপ ধ্যানে কাটান। আবার চলার হল সুরু। একটানা ভাটমারীর পথ। ফিরতেও দু তিন দিন লাগলো। এখান থেকে উত্তরকাশী হয়ে হৃষীকেশে ফিরলেন। হৃষীকেশে ফিরে

পূর্ব্বের মত স্বামিপাদ আর তুলসী মহারাজ ফুস ঘাস ও ডাল দিয়ে ঝুপড়ি তৈরী করে আবার তপস্যা সুরু করলেন...

এদিকে চলল কৈলাসগিরির মোহান্ত ধনরাজগিরির কাছে শঙ্করভাষ্য সমন্বিত বেদান্তের পাঠ। পরবর্ত্তীকালে ইনিই স্বামিজীর কাছে জানিয়েছিলেন, অভেদানন্দজীর অলৌকিকী প্রজ্ঞা। এইখানে অভেদ স্বামিজী ব্রহ্মানুভূতির এক চরম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। প্রথমে বিষ্ঠাচন্দনের সমজ্ঞানে সিদ্ধ হয়ে রোগাদির দ্বন্দসহিষ্ণুতার পরীক্ষার জন্য দৃঢ় প্রার্থনা করেন। তিন দিনের মধ্যে জ্বর, ব্রঙ্কাইটিশ, রক্ত আমাশয় ও হৃদযন্ত্রের পীড়ায় একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। শ্রীঠাকুরের একান্ত করুণাতেই যেন সে সময় তুলসী মহারাজ, হরি মহারাজ, শরৎ মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় এসে পড়েন। যখন তিন চার দিনে শুশ্রূষার পর স্বামিপাদ একটু সুস্থবোধ করলেন তখন তুলসী মহারাজের সঙ্গে তাঁকে হরিদ্বার পাঠিয়ে দেওয়া হল। কাশী যাবার পথে তুলসী মহারাজ কাশীর একটি গাড়ীতে তুলে দিয়ে ফিরে যান হরিদ্বারে।

ক্ষীণ শরীর তাতে নিঃসঙ্গ স্বামিপাদ সারারাত্রি ট্রেনে বসে বসে কাটালেন। আত্মার এই বৈজয়ন্তীতে মনে তখন ঘনিয়ে এসেছে পরম প্রশান্তি। ভোরেই এসে পড়লেন কাশী বিশ্বনাথের আশ্রয়ে। সেখানে অন্নপূর্ণা-মার গৃহে হলেন অতিথি। উপযুক্ত পথ্য আর হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ধীরে ধীরে ক্ষীণ শরীরের সন্তাপ যায় কেটে। নিরাশ্রয়ের আশ্রয় এই জীবন্ত অন্নপূর্ণা, এর কথা স্বামিপাদের মনে মণিদীপই হয়েছিল চিরদিন। কিন্তু আঁধার বুঝি আঁধারেই ডেকে আনে! অন্নপূর্ণা-মার আশ্রয় ছেড়ে তিনি এলেন বংশীদত্তের বাড়ী। তাদের সেবাযত্নের ত্রুটি ছিল না। জনৈক ভক্ত প্রমদাচরণ রায় সহসা একদিন এসে বলেন যে, নরেন্দ্রনাথ কাশীতে তাঁর গৃহে আছেন, সর্দ্দিজ্বরে একেবারে শয্যালীন অবস্থা তাঁর। সেবা করবার লোকের অভাব হয়ে পড়েছে। কর্তব্য স্থির করতে অভেদপাদের তিলমাত্র বিলম্ব হয় না। সেই খিন্ন শরীরে তিনি চলেন সেবা করতে...

বহুদিনের অদর্শন—স্বামিজী পরমানন্দে গ্রহণ করেন অভেদজীকে কিন্তু তাঁর শীর্ণ দেহ দেখে ব্যথিত হয়ে সেবা-শুশ্রূষায় দেন বাধা। কিন্তু মৌন দৃঢ়তায় অভেদপাদ কর্মে হলেন ব্রতী। দিন দুই পর নরেন্দ্রনাথের দেহ হল বিজ্বর। কিন্তু তাঁর সেই ব্যাধি কালী মহারাজের দেহে নিল আশ্রয়। দুর্বল অক্ষম দেহে

নিলেন শয্যা। ইনফ্লুয়েঞ্জার পুনরাবৃত্তির অনেকসময় ভয়াবহই হয়ে ওঠে। ক্রমে জীবনদীপ হয়ে আসে ক্ষীণ। নরেনস্বামী হয়ে পড়েন ভীত—কালী তপস্বীর মন তখন ব্রহ্মাবগাহী। নির্ভীক নির্বিকারে শুধু ছন্দিত হতে থাকে—"চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং"...কখন-বা বলেন—"আত্মা বিজ্বরঃ, বিমৃত্যুঃ, বিশোকঃ।" সকলে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন এই ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের মুখের পানে। প্রসাদ-প্রসন্ন মুখে রোগের পাণ্ডুরতা যেন ঠাঁই পায় না।

স্বামিজীর সেবা প্রযত্নে কিছুটা সুস্থ হয়ে উঠলেন কিন্তু কলকাতা থেকে এক তার যোগে সংবাদ এলো গুরুভ্রাতা বলরামবাবু দেহত্যাগ করেছেন। ত্রস্তে নরেন্দ্রনাথ নিলেন বিদায়—কলকাতায় তাঁর যাওয়া যে একান্ত প্রয়োজন! কিন্তু কালীভাইকে এমন করে ফেলে যাওয়া কি করে সম্ভব? এই দ্বন্দ্বসমস্যায় নরেন্দ্রনাথের দুই চোখে নামে বেদনার ঢল। যেতে তাঁকে হবেই—কর্তব্য রয়েছে শ্রীশ্রীঠাকুরের ভক্ত পরিবারের প্রতি। কলকাতায় এসেই পাঠিয়ে দেন সারদানন্দ আর সদানন্দ মহারাজদের। এঁদের পরমার্ত্তিতে সে যাত্রা কালী মহারাজ প্রায় চার মাস পরে সুস্থ হয়ে ওঠেন। রোগের মহা পরীক্ষার শেষ এতদিনে।

চরণিক স্বামিপাদের মনে তখনও দিগন্তের ডাক। মন যে এখনও তৈর্থিক। বিদায় নিলেন সাধু ভাইদের কাছে। পবিত্র যমুনার তীরে ঝুঁসীতে তখন সাধু সন্তদের মেলা! ঝুপ্‌ড়ীতে ঝুপ্‌ড়ীতে ধূমায়িত ধুনি আর রিক্ততায় সে ভূমি যেন মন্দারের মাল্য রচনা করেছে। সূর্য্যাস্তের সময় যমুনার তীরে তীরে সন্তদের ভীড়। স্মৃতিচারণে কত না সিদ্ধ সন্তদের কথা এসে পড়ে—এমনি এক সন্ত-মেলায় তুলসীদাস ত তিলক অলকা রেখা শ্রীরামচন্দ্রের কপোল তলে এঁকে দিয়েছিলেন···তাঁর রামচরিত মানসই যে তার স্বাক্ষর।

চিত্রকুটকে ঘাটপর ভইসন্তনকী ভীড়
তুলসী দাস চন্দন ঘিসেঁ তিলক দেত রঘুবীর॥

পাঠে, নামে আর ভজনে আকাশ বাতাস হয়ে ওঠে মন্থর—স্বামিপাদের মন সানন্দে দেয় সায়। তিনিও একটি ঝুপড়ীতে বিছালেন তাঁর আসন। সারাদিন ধ্যানে, স্বাধ্যায়ে দিনগুলি হয়ে ওঠে প্রোজ্জ্বল। শুভ মুহূর্তের প্রতীক্ষায় যেন শুভমুহূর্তই থাকে। সহসা এসে মিলিত হলেন সদানন্দজী; দুইজনের সাধন স্রোতে উজান সৃষ্টি হল। সাধন ভজন আর শাস্ত্র স্বাধ্যায়। আনন্দ সঙ্গীতের মত দিন যায়

বয়ে—সেদিন প্রত্যাসন্ন সন্ধ্যা। বর্ষার মহলার বর্ষণ হয়ে গেছে শুরু। জনৈক নানকপন্থী সাধু কাছেই থাকতেন। ভিক্ষাটনের সঙ্গীও ছিলেন। এসে বলেন—এই বর্ষা আর সূর্য্যও অস্তাচলে! আসুন মহারাজ তাড়াতাড়ি ভিক্ষা করে ফেরা যাক। সহসা স্বামিপাদের ধ্যাননেত্রে জাগে গীতার যোগক্ষেমের কথা। ভগবানের শ্রীমুখের প্রতিজ্ঞা—আমি নিজে বয়ে নিয়ে যাই যোগ আর ক্ষেম ভক্তের কাছে, বলেন,—আজ গীতার বাণী প্রমাণ করে দেখবো। আজ আর ভিক্ষান্নে আমাদের ইচ্ছা নাই। ফিরে যান সাধুজী—অবাক হয়ে পড়েন সদানন্দ। এই অলস সন্ধ্যায় সারারাত্রির অনশন, ভাবাও যায় না। কাল কখন কি জুটবে তার স্থিরতা নাই। বসে থাকেন দুইজনে নিভৃত পাঠসুখে। 'বিচার সাগর' সেদিন ছিল পাঠের বিষয়। সহসা উপস্থিত কাশীপুরের চিরপরিচিত মৈত্র মহাশয়। এসেই বলেন,—ভাই কালী! এখানে এসে শুনলাম কালীবেদান্তী নামে একজন সমর্থী সাধু এখানে আছেন। শুনেই বুঝলাম এ আর কেউ নয় আমাদের কালীভাই। তাই এসে পড়েছি। সদানন্দকে দেখেও আর আনন্দ ধরে না। সরযূর তীর ছেড়ে এলেন ঝুপ্‌ড়ীতে, এসেই নানকপন্থীকে ডেকে পাঠান। ধ'রে দেন তাঁ'র হাতে মৈত্রমশায়ের আনা যোগক্ষেম···সেদিনের সন্ধ্যা সাধুজীর চোখে যেন গীতার নবছন্দই দিয়েছিল এঁকে। শ্রীঠাকুরের মঙ্গল হস্তে প্রেরিত সেই পরম প্রসাদে সেদিন সকলেই হয়েছিলেন পরম পরিতৃপ্ত। গীতা সেদিন যেন সুগীতাই হয়েছিল।

এবার পূর্ব কথায় ফিরে যাই স্বামিপাদ তখন গাজীপুরে। গাজীপুরে গোলাপের বাগান। সারা গাজীপুর শুধু নয় বহুদূর পর্য্যন্ত মহাত্মা পাওহারী বাবা ছিলেন চন্দন তরুর মতই পুণ্যময়। আশ্রমটি তাঁর চারিদিক ঘেরা তার মধ্যে গুহায়িত জীবন নিয়ে এঁর কাটত দিন। পবন আহার বা স্বল্প আহার ব্রতী ছিলেন বলেই লোকে তাঁর নাম দিয়েছিল পাওহারী বাবা। তিনি যোগী হলেও নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আর তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা সেই মন্দিরে পূজাদি করতেন। এই গুহায়িত জীবনেও তিনি লোক কল্যাণব্রত ছাড়েননি। কথামৃতেও পাই শ্রীঠাকুরের এক ভক্ত এই মহাত্মাকে দর্শন করে শ্রীঠাকুরের কাছে তাঁর কথা বলেন। আরো বলেন যে, গুহায় শ্রীঠাকুরের এক পট বিদ্যমান ছিল। ভক্তটির নাম মণিমোহন। যাই হোক স্বামিপাদ এঁর সম্বন্ধে অনেক যোগ ঐশ্বর্য্য শোনেন। শোনা যায় যে ইনি যোগ ঐশ্বর্য্যে কল্পতরুর মত যে যা চেয়েছে তাকে

তাই দিয়েছেন। এটা একবারের কথা। পাওহারী বাবা স্বামিপাদের আসার কথা শুনে তাঁর সঙ্গে কিছু ধর্ম্মীয় প্রসঙ্গ করেছিলেন,—কথায় ও ইঙ্গিতে। আমরা মানস নেত্রে দেখি দুই পবিত্র ধারা সেদিন গাজীপুরে এক সঙ্গমক্ষেত্র রচনা করেছিল। সাধুর রাজা শ্রীঠাকুরও এমনি কাশীর ত্রৈলঙ্গস্বামীর সঙ্গে একদিন দেখা করে এসেছিলেন। কথামৃতে আর লীলাপ্রসঙ্গে সেই চিত্রটি আজও রম্য হতেও রম্যতর হয়ে আছে।

স্বামিপাদের জীবনে পাওহারী বাবার একটি মধুর কথা, একটি দিব্য কাহিনী স্মৃতি সুরভিত•করে রেখেছে। মহতের যাদুস্পর্শে কেমন করে কয়লা হৃদয় সোনা হয়ে যায় এটি সেই কাহিনী। পাওহারী বাবার নিষ্কিঞ্চন ঘরে একদিন এক চোরের অভিযান ঘটে। চোরটি তাঁর তৈজসপত্র পুঁটলিতে বেঁধে পালাবার উপক্রম করে। সহসা পাওহারী বাবা জাগ্রত হওয়ায় সে সমস্ত ফেলে পালাতে থাকে। পাওহারী বাবাও সেই পুঁটলি নিয়ে তাকে অনুসরণ করেন। শেষে চোরকে ধরে ফেলায় চোর ক্ষমা ভিক্ষা করতে সুরু করে। পাওহারী বাবা তখন তাকে বলেন,—তোমার তো তৈজসপত্রগুলি প্রয়োজন, তাই তো তুমি আনতে গিয়েগিলে, অথচ না নিয়ে চলে এলে কেন ? তাই আমি ছুটে এসেছি সেইগুলি ফেরত দিতে। সেদিন থেকে সেই জিনভলজিন চিরদিনের জন্য অসাধু পথ পরিত্যাগ করে। বিবেকস্বামিপাদও এই চোরের সঙ্গে আলাপ করে মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন সেই চোর একজন খাঁটি সন্তহিসাবে পরিব্রাজক অবস্থায় ঘুরে :বেড়াচ্ছিলেন। ছোট ছোট সাধুসন্তদের ভিতর যতই বিদ্বেষ থাকুক না কেন মহাপুরুষদের অন্তরে এক সমভূমী আছে। যেখানে হিংসা দ্বেষের কোন স্থান নাই। তৎকালীন বিদগ্ধজনেদের কাছে স্বামিপাদ পরিব্রাজক অবস্থায় গেছেন ছুটে—যেমন তিনি গেছেন আমেরিকায় বিদগ্ধমণ্ডলীর মধ্যে। সাত্ত্বিকতা বোধহয় চুম্বকধর্মী।

ভাস্করানন্দ স্বামী তখন কাশীতে থাকেন। একটি বাগান বাড়ীতে তাঁর আশ্রম। পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। পরিচয়ে কেন জানিনা তাঁর মুখে ঈষৎ হাসি ফুটে ওঠে। ভাস্করানন্দজীর সঙ্গে এঁদের কিছু শাস্ত্র বিচার হয়েছিল। এতে তাঁর পাণ্ডিত্যের অগাধ স্বাক্ষর ছিল। কিন্তু স্বামিপাদ বুঝেছিলেন যে, ইনি এখনও সিদ্ধ হতে পারেননি। ঠাকুরের দেখা• ত্রৈলঙ্গস্বামীকেও এঁরা আর একদিন দেখেছিলেন। ইনি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী। ইনি সর্ব্বদা শ্লেট পেনসিল

রাখতেন, লিখে লিখে উত্তর দিতেন। এঁকে দেখে মনে হয়েছিল, সত্যিই ইনি কাশীর একজন সিদ্ধপুরুষ। প্রথম দিন গিয়ে দেখেন দশাশ্বমেধ ঘাটে পাথরের সিঁড়ির ওপরে সুখে শুয়ে আছেন। এদিকে গরমে পাথরে পা রাখা যাচ্ছে না! আশ্চর্য্য হয়ে স্বামিপাদ ফিরে আসেন। পরদিন তাঁর আশ্রমে গিয়ে দেখা করলেন। কাশীতে বেণীমাধবের বাগানের কাছেই তাঁর আশ্রম। স্বামিপাদেরা ঈশতত্ত্ব সম্বন্ধে একটু প্রশ্ন করেন। তিনি হেসে মুখের দিকে তাকিয়ে সংস্কৃততে তার উত্তর শ্লেটে লিখে দেন। এঁর উত্তরে স্বামিপাদদের মনে হয়েছিল যে ইনি যথার্থই একজন সিদ্ধপুরুষ। গভীর শ্রদ্ধায় প্রণাম জানিয়ে স্বামিপাদেরা আসেন ফিরে।

স্মৃতিচারণে দেখি কাশী থেকে হরিদ্বারের পথে স্বামিপাদ চলেছেন। পদব্রজে চলা—তাতে ধীরে ধীরে বেলা হতে থাকে। পাহাড়ে বেলা হলে চলা যে কত কষ্ট তা সকলেই জানেন। সঙ্গে রয়েছেন তুলসী মহারাজ। ছায়ার মত চলেছেন সঙ্গে। ভগবানের কৃপা করুণা তাঁর তীর্থস্থানে বিশেষ করে হিমালয়ে যত সহজে উপলব্ধি করা যায় তত আর কোথাও বোধ হয় নয়। চলতি পথে একজায়গায় একটি বড় গ্রাম তাঁরা দেখতে পেলেন। তুলসী মহারাজ বলেন যে, সেখানে সেইদিনকার মত যাত্রা থামিয়ে রাখাই ভাল। কালী মহারাজ প্রথমে সম্মত হয়েছিলেন। একটা পুকুর দেখে সেখানে স্নান সেরে নিলেন কিন্তু স্বভাব সন্ন্যাসী স্বামিপাদ সেই গ্রামে ভিক্ষায় যেতে রাজী হলেন না। তিনি তুলসী মহারাজকে বলেন যে—ধনী বৰ্দ্ধিষ্ণু গ্রাম দেখলেই যে ভিক্ষার সুবিধা হবে আর গরীবের গ্রাম হলে হবে না এটা ভাবা উচিত নয়। সন্ন্যাসীর পক্ষে ভগবানে নির্ভর করে থাকতে হবে। ভক্তের বোঝা ভগবান বহন করেন। আমরা যখন ভগবানের নাম করে বেরিয়েছি তখন ধনীর গ্রাম না হলেও ভিক্ষা পাবো। মায়ের বুকে দুধ তিনি আগে থাকতেই রেখে দেন। চলতে আরম্ভ করেন স্বামিপাদ। অনুগামী হলেন তুলসী মহারাজ। খালি পা, দূরের পথ—চারিদিকে কড়া রোদ্দুর আর ধূলোর ঝড়। তুলসী মহারাজের মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। দুইজনেই শ্রান্ত, ক্লান্ত, ঘর্ম্মাক্ত। প্রায় চারঘণ্টা এই রকম চলার পর একটি ক্ষুদ্র গ্রামে তাঁরা পৌঁছুলেন বেলা তখন দুটো। এক শিব মন্দিরে নিলেন আশ্রয়। তুলসী মহারাজ বলেন—আমি তো বলেছিলুম ভাই, পরের গ্রাম বহুদূর, আর সেখানে মাধুকরী মেলা কঠিন। স্বামিপাদ বলেন সান্ত্বনা দিয়ে,—ভাই হতাশ

হয়ো না, আমি যা বলেছি তাই হবে। ঠাকুর আমাদের জন্য মাধুকরী ঠিক করে রেখেছেন। শিবালয়ের শান্ত বারান্দায় তুলসী মহারাজ শুয়ে পড়লেন। স্বামিপাদ অবশ্য শুয়ে পড়েন নি, বসেই বিশ্রাম করছিলেন। সহসা গীতার বাণী যেন মূর্ত্ত হয়ে উঠলো বারান্দায়। মহারাজ,—জনৈক মাড়োয়ারী প্রশ্ন করেন,—কুছ্ ভোজন মিলা? স্বামিপাদ বললেন,—নেহি বাবা। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক শুনে চলে গেলেন। তুলসী মহারাজ শুয়েই রইলেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল প্রচুর লাড্ডু, মিঠাই পরিপূর্ণ এক ঝুড়ি তিনি নিজে নিয়ে এলেন এবং সেটি রেখে তিনি আস্তে আস্তে চলে গেলেন। স্বামিপাদ তখন শ্রীমদ্ভাগবত গীতার নবম অধ্যায়ের সেই শ্লোক পড়তে লাগলেন—'অনন্যশ্চিয়ন্ত' এই শ্লোকটি খুব উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করতে লাগলেন। যাই হোক খাবারগুলি ঠাকুরের চরণে নিবেদন করে নিজেরা কিছুটা গ্রহণ করলেন আর বাকীটা পাহাড়ী ছেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন।

আর একটি কথা লক্ষ্ণৌতে একটি হিন্দুস্থানী ভক্ত হঠাৎ এসে হাজির এবং বলেন যে,—মহারাজজী, আপনারা কিসে যাবেন?—আমরা নিষ্কিঞ্চন সাধু, আমারা পায়ে হেটে যাবো। তিনি বললেন,—ওখান থেকে হরিদ্বার তো অনেক দূর, পায়ে হেঁটে কি করে যাবেন? স্বামিপাদ বললেন,—আমরা পদব্রজে কলকাতা থেকে আসছি আর পায়ে হেঁটেই যাবো। তিনি বললেন,—আমি যদি ভাড়া দি, আপনারা নেবেন? স্বামিপাদ জানালেন যে,—আমরা পয়সা স্পর্শ করবো না। তখন হিন্দুস্থানী ভক্তটি দুখানি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট এনে দিলেন আর রাস্তায় খাবার জন্য কিছু পয়সা দিতে চাইলেন। তাতেও অস্বীকৃত হওয়ায়—তিনি কিছু খাবার কিনে শালপাতায় মুড়ে সঙ্গে দিলেন। তুলসী মহারাজ বার বার ভগবানের অপার করুণা দেখে প্রীত হয়ে আবার পথের দিশায় বেড়িয়ে পড়লেন।

আমরা পূর্ব্বকথারই অনুসরণ করছি। স্বামিপাদ ছিলেন চিরদিনই এক উধাও পথের যাত্রী। ঝুসীতে কিছুদিন তপস্যা চলে। ইচ্ছা হল কাশীতে যাবেন। সদানন্দ মহারাজ ঝুসীতেই থাকবেন মনস্থ করলেন। এলাহাবাদ হতে পদব্রজে কাশীর অভিমুখে চললেন। সেই জীবনের একটানা পদ্ধতি। মধ্যাহ্নে মাধুকরী, রাত্রে গাছতলা, পরিব্রাজকের শুষ্ক কঠোর নিয়ম, কোনটির ত্রুটি ছিল না। বংশী দত্তের বাড়ী তখনকার দিনে রামকৃষ্ণ পরিমণ্ডলের,

ঠাকুরের কথায়, একটি আড্ডা বিশেষ ছিল। সোনারপুরে এই বংশী দত্তের বাগানে শরৎ মহারাজের মত মহারাজের দিনরাতগুলি তপোগহিন হয়ে উঠলো। নীড় বিরাগী পাখীদের মাঝে মাঝে নীড়ের সন্ধানও মনে জাগে। বরানগর মঠের ডাক যেন লঘুপক্ষে ভেসে এল পূর্ব্বাশায়। আবার সেই কলিকাতার পথ। নিষ্কিঞ্চন সাধু চলেছেন গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে। মধ্যাহ্নে তিনবাড়ী মাধুকরী, রাত্রে বৃক্ষতল বা মন্দিরে বিশ্রাম।

এমনি উজান স্রোতে জীবন জাহ্নবী এসে পড়ল বরানগর মঠে। গঙ্গা পার হয়ে বরানগরের মঠে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে বহুবঞ্চিতের সাক্ষাৎ প্রথমেই। বহুদিন পরে ভায়ের বুকে বুক রেখে হয়ে পড়েন আকুল। তাদের চোখে নেমেছে আনন্দ ঢল। শশী মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন,—এতদিন কোথাই ছিলে ভাই? উত্তরে স্বামিপাদ বলেন,—তাথে তীর্থে—তীর্থপথের আমি ছিলাম পথিক। শশী মহারাজ বলেন,—আমি কিন্তু ভাই ঠাকুরকে ছাড়তে পারিনি। আমি তাঁকে নিয়েই দিন কাটাচ্ছি। কালী মহারাজের বুক ভরে ওঠে। উচ্ছ্বাসে বলে ওঠেন,—তুমিই আমাদের মধ্যে যথার্থ ভাগ্যবান। 'মধুকরত্বং খলুকৃতি' তোমার উপর ঠাকুরের বিশেষ করুণা। ছুটে আসেন তারক মহারাজ, নিরঞ্জন মহারাজ, আনন্দের হাট বসে যায়। সেই মিলন লগ্নে স্মৃতির মুকুরে জেগে ওঠে ঠাকুরের চরণতীর্থে পুরাণো সব কথা। নর্ম কথায় যেন দখিণাপুরীর সেই পুরাণো দিনগুলি ফিরে আসে। চোখে জল নিয়ে নিরঞ্জন মহারাজ আর তারক মহারাজকে নিবিড় আলিঙ্গনে ধরে নিলেন—সজল মেঘের ফাঁকে একটুকরো চাঁদের আলো।

শ্রীঠাকুরকে দর্শন করার পর তপস্যার প্রয়োজন নিয়ে মতান্তর শ্রীঠাকুরের সময় থেকেই সুরু। মঠের দুইটি দল ছিল রাম দত্তদের একটি দল—আর নরেন, কালী এই সব স্বামিপাদদের একটি দল। প্রথম দলের বৈষ্ণবদের জন্য তপস্যার প্রয়োজন শেষ হয়ে গেছে যখন তাঁর দর্শন পেয়েছি, কৃপা পেয়েছি। একথা শ্রীঠাকুরই বলতেন,—

অন্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্,
নান্তর্বহির্যদি হরিস্তপসা ততঃ কিম্।

এদিকে স্বামিজীরা বলতেন,—তিনি যে আমাদের তপস্যা করতে বলে গেছেন। এই নিয়ে রামদত্ত মশায়ের বাড়ীতেও একদিন একটি কথান্তরের সৃষ্টি

হয়। মধু রায়ের গলিতে দত্ত মশায়ের বাড়ী। স্বামিপাদ বলেছেন,—তাঁকে আদর্শ রেখে জপ-ধ্যান আর সঙ্গে সঙ্গে বেদান্ত উপনিষদ এসব শাস্ত্রও পড়তে হবে। নানা দেশের দর্শনও অধিগত করতে হবে। দত্ত মশায় বলেন,— তিনি পূর্ণ ব্রহ্ম অবতার, তাঁকে দর্শন করলে আর তাঁর কথা শুনলেই তো সব হবে। জপ, তপ, শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই। সেদিন তর্ক অনেকদূর গড়িয়েছিল। যাই হোক বরাহনগর মঠে নিস্তরঙ্গের দিনগুলিতে একটুকরো কালো মেঘ দেখা দিল। কোন কোন গুরুভ্রাতার এই শাস্ত্রানুশীলন ভাল লাগেনি। তাদের মতে লেখাপড়া অন্যায়, শ্রীঠাকুর তো লেখাপড়া করেন নি কোনদিন। তারা স্বামিপাদকে মঠ থেকে সরাবার ব্যবস্থা করছিল অতি গোপনে।

কালী তপস্বীর চিরদিনই অতি নির্ব্বিরোধী মন। তিনি এসব সংবাদ পেয়ে মঠ পরিত্যাগের জন্য তৈরি হলেন চিরদিনের জন্যেই।

সেদিন গগনে গগনে আসন্ন বর্ষণের বেদনার্দ্রতা আর কালী প্রসাদেরও দুই চোখে নেমেছে ব্যথার ঢল। অন্তরপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির অচ্ছেদ্য মিল যে চিরন্তন। খেয়া পার হয়ে তিনি কাশী, প্রয়াগ, দিল্লী, আগ্রা হয়ে ত্রিকূট, সরযূ দর্শন করেন। আবার সেই বন্ধনহীন অনিকেত জীবন। পোরবন্দরের শঙ্কর পাণ্ডুরাঙের গৃহে অতিথি হলেন। এখানেই স্বামী বিবেকানন্দের কথা শুনেন। স্বামিজী তখন সচ্চিদানন্দের ছদ্মনামে তীর্থ দর্শনের পথিক। সেখান থেকে তিনি জুনাগড়ের নবাবের সেক্রেটারী মনসুখরাম সূর্য্যরাম ত্রিপাঠীর বাড়ীতে বিবেকপাদকে দেখতে পেলেন। এখানে স্বামিজীর কাছে এক পণ্ডিত ছিলেন। অভেদপাদকে পেয়ে স্বামিজী বেদান্ত বিচারে যুক্ত করে দিলেন! বোধহয় ভবিষ্যতদর্শী স্বামিজী মার্কিন বিজয়ের পূর্ব্বাভাস পেয়েছিলেন তাঁর মধ্যে। অভেদপাদের ক্ষুরধারে পণ্ডিতের পরাজয় হল একথা বাহুল্য বলা। স্বামিজীর সঙ্গে ঐ মিলন কিন্তু বেশী দিনের নয়। স্বামিজী তখন তৈরী হচ্ছেন ভবিষ্যতের দিগ্বীজয়ে। তিনি বোম্বাইয়ের দিকে চললেন। যাবার আগে তিনি কালী মহারাজকে মঠে ফিরতে বলে গেলেন। কালী মহারাজও দ্বারকা হয়ে প্রভাসে পৌছালেন।

গোমতীর গৈরিকোচ্ছ্বাসের সঙ্গে নীল সাগরের সঙ্গম তীর্থেই সাগরস্নিগ্ধ দ্বারকাবতী। স্বামিপাদ এখানে দ্বারকানাথের মন্দির দর্শন করেন। উঁচু ভিত্তিভূমীতে স্থাপিত এই মন্দির। মূর্ত্তির নাম রনছোড়জি। রাজরাণী মীরার

এই ঠাকুর। এখানেই জগদ্‌গুরু আচার্য্যদেবের সারদা মঠ। চন্দ্রালোকিত রূপালী সৈকতে স্বামিপাদের মন কি বিরহবিশীর্ণ হয়নি...যাই হোক এখান থেকে ত্রিবেণীসঙ্গমের প্রভাসতীর্থে এসে পড়েন। হিরণ্য, সরস্বতী, আর সাগর মথিত এই তীর্থ—ভারতের প্রাণ পুরুষের শেষ নটমঞ্চ এ ধাম—আজো উদাস কেকাধ্বনি মর্মরিত করে রেখেছে এই পুরী। এর পর তিনি জাহাজে বোম্বাইতে এসে পড়েন। এখান থেকে মহাকালেশ্বরে গোকুলদাসের বাড়িতে আবার স্বামিজীর সঙ্গে দেখা। কিছুদিন একসঙ্গে কাটিয়ে পুরী, বরোদা, নাসিক, দণ্ডকারণ্য, তাপ্তী, গোদাবরী, কাবেরীতে আসেন। সেখান থেকে রামেশ্বরে এসে পড়েন। রামেশ্বরে সাগরসঙ্গমে স্নান করে তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, মাদুরা, কাঞ্চী, পক্ষীতীর্থ, কুম্ভকোনমে এসে তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষ হয়। এবার ভারত আর চরৈবেতি মন্ত্র শোনবার ঠাঁই পায় না। ও দেশের হাতছানি হয়ত জেগেছিল। হয়ত পেয়েছিলেন সাগরপারের দিশা, ফিরে আসেন মঠে মাদ্রাজের এক জাহাজে চড়ে—সঙ্গে চিঁড়ে ছিল সমুদ্রের জলে ভিজিয়ে তাই খেতে খেতে। তীর্থফল কি এমনি—তীর্থ দেবতাই বুঝি অমৃত—এসে দেখেন মঠ, আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়েছে। স্বামিজীর কথাও রাখা হল, নিজের প্রতিজ্ঞাও রক্ষা হল। অলক্ষ্যে ঠাকুর হাসলেন।

মঠের জয়যাত্রা তখন হয়ে গেছে সুরু। আলমবাজারে নূতন মঠ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে। বরাহনগরে মঠ ১৮৮৬ থেকে ১৮৯১ সাল পর্য্যন্ত থাকে। নূতন মঠে অবস্থা ও ব্যবস্থা উন্নততরই ছিল। শশী মহারাজ—যাঁকে মঠের মা বলা হত, আর শরৎ মহারাজ নূতন মঠটি কালীমহারাজকে দেখালেন। মঠের তিন ফুকরওয়ালা ঠাকুর দালান। দোতলায় বারান্দা—লাল, নীল রঙ্গীন টালি মোড়া—পূর্বদিকে সান বাঁধান ঘাটওয়ালা একটি পুকুর। এইগুলি নিয়ে নতুন মঠটি বেশ প্রশস্তই ছিল। আর আহারাদির ব্যাপারও একটু স্বচ্ছলই ছিল। ভক্তেরা এবিষয়ে একটু লক্ষ্য রাখছিল আর শশী মহারাজের পূজায় তুলসী মহারাজ করতেন সাহায্য—রাত্রি যত গহীন, প্রভাত তত এগিয়ে আসে।

শশী মহারাজ উত্তর দিকের একটি ঘর স্বামিজীর জন্য ছেড়ে দিলেন। আমাদের স্বামিজীর মনে তখনও বিশ্বশোষী তপস্যার তৃষ্ণা—আর তারই জন্যে মঠের ভাইদের কিছু মতান্তরও ছিল। নির্জ্জন আলমবাজারের পরিবেশে ঘরখানি পেয়ে অভেদ স্বামিজী আবার ডুব দিলেন তপস্যার অগাধ সায়রে। খাবার

সময়টুকুও যেন অপব্যয় মনে হত আর অন্য সময় হয় ভজন, পাঠ, না হয় জপধ্যান নিয়ে কি করে যে দিনগুলি কেটে যেতো গঙ্গাধারার মত বুঝতেও হয়ে যেতো ভুল। মঠে এই সময় তীব্র তিতিক্ষার সময়গুলো যেন আনন্দ রসে বাউল হয়েছিল। শশী মহারাজ কিন্তু শুধু ঠাকুরের সেবা নিয়ে যেন জীবনটা কাটিয়ে দেবেন এমনিভাবে চলছিলেন। সন্ন্যাসীজীবনের অন্ধকার দিনগুলি যেন কেটে এসেছে বলেই মনে হয়। কিন্তু আলো ছায়ার লুকোচুরী জীবনের প্রতি পদেই তো আছে। মেঘ আসে আবার কেটে যায়—কঁহি ধূপ—কঁহি ছায়া। এই নিয়েই জীবন। খালি পায়ে চারণিক হওয়ার ফল এতদিনে ফলল। স্বামিজী গিনিওয়ার্ম অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়লেন, একসঙ্গে সাতবার অস্ত্রোপচার হল। প্রায় চারমাস এই অসুখে স্বামিজীকে একান্ত অসহায় হয়ে পড়ে থাকতে হয়েছিল। আপন মায়ের আর্ত্তি নিয়ে শরৎ মহারাজ আর নিরঞ্জন মহারাজ স্বামিপাদকে করে তোলেন সুস্থ। কাঁধে ভর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে বেড়ানো, খাওয়ানো, আর সব রকমের পরিচর্যায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন এই চার মাস। কিন্তু স্বামিপাদের নিজের পায়ে চলবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত গিয়েছিল হারিয়ে। একদিন শরৎ মহারাজ স্বামিজীকে অসহায়ের মত ছেড়ে দিয়ে ওপরে উঠে পড়েন। কালী মহারাজ কাঁদতে আরম্ভ করেন, নিজের চলার অক্ষমতা ভেবে। শরৎ মহারাজ ওপর থেকে নানারূপ ঠাট্টা করেন সুরু। কালী মহারাজের মনে সহসা সুপ্ত শক্তি যেন জেগে উঠলো। তিনি নিজের পায়ে সুরু করলেন চলতে। সারদানন্দ কৌশল করেই এটি করেছিলেন।

এদিকে বিবেক স্বামিজীর কোন সংবাদই কেউ পায় না। এ সময় তিনি বিবিদিষানন্দ, সচ্চিদানন্দ, এই সব ছদ্মনাম নিয়ে ছদ্মভাবে ঘুরছেন ভারতের তীর্থ হতে তীর্থান্তরে। ১৮৯৩ সালে একটি ইংরাজী দৈনিকে মারউইন মেরী স্পেন নামে জনৈক আমেরিকান মহিলা 'স্বামী বিবেকানন্দ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তখন গুরুভাইদের ধারণা হয় যে নিশ্চয় স্বামিজী আমেরিকা গেছেন ভারতের ধর্ম্ম প্রচারের জন্য। এরপর ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে এই মহাসভার বিবরণ এসে পৌছুল আলমবাজার মঠে। ভারতের ব্রাহ্মসমাজের প্রতাপ মজুমদার আর বৌদ্ধ মঠের অনাগরিক ধর্ম্মপাল এঁরাও সব সভায় যোগ দিয়েছিলেন। হিন্দু ধর্ম্মের উপর স্বামিজীর বক্তৃতা আমেরিকার চিকাগো সহরে এক বিরাট আলোড়ন সুরু করে দেয়। ঝড়ের সময় মহাসমুদ্রে যেমন এক নিম্নচাপ সৃষ্টি

সুবিধা বজায় হয় তেমনি স্বামিজীর এই সাফল্যে আমেরিকার মিশনারীরা নিজেদের সম্মান রাখতে এক বিরাট বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। আমাদের দেশের কেউ কেউ এতে যোগ দিতে ক্রুটি করেনি—চিরদিনের ভবানন্দের দল—স্বামিজী এর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার জন্য লিখে পাঠান মাদ্রাজে আলাসিঙ্গার কাছে ও কলকাতায়।

স্বামিজী লেখেন যে ভারতের খৃষ্টানেরা যা কিছু বলছে এখানে মিশনারীরা তাই সংগ্রহ করে নিয়মিত প্রকাশ করছে আর বাড়ী বাড়ী গিয়ে যাতে আমার বন্ধুরা আমায় ত্যাগ করে তাই চেষ্টা করছে। আমি যে জুয়াচোর নই তার প্রমাণ স্বরূপ একটি সভা করে তার রিপোর্টের এক কপি ধর্ম্মমহাসভার সভাপতি ডাঃ ব্যারোজকে পাঠিয়ে দাও, আরো কপি হেরল্ড প্রভৃতি পত্রিকায় পাঠিয়ে দাও। জে, জে, ব্যাগলির নামেও এক কপি পাঠাবে। যাতে এখানে প্রমাণিত হয় যে আমি হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ প্রতিনিধি। রামনাদের মহারাজ প্রভৃতিকে নিয়ে এক সভা করবে। এই সব পত্রানুসারে আলাসিঙ্গা এক সভা করেন ও তার প্রস্তাবগুলি যথাযথ টাইপ করে পাঠাবার জন্য জনৈককে দেন কিন্তু দুঃখের বিষয় তিনি সেগুলি তাঁর বাক্সে চাবি দিয়ে রেখে দেন। কালী মহারাজ, শশীমহারাজ এই সংবাদ পেয়ে সভার জন্য বিশেষ চেষ্টিত হয়ে পড়েন। কালীমহারাজ মঠ থেকে এসে বলরামবাবুর গৃহে থাকতেন কাজের সুবিধার জন্যে। শরৎ মহারাজ, মনমোহন মিত্র এঁরা সকলে খুব উৎসাহের সঙ্গে চেষ্টা আরম্ভ করলেন সভা যাতে সাফল্যযুক্ত হয়। কালীমহারাজ সকলের বাড়ী ঘুরতে সুরু করেন। মাড়োয়ারীদেরও এই সভায় যাতে গ্রহণ করা হয় তাঁরা সে চেষ্টাও করতে লাগলেন। এক বিশিষ্ট মাড়োয়ারীর কাছে একদিন সন্ধ্যায় এই প্রস্তাব করায় তিনি আপত্তি তুললেন যে ওসব ভ্রষ্টাচার। বিলেতে বিদেশীদের সঙ্গে আহারাদি করা অনুচিত। মনোমোহনবাবু মাড়োয়ারী সমাজের একজন জহুরী বললেও চলে। তিনি তর্ক ব্যাপারে আর অগ্রসর না হয়ে তাঁকে বললেন, —বাবুজী আপকা নাম কোমটিমে চঢ় গিয়া। অর্থাৎ আপনার নাম কমিটিভুক্ত করা হয়েছে। কমিটিভুক্ত হওয়াটা একটা বড় কথা ছিল সেদিনের। এককথায় সমস্ত বিষয়টা জলের মত হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

সভাপতি নির্ব্বাচন করা প্রয়োজন তাই মনোমোহনবাবু, নগেন্দ্রনাথ মিত্র, ভূপেন বসু, চারুচন্দ্র বসু ও আরো কয়েকজনকে নিয়ে কালীমহারাজ মাননীয়

গুরুদাসবাবুর কাছে যান। সেখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। তিনি তখন পূজাদিতে ব্যস্ত ছিলেন। পরে বাহিরে আসেন পূজারী বেশেই। সমবেতরা বহুভাবে তাঁকে বোঝান যে সভাপতি হওয়া তাঁর পক্ষে সবচেয়ে সমীচিন। তিনি কোন মহামহোপাধ্যায়ের কথা তুলে বলেন, তিনি বৃদ্ধ বয়সে কোন ধর্ম্মসভায় সভাপতিত্ব করতে পারবেন না। এরপর সকলে রাজা পিয়ারীমোহন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উত্তরপাড়ার বাড়ীতে যান। তিনি স্বামিজীর কথা কিছু শুনতে চান। আমেরিকার কাগজে স্বামিজীর যে-সব কথা লেখা হয়েছিল সে-সব কথার কিছু কিছু অংশ এঁরা সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন। তার মধ্যে এই কথাটি ছিল— After hea ing him we feel how foolish it is t send missionaries to this learned nation. রাজা বাহাদুর এতেই একান্ত হৃষ্ট হয়ে বলেন—India should eternally remain grateful to him.

কালীমহারাজ ও অন্যসব স্বামিপাদের একান্ত চেষ্টায় সভা আর সভাপতির ব্যবস্থা এমনি করেই হল সম্ভব। নূতন সৃষ্টির আগে ব্রহ্মাকেও তপস্যা করতে হয়েছিল, উপনিষদে একথা আছে। বিবেকপাদও এখানে তাঁর সতীর্থদেরও যে বিরাট চেষ্টা করতে হবে পথিকৃৎ হিসাবে তার ইতিহাস সামান্য মাত্রই এখানে দেওয়া হল। পূর্ণ পরিচয়ের একমাত্র সাক্ষী মহাকাল নিজে······

১৮৯৪ সালের সেপ্টম্বর মাসের ৫ই. টাউন হলের উপরের ঘরে এক মহতী সভা আহূত হল। সভায় ছিলেন মহারাজকুমার বিনয়কৃষ্ণদেব বাহাদুর, বাবু গুরুপ্রসন্ন ঘোষ, রায় বাহাদুর নন্দলাল বসু, রায় বাহাদুর যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী (টাকী), বিচারপতি সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান মিররের সম্পাদক মিঃ এন ঘোষ, ডেলি নিউজের সম্পাদক Mr G. B. Daily, নরেন্দ্রনাথ সেন, শিবনারায়ণ শিরোমণি, পণ্ডিত মধুসূদন, স্মৃতিরত্ন শশীভূষণ মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বাবু অমৃতলাল রায়, সিউবক্স বাগলা বাহাদুর ও এটর্নী ভূপেন্দ্রনাথ বসু প্রভৃতি অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন গ্রহণ করে রাজা পিয়ারীমোহন নিম্নলিখিত ভাষণ দেন। বলাবাহুল্য বিচারপতি গুরুদাসবাবু তাঁর মত পরিবর্ত্তন করে সভায় যোগ দেন। ভাষণটির বাংলা অনুবাদ—মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস ও সমবেত ভক্ত মহোদয়গণ আমাকে সভাপতি করার জন্য আপনাদের অতি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ দিচ্ছি। আজ যে আমরা এই সন্ধ্যায় এই সভাতে উপস্থিত হয়েছি আমাদের ধন্যবাদ জানাবার জন্য, সে ধন্যবাদ একজন এমন

কারুর জন্য নয় যে দেশের কোন বিশিষ্ট কুশল কোন কর্ম্মে লিপ্ত ছিলেন অথবা যিনি সম্মানিত হয়েছেন কোন রাষ্ট্রনৈতিক কাজের জন্য। আমাদের এই বিরাট সম্মিলন হচ্ছে একজন সন্ন্যাসীকে আমাদের গভীর কৃতজ্ঞতা আর অভিনন্দন জানাবার উদ্দেশ্যে। তিনি মাত্র ত্রিশ বৎসর বয়সে আমেরিকার বিদগ্ধজনের কাছে আমাদের ধর্ম্মের সত্যগুলি দক্ষতার ও নিপুণতার সঙ্গে প্রচার করেছেন আর এগুলি সেদেশে শ্রেষ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছে। আমাদের সহোদর প্রতিম বিবেকানন্দ একটি বিশিষ্ট সভ্য সমাজের চোখ খুলে দিয়েছেন, তাঁর এই হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ তত্ত্বগুলি প্রচারে। আর তাঁদের তিনি এই প্রতীতি এনে দিয়েছেন যে, দর্শনে আর ধর্ম্মরাজ্যে মানুষের চিন্তার ধারাগুলির পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও সাহিত্যে দিশা মেলে না। মেলে আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রতে।

এই কথাগুলি বলে আমি আমার বন্ধু নরেন্দ্রনাথ সেনকে প্রথম মন্তব্যটি সভার সম্মুখে আনবার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এর পর বাবু শালিগ্রাম সিংহ আর একটি মন্তব্য নিয়ে আসেন। এই মিটিং, চেয়ারম্যানকে অনুরোধ জানাচ্ছে যে, এই সভার মন্তব্যগুলি তার সঙ্গে নিম্নলিখিত পত্রটি স্বামী বিবেকানন্দ, ডাঃ ব্যারোজ, ও শ্রীমতী স্নেলকে পাঠান হোক। এর পর চিঠিখানির অনুবাদ আমরা দিচ্ছি। শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি—ইংরাজী ১৮৯৫ সালে ৫ই সেপ্টেম্বরে টাউনহলে যে মহতী জনসভা আহূত হয় তাতে কলকাতা ও শহরতলীর বহু প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন। তার সভাপতি হিসাবে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে,—আপনি যে ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বরে চিকাগো আহূত 'পার্লামেণ্ট অফ রিলিজিয়ান্সে' হিন্দুধর্ম্মের যে স্বরূপ দক্ষতার সঙ্গে প্রচার করেছেন স্থানীয় হিন্দুসমাজ তার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছে। হিন্দু ধর্ম্মের প্রবক্তা হিসাবে আমেরিকা গিয়ে যে কষ্ট বরণ করেছেন ও যে ত্যাগস্বীকার করেছেন তার আমরা সকলেই আন্তরিক ও স-প্রশংসা সমর্থন করছি। আর তারা আপনাকে বিশেষভাবে সমর্থন করছে আপনার আর্য্যধর্ম্মের প্রতি শুভ প্রচেষ্টার জন্য। এই আর্য্যধর্ম্ম আমাদের অন্তরের অতি প্রিয়।

ঐ বৎরের ১৯শে সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন হিন্দুধর্ম্মের সঠিক মতবাদগুলি নিয়ে ক্ষুদ্র বক্তৃতার মধ্যে তার চেয়ে আর ভালভাবে দেওয়া যায় বলে আমরা মনে করি না। এর পরেও আপনি যে সব বক্তৃতা দিয়েছেন

এ বিষয়ে, সেগুলিও অনুরূপ সহজ ও যথোপযুক্ত হয়েছিল। বিদেশে এবং অন্ত ধর্ম্মাবলম্বীদের কাছে আপনি যে সাহস, যে শক্তি নিয়ে হিন্দুধর্ম্মের সত্যগুলি ওদেশে উপস্থাপিত করেছেন ও তাদের মধ্যে অন্ধকার দূর করবার যে চেষ্টা করেছেন তার জন্যে আমরা কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে পারছি না। দুঃখের বিষয় এই যে আমাদের ধর্ম্ম দীর্ঘদিন ধরে ভুল প্রচারের মধ্যে পড়েছিল আর এই ধন্যবাদ তাদেরও প্রাপ্য যে সব শ্রোতা ও সভার উদ্যোক্তাগণ আপনাকে এত আদরের সঙ্গে গ্রহণ করেছেন, বলবার সুযোগ দিয়েছেন ও আপনাকে উৎসাহ দিয়েছেন আপনার কাজে—সর্ব্বোপরি ধীর এবং মুক্ত হৃদয়ে শুনেছেন আপনার বক্তব্য। হিন্দুধর্ম্ম এই প্রথম একজন প্রচারককে পেয়েছে এবং এটি তার বিশেষ সৌভাগ্য যে আপনার মত একজন দক্ষ ও সুশিক্ষিত সেবককে পেয়েছে এই কাজে। আপনার স্বদেশবাসী ও আপনার দেশের নাগরিকগণ, আপনার স্বধর্ম্মচারীগণ আপনার এই প্রাচীন ধর্ম্মের সত্যগুলি প্রচারের প্রচেষ্টার জন্যে যদি তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা না জানায় তাহলে তাদের অবশ্য কর্ত্তব্য হতে বিচ্যুত মনে করবে। যে শুভকর্ম্ম আপনি আরম্ভ করেছেন ভগবান আপনাকে অগ্রগতির জন্যে শক্তি ও শৌর্য্য দান করুন।

আপনার বিশ্বস্তরূপে

সভাপতি—(সই) প্যারীমোহন মুখার্জি

তখন কালীমহারাজ সামান্য স্কুলের ছাত্র। সভার ব্যবস্থা করা একেত্তো অতি কঠিন কাজ তারপর কলকাতার বিশিষ্ট নাগরিকদের ভাষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সে আরও কঠিন। যদিও সাহায্যকারী অতুলবাবুর মত কেউ কেউ ছিলেন তবু যেন ভবিষ্যতের সমুজ্জ্বল জীবনের এই একটা ইঙ্গিত। যাইহোক স্বামিজীর নিকট সভার সমস্ত বিবরণ পাঠিয়ে দেওয়া হল। স্বামিজীও অকুণ্ঠ প্রশংসায় কলকাতার নাগরিকদের ও সমস্ত গুরুভাইদের ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন।

প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা এখানে বলা ভাল—Yours faithfully কথাটির স্থানে Yours in the Lord এই কথাটি স্বামিজী প্রবর্ত্তন করেন, এখন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে এইটিই কায়েমী হয়ে গেছে। সে সময় স্বামিজী তাঁর দাঁড়ানো ফটো আমেরিকা হতে পাঠিয়ে দেন। শরৎ মহারাজ এটি এক টাকা করে বিক্রয়ের

ব্যবস্থা করেন। স্বামিজীর ফটো এই প্রথম বিক্রয়ের ব্যবস্থা হয়েছিল। উত্তর-পাড়ার মুখুজ্যেদের লাইব্রেরীতে একজন জার্ম্মান অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ঠাকুরের উৎসবের সময় বেলা তিনটায় কালীমন্দিরে এসে জামা জুতো খুলে ভক্তিভরে প্রণিপাত করেন। ফল প্রসাদও আহার করেছিলেন। আর একটি কথা, স্বামিজীর লেকচারটিতে পাছে কোন ভুল থেকে যায় এই ভেবে শ্রীযুক্ত হরমোহন মিত্র সেটি বিশুদ্ধ করবার জন্যে দিয়েছিলেন Daily Newsএর সম্পাদক Daily সাহেবের কাছে। কিন্তু দুঃখের কথাই হোক বা সুখের কথাই হোক তিনি ভুল কিছু পাননি, উপরন্তু বলেছিলেন, উৎকৃষ্ট ইংরাজী হয়েছে—স্থানে স্থানে যতি চিহ্ন বসিয়ে দিয়েছিলেন মাত্র।

অনাগরিক ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচারক হিসাবে গিয়েছিলেন, চিকাগোর ধর্ম্মমহাসভায়। জাপান ও অন্যান্য দেশ দেখে তিনি যখন ভারতে ফিরে এলেন তখন গ্রীষ্মকাল—সকলে তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত,—ধর্ম্মমহাসভায় স্বামিজীর বক্তৃতার ব্যাপার শুনতে। ধর্ম্মপাল বলছেন—ওদেশে রাস্তায় রাস্তায় স্বামিজীর ফটো সাজানো হয়েছিল। স্বামিজীর সম্বন্ধে তিনি মুক্ত কণ্ঠেই সুখ্যাতি করেছিলেন। বললেন,—তাঁর বক্তৃতায় যেন চুম্বকের শক্তি এসে গিয়েছিল। আজও আমরা ধর্ম্মাঙ্কুর বিহারের বৌদ্ধদের আমাদের শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রতি সহৃদয়তার পরিচয় পাই।

এই সময় দক্ষিণেশ্বরে উৎসব হচ্ছিল ঠাকুরের তিথি উৎসব। উৎসব ভালই হয়েছিল। উৎসব দেখতে এসেছেন ধর্ম্মপাল, সঙ্গে কালী বেদান্তী। মহারাজের ব্যক্তিগত স্বাধীন মতবাদ চিরদিনই ছিল। ধর্ম্মপাল সমস্ত উৎসব দেখে বললেন—এদের একটু আধ্যাত্মিক খোরাক দাও—বার বার একথা শুনে কালীমহারাজ একটু বিদ্রূপ করে বললেন.—শুধু কি দাঁড়িয়ে লেকচার করলে আধ্যাত্মিক খোরাক দেওয়া হয়? এই যে এত লোক ঠাকুরের নামে কীর্ত্তন করছে, ঠাকুরের নামে প্রসাদ পাচ্ছে, আনন্দ করছে—পরস্পর ভেদজ্ঞান ভুলে হাজার হাজর লোক পরস্পর মিলছে—এতেই আমাদের আধ্যাত্মিক খোরাক দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করি। ধর্ম্মপাল মৌন হয়ে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায় খুঁজে পেলেন না।

দক্ষিণেশ্বরে হাজরা মহাশয়ও সেদিন উৎসবে অবতীর্ণ। মৃগচর্ম্মের আসন পেতে রুদ্রাক্ষের মালায়, ফোঁটা চন্দনে বেশ একটা দৃশ্য সৃষ্টি করে বসেছিলেন।

মহেন্দ্র দত্ত মহাশয় বেশ ভক্তিভরে প্রণাম করলেন—স্বামিজীর বন্ধু হিসাবে। অতুলবাবু সঙ্গে ছিলেন, তিনি একটু বিরক্ত হয়ে বললেন—ওকে আবার প্রণাম করা কেন? ওটা একটা ভণ্ড- কিছু পাবার আশায় এখানে এসেছে। আগেও দক্ষিণেশ্বরে ও ঐ করত। ভেবেছে আমেরিকায় স্বামিজীর খুব প্রতিপত্তি, স্বামিজীর শিষ্যরা সব টাকাকড়ি দেবে। কেউ কিছু না দিলে এখনই পালিয়ে যাবে। সত্যি সেদিন হাজরা মহাশয়ের আসর জমানোর কোন ফলই হল না। তিনটের মধ্যে তিনি আসন গুটিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। স্বামিজীর মাদ্রাজ অভিনন্দনখানি প্যাম্পলেট আকারে ছাপা হয়েছিল আর সেটিতে প্রচারের খুব সুবিধা হয়েছিল।

অদ্বৈত বেদান্তের সিদ্ধসাধকদের মন জাগতিক ফলাফলের অনেক উর্দ্ধে থাকে। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ পশ্যেদকর্ম্মণি চ কর্ম্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ, কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ ॥ ৪।১৮

তাই আবার আলোকতীর্থের যাত্রা হল সুরু ১৮৯৫ সালে। স্বামিপাদ চললেন নৈনিতাল অভিমুখে। সেখান থেকে আলমোড়া; দিব্যসুন্দর প্রকৃতি স্বামিপাদকে তপস্যার অগাধ জলে ডুবিয়ে দিতে কোনদিনই কৃপণতা করে নাই। রম্য প্রকৃতির দুটি সহজ প্রেরণা আছে। একদিকে সে ডাক দেয় দেহসুখ ও পশু-প্রবৃত্তির পথে আর তার আর একটি আবেদন আন্তরচৈতন্যকে জাগ্রত করা। হিমালয় দেবাত্মা, তবু সেখানে পার্বত্যবাসীদের অবাঞ্ছিত জীবনাদর্শের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে ঋষি, মুনি, সাধুসন্তদের পবিত্র আত্মার অভ্যুদয়। এই সময় স্বামিপাদ একটি প্রবন্ধ ব্রহ্মবাদিন পত্রিকার সম্পাদক আলাসিঙ্গার কাছে পাঠান; ঐটি ১৮৯৪ সালের ২৫শে নভেম্বরের সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। স্বামিপাদ লিখেছেন,—'এ প্রবন্ধ লিখিবার সময় বা পূর্বে আমি কোনদিনও ভাবি নাই যে স্বামিজীর আহ্বানে আমাকে একদিন ধর্ম প্রচারের জন্য পাশ্চাত্যে যাইতে হইবে'। তুষারমৌলী হিমতীর্থে স্বামিপাদের ধ্যানানন্দে কয়েক মাস কাটল; আবার যাত্রা করলেন আলমবাজার মঠের দিকে। স্বপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ চারণিক হয়েই এসে উপস্থিত হলেন আলমবাজার মঠে। তখন মঠের দিকদেশ স্বামিজীর জয়রথচক্রে মুখর। অলকানন্দার ধারার মত ঠাকুরের আশীর্বাদ, বিবেকস্বামীর জয়বাণী আর

আমাদের স্বামিপাদের জীবনবেদ এই ত্রিবেণীসঙ্গমে যে তীর্থের সূত্রপাত হয়েছিল তা স্মরণ করে সঞ্জয়ের মত বলতে হয়,—"হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ, হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ।"

স্বামিজীর কর্মের প্রসারতা তখন গগনচুম্বী হতে চলেছে। একা স্বামিজী আমেরিকার কাজ গুছিয়ে উঠতে পারছেন না—তাই ডাক পড়ল কালিবেদান্তীকে। স্বামিজীর পরেই তাঁর স্থান কি না।

প্রাচীন ভারতে যুদ্ধের সময়ই ছিল শরৎকাল। শ্রীরামচন্দ্র ধর্মযুদ্ধে বেরিয়েছিলেন বিশ্বামিত্রের সঙ্গে এই শরৎকালে। ভট্টিকাব্যে তার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে। আমাদের কালীমহারাজও চলেছেন জয়যাত্রায় এই শরৎকালে। ধর্মই এর লক্ষ্য। ভারতের লুপ্তগৌরব উদ্ধার করতে চলেছেন দ্বিতীয় সব্যসাচী।

জাহাজটির নাম ছিল গোলকুণ্ডা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরার যাত্রী হয়ে রওনা হবেন। স্বামিপাদকে সেদিন জাহাজে উঠিয়ে দিতে গিয়েছিলেন ত্রিগুণাতীত, তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জনানন্দ, যোগানন্দ, অদ্ভুতানন্দ ও সুবোধানন্দ। এই সময় একটি ফটো তোলা হয় আউটরাম ঘাটে। বর্ষার মেঘ নির্মুক্ত স্বচ্ছ দৃষ্টিতে স্বামিপাদ চেয়ে আছেন বিষণ্ন দিগন্ত পথে—

দিগন্তর হতে ফিরে আসা যত
মুক্ত পক্ষ বিহঙ্গের মত
যেন নীড়ে ফিরে আসে মন
তবু জানি,—যেতে হবে।
অস্ত ম্লান সায়াহ্নের রবি
সীমা আঁকা শ্যামায়িত ছবি
দিক্‌চক্রে লেখে শুধু—
সায়াহ্ন সোহাগ।
এই যে উত্তাল নীল জল
উচ্ছল উন্মত্ত খল খল
ধরণীরে ভালবাসি হায়
বেলা যেন লঙ্ঘিতে সে চায়।

হিমকান্ত ধৃত তপোবন
বালুর সৈকতে সন্ধ্যার লগন
মুছে নাহি যায় যেন
হে জননী মোর
ফিরায়ে আবার নিও
তোমার ও ক্রোড়ে।

জাহাজ চলেছে, শরতের সমুদ্রে মৌসুমী বায়ুর মাতামাতি প্রদীপের শেষ শিখার মত উঠেছিল দুলে, সমুদ্র পীড়ায় স্বামিপাদ হয়ে পড়লেন কাতর। বমি জ্বর এইসব যুগপৎ শরীরের আক্রমণ করল। জাহাজে আরও এক অসুবিধার কারণ, তিনি ছিলেন নিরামিশাষী। ক্রমে জাহাজ ভূমধ্যসাগরে এসে পৌছুল। সিসিলী দ্বীপ, জিব্রালটার এই সব পার হয়ে এলবার্ট ডকে এসে পৌছুতে লেগেছিল প্রায় পাঁচ সপ্তাহ। সহসা লণ্ডনের আকাশ তাঁর কাছে আরো ধূসর মনে হল। ডকে কালীমহারাজ বিবেকপাদ, বা ষ্টার্ডি কাউকেই দেখতে পেলেন না। একা কোথায় যাবেন কি করবেন স্থির করতে পারলেন না—ঠাকুরই কিন্তু সহায় জুটিয়ে দিলেন। ডাব্লু, সি, বোনার্জির বাড়ীতে থাকার কথা একটি সঙ্গী বাঙ্গালী যুবক করলেন প্রস্তাব। ডাব্লু, সি, বোনার্জি তখন লণ্ডনের একজন বিখ্যাত লোক। বাঙ্গালী মাত্রেরই তিনি ছিলেন পরম সুহৃদ। সঙ্গের মালপত্র Express Company-র হাতে দিয়ে তিনি ডাব্লু, সি, বোনার্জির বাড়ীর দিকে যাত্রা করলেন। দুজনে একটি ঘোড়ারগাড়ী ভাড়া করে বোনার্জির বাড়ীতে এসে পৌছুলেন। বোনার্জি তখন বাড়ী ছিলেন না। তাঁর স্ত্রী তাঁকে কিছু খাওয়াতে ব্যস্ত, স্বামিপাদ কিন্তু বিবেকস্বামিজীকে দেখবার জন্য আরও ব্যস্ত। যেন এক মুহূর্ত্তেরও দেরী সয় না। মিসেস্ তাঁর এক ছেলেকে দিলেন উইম্বল্‌ডনে যেখানে স্বামিজী আছেন সেখানে স্বামিপাদকে পৌছে দিতে। ছেলেটি স্বামিপাদকে ভূগর্ভস্থ রেলে তুলে দিল। আর্লকোর্ট জংশনে গাড়ী বদল করে টিউবরেলে করে স্বামিপাদ এসে নামলেন উইম্বল্‌ডন ষ্টেশনে।

পথঘাট সমস্তই অজ্ঞাত—তবু একটি গাড়ী ভাড়া করে উইম্বল্‌ডনে মিস্ মুলারের বাড়ী পৌছুলেন। কড়া নাড়তেই একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে পরিচয় জিজ্ঞাসা করল। ভেতর থেকে মিস্ মুলার সংবাদ জানতে পেয়ে ছুটে এসে ভিতরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। ষ্টার্ডি আর বিবেকস্বামীর সঙ্গে দেখা হয়নি

জেনে একটু অপ্রস্তুতই হয়ে গেলেন। এদিকে স্বামিপাদের সঙ্গেও গরম কাপড় বিশেষ ছিল না। স্বামিপাদ শীতে কাঁপছিলেন। মিস্ মূলার স্বামিপাদকে আগুনের ধারে নিয়ে গেলেন। এরপর আর্মিনেভিষ্টোর্স থেকে গরম কাপড়ের ব্যবস্থা করে সন্ধ্যেবেলায় যখন ফিরলেন তখন দেখলেন বিবেকস্বামী ও ষ্টার্ডি খুব ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ফিরছেন।

স্বামিজী হতাশ হয়ে বললেন,—আমি অভেদানন্দের দেখা পেলাম না, বোধহয় মহানগরীতে পথ হারিয়েছেন। যাইহোক বহুদিন পরে দুই গুরু-ভ্রাতার মিলন মহোৎসবে পরিণত হল। বিবেকস্বামী আলমবাজার মঠ, আমেরিকার জনসভার কথা কিভাবে কলিকাতার নাগরিকরা নিয়েছেন তা খুটিয়ে খুটিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। মিস্ মূলারের বাড়ীতে থেকে আর নানা আলাপ আলোচনায় দিন বেশ কাটতে লাগলো। মিস্ মূলারের ঘরটি তখন যেন বরাহনগর মঠেই পরিণত হয়েছিল।

ঠাকুর বলতেন অবতার-কল্প যারা তারা রাজার ছেলে। সাততলাতে যেতে পারে আবার নীচেও নামতে পারে। বিবেকস্বামীকে ঠাকুর সে অধিকার দিয়ে গেছেন নিজে। স্বামিজীর জন্যে বলে গেছেন আগুন জ্বলে গেছে এখন রইলো আর গেলো। সেদিন স্বামিজী আর কালীপাদের ভিতরের এক মধুর কলহের সৃষ্টি হল। স্বামিজী কালীপাদকে ডেকে বললেন,—আজকে তোমায় লেকচার দিতে হবে। তিনিও বেশ সোজাসুজি জানালেন,—ও আমি পারবো না—আমি কখনও লেকচার দিইনি।—স্বামিজী তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে ইংলণ্ডের জনসমাজকে মুগ্ধ করবার মত একটিমাত্র অস্ত্র আছে সে আমাদের ধর্ম্ম আর তাই বলতে হবে তোমাকে। স্বামিপাদ বলেন,—তবে আমায় শিখিয়ে দাও। বিজ্ঞ শিক্ষকের মত স্বামিজী বলেন,—আমায় কে শিখিয়েছিল, তুমি নিজে শিখে নাও। মানুষ গড়ার কারিগর বিবেকপাদ এমনি করেই শিক্ষার শেষ কথাটি দিতেন বলে। সমস্ত জ্ঞান ব্রহ্মস্বরূপে আমাদের অন্তরে আছে শুধু আবরণ সরানোর অপেক্ষা। স্বামিপাদ প্রকৃত শিক্ষায় মানুষ হয়েছিলেন। সক্রেটিসের প্রমাণিত মতবাদ—সমস্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার আমাদের অন্তরে। বাহিরটা শুধু উদ্বোধক মাত্র। বেদান্তও বলেন,—সমস্ত শিক্ষা—আবরণ সরিয়ে দেওয়া মাত্র। সাংখ্যকার বলেন...প্রকৃত্যাপূরণাৎ। বিবেকস্বামিজী লেকচারটি প্রথমে লিখে ভাল করে পড়ে নিতে বলেছিলেন। লেকচারটি লেখা হল 'পঞ্চদশীর' উপর। এই

পঞ্চদশী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন,—পঞ্চদশী বেদান্তের উপর লিখিত একটি পুস্তক। বিদ্যারণ্য বলেন,—বেদান্তের জ্ঞান সমস্ত খণ্ডজ্ঞানের ঊর্দ্ধে অবস্থিত। প্রস্থানত্রয়ের কথাও এই বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন। ব্রহ্মজ্ঞান জাগতিক সমস্ত জ্ঞানের ঊর্দ্ধে বিরাজমান। তাঁকে বাক্য দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, কারণ বাক্য হচ্ছে খণ্ডজ্ঞানের দ্যোতক। এই পঞ্চদশীর মতে জীব হচ্ছে কর্ত্তা ও ভোক্তা। বাসনা কি তাও তিনি এই বক্তৃতায় বিশ্লেষিত করেন। কি করে আমরা এই জন্মমৃত্যুর পারে যেতে পারি তাও তাঁর বক্তৃতায় তিনি দিয়ে দিলেন। সাধনাদি সহায়ে চরমে ব্রহ্মের সহিত একীভূত হওয়া, এই পঞ্চদশীর মত। নামরূপ অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা; সদসৎ বিচারের প্রয়োজন আছে। ধ্যানের দ্বারা আমরা মিথ্যাজ্ঞান হতে পরিত্রাণ পেতে পারি। জ্ঞান, জ্ঞাতা, জ্ঞেয় এই ত্রিপুটি কাকে বলে এই বিচারও তিনি করলেন। জীবন্মুক্ত অবস্থা যা পঞ্চদশীতে দেওয়া আছে তাও এই বক্তৃতায় বর্ণনা করেন যেমন,—আমি সেই পরমাত্মাকে জেনেছি তাই আমি সুখী, আমি জাগতিক বন্ধন হইনে মুক্ত তাই আমি সুখী, আমি কারও কোনও বন্ধনে নেই তাই আমি সুখী—এইভাবে বক্তৃতার সমাপ্তি রেখা টানেন।

এই লেকচার খৃষ্টান থিওসফিক্যাল সোসাইটির হলে দেওয়া হয়। স্বামিজী উপস্থিত ছিলেন। স্বামিপাদের মিষ্ট গলায় বক্তৃতাটি খুব মনোজ্ঞ হয়েছিল। পরে একথা বিবেকস্বামী আলমবাজার মঠে লিখে পাঠান। এর পর স্বামিজীরা গ্রে কোর্টে তিন মাসের জন্য উঠে যান আর ভিক্টোরিয়া ষ্ট্রীটে একটি হল ভাড়া করেন লেকচার দেবার জন্য। এগুলি স্বামিপাদকে ওদেশে গিয়ে শিখতে হয় কেননা আমাদের দেশে হল ভাড়া করে বক্তৃতা দেওয়ার প্রথা ছিল না। সাধুদের এসব প্রকল্প কোনদিনই জানবার কথা নয়।

গ্রে কোর্টের বাড়িটি যেন বরাহনগর মঠই হয়ে গেল। স্বামিজী বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতেন। গুডউইন ছিলেন সাঙ্কেতিক লেখক আর আমাদের স্বামিপাদ নিলেন বাজার সরকার আর পাচক ব্রাহ্মণের কাজ। বাঙ্গালী প্রথায় রান্না হত। অতিথি অভ্যাগতও আসতেন। জীবনের প্রথম উষার মত ঐদিনগুলি শুধু আনন্দই বয়ে এনেছিল।

আর একদিকে আমাদের স্বামিপাদ ছিলেন বিবেকানন্দের সখামিথ। রাত্রে ক্লান্তক্লিষ্ট মাথা নিয়ে ছটফট করতেন স্বামিজী, আর আমাদের স্বামিপাদ মাথায়

হাত বুলিয়ে স্বামিজীকে ঘুম পাড়িয়ে দিতেন। এমনি করে অনাবিল ছন্দে সুখে দুঃখে দিনগুলি যেত কেটে। স্বামিপাদের সংস্কৃত প্রীতি এক আবাল্য সংস্কার। সংস্কৃত রচনা, ছন্দমঞ্জরী পড়ে স্তোত্র লেখা এ আমরা দেখেছি বহু আগেই। পল ডয়সন সংস্কৃত-পারঙ্গম্ জনৈক দিগম্বর, আমাদের স্বামিপাদ তাঁর সঙ্গে সংস্কৃতে কথা বলে ভারতের গৌরব বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য অনেক পণ্ডিত সংস্কৃতে কথা বলতে পারেন না। ম্যাক্সমূলারের সঙ্গে যে সাক্ষাৎকার হয় সেখানেও দেখি যে প্রথমে সংস্কৃত ভাষায় কথাবার্তা আরম্ভ হয় কিন্তু ম্যাক্সমূলার সংস্কৃত ভাষায় কথা বলতে বা বুঝতে সম্পূর্ণ অক্ষম ছিলেন। কাজেই আলোচনা সে ভাষায় বেশীদূর যায় নি।

যোগ্যজনের হাতে ভার দিয়ে স্বামিজী এবার লণ্ডন হতে বিদায় নেবেন। আয়োজন চলতে লাগলো, স্বামিপাদকে নিয়ে তিনি বিলিতি সমাজের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন—শেখাতে লাগলেন তাদের চালচলন। এই সময় রেভারেণ্ড হাউইসন্ ছিলেন তখনকার দিনে এপিসকোপাল হাইচার্চ্চের ধর্ম্মযাজক, এক বিশিষ্ট ব্যক্তি। তিনি হয়ে উঠলেন স্বামিপাদের অনুরাগী বন্ধু। প্রায়ই বক্তৃতা শুনতে আসতেন। স্বামিপাদের মতগুলি এমনিভাবে ধীরে ধীরে ধর্ম্মযাজকদের ভিতরও ছড়িয়ে যা'চ্ছল। স্বামিজী অভেদানন্দকে অনেক জায়গায় বক্তৃতা করতে পাঠাতেন ও নিজের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গেও পরিচয় করিয়ে দিতে লাগলেন।

তেরই ডিসেম্বর আঠারোশো ছিয়ানব্বই সালে স্বামিজীকে একটি বিদায় অভিনন্দন দেওয়া হল। ঘরের ছেলের এবার ঘরে ফেরার পালা। লণ্ডনের সমাজে ডিসেম্বর মাসে ভগবান ঈশামসির জন্মোৎসবের জন্য ছুটি থাকে তখন বিশেষ কিছু করা চলে না। তাই গ্রে কোর্টগার্ডেনের ঘরটি ছেড়ে দেওয়া হল। স্বামিপাদ আশ্রয় দিলেন ষ্টার্ডির ঘরে। তিনতলা ঘরটি ছিল স্বামিপাদের রাত্রির আশ্রয় আর নীচের ঘরটি পাঠাগার—বসবার ঘরও হল। ঘরে চিমনীর ব্যবস্থা ছিল না তাই ঠাণ্ডা লাগতো। ষ্টার্ডিরা নিরামিষাশী তাই স্বামিপাদ যখন ওর ঘরে গেলেন তখন খাওয়া দাওয়ার কোন কষ্টই হয়নি তবে শীতের রাত্রে প্রায়ই ঘুম হত না। আর একটি বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে ষ্টার্ডি বালিশ ব্যবহার পছন্দ করতেন না—নিজেও নিতেন না···কাউকে ব্যবহার করতেও দিতেন না।

আবার জানুয়ারী মাস হতে লেকচার সুরু হলো উইম্বলডনের হলে। ষ্টার্ডি হলেন সভাপতি, এই সময় একদিন স্বামিপাদ তাঁর সমাধিনিষ্ঠ মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। বক্তৃতা দিচ্ছিলেন খোলা জায়গায়। স্বামিপাদ লেকচার দিচ্ছেন মনসংযমেয় সম্বন্ধে। পাশে সৈন্যরা কুচকাওয়াজে যাচ্ছিল। বক্তৃতা শেষে রেভারেণ্ড হাউইসন তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন,—সৈন্যদের কুচকাওয়াজে আপনার খুব অসুবিধা হয়েছিলো না? মিষ্টার হাউইসন শুনে অবাক হয়ে গেলেন যে স্বামিপাদ কুচকাওয়াজের কথা বিন্দুবিসর্গও জানেন না। এমন ফলিত রাজযোগ হাউইসন বোধহয় জীবনে দেখেননি।

লণ্ডনের সমিতির ভার স্বামিজী দিয়েছিলেন মিষ্টার ষ্টার্ডির হাতে। কিন্তু যে কারণেই হোক তার হাতে ইংলণ্ডের সমিতি একরকম অচল হয়ে আসে। ইতিমধ্যে মার্চ্চ মাস এসে পড়ে। শ্রীঠাকুরের জন্মতিথির এটি মধুমাস। স্বামিপাদ নিরম্বু উপবাসে উৎসব উদযাপন করেন। পূজা, জপ, চণ্ডীপাঠে আর জীবন-বেদ আলোচনায় দিনটি অম্লান ভাবেই গেল কেটে। এর পর ডাক পড়লো মার্কিনে —ভারত থেকে বিবেকস্বামীর সে নির্দেশ। ষ্টার্ডির কাছে ৩০ পাউণ্ড রাখা ছিল, বিবেকস্বামী রেখে গিয়েছিলেন। সেই টাকা থেকে গাড়ীভাড়া নিয়ে স্বামিপাদ যাত্রা করলেন আমেরিকার পথে। ১৮৯৭ সালে ৩১শে জুলাই সাধু পলএর নামাঙ্কিত জাহাজে সাধু পলের মতই চললেন মার্কিনে ধর্ম প্রচারে, মনে হয় আগে থেকেই এই বিধিলিপি ঠিক করা ছিল। সাধু পলের মত স্বামিপাদ চলেছেন জয় যাত্রার পথে! ভারত তটভূমি ছেড়ে আসার সময় তিনি ভারতীয় দর্শনের বইগুলি নিয়ে গিয়েছিলেন আর মার্কিনে যাত্রার সময় সেগুলি তিনিসঙ্গে নিয়েই যান। নিউইয়র্ক বন্দরে শুল্ক কর্ম্মচারীরা তাঁর সমস্ত বইগুলির ওপর মাশুল চেয়ে বসল। তারা জানত না এইসব বইগুলি কি এবং কেন নেওয়া হয়েছে। মেষ শৃঙ্গের সঙ্গে হীরার ধারের এক বিরোধ সম্বন্ধ আছে। স্বামিপাদ তাঁদের বুঝিয়ে দিলেন যে এই বইগুলি তাঁর নিজ ব্যবহারের, বিক্রয়ের জন্য নয়। মিস্ ফিলিপস্এর বাড়ীতে উঠবার কথা ছিল। স্বামিপাদ সেই উদ্দেশ্যে একটি ঘোড়ারগাড়ী করে নিজেই রওনা হলেন। তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য নিউইয়র্ক বন্দরে কেউ আসেন নি, কিন্তু ইংলণ্ডে একমাস থাকায় আজ আত্মনির্ভরতা যথেষ্টই গড়ে উঠেছিল। বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা মিস্ ফিলিপস্এর বাড়ী তখন ১৯ নম্বর ওয়েষ্ট ষ্ট্রীটে ৩১ নং ঘরে। তখনকার দিনে আমেরিকায় এত মোটর গাড়ীর চলন হয়নি। স্বামিপাদ

একখানি 'ক্যাবে' করেই সেখানে পৌছিলেন। গাড়ী হতে নেমেই সহজভাবেই বাড়ীর কলিং বেল টিপে কার্ডখানি দিলেন। মিস্ মেরী তাঁকে একাই চলে আসতে দেখে তাঁর সাহসের প্রশংসা করে বলেন,—আপনি দেখছি পুরোপুরী ইয়াঙ্কি হয়ে গেলেন। প্রৌঢ়া মেরী ফিলিপ্‌স্ তাঁর জন্যে নির্দ্দিষ্ট ঘরে তাকে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর জিনিষপত্র সেখানে রাখবার ব্যবস্থা করে দিলেন। ফিলিপস্ একজন বোর্ডিং হাউসের মালিক ছিলেন। স্বামিজী এই প্রৌঢ়াকে বেদান্ত সমিতির সম্পাদিকা করে গুডইয়ার দম্পতিকে নিয়ে বেদান্ত সমিতির পত্তন করেছিলেন এই নিউইয়র্কে। এদিকে মিষ্টার ভনহ্যাগান্ গিয়েছিল স্বামিপাদকে নিয়ে আসতে, ফিরে এসে এক হাস্যজনক পরিবেশের সৃষ্টি করলেন। ভনহ্যাগানের বয়স প্রায় পঁচিশ। তিনি এসেই বলেন অভেদানন্দ বোধহয় নিউইয়র্কের জনারণ্যে গেছেন হারিয়ে। মুখে তার দুশ্চিন্তার রেখা উঠেছিল ফুটে। মেরী ফিলিপস্ আর সমবেতদের মনে যথেষ্টই কৌতুকের খোরাক জোগাচ্ছিল। শেষে স্বামিপাদের কাছে ভনহ্যাগান্‌কে পাঠিয়ে দেওয়া হল। সমবয়সী হওয়ার জন্য এরপর থেকে ভন্‌হ্যাগান্ স্বামিপাদের একরকম নিত্যসঙ্গী হয়ে উঠেছিলেন।

নিউইয়র্কের সমাজে তখন নেমে এসেছিল একরাশ দুরপনেয় অন্ধকার। নানা রকম অবাঞ্ছিত মতবাদের অঙ্কুরভূমি হয়ে পড়েছিল নিউইয়র্কের সমাজ। প্রেততত্ত্ব ও অন্যান্য আলোচনায় মার্কিন সমাজ তখন ভরপুর। বেদান্তের আনন্দময় বার্ত্তা নিয়ে আলোর দূত এসে দাঁড়ালেন মার্কিনের দ্বারে। কিন্তু 'মেফিষ্টোফ্লিসের' দল তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে। কিন্তু আত্মাকে বাঁধা দেবার মত পাত্র স্বামিপাদ ছিলেন না কোন দিনই।

অন্যদিকে খৃশ্চান পুরোহিতের দল উদ্বিগ্ন স্বার্থ নিয়ে এসে দাঁড়াল বিরোধিতা করতে। যুক্তরাষ্ট্রে আর একটি দল ছিল। ফ্রি-থিংকারদের দল। এরা অজ্ঞেয়বাদী, নিরীশ্বরবাদী আর যুক্তিবাদীদের দল। এরা একদিন অভেদস্বামীকেই আক্রমণ করে বসল তাদের এক সভার আয়োজনে। স্বামিপাদ তাঁদের সমস্ত যুক্তি ছিন্ন ভিন্ন করে দেখিয়েছিলেন যে মনুষ্য জীবনের সব সমস্যা তারা নিরসন করতে একান্ত অক্ষম—একমাত্র বেদান্ত বিজ্ঞানই সে কাজে সমর্থ।

স্বামিপাদের মন্ত্র ছিল প্রেমের মন্ত্র। এতেই জয় করতে চেয়েছিলেন মার্কিনের মর্ম্মজীবন। মিশে যেতে চেয়েচিলেন তাদের সঙ্গে। তাই ভনহ্যাগান্‌কে নিয়ে দর্শনীয় স্থানগুলি দেখেই সুরু হল প্রচার জীবন। সেন্ট্রাল পার্কের জুয়োলজিক্যাল

গার্ডেন, রিভার সাইড ড্রাইভ, মিউসিয়াম্, এই সব রম্য স্থানগুলি প্রায় পনেরো দিনেই নিলেন দেখে।

সেই যে প্রথম জীবনের শিল্পী মনের ছোঁয়াচ, জোর করে যার অচলায়তন দিয়েছিলেন ঠেলে, সে মন যেন অবচেতনের থেকে নিয়ত নিয়ে বেরিয়েছে সুন্দরের সন্ধানে। আরো প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আছে একটা নিবিড় যোগ। এককে বাদ দিলে আর একককে নেওয়া যায় না। ফলে পরবর্ত্তীকালে মার্কিনেরই যেন একজন হয়ে গিয়েছিলেন। আর সে দেশের লোকেরাও উৎসুক হয়ে উঠেছিল তাঁকে নাগরিকত্ব দিতে। নাগরিক হওয়া তখনকার দিনে ছিল মধুর এক কল্পনা।

পঁচিশে আগষ্ট একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন স্বামিপাদকে সমিতি থেকে অভিনন্দিত করা হয় আর তিনি এই অভিনন্দনের উত্তরে অনাগত কার্য্যপ্রণালীর কথা কিছু কিছু বলেন। এই সভায় মিস্ ওয়াল্ডোর সঙ্গে তিনি পরিচিত হন। ইনি বিবেকস্বামীর কাছে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতে দীক্ষিত হয়ে যতিমাতা নামে সারা জীবন শ্রীঠাকুরের কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। এঁর দর্শনশাস্ত্রও বিশেষ অধিগত ছিল। কাউণ্টদের কাছে একদিন যেতে না যেতেই ডাক এল ফিলাডেলফিয়া থেকে। এটি ভার্জিনিয়ার এক স্বর্গসুন্দর নগরী—এ্যাটলান্টিক সাগরের কোল ঘেঁসে মধ্যমণির মত জেগে উঠেছে এই নগরী। এখানে কেরোলেনিয়ার মসনেক্ সহরে কাউণ্ট দম্পতির কাছে উপস্থিত হলেন। স্বামিপাদের বেদান্তের সাগরউদার বাণী শুনে তাঁকে এরা আচার্য্য পদে বরণ করতে সিদ্ধান্ত করেন। এরপর ফিরতি পথে নেমে পড়েন ওয়াশিংটনে—মার্কিন সভ্যতার মুকুটমণি এ নগরী। ইচ্ছা দর্শনীয় স্থানগুলি দেখবেন। মার্কিনের প্রতি অঙ্গের সঙ্গেই যেন তাঁর নিবিড় পরিচয়ের প্রয়োজন। এই জন্যেই নিউইয়র্কের পুরাতন বন্ধুদের কাছে পরিচয়পত্র চেয়ে স্বামিজীকে এক পত্র লেখেন। স্বামিজীও প্রকৃত শিক্ষকের মত লিখলেন নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করো। অভেদপাদও জীবনের কর্ত্তব্য নিলেন ঠিক করে। গীতার কর্ম্মী তিনি, ঠিক করলেন—ভারত পথের পথিক হয়ে যে বৈদান্তিক আত্মনির্ভরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, যুক্তরাষ্ট্রে সেই নির্ভরতাই হবে তাঁর নিত্যসঙ্গী। ডাইরীতে এই সময় লেখা আছে—I was inspired with a grim determination to depend enti rely upon the Will of our Lord.

এরপর তিনি যতিমাতার আহ্বানে নিউপ্যালজেতে যান। এখানে রাজযোগ সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। মাত্র তিন দিনের এই থাকা, এরই মধ্যে তিনি গির্জায় গিয়ে সেখানকার ধর্ম্মযাজক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে পরিচিত হন। নিভৃতে স্বামিপাদের কিন্তু ছিল চিরদিনের এক পাহাড়িয়া মন। একি দুর্গমের ডাক না অজানাকে জানবার চির চেষ্টা। ওদেশের এপালেশিয়ন ক্লাবের সভ্য হয়েছিলেন। আল্‌পস্‌ এর হাত ছানিতে সাড়া দিয়েছিলেন। আবার ভারতের দুর্গম তীর্থগুলিও পথিক করে নিয়েছে তাঁকে। তিমির তীর্থ তিব্বতের হিমিস গুহাও পেয়েছে আপন ক'রে। মার্কিনে এসেই পেলেন মোহাঙ্ক পর্ব্বতের ইশারা। দুরারোহ এই পর্ব্বত সতেরো হাজার ফুট উঁচু—পথ রেখাহীন তার শীর্ষদেশ। পাহাড়ের ফাটলে পা রেখে রেখেই উঠলেন উপরে। মোহাঙ্কের তুষার মোহে মন যেন যায় হারিয়ে—সেই সুন্দরের সীমানায় কি পেয়েছিলেন—সেকি ব্রহ্মানন্দ না আর কিছু!

এরপর এখানে আর একটি বক্তৃতা দিয়ে তিনি যতিমাতার সঙ্গে নিউইয়র্কে আসেন ফিরে। এই সময় স্বামী সারদানন্দের সঙ্গে দেখা। স্বামিপাদের আসার পরই সারদানন্দজী মার্কিনে আসেন। অনেক দিন পরেই এ দেখা। তাঁর নিজের কথায়,—সেদিন বিস্মৃত অতীত যেন রূপ ধরে এসে উপস্থিত হয়েছিল আমাদের সামনে। সমস্ত দিন নানা কথায় কাটলো। মনে পড়ল সেই কাশীপুরের বাগানবাড়ী, সেই পালাক্রমে শ্রীশ্রীঠাকুরের সেবা, ধুনি জেলে রাতের পর রাত শাস্ত্রালোচনা। শ্রীশ্রীঠাকুরের দেহ রক্ষার পর বরাহনগর মঠে একত্র বাস ও তপস্যা আর মনে পড়লো আমাদের দুইজনকে স্বামিজী তাঁর নিত্যসঙ্গী বলে মনে করতেন—তাঁর কেলুয়া—ভুলুয়া....পুরীতে বাবুরামের সঙ্গে ভ্রমণ—এমার মঠে বাস—সেখানে দীর্ঘ তপশ্চর্য্যা—কোণার্কে সূর্য্যমন্দির দর্শন—বালুবেলাময় সমুদ্র সৈকত দিয়ে চিল্কাহ্রদে গমন, খণ্ডগিরি উদয়গিরির পথে—অরণ্যে যোগীসন্ন্যাসীর অনুসন্ধানে বাঘের কবল হতে অল্পের জন্য প্রাণ রক্ষা—আর মনে পড়ল আলমবাজার মঠে সারদানন্দের অক্লান্ত পরিচর্য্যা—তার প্রেমার্ত্ত সেবা। এ সমস্তই ছায়াচিত্রের মত আমার মানসপটে একটির পর একটি উঠতে লাগল আর আমায় অভিভূত করে ফেলল······বৌদ্ধযুগে আমরা একবার দেখেছি ভারতে প্রাণস্পন্দন সুদূর মার্কিনে ভারতের ভ্রমণ অভিযান, যার ফলে আজও সেখানে মায়া সভ্যতার নিদর্শন ঐ মার্কিনদের চক্ষে ধরা পড়ছে। আজ আবার নূতন করে সেই প্রাণ-

স্পন্দন নিয়ে স্বামিপাদেরা এসে দাঁড়িয়েছেন,—সুরধুনীর স্রোত অবরুদ্ধ হয়নি... মার্কিনে প্রথম পাঁচ বছরে স্বামিপাদের কৃতিত্ব অসাধারণ। বিবেকস্বামী নিউইয়র্কে কোনরকম স্থায়ী কেন্দ্র গড়ে তুলতে পারেন নি। তাই এখন থেকেই অভেদ-মহারাজ পণ করলেন যে, বিবেকস্বামী যে পুণ্যব্রতের সূত্র দিয়ে গেছেন সেটিকে সার্থক করে তুলতেই হবে। এর জন্য তিনি মটমেমোরিয়্যাল হলটি ভাড়া নিলেন বক্তৃতার জন্যে। আর তারি প্রথম পদক্ষেপে 'বেদান্ত কি' এই বক্তৃতাটি দেন। এ সময় যতিমাতার ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা ছিল। রাত্রে যাতে শুতেন দিনে তাকেই বসবার কৌচ করে দিতেন। অতি সাধাসিধা ছিল সে সব দিনের জীবন। বক্তৃতার পর যে যা স্বেচ্ছায় দিত তাতেই চলত সভার সমস্ত ব্যয়। নিজের আহারাদির জন্যে তিনি হিন্দু সন্ন্যাসীর মত মার্কিনবাসীদের দরদী মনের উপরই নির্ভর করতেন। আর তারাও তাঁকে নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতে পিছপা হত না। মাধুকর ব্রত তাঁর সেদিনও অক্ষুণ্ণ ছিল।

স্বামিপাদের শ্রীমুখে শোনা যেত একটি গভীর মনোবিজ্ঞানের কথা। তিনি বলতেন যে,—আমি মার্কিনে গিয়ে সেখানকার লোকদের সঙ্গে দরদী মন নিয়ে মিশে তাদের কাছে সব শিখতুম আবার তাদেরই গুরু হয়ে দাঁড়াতুম, এমনি করে ধর্ম ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া সহজ হয়েছিল···তখনকার দিনে প্রথম সাইকেল ওঠে। সে সাইকেল স্বামিপাদ একদিনে চড়তে শিখে ছিলেন। ওদের সঙ্গে গলফ খেলতেন, ওদের ক্লাবের সদস্য হয়েছেন আর সেই সব ক্লাবে কথা প্রসঙ্গে বেদান্তের কথা, ধর্মের কথা এনেছেন। বিশেষ করে ধর্মজীবনে ওদের ধর্ম্মযাজকদের প্রতিপত্তি আছে। স্বামিপাদ এদের সঙ্গে বিরোধিতার পথে যাননি। এরই ফলে ডক্টর হেবার নিউটনের মত বিদগ্ধ ধর্ম্মযাজকেরাও স্বামিপাদের বন্ধুপদবী লাভ করেছিল। আর তারাই হয়েছিলেন স্বামিপাদের বক্তৃতার জীবন্ত বিজ্ঞাপন। এমনি আরও অনেক মিশনারী স্বামিপাদের সহায় হয়েছিলেন শেষের দিকে।

বিবেকস্বামী বা অভেদস্বামী সে দেশে ঠিক হিন্দুধর্ম্ম প্রচারের জন্য যাননি। শ্রীঠাকুরের শিক্ষা—"যত মত তত পথ, সব ধর্ম্মই সত্য" একথাই বার বার সে দেশের লোকের কাছে বলে এসেছিলেন। আর তাদের মনে যে সংশয়ের মেঘ সময় সময় ঘনিয়ে এসেছে—যে হিন্দু প্রচারকরা কোন কূট মতলব নিয়ে এসেছেন তাদের দেশে তারও নিরসন করে গেছেন নিরালম্বে। Times পত্রিকায় এমন

লেখাও বেরিয়ে ছিল যে ভাল খৃষ্টান বলতে ভারতের স্বামিজীদেরই যেন বোঝায়। তাঁরাই যিশুর শিক্ষা পুরোপুরিই নিয়েছেন।

বিপরীত পরিবেশে পুরাণো দিনের তপস্বী ঘুমিয়ে পড়েননি। নভেম্বরের শেষের দিকে দেখি তিনি দুধ ও ফলমূল খেয়ে থাকতে সুরু করেছেন। এদিকে বক্তৃতা ও ক্লাসগুলি নিয়মিত কৃচ্ছ্র সাধনেই চলতে থাকে। মিঃ লেগেট, মিস্ মাকলিয়ডদের মনও ধীরে ধীরে স্বামিপাদের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। এই সময় তখনকার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ্ মিঃ গেটস এসে অতিথি হন লেগেটের গৃহে। লেগেটও তাঁকে পরিচিত করে দেন স্বামিপাদের সঙ্গে। রাজযোগের মনস্তত্ত্ব আলোচনায় গেটসও বিশেষ আনন্দিত হন।

১৮৯৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রে টোয়াইলাইট ক্লাবের ভোজের এক সভায় স্বামিপাদের নিমন্ত্রণ এল প্রথম সপ্তাহে। নৈশ ভোজের পর বক্তৃতার পালা, এই ওখানকার নিয়ম। প্রথম বক্তা ছিলেন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার ও সমাজ সংস্কারক—এন স্মৃষ্টার। দ্বিতীয় বক্তা ছিলেন স্বামিপাদ নিজে। যে দেশে স্বামিপাদকে নিজের দুই মুঠো আহারের জন্যে নির্ভর করতে হয়েছিল জনসাধারণের কাছে সে দেশের বিরুদ্ধে কিছু বলার সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু স্বামিপাদের তেজস্বী মন কোন কিছুতেই সত্যকথা বলতে পিছিয়ে যেত না। তিনি বল্লেন প্রাচীনকালে যেসব জাতি বড় হয়েছে তাদের চরিত্র মার্কিনবাসীদের মত ছিল না। সুস্পষ্ট আর সুমধুর ইংরাজীতে তিনি জানান যে প্রাচ্যবাসীরা মার্কিনবাসীদের বিরাম বিহীন কর্ম্ম ও মানসিক চঞ্চলতা ভীতি আর বিস্ময়ের চক্ষেই দেখে থাকেন। কোন মহৎ কর্ম্ম সাধন করতে হলে আত্মসংযম আর বিশ্রাম করা প্রয়োজন। কর্ম্মেই তোমাদের অধিকার, ফলে নহে।

আমরা স্বামিপাদের এই ভবিষ্যৎ বাণী যে কত সত্য সে কথা মাত্র সেদিনের সংবাদে পাই। ওয়াশিংটন ২১শে জুন ১৯৬৬ সালে সে সংবাদ প্রচারিত হয় তাতে প্রেসিডেণ্ট জনসনের মুখ্য বৈজ্ঞানিকগণের ধারণা যে রাসায়নিক বিষ ক্রিয়ার কবল থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে মুক্ত করতে না পারলে ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

সকল কাজের পিছনে জেগে ওঠে সমান একটি বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া—এই বৈজ্ঞানিক নিয়মের পর্য্যায়ে তাঁর প্রচারও পড়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রে স্বামিপাদের বিরোধীদলও ওঠে জেগে। আবার তার পিছনেও উঠে পড়ে আরো এক বিরুদ্ধতা। এই সময়ে জনৈক মার্কিনের বেদান্ত ছাত্র নিউইয়র্ক টাইমসে—

"Who are the Swamis and what are the Swamis" নামে এক নিবন্ধ প্রেরণ করেন। এতে লেখক জানান যে, "খৃষ্টান বলিতে আমরা যাহা জানি তাঁহারা তাহাই—তাঁহারাই অক্ষরে অক্ষরে খৃষ্টধর্ম্মের মতানুসরণ করেন। ঈশামসির উপদেশবাণী তাঁরা স্বীয় জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরা জ্ঞানের আলোক ছাড়া আর কিছু দান করেন না। তাঁরা আমাদের ধর্ম্মকে ও সমাজকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গেই দেখে থাকেন।"

জানুয়ারী মাসে সারদানন্দ ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সেটি ১৮৯৮ সাল। এর কয়েকদিন পরই স্বামিপাদ একদিন বক্তৃতা দেবার পর ঘরে ফিরছেন। পথে একজন মার্কিনবাসীর সঙ্গে দেখা হয়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে তাঁর সঙ্গে কিছু আলোচনা হয়। সামান্য সময়ের মধ্যেই এক অঘটন ঘটে গিয়েছিল। স্বামিপাদ দেখেন তাঁর শোবার ঘরের ছাদটা খসে পড়েছে। আর কিছু আগে এলে সেই ছাদ তাঁর মাথাতেই পড়ত। ভারতের পথে পথে পথিক বৃত্তি নিয়ে যিনি চলেছিলেন দীর্ঘ ছয় বৎসর তাঁকে যিনি রক্ষা করেছিলেন তাঁরই মঙ্গল হস্ত এবারও করেছেন রক্ষা ··

নিউইয়র্কের বেদান্ত সমিতি স্বামিপাদের প্রচেষ্টায় নূতন করে গড়ে উঠল। ডাঃ হিবার নিউটন স্বামিপাদের সঙ্গে বেদান্ত আলোচনায় বেদান্ত ধর্ম্মের সার্ব্বজনীনতায় মুগ্ধ হন আর বহু প্রকারে সাহায্য করতে সুরু করেন। এতে অভেদপাদের কাজে অনেক সুবিধা হয়। যাঁরা ধর্ম্মযাজকদের বহু মান দিয়ে থাকেন তাঁদের এতে এই দর্শনমুখী ধর্ম্মের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব কতকটা যেন কেটেই যায়। নিউইয়র্কের আর এক ধর্ম্মযাজক ডাঃ ম্যাক আথারও স্বামিপাদের সঙ্গে পরিচিত হন। মার্কিন সমাজের বিরোধিতা এমনি অক্লান্ত চেষ্টায় তিনি ধীরে ধীরে কাটিয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু জন সমুদ্রের ঢেউ ওঠে আবার নামে। ইতিমধ্যে ডাঃ ব্যারোজ ভারতের সফর হতে ফিরে এসে নানা বিরোধিতা করলেন সুরু। এদিকে স্বামিপাদ ঝড় জল তুচ্ছ করে বেদান্তের বাণী, গীতার বাণী ছড়িয়ে দিতে লাগলেন মার্কিনের জনারণ্যে। গীতার ওপর ৬৪টি বক্তৃতা দেওয়া হয়। এই সময় ফ্ল্যাগ নামে জনৈক ধনী মার্কিনবাসীদের সঙ্গে পরিচিত হন, স্বামিপাদ। ইনি বিবেকস্বামীর বন্ধু, রাজযোগের অনুরাগী ভক্ত।

জ্যাকসন কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ইরাণী ভাষার অধ্যাপক। সংস্কৃতও পড়াতেন। তিনি বেদান্তের উদার ভূমির কথা স্বামিপাদের বক্তৃতায় শুনে

মুগ্ধ হয়ে পড়েন। সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণ শিখবার ব্যবস্থাও তাঁর কাছে গ্রহণ করেন। এর পর স্বামিপাদ নিউইয়র্কের এপিসকোপাল চার্চ্চের প্রার্থনায় মিঃ রেন্‌সফোর্ডকে বন্ধু ও সহকারী রূপে পেয়েছিলেন। ইনি বেদান্ত ক্লাসের একজন ছাত্রও হয়েছিলেন।

ইউনিটেরিয়ান চার্চ্চের মত, মুক্তিবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মানুষের মনে অনন্ত পবিত্রতা, অনন্ত কর্ম্মশক্তির বীজ রয়েছে। অন্ধ বিশ্বাসের ওপর সত্যের প্রতিষ্ঠা এঁরা কোনদিনই গ্রহণ যোগ্য মনে করেন না। এই জন্যে এঁদের কেহই খাঁটি খৃষ্টান বলে মেনে নিতে অনিচ্ছুক। স্বামিপাদ এদের এক সভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন—মৃত্যুর পর আত্মার কি অবস্থা হয়? অক্টোবর থেকে এপ্রিল পর্য্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করলেন। এপ্রিলের শেষে নিউইয়র্কের সাত মাসের বক্তৃতা শেষ হয়ে গেলে অভেদপাদ বোষ্টনে এলেন - এখন তাঁর বিশ্রামের দিন। বিশেষ কোন কর্ম্মপদ্ধতি তিনি এখানে নেননি। এরপর তিনি ওয়াশিংটনে যান। সেখানে মিঃ আগিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইনিই তাঁকে প্রেসিডেন্ট মিঃ ম্যাককিনলির সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ করে দেন। প্রেসিডেন্ট বেদান্ত প্রচারে নিজের সহানুভূতি জানিয়ে ছিলেন। আর ভারতে বৃটিশ শাসন সম্বন্ধে দু'চারটি কথা তিনি স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

মার্কিনে স্বামিপাদকে যেমন স্থূল বিষয়ে সচেষ্ট হতে হয়েছিল তেমনি সূক্ষ্ম বিষয়েও অবহিত হতে হত। সেদিন অভেদস্বামী গেছেন হারভার্ডের প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছুটীর আগে ছেলেদের পড়া তৈরী করে দেওয়া হচ্ছিল। স্বামিপাদ যোগ দেন অধ্যাপক জেম্‌সের বক্তৃতায়। অধ্যাপক জেম্‌স্ সেদিন প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সত্ত্বার বহুত্ব। স্বামিপাদ ছিলেন ছাত্রদের মধ্যে। বক্তৃতার নোট তিনি লিখে নিতে সুরু করেন। বক্তৃতার পর অধ্যাপক জেম্‌স্ স্বামিপাদকে ঐ বিষয়ে কিছু বলতে আহ্বান করেন। অভেদপাদ প্রত্যুত্তরে জানান যে আগামী দিনে তিনি ক্যাম্ব্রিজ কন্‌ফারেন্সে এক বক্তৃতা করবেন, তবে তিনি বক্তৃতার বিষয় পালটে নিয়ে বহুত্বের মধ্যে একত্বের কথাই বলবেন। পরদিন ছিল রবিবার। স্বামিপাদ পরদিন যখন বক্তৃতা সুরু করেন তখন জেম্‌স্ তাঁর ছাত্রগণের সঙ্গে বসে বক্তৃতা শুনছিলেন আর মধ্যে মধ্যে বিরুদ্ধ মতগুলি উপস্থাপিত করছিলেন। তখন সভাপতি ডাঃ জেন্‌স্ অধ্যাপক

জেম্‌স্‌কে স্বয়ং প্রশ্নগুলি উপস্থিত করতে আহ্বান করেন। কিন্তু জেম্‌স্‌ অসম্মত হন। সভান্তে অধ্যাপক স্বামিপাদের করমর্দ্দন করেন আর বলেন যে বক্তৃতাটি যুক্তিপূর্ণ ও সুপ্রতুল হয়েছে। প্রফেসর জেম্‌স্‌ তবু আর একবার চেষ্টায় ছিলেন। তিনি স্বামিপাদকে পরের দিন খানার টেবিলে নিমন্ত্রণ করলেন। স্বামিপাদ উপস্থিত হয়ে দেখেন বড় বড় বিদগ্ধজনেরা উপস্থিত। যথা—অধ্যাপক রয়েস্‌, অধ্যাপক ল্যানম্যান, অধ্যাপক সেলার। তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন ডাঃ জেন্‌স্‌। কিন্তু খানার টেবিলে অধ্যাপক জেম্‌স্‌ সহসা বহুত্ত্ববাদের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থিত করলেন। স্বামিপাদও একত্ববাদের পক্ষ নিলেন। চারঘন্টা ধরে এই তত্ত্ব সমীক্ষা চলে। উপস্থিত পণ্ডিতগণ স্বামিপাদের যুক্তির সমীচীনতাই স্বীকার করেন। ডাঃ জেন্‌স্‌ এই বিচার বিন্যাসে কোন সাংকেতিক লিপিকার না আনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন, যুক্তিগুলি এতই হয়েছিল সুষ্ঠ।

১৮৯৮ সালে তিনি বেদান্তের উপর একটি বক্তৃতা দেন। তাতে বলেন বেদান্তের আদর্শ হচ্ছে মানবজীবনের সমগ্র প্রশ্নের সমাধান করা, জীবনের উদ্দেশ্য নির্ণয় করে দেওয়া, চলার পথকে করে তোলা সুকর, আর বিশ্বজনীন ইচ্ছার সঙ্গে যতদুর সম্ভব ছন্দময় করা। আমরা দুঃখ শোকে যেন আচ্ছন্ন না হই—এদের হাত থেকে মুক্ত আমরা কোন দিনই হতে পারব না। মৃত্যুকে জয় করার পদ্ধতি বেদান্তই দেখিয়ে দেয়, দেখিয়ে দেয় কি করে অভী হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন আমরা করতে পারি। তিনি আরো বলেন, সব শেষের কথা—বেদান্তের মূল কথা হচ্ছে আমাদের নিঃস্বার্থ-পবিত্র করে তোলা, আমাদের জীবনকে আদর্শ করে তোলা, আর মুক্তিব্রতী করে তোলা। বেদান্তের শিক্ষা এই যে কোন প্রশ্নের মীমাংসা সহজ হয়ে যায় যদি আমরা সেই সার্ব্বজনীন সূত্রটি বার করতে পারি যার মধ্যে এই প্রশ্নটি রয়েছে। এই জগতে যে অসীম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবন সত্ত্বাগুলি রয়েছে সেগুলি বিবর্ত্তনক্রমে সীমা থেকে অসীমে চলেছে। আমরা প্রথমে সুরু করি একটি ক্ষুদ্র আর সূক্ষ্ম ইচ্ছার সূত্র নিয়ে। আমরা জীবনে যত উঁচুস্তরে উঠি, শেষ পৈঠায় উঠে দেখি যাকে আমরা আমাদের ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত ইচ্ছা বলে ধরেছি সেটি আর কিছু নয় সেটি সেই বিরাট ইচ্ছাশক্তি যেটি ক্ষুদ্র অণু হতে বিরাট সৌরমণ্ডলকেও চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

স্বামিপাদকে নিমন্ত্রিত অতিথি হিসাবে ফ্রি রিলিজিয়াস এসোসিয়েসানের বাৎসরিক আনন্দ উৎসবে বক্তৃতা দিতে আহ্বান করেন ডাঃ লুইজেন্‌স্‌। ইনি

ক্যামব্রিজ কন্‌ফারেন্সগুলির ডিরেক্টর ছিলেন। স্বামিপাদকে এই সভায় পরিচিত করতে তিনি বলেন—ট্রান্সেনডেণ্টালিষ্ট মুভমেণ্টের যে চিন্তাধারা, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারেই হোক, তার কিছুটা এসেছে প্রাচীন ভারতের আর্য্য ভাইদের কাছ থেকে—কিছুটা গৌণভাবে জার্ম্মানীর ভেতর দিয়ে—আর কিছুটা বা—মুখ্যত এমার্সনের চিন্তার মধ্যে ; কেমন করে তা ঠিক বলা যায় না। পরম আনন্দে আমি স্বাগত জানাচ্ছি ভাই অভেদানন্দকে। বলা বাহুল্য স্বামিপাদ ট্রানসেনডেণ্টালিস্‌ম্‌ বিষয়েই বক্তৃতা দেন। এটি ১৮৯৮ সালের মে মাসে পার্কার মেমোরিয়াল হলে ঘটে। ম্যাসাচুসেট-এ আউটলুক ক্লাবের একটি মহিলা ক্লাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে,—মিশনারীরা বলেন যে হিন্দু মায়েরা তাদের শিশুদের গঙ্গায় কুমীরের মুখে ফেলে দেয়। কিন্তু আমি পায়ে হেঁটে প্রায় পনোরো শত মাইল গঙ্গার তীর ধরে গিয়েছি আর সব রকম হিন্দুদের সঙ্গে মিশেছি কিন্তু কখন শুনিনি যে মায়েরা তাদের ছেলেদের দিয়ে কুমীরকে খাওয়াচ্ছে। এটি মিশনারীদের স্বার্থান্ধ প্রচেষ্টা মাত্র, যাতে তারা তাদের বিদেশের কর্ম্মে বেশী কিছু পেতে পারে।

ম্যাসাচুসেট ওয়ালথাম. সহরে তিনি ভগবানের মহত্ত্ব সম্বন্ধে এক বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতা এমার্সনের সহকর্মী চার্লস ম্যালয় মহাশয়ের কাছে বিশেষ প্রশংসিত হয়। জার্ম্মাণ দার্শনিক নিট্‌সের উপর এক বক্তৃতা দেন বিখ্যাত অধ্যাপক রয়েস। বক্তৃতার পরে স্বামিপাদকে এর উপর কিছু বলতে বলা হয়। তিনি নিট্‌সের মতবাদের সঙ্গে বেদান্তর তুলনামূলক কিছু বলেন। অবাক বিস্ময়ে আজ ভাবি যে অধ্যাপক রয়েসের মত বিখ্যাত পণ্ডিতের বক্তৃতার পর স্বামিপাদকে কিছু বলতে দেওয়া যে কত গৌরবের কথা আর তাতে কত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন!

বিদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রতিষ্ঠার পথ ছিল যেন নিরলস সংগ্রামের মত। সময়ে সময়ে কি ভাবে তাঁদের কাজ করতে হ'ত তার কিছু নিরিখ তাঁর লেখা ডাইরীতে পাই। "১৩ ফেব্রুয়ারী প্রচুর বরফপাত হচ্ছে। বাতাস ঘণ্টায় ৫৮ মাইল বেগে প্রবাহিত হচ্ছিল। ট্রেণ বাস সেদিন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমস্ত রাস্তাগুলি বরফে ঢেকে গেছে। সেই হাঁটু পর্য্যন্ত বরফের ভিতর দিয়ে হেঁটে ঠিক সময়ে মিসেস্‌ লিঙ কুইষ্ট-এর বৈঠকখানায় গিয়ে ধ্যানের ক্লাস করেছি।" এ যেন গীতার স্থিত প্রজ্ঞতার মূর্ত্ত প্রতীক।

মার্কিণে ক্লাবগুলি যেন জাতির কৃষ্টির নিরিখ। মার্কিণবাসীরা অবসর সময় এই সব ক্লাবে যোগ দেয় আর পরস্পরে আলাপ আলোচনায় নিজেদের জ্ঞানের পরিসর বাড়িয়ে নেয়। এই ক্লাব-জীবনে তিনিও ধীরে ধীরে দিলেন যোগ। নিজেই বলতেন—"ওদের সঙ্গে ওদের মত না হলে মনের মিল পাওয়া যায় না।" এইভাবে সাংবাদিকদের সঙ্গেও তাঁর একটা স্থান হয়ে গেল। ধর্ম্ম-যাজক সম্প্রদায়ও ধীরে ধীরে তাকে আপন করে নিতে স্বরু করলো। এমন কি তারা তাদের চার্চ্চেও বক্তৃতা দেবার স্বযোগ দিল করে। কি ভাবে তিনি মার্কিণের হৃদয় জয় করেছিলেন তার দু একটি ঘটনা না দিলে ঠিক হয় না। তিনি সাঁতার ক্লাবের সদস্য ছিলেন। একদিন কলম্বিয়ার বিখ্যাত অধ্যাপক ডক্টর পার্কার আর তিনি প্লাসিড হ্রদে সাঁতার কাটছিলেন। সেদিন হ্রদের জল খুব ঠাণ্ডা ছিল। ডাঃ পার্কার দক্ষ সাঁতারু হলেও সহসা অবসন্ন হয়ে পড়লেন। কাছে অন্য সহায় কেউ ছিল না। স্বামিপাদ একহাতে তাঁর কলার ধরে অন্য হাতে সাঁতার দিয়ে তাকে কূলে নিয়ে আসেন। সন্তরণকারী মাত্রেই জানেন যে এ ধরণের প্রচেষ্টা কত বিপদসঙ্কুল। ইনি এ কৃতজ্ঞতায় স্বামিপাদের সঙ্গে চিরদিনের মৈত্রী বন্ধনে আবদ্ধ হন, আর সভায় এক সঙ্গে বক্তৃতা দিয়েছেন। তিনি এপালেশিয়ান পার্ব্বত্য ক্লাবের সদস্য ছিলেন।

এই অধ্যাপক আর একদিন ক্যানেডিয়ান আল্পস্ পর্ব্বতে উঠছেন। পাহাড়টি ১৮০০ ফিট উঁচু। তুষারনদী বলয়িত সেই পাহাড়ে ৪৮ মাইল তারা একদিনে অতিক্রম করেন। সাধারণ লোকে ঘোড়ায় চড়ে তিনদিনে যেতে পারে। এমারেল্ড লেকের ধারে চলতে গিয়ে তাঁরা হারালেন পথ। শেষে জঙ্গলে গিয়ে পড়লেন। অধ্যাপক হঠাৎ একটি খালে পড়ে যান পার হতে গিয়ে। দারুণ শীত—তাতে জলে ভিজে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে স্বরু করেছেন ভদ্রলোক। সঙ্গে একটিমাত্র দেশলাইএর কাঠি ছিল। তাও গেছে ভিজে। কি করেন, বন্ধুকে বাঁচাতে স্বামিপাদ সারারাত্রি তাকে বুকে করে জড়িয়ে কাটালেন। তুহিন মৃত্যুর রাত্রি—শীতে পা সব জমে শক্ত হয়ে গিয়েছিল। এমনি করেই সে দেশকে করে নিয়েছিলেন আপন। মিসেস লা পেজের পুস্তকে এই ক্লাবের সদস্যদের সঙ্গে তাঁর একটি ছবি দেওয়া আছে। ধীর প্রবাহিনী নদীর মত স্বামিপাদ মার্কিনে নিজের বৈশিষ্ট্যের করেছেন প্রতিষ্ঠা, তাইত আবার দেখি, যে সব সভায় মাত্র ৪০ জন শ্রোতা ছিল, সে সব সভায় সাত হাজার পর্য্যন্ত শ্রোতার মন্ত্রমুগ্ধ অভিনিবেশ।

বিদেশীয়দের কাছে হিন্দু দর্শনের কঠিন তত্ত্বের কত সুষ্ঠু প্রকাশভঙ্গী তাঁর ছিল এও তার প্রমাণ।

সত্যের পূজারী ছিলেন চিরদিনই। জনৈক মহিলা স্বামিপাদের বেদান্ত ক্লাসের ছাত্রী ছিলেন। একদিন একান্ত অসহায়ের মত তিনি এসে জানান যে তাঁর ভগ্নী কঠিন উন্মাদ রোগগ্রস্ত। ডাক্তারেরা আশা হারিয়েছে তার বিষয়ে। সে এখন একটি আরোগ্য সদনের চিকিৎসাধীনে। স্বামিপাদের করুণাই তার এখন একমাত্র সম্বল। গভীর বিশ্বাস নিয়েই সে এসেছে তাঁর কাছে। প্রথমেই ত তিনি কোন কথায় দেননি কান, বলেন—আমি যোগীও নই, ফেথহিলারও নই যে ব্যাধি সারিয়ে দেবো। ভগ্নী কিন্তু নাছোড়বান্দা। শেষে তিনি তিনদিন পরে আসতে বলেন। তিন দিন পর সঙ্গে গেলেন সেই আরোগ্য সদনে। স্বামিপাদ ধীর মন্থরে তার শয্যা পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন মাথায় একটু মৃদু স্পর্শ আর তার সঙ্গে মৌন নিথর প্রার্থনা। এর পরে—ধীরে তার নাম ধরে ডাকলেন। কয়েক দিনের মধ্যে রোগিণী আরোগ্য লাভ করে গৃহে ফিরে আসে পূর্ণস্বাস্থ্য নিয়ে। এরপর ভগিনীটি যখন কিছু অর্থ বা রত্নাদি উপঢৌকন দিতে চায় তখন গম্ভীরভাবে বলেছিলেন স্বামিপাদ,—সত্যবস্তু কেনার জিনিষও নয়, বিক্রয়ের জিনিষও নয়, আর ঠাকুরই ভাল করেছেন, আমি কিছুই করিনি।

আরো দুটি অল্পবয়সী মেয়েদের কথা। এরা ভৌতিক কিছু ক্রিয়াকলাপের দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে আর বিপদগ্রস্ত হয়; নানারকম মানসিক বিকার নিয়ে তারা স্বামিপাদের কাছে আসে। স্বামিপাদের কৃপায় তারা শান্তির রাজ্যে আবার ফিরে আসে। মিসেস লা পেজ—এঁকে স্বামিপাদ সিষ্টার শিবানী নাম দিয়েছিলেন। ইনি কয়েক বছর ধরে গলগণ্ড রোগে কষ্ট পাচ্ছিলেন। কিন্তু স্বামিপাদের বেদান্তের ছাত্রী হওয়ায় কিছুদিনের মধ্যেই রোগের পূর্ণ উপশম হয়। আরো একটি দিনের কথা, স্বামিপাদ বক্তৃতা দিচ্ছেন। সহসা তাঁর কথা মোড় নিল আত্মহত্যার দিকে। কেমন করে আত্মহত্যায় আমাদের ধর্মজীবন ব্যাহত হয়, আর যারা এ বিষয়ে ইচ্ছুক তাদের সান্ত্বনার বাণীও বলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সভায় সিষ্টার শিবানীর সঙ্গে ছিলেন তাঁর এক বান্ধবীর আত্মীয়া। ইনি খাবার টেবিলে হঠাৎ একটি মানসিক উদ্বেগে পড়েন আর ফিরে আসেন সিষ্টার শিবানীর গৃহে। তখন সেখানেই তিনি ছিলেন। এসেই তাঁর আত্মহত্যার প্রবৃত্তি জেগে ওঠে কিন্তু গৃহে তখন সিষ্টার না থাকলেও অন্য যারা ছিল তারা বাধা

দেয়। এর পরই সেই মহিলা স্বামিপাদের বক্তৃতা শুনতে গিয়েছিলেন সিষ্টারের সঙ্গে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, স্বামিপাদ পরলোক সম্বন্ধেই বক্তৃতা করলেন সেইদিনই।

পরলোকতত্ত্ব বিষয়ে স্বামিপাদের অনেক প্রত্যক্ষানুভূতি ছিল। তিনি অনেক আত্মিক চক্রে যোগদান করেছিলেন। মার্কিণ সমাজে প্রেতচর্চ্চা তখন বেশী করেই দিয়েছিল দেখা, এখনও আছে।

লিলিডেলে সে সময় প্রেত তাত্ত্বিকদের এক বৈঠক চলছিল। স্বামিপাদকে এই বৈঠকে আহ্বান করা হয়। এই কনফারেন্সে প্রেতদের টাইপরাইটিং, শ্লেট রাইটিং, পোর্সিলেন রাইটিং প্রভৃতি সিয়ান্সে যোগ দিয়েছেন। শ্লেট রাইটিং সভায় গিয়ে তিনি দেখলেন, দুইটি শ্লেটের মধ্যে একটি পেনসিল রাখা হয়। আর একটি দড়ি দিয়ে শ্লেট বাঁধা হয়। কিছুক্ষণ পরে একটি খচ্ খচ্ শব্দ হয়। খুলে দেখা গেল গ্রীক ও ইংরাজীতে লেখা রয়েছে। ইংরাজী লেখাটিতে স্বামী যোগানন্দ নাম লেখা রয়েছে। গ্রীক কেউ জানতেন না কাজেই সেটি পড়া গেল না। এই শ্লেটটি এখনও এখানকার বেদান্ত মঠে রয়েছে! আর একটি সভায় মিডিয়াম লিলির মুখে বিখ্যাত ভ্রমণকারী থিয়োডোর পার্কার কথা বলেন। তিনি বলেন, অভেদানন্দ ভগবানের চিহ্নিত পুরুষ। অন্য একটি সিয়ান্সে তিনি যোগেন মহারাজের সঙ্গে কথা বলেন। স্বামিপাদকে যোগেন মহারাজ জিজ্ঞাসা করেন, এদেশ কেমন লাগছে। তিনি বলেন—আমার ভাল লাগে না। আরো বলেন, বলরামবাবু আমাদের সঙ্গে আছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভারতে আমি ম্যাকে দেখতে যাচ্ছি...মিসেস মসের সিয়ান্সে গিয়েছিলেন। সেখানে বলরামবাবু শরীর ধারণ করে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁর সাদা দাড়ি, সাদা পাগড়ী ছিল, আর তাতে ছোট ছোট অসংখ্য জ্যোতিরবিন্দু ছিল। তিনি শুধু স্বামিপাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্ব্বাদ করেন। যোগেন মহারাজ মিডিয়ম লিলির মুখ দিয়ে কথা বলেছিলেন। আর রাত্রে তাঁর ঘরে আসবেন বলেন। রাত্রে তিনবার দরজায় টোকা পড়ে। স্বামিপাদ জিজ্ঞেসা করেন কে—যোগেন?—উত্তর আসে হ্যাঁ। সেদিনের লেখার কথায় বলেন—সেদিন সঙ্গে একজন গ্রীক দার্শনিক ছিলেন। একটি প্রেতচক্রে তো মিডিয়ম তাঁকে 'চিন্তাশীল বাক্স' বলেই অভিহিত করে। সিষ্টার শিবানী তাঁর একটি অনুভূতির কথা লিখেছেন তাঁর বইতে। এটি ঘটে তাঁর শিশুপুত্রের মৃত্যুর পর। এই প্রেতের মুখ মানুষের মত, দেখতে সবল

আর বয়সের নিরিখ ছিল না সে মুখে। চোখ বলতে মাথার মাঝখানে একটি মাত্র ছিল। একটি আবছা মেঘের মত মেঝে থেকে ছাত পর্য্যন্ত অল্পাধিক সাতফুট হবে। এতে লেখিকার দৃঢ় উপলব্ধি হয়েছিল যে মৃত্যু নাই, বাল্য বা বয়স নাই—অনন্ত জীবনই একমাত্র সত্য।

সিষ্টারের এই দর্শন স্বামিপাদের স্থূল প্রেরণাতেই, একথা তাঁর পরবর্ত্তী বক্তৃতা'য় প্রকাশ হয়েছিল। পরলোক বিষয়ে নানা বক্তৃতা দেন। এই সব বক্তৃতা তিনি বিভিন্ন আত্মিক সমিতির আহ্বানে দেন।

তিনি পরলোক তত্ত্বের কিছু গূঢ় রহস্য ভেদ করেছেন তাঁর বক্তৃতাগুলিতে। এক মধ্যে একটি কথা এই যে, মৃত্যুর পর আত্মা বাস্তব জগতের তিনটি—Dimension বা দিক ছাড়িয়ে চতুর্থ স্তরে বাস করে। তৃতীয় চতুর্থ স্তর যেন একটি বৃত্তের মধ্যে আর একটি বৃত্ত। বিজ্ঞানের মতে কেবল জড়ের পরমাণু স্পন্দনের কথাই আছে। কিন্তু জড়ের স্পন্দনে চেতনা উদ্ভব সম্ভব নয়। তিনি আরো বলেছেন যে যেমন একটি মানুষ তার প্রোটোপ্লাজমের ভিতর নিহিত ছিল তেমনি সমস্ত মানবতা নিশ্চয়ই কোন জৈব জীবাণুতে নিহিত ছিল, না হলে এই সব শক্তি শূন্য হতেই এসেছে একথা বিজ্ঞান বিরুদ্ধই হবে।

আত্মার মৃত্যুর পর তার জীবন নির্দ্দিষ্ট হবে তার বাসনা কামনা নিয়ে। মৃত্যুর সময় আমাদের শক্তিসমূহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় আর আমাদের চৈতন্য সত্ত্বা কেন্দ্রীভূত হয়। অন্য সব শক্তি আত্মসাৎ করে এই আত্মা দেহ পরিত্যাগ করে। এমনি বহু মূল্যবান তথ্য স্বামিপাদ এই সব বক্তৃতায় দিয়েছেন। অবশ্য তিনি শেষ ছেদ টেনেছেন বেদান্তের ব্রহ্মসত্যে।

১৯০০ সালে স্বামিপাদ ইণ্ডিয়ানাতে কতকগুলি বক্তৃতা দেন প্রায় ৭০০০ শ্রোতার সম্মুখে। এর মধ্যে রি-ইনকারনেশন বিষয়টিও ছিল। এতে তিনি তালমুদ, কাবালা, পিথাগোরাস, এমপিডক্লিস, প্লেটো, ভারজিল, ওভিউ ও প্লটিনাস প্রভৃতির মতবাদ থেকে দেখান জন্মান্তরবাদের দৃঢ় ভিত্তি। ওয়ার্ডসওয়ার্থ, টেনিসন, হুইটম্যানের কবিতাও তিনি উদ্ধৃত করেছেন এ বিষয়ে। তিনি দেখান যে বেদান্ত মতে কিছুই নষ্ট হয় না। স্বামিপাদ বলেন প্রত্যেকের অবচেতন মনে তার পূর্বপ্রাপ্ত উলপব্ধিগুলি বেঁচে থাকে। তিনি Weisman থেকে উদ্ধৃত করে দেখান যে আমাদের দেহের germ-গুলি পূর্ব পূর্ব জন্ম হতে চলে আসছে মাত্র। এরাই আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত করে।

তিনি অন্ধ টমের কথা তাঁর বক্তৃতায় বলেন, টমের অদ্ভুত সঙ্গীত মনীষা এই জন্মের সাধনার নয়। বড় বড় মানস্বী আর আবিষ্কারকদের জীবন-বেদ ব্যাখ্যা করতে হলে এই পুনর্জন্মবাদ মানতেই হবে। তিনি বিবর্ত্তনবাদকে খণ্ডিত করে বলেন যে এই মতবাদ সম্পূর্ণ নহে। কারণ মানুষের নৈতিক জীবন কেন যে গড়ে উঠল তা এতে বলতে পারে না। বলতে পারে না, নানা প্রকারের জীবন কেন সৃষ্টি হল। বেদান্ত কিন্তু বিবর্ত্তনবাদকে স্বীকার করে আর জীবের নানা স্তর বিন্যাসের কারণও দিয়ে থাকে। এই মতবাদে—যা পরে হয়েছে তার বীজ প্রথম স্তরেও ছিল। তার মতে মানব দেহের বীজাণুগুলির মধ্যেই রয়েছে প্রাণশক্তি, ইন্দ্রিয়শক্তি, মনের শক্তি ও নৈতিক শক্তি। বেদান্ত এদের বলে সূক্ষ্ম দেহ। এরাই ক্রমবিবর্ত্তনে মানুষরূপে প্রকাশিত হয়।

ষ্টারিক দম্পতি স্বামিপাদের নিউইয়র্কের ক্লাশে আসতেন। এটি ১৯০১ সালের কথা।. এর বহু পরে ১৯০৪ সালে স্বামিপাদ এটলাণ্টায় আসেন বক্তৃতা প্রসঙ্গে। এসে দেখেন শ্রীমতী ষ্টারিক হয়েছেন যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত আর ডাক্তারেরা তাঁকে শুয়ে থাকতে নির্দ্দেশ দিয়েছেন। এসে তাঁর এই অবস্থা দেখেই স্বামিপাদ মর্ম্মাহত হয়ে ষ্টারিকের হাত চেপে ধরে বললেন—আমি তোমায় সাহায্য করবো। এরপর রোগীণী নিজেই বলছেন—স্বামিপাদ চলে যাওয়ার পর মনে হল, আর সমস্ত রাত্রিটাই এ ধারণা ছিল, যে আমার বুক থেকে একটা ভারী পাথরের বোঝা যেন নেমে গেল। এরপর শ্রীমতী স্বামীপাদকে এক ভোজে করলেন নিমন্ত্রণ আর নিজেই নিলেন রন্ধনের সমস্ত ভার। সেদিন থেকে কয়েক বছর আর কখনও শ্রীমতী এমন শয্যালীন হন নি।

মার্কিণে স্বামিপাদকে ধর্ম প্রচারে বহু নরনারীর সঙ্গে মিশতে হয়েছে। কেহ হয়তো এসেছে বড় গাড়ী করে, ভূষণ ভূয়িষ্ঠ হয়ে—স্বামিপাদ তাকে দেননি বহুমান। আবার অল্প বয়সের দুইবোন এসেছে ধ্যানের ক্লাশে, প্রাণায়ামের শিক্ষা কে কত নিতে পারে এই নিয়ে চলেছে মনান্তর। দেখেছেন তাদের সস্নেহে।

স্বামিপাদ যখন ওদেশে প্রথম পদার্পণ করেন তখন তাঁর বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর। কিন্তু সেই বয়েসেই তাঁর প্রজ্ঞার কথা বলতে ওদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধিধারী জনৈক মহিলা বলেছেন সিষ্টার শিবানীকে—স্বামিপাদ হচ্ছেন এ যুগের শ্রেষ্ঠ মনীষী। এক সঙ্গে আরো একটি প্রশ্ন ভগিনী স্বামিপাদকে

করেন। সেটি এই, আপনি যে আহ্বান পেয়েছিলেন হারভার্ডে ইংরাজীর প্রধান অধ্যাপকের পদে সেটি প্রত্যাখ্যান কেন করলেন। উত্তরে বলেন স্বামিপাদ,—সন্ন্যাসীর জীবনে অর্থের বা যশের কোন পদবী গ্রহণ নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে আরো একটি প্রশ্নের কুহেলিকা রয়ে গেছে। ভগিনী শুনেছিলেন যে ব্রুকলিন ইনষ্টিটিউট অব আর্টস্ এ্যাণ্ড সায়েন্স পি, এইচ, ডি, সম্মান করে স্বামিপাদকে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তাদের সেকথা লেখায় তারা অস্বীকার করেন। কিন্তু তারা এও জানান যে যত বারই তাঁর নাম তাদের ইয়ার বুকে দেওয়া হয়েছে তত বারই তাঁর নামের সঙ্গে পি, এইচ, ডি, সংযুক্ত ছিল। তবে তারা আরো জানায় যে পি, এইচ, ডির কাছাকাছি যে ডিগ্রী তাদের আছে সেটি তাদের মেম্বারসিপ বা ফেলোসিপ সে সম্মানও তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তাদের ইয়ারবুকে ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত তাঁকে সভ্য বলে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের কাছে এই সবগুলির সামঞ্জস্য করা দুষ্কর ব্যাপার বলেই মনে হয়। এটির অর্থ কি এই যে, কোন কারণে তারা তাদের ইয়ারবুক হতে একথা মুছে দিয়েছেন। আর একটি আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে—গোরখপুরের গীতা প্রেস হতে প্রকাশিত 'সন্ত অঙ্ক' নামে পুস্তকে স্বামিপাদের নামের সঙ্গে পি, এইচ, ডি, দেখা যায়। এর অর্থ দুর্বোধ্য।

বেদান্ত প্রচার বিভাগগুলিতে পুস্তক বিক্রীত হত। তার সালতামামিতে আমরা বুঝতে পারি ধীরে ধীরে বেদান্ত কিভাবে মার্কিণের জনসাধারণকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। প্রথম বৎসর ৫২৫০ খানি পুস্তিকা আর ২৫০০ পুস্তক বিক্রয় হয়। এমনও দেখা গেছে জনৈক মোটর চালক প্রচুর বেদান্তের বই কিনেছেন— জিজ্ঞেস করায় তিনি বলেন, আমার গ্যারেজে অনেক ছেলে আসে তাদের পড়ার জন্যই বই কিনি। আবার একজন হয়তো দাঁড়িয়ে আছে সতৃষ্ণ নয়নে সমিতির দিকে চেয়ে। বলে একটা বই কিনবো কিন্তু নামটা মনে নাই, মাত্র দুটি কথা মনে আছে—'ভগ'। শুনে সমিতির লোকদের বুঝতে ভুল হল না যে ভদ্রলোক ভগবদ্গীতাই চান।

মার্কিণে প্রথমদিকে স্বামিপাদকে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল। তাঁর গৃহে ব্যবস্থাপনার ভারে যিনি ছিলেন তাঁর একটি উক্তি এখানে আমাদের কাছে প্রামাণ্য বলেই স্বীকৃত হবে। তিনি রাত্রে শুতে যাবার আগে দেখতেন স্বামিপাদের ঘরে আলো জ্বলছে। আবার ভোরে কাজ করতে এসেও দেখতেন

তাঁর ঘরের প্রান্ত আলোয় সমুজ্জ্বল। তিনি বলেন,—খুব অল্পলোকেই জানে কত কঠিন পরিশ্রমই না করতেন স্বামিপাদ। ভগিনীর নিজস্ব একটি কথা এখানে দেওয়াই ভাল মনে হয়। একদিন বক্তৃতায় কোন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকের একটি অধ্যায় তিনি বিশ্লেষিত করছিলেন তখন জনৈক অনামা ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে ঐ উক্তি যে ঠিক নয় সে কথা জানান। স্বামিপাদ তাঁকে পুস্তকের পত্রাঙ্ক ও পরিপূরক অংশটিও বলে দেন এবং বলেন যে তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন নি—কলকাতা আশ্রমেও আমরা দেখেছি কত নিখুঁত ছিল তাঁর অধিগত বিদ্যা। একদিনের কথা মনে পড়ে,—বেদান্তমঠ তখন রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে। স্বামিপাদ ফাউণ্টেন পেনের নিবটি পরিষ্কার করছেন। চেয়ে নিলাম কলমটি আমাদেরই কাজ বলে। একটু ব্লটিং তাঁর লেখার প্যাড থেকে নিতে যাচ্ছি। থামিয়ে দিয়ে আলমারির একটি কোণ থেকে একটুকরো কাপড় এনে দিলেন। অত উঁচু থেকে মন নামিয়ে এনে সামান্য কলম আর পরিষ্কারের জন্যে কাপড়ের ঠিক রাখা এ তাঁরই সাধ্য—

ছোট ছোট শিশুনারায়ণদের জন্যও স্বামিপাদ করেছেন চেষ্টা – ইয়ং পিপল্স গেম এসোসিয়েসানের মাধ্যমে। নিয়মিত পঠন পাঠন হত নিউইয়র্কে। নিউইয়র্ক হেরাল্ডে এ বিষয়ে এক সংবাদ প্রকাশিত হয়, স্বামিপাদের একটি মনোজ্ঞ প্রতীতি সমেত। এতে লেখা ছিল প্রতি শনিবার পূর্ব্ব ২৫ নম্বর রাস্তায় ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একটি ক্লাস হয়। এখানে বেশ মনোজ্ঞভাবে 'হিন্দুদর্শন' ছেলে-মেয়েদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এই সব ছেলেমেয়েরা আশা ভরা মুখ নিয়ে আনন্দ করে আসে, সেখানে তারা গোল হয়ে সুদর্শন স্বামিপাদের চারপাশে বসে। তাঁর গায়ে থাকে ঘন লাল রংএর আলখিল্লা · ভগবান ঈশামসির কথাও থাকে বেদান্ত দর্শনের সঙ্গে।

প্রথম প্রথম ছেলেদের সঙ্গে তাদের মায়েরাও আসতো। তখন তাদের দিকে দৃষ্টি দিতে হত, কাজেই ছেলেদের সুবিধা হত না। সেইজন্য পরে শুধু ছেলেদেরই আসতে দেওয়া হত ঐ সব দিনে।

১৯০১ সালের মার্চ্চ-এ শিশুদের ক্লাস নেওয়া সাধ্যায়ত্ত না হওয়ায় উঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৮৯৮ সাল থেকে মিঃ ট্রাইন স্বামিপাদের সঙ্গ করেন নানা ভাবে। মনোযোগী ছাত্র হিসাবে বেদান্তের ভাষণ শোনা, পর্ব্বতারোহণ, এই সবে স্বামিপাদের সঙ্গী ছিলেন। কিন্তু তাঁর পুস্তকে স্বামিপাদের কোন ঋণ স্বীকার

করেন নাই। তাঁর Every Living Creature গ্রন্থে Why a Hindu is a vegetarian নামক বক্তৃতার দীর্ঘ অংশ বিশেষ রয়েছে, অন্য পুস্তক Greatest thing everknown এর ভাবশৈলীতে বেদান্তের স্পর্শ রয়েছে, এর পর প্রকাশিত In tune with infinity এতেও স্বামিপাদের ভাবধারা রয়েছে, কিন্তু স্বীকারোক্তি কোথাও নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মের প্রয়োজন বিষয়ক এক বক্তৃতা ১৯০১ সালের প্রথম সপ্তাহে দেন। এটি নিউইয়র্ক 'সান' পত্রে প্রকাশিত হয়। 'কার্ণেগী লাইসিয়া'মে এই বক্তৃতা হয়। এতে স্বামিপাদ বলেন, আমাদের মস্তিষ্কের কোষগুলিকে এমনভাবে টিউন করতে হবে যাতে এরা বিশ্বআত্মার সঙ্গে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করে। এতে শক্তি বৃদ্ধিই হবে। আরো মন আর বস্তু বিভিন্ন কিছুই নয় এবং এরা সেই অনির্দ্দেশ্য তত্ত্বের মানস সত্ত্বা ও বস্তুসত্ত্বা মাত্র। বিংশশতাব্দীর ধর্ম্মে কোন পুস্তকের আদর্শ এবং ব্যক্তি বিশেষের কথা থাকবে না। এক ভগবান ব্যক্তিবিশেষ বা নৈর্ব্যক্তিক হবে না—হবে দুয়ের পারে। এঁর পরম সত্ত্বা, সৃষ্টির চরম সত্ত্বার সঙ্গে পাবে সামঞ্জস্য।

অনেকদিন থেকেই ভারতের হাতছানি তাঁকে ডাকছিল। সেখানেও তাঁর করণীয় রয়েছে। বিশেষ বিবেকবীরেশ্বরের অন্তর্ধানের পর দেশের ডাক হয়ে ওঠে অসহ। আরো যখন শুনলেন যে স্বামিজীর অবর্ত্তমানে ভারতে বেদান্ত প্রচার ম্লান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাঁর ভারতে বক্তৃতাগুলি এই চিন্তারই ফল। ১৯০৬ সালে ১৬ই জুন্ মুলতান জাহাজে রওনা হলেন ভারতের দিকে। বেদান্ত সমিতির সভ্যেরা তাঁকে যে মানপত্র দান করেন তার কিছু সারোদ্ধার এখানে না দিলে পরের কথা ঘরে আনা হবে না। বেদান্ত সমিতির সভ্যেরা বলেন,—দশ-বৎসর আপনি অবিশ্রান্ত কার্য্য করেছেন। আমাদের মধ্যে নানা কষ্ট নানা বাধা, এমন কি শত্রুতাও পেয়েছেন শেষপর্ব্বে, তবে এগিয়ে গেছেন অভয়ে...। আমাদের মধ্যে যারা এসেছিল শরীর ও মনের অসুস্থতা নিয়ে তাদের শরীর আজ সুস্থ মনও পূর্ণ। সর্ব্বত্রই আপনি আমাদের আশার বাণী, শক্তির বাণী, আনন্দ আর ধর্ম্মের আলো এনে দিয়েছেন। এই সঙ্গে মনে পড়ে আজ মার্কিণের আশ্রমে যে ভারতীয়দের প্রভুত্ব বজায় রয়েছে তার মূল ছিল স্বামিপাদের দৃঢ়তা। মিসেস্ ওলিবুল ও তাঁর মতানুগেরা একবার একটি প্রস্তাব এনেছিলেন যে মার্কিণে বেদান্ত সমিতিতে ভবিষ্যতে কে প্রধান হবে তার নির্ব্বাচনের ভার

থাকবে মার্কিণবাসীদের ওপর। অভেদপাদ দৃঢ়ভাবে এর বিরুদ্ধে দাঁড়ান আর বলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণের পতাকা বহন করবে তাঁর চিহ্নিত কর্ম্মীরাই—অন্য কেউ নয়। বলা বাহুল্য অগ্নিতুল্য এই মহাপুরুষের কথা সকলেই মাথা পেতে নিয়েছিল সেদিন।

১৮৯১ সাল থেকে ১৯০৬ পর্যন্ত স্বামিপাদের বিরাট কর্ম্মপদ্ধতিতে আমরা দেখি বিবেকস্বামিপাদের সবল করাঘাতে যে নিউইয়র্কের দুয়ার উন্মোচিত হয়নি সেখানে স্থায়ী ভবনের ব্যবস্থা হয়েছিল। নানা স্থানে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বক্তৃতা ছাড়া বড় বড় মনস্বীদের সামনে বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর বক্তৃতা বিদগ্ধজনের কাছে তাঁকে যে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল সে কথা ঐতিহাসিক। ডাঃ জেন্‌স্‌, অধ্যাপক রয়েস, অধ্যাপক জেম্‌স্‌, ল্যানম্যান প্রভৃতি বিখ্যাত চিন্তানায়কদের সঙ্গে সমান পদবীতে ভাষণ দিয়েছেন—বন্ধুত্ব অর্জ্জন করেছেন। মার্কিণবাসিনী এক ছাত্রী মিস্‌ মিনি বুক চার একর জমি তাঁকে দান করেন। এরই উপর শান্তি আশ্রম স্থাপিত করেন পূজনীয় তুরীয়ানন্দ মহারাজ। এই জমি অভেদপাদ বেলুড় মঠকে অর্পণ করেন। এ ছাড়া বহু শিষ্য ও ভক্তের সৃষ্টি হয়েছিল সে-দেশে। সে-দেশে কিভাবে যে আপামর জনসাধারণকে তিনি ভালবেসে আপন করে নিয়েছিলেন আজ তার হিসাবের দিন উপস্থিত বলেই মনে হয়।

ভারতে তাঁকে যে রাজকীয় সম্বর্দ্ধনা করা হয় তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দেওয়া অসম্ভব তবু আমরা কিছুটা দিতে চেষ্টা করব।

তাঁকে কলম্বোয় লঞ্চে করে নামান হয়। তারপর ব্যারিষ্টার তিয়াগরাজা তাঁকে মাল্যচন্দনে ভূষিত করেন। এখানে বিরাট অভিনন্দনের পর তিনি একটি ছোট বক্তৃতা করেন। পরে এই সম্পর্কে দুইটি বক্তৃতা দেন। কান্দী ষ্টেশনে তাঁকে রাজ সম্মানে অভিনন্দিত করা হয়। এখান হতে জাফনায় তাঁর আগমনে দীপান্বিতার আয়োজন হয়। এখানেও তিনি একটি বক্তৃতা দেন। রাত্রিতে জনসভায় 'বেদান্ত' বিষয়ে আর একটি বক্তৃতার ব্যবস্থা হয়। তুতিকোরিনে কসমপলিটান ক্লাবে তাঁর বক্তৃতায় প্রায় চারহাজার শ্রোতা ছিল। টিনেভেলিতে সহস্র সহস্র লোক হস্তী, অশ্ব, পতাকায় এক রাজকীয় শোভাযাত্রার আয়োজন করেন। সহস্র সহস্র উদগ্রীব শ্রোতার সম্মুখে তিনি 'বিশ্বজনীন বেদান্ত' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। শ্রীরঙ্গম তীর্থে উপস্থিত হলে, স্থানীয় ক্লাবে 'হিন্দুধর্ম্ম' বিষয়ে এক দীর্ঘ বক্তৃতা হয়েছিল। পাদুকোটার দেওয়ানের অভ্যর্থনায় তিনি 'মার্কিণে

বেদান্ত' নামে এক বক্তৃতা দেন। এ সময় এক বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। সে স্থানে তখন অনাবৃষ্টি চলছিল। স্বামিপাদ বক্তৃতা সুরু করলে অজস্র বারিধারা দেখে লোকে তাঁকে দৈবাদিষ্ট পুরুষ মনে করেছিল। ইয়ংমেন এসোসিয়েসনেও সেবার স্বামিপাদ বক্তৃতা দেন। তাঞ্জোরে তাঁর আগমনে আবার এক দীপসজ্জার ব্যবস্থা হয়েছিল। এখানে বেদান্ত হলে 'পাশ্চাত্যে বেদান্ত' নামে এক বক্তৃতা দেন। এর পর তাঁকে কুম্ভকোণমে নিয়ে যাওয়া হয়। পরদিন সকালে তিনি বাঙ্গালোর যাত্রা করেন। এ স্থানে মানপত্র দেওয়া হলে প্রায় তিন হাজার লোকের সম্মুখে 'হিন্দুধর্ম্ম' বিষয়ে এক বক্তৃতা হয়। জুলাই মাসের ১৫ই তারিখে তিনি মাদ্রাজে শুভাগমন করেন। ষ্টেশনে বিরাট জনসমুদ্র তাঁর দর্শনের অপেক্ষায় ছিল। ভিক্টোরিয়া হলে অভ্যর্থনা অসম্ভব হওয়ায় খোলা ময়দানে তাঁকে অভ্যর্থিত করা হলে পরদিন অপরাহ্নে ভিক্টোরিয়া হলে পাঁচশত শ্রোতার সামনে তিনি 'বেদান্তের সার্ব্বভৌমিকত্ব' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এর পর 'বিবেকানন্দ মেমোরিয়াল হলের' ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। 'রামকৃষ্ণ হোমের' ভিত্তিও ২০শে জুলাই স্থাপন করেন। পরে তাঁকে নিয়ে বাঙ্গালোরে ৮০০০ হাজার লোকের সমাবেশে এক বিরাট শোভাযাত্রা হয়। এই শোভাযাত্রায় রাজকীয় শকটে স্বামিপাদকে বসান হয়। অগ্রে মিশনের পতাকা তার পর ঠাকুর ও স্বামিজীর মূর্ত্তি পশ্চাতে স্বামিপাদ। এর পর প্রায় আট হাজার নাগরিকের উপস্থিতিতে ডোডনা হলে বেদান্ত দর্শনের উপর এক বক্তৃতা দিলেন। ৩রা আগষ্ট 'অন্ন বাসন্তী সংঘ' তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করে। সেখান থেকে মহীশূরে তাঁকে বিরাট অভ্যর্থনা করে নিয়ে যাওয়া হয় রঙ্গচার্লু মেমোরিয়্যাল হলে। প্রায় দশ সহস্র লোকের সমাগম হয়। এখানেও একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা তাঁকে দিতে হয়।

মহীশূরে ছাত্রদের সভায় 'শিক্ষার আদর্শ ও ভারতীয় যুবকদের কর্ত্তব্য' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। ১৮ই আগষ্ট দেওয়ান প্রদত্ত ৯ একর ভূমির উপর এক শিক্ষা-কেন্দ্রের ভিত্তি স্থাপন করেন। ২৩শে আগষ্ট তাঁরা পুরী দর্শন করেন। এখানে প্রবাসী বাঙ্গালীরা তাঁকে অভিনন্দিত করেন। স্বামিপাদও একটি বক্তৃতা দেন। পরের গম্যস্থান কলিকাতা। এখানে হাওড়ায় সহস্রাধিক লোক তাঁর জন্য উন্মুখ হয়েছিল। ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতার নাগরিকগণের পক্ষ হতে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয়। তিনিও একটি বক্তৃতা প্রত্যুত্তরে দেন। এর পর পাটনা, কাশী,

আলোয়ার, আগ্রা প্রভৃতি স্থানে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয় প্রত্যেক স্থানেই আলোচনা ইত্যাদি করেছিলেন। পরের কথা আমাদেবাদ হয়ে বোম্বাইয়ে উপস্থিত হলেন। এখানেও তিনি কতকগুলি বক্তৃতা দেন। বোম্বাই থেকে তিনি 'এস. এস. মানওয়ার' নামক জাহাজে মার্কিণে ফিরে আসেন।

১৯০২ সালে তিনি ফ্রান্সিস্কোর ক্লাসে "স্পিরিচ্যুয়াল আনফোল্ডমেণ্ট" এই বক্তৃতা দেন। স্বামিপাদ এতে বলেন যে,—ধর্ম্মের সার কথা হচ্ছে আত্মজ্ঞান ও আত্মসংযম। সম্পূর্ণ স্বাধীনতা পেলেই আমাদের প্রকৃত সুখ আর আত্মসংযম ঠিক হলেই আমাদের ঠিক ঠিক স্বাধীনতা লাভ হয়। নিজের মনকে আমাদের বুঝতে হবে। সুখের ইচ্ছা থেকে প্রবল বাসনা আর তার থেকে ক্রোধ ইত্যাদি হয়—যদি না তাকে পরিপূরণ করতে পারি। এই সব বাসনা আমাদের অবচেতনে থাকে। এই সব জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার, মৃত্যুতেও নষ্ট হয় না। এরাই আমাদের চরিত্র গঠিত করে। এগুলির ওপর মনের জোরে আধিপত্য করাই যোগের উদ্দেশ্য। পরমপুরুষের উপর মনঃসংযম এর আর একটি উপায়। হিন্দু-মনোবিজ্ঞানে মনের ক্রিয়ার পাঁচটি অবস্থা আছে। ক্ষিপ্ত, মূঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিরুদ্ধ। প্রথমটিতে সর্ব্বদা অস্থির। দ্বিতীয়ে মোহগ্রস্ত, তৃতীয়ে কখন শান্ত কখন অস্থির। চতুর্থ অবস্থায় একাগ্র ও পঞ্চমে আত্ম সাক্ষাৎকার হয়। তখন আমরা পরম তত্ত্বের সহিত একীভূত হই।

১৯০৪ সালে স্বামিপাদ 'ওয়েবষ্টার গ্রোভ সোসাইটি'র নিমন্ত্রণে 'ভারতীয় নারী' বিষয়ে এক বক্তৃতা দেন। এই সব বক্তৃতায় তিনি বৈদিক যুগ ও পৌরাণিক যুগের মহিয়সী মহিলাদের জীবনায়ন উদ্ধৃত করেন। ঋক বেদের রাজা 'নমুচী' তাঁর মহিষীকে যুদ্ধে পাঠান সে কথাও উদ্ধৃত করেন। ঝাঁসীর রাণীর কথাও ঐতিহাসিক। অহল্যাবাঈ নিজে রাজ্য পরিচালনা করেছিলেন সেকথাও বলেন। হিন্দু নারীদের দেবীরূপে শ্রদ্ধা করতে শিক্ষা দেয় মনু প্রভৃতি এঁদের উক্তিও তিনি উদ্ধৃত করেন। শিক্ষা বিষয়ে মালাবারে সাতজন কবির কথা, ইতিহাস প্রসিদ্ধ লীলাবতীর আঙ্কিক পারদর্শিতার কথাও উল্লেখ করেন। মিসেস্ ষ্টীলের লেখাও স্বামিপাদ তাঁর কথার সপক্ষে উদ্ধৃত করেন। এই মহিলা পাঁচিশ বৎসর ভারতে ছিলেন।

'ব্রুকলিন ইনষ্টিটিউট অফ্ আর্টস এণ্ড সায়েন্স এসোসিয়েসন হল'-এ ১৯০৫ সালে স্বামিপাদ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। এই বক্তৃতাটি পরবর্ত্তীকালে

'ইণ্ডিয়া এণ্ড হার পিপ্‌ল' নামে মুদ্রিত হয়। খুব সম্ভব এই পুস্তকটি তদানীন্তন ভারতের ইংরাজ সরকার কর্তৃক এদেশে প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছিল। এতে স্বামিপদ ভারতের দার্শনিক মতবাদগুলি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। তিনি বেদান্তের মতবাদের সঙ্গে কাণ্টের মতবাদের কিছু তুলনা এই প্রসঙ্গে করেন। এরপর তিনি ভারতের তৎকালীন ধর্ম্মজীবনের একটি স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। এতে রামায়েত সম্প্রদায়ের কথা, কৃষ্ণ উপাসক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কথা, শঙ্করাচার্য্যের বেদান্ত সম্প্রদায়, রামানুজী সম্প্রদায়, মধ্যসম্প্রদায়, রামানন্দী সম্প্রদায়, নিম্বার্ক সম্প্রদায়, শৈব সম্প্রদায়, শাক্ত সম্প্রদায়ের বর্ণনা আছে। তিনি বলেন যে সাংখ্য মতবাদকে ভিত্তি করেই শক্তি সম্প্রদায় গঠিত, গুরুনানক প্রতিষ্ঠিত শিখ সম্প্রদায় ও জৈন সম্প্রদায়ের ও বৌদ্ধদের কথাও তিনি বলেন। ব্রাহ্ম সমাজের কথা অন্য সমাজের কথাও স্বামিপাদ ভারতের ধর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। শেষ ধর্ম্মচক্র শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার, এটিকে বিশ্বধর্ম্ম বলাও চলে। তিনি এই বক্তৃতায় প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থার কথা আলোচনা করেন। আর এর সঙ্গে তুলনামূলক ভাবে বলেন, বর্ত্তমান সমাজের কথা। তখনকার সমাজ যে পবিবর্ত্তনের মুখে ছিল সে প্রসঙ্গও ছিল, আর বলেন যে বেদান্তের অনুশাসনেই এর যথার্থ মীমাংসা হবে। এরপব তিনি প্রাচীন ও আধুনিক রাষ্ট্র ব্যবস্থার উল্লেখ করেছেন। শিক্ষা প্রকরণে ঐতিহাসিকের দৃষ্টি নিয়ে তিনি বৈদিক যুগ হতে বর্ত্তমান শিক্ষা সমস্যাগুলি বিশ্লেষিত করেন। এরপর স্বামিপাদ পাশ্চাত্য সভ্যতায় ভারতের অবদান সম্পর্কে এই বিবৃতি দেন। জ্যামিতি, বীজগণিত, অঙ্কশাস্ত্র, সঙ্গীত বিদ্যা ও চিকিৎসা বিদ্যা ভারতেরই দান। প্লেটোর ত্যাগের মন্ত্রে আমরা ভারতের ঋষিদেরই খুঁজে পাই। অধ্যাপক হাওয়ার্ডেরও এই মত। প্লেটোর গুহার ছায়া আমাদের মায়াবাদেরই নামান্তর। মোক্ষমুলারের মতে আরিস্ততলের ন্যায়শাস্ত্র, হিন্দুন্যায়েরই গ্রীক অনুবাদ। সেকন্দর সাহের ভারত আক্রমণের পর থেকে ভারতের সঙ্গে গ্রীক দেশের আদান প্রদান গভীরতর হয়। মহাফ্‌ফি ছিলেন খ্রীষ্টান ঐতিহাসিক, তিনি বলেন যে ইহুদিদের এসেনি সম্প্রদায়, বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারকদের কাছে তাদের মতবাদের জন্য ঋণী। ভগবান যীশুখৃষ্টের গুরু জন দি ব্যাপ্টিষ্ট এই এসেনি সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পবিত্র জল সেচন প্রভৃতি যে প্রক্রিয়া খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ে আছে তাও বৌদ্ধদের কাছে নেওয়া হয়। আরনেষ্ট রেনান এই মত পোষণ করেন।

বিদেশী সভ্যতা আমাদের স্বাধীনতার চিন্তা ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষার দিকে দৃষ্টি দিতে শিক্ষা দিয়েছে। অবশ্য ভারতের সমাজ ব্যবস্থা নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে। ধর্ম্মচিন্তাও শ্লথ হয়ে যাচ্ছে, ব্যবসায় বুদ্ধিও বেড়ে চলেছে। এই শিক্ষা কেন্দ্রে তিনি আরও বক্তৃতা দেন তার মধ্যে জগতের পরিত্রাতাগণের কথা, তাঁদের জীবনবেদ ও মতবাদগুলি বেশ দক্ষতার সঙ্গে দিয়েছেন। পরিত্রাতাগণের কথা মধ্যে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীজরথুষ্ট, লাওৎসে, ভগবান বুদ্ধ, ভগবান ঈশামসি, মহম্মদ ও ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের কথা প্রধান ভাবে বলেছেন।

এতদিনে নিউইয়র্কে নিজস্ব বাড়ী কেনা হল। সেটা ৯০৭ সালের ২রা মার্চ্চের কথা। ১০৫ ওয়েষ্ট ৮০নং ষ্ট্রীটে এটি অবস্থিত। ২৫শে এপ্রিল এই গৃহে আশ্রম স্থাপিত হল। নির্জন একটি আশ্রমের গৃহও কেনা হল, এটি নিউইয়র্ক থেকে ১০৭ মাইল দূরে কনেকটি কাট সহরে অবস্থিত। মনোরম পর্ব্বতমালায় ৩০০০ ফুট উঁচুতে একটি কৃষকের বাড়ী আর ধানের গোলা, এ্যাপ্‌ল ও পাইন কুঞ্জে ছড়ান রয়েছে দু একটি ঝরণা। ২৫০ একর পরিমিত এই জমি তার মধ্যে ৬৪ একর আবাদী জমি। স্বামিপাদ পরমানন্দকে মার্কিণের জন্য তৈরী করেছিলেন সব দিক দিয়ে। আর ইংরাজী শিক্ষার জন্যে দুটি শিক্ষকও ঠিক করে দিয়েছিলেন।

লণ্ডনের বেদান্ত সমিতির ডাক এসেছে বার বার সেখানে বেদান্ত সম্বন্ধে বক্তৃতাও দিয়েছেন। এখানে সিষ্টার নিবেদিতা স্বামিপাদের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলেচেনা করতেন। এখানে যোগের ক্লাশে স্যার হেনরি গ্রেহামও ছাত্র ছিলেন।

ডাঃ কাথবার্ট, ডাঃ সাণ্ডারল্যাণ্ড, ডাঃ রাইট প্রভৃতি মনীষীগণও তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি আতলান্তিক সাগর পার হয়ে সতেঁরো বার ইংলণ্ডে আসেন। মনে হয় আর কোনো মনীষী এতবার সাগর পার হন নি। যাই হোক এক বারের কথা। ১৯১৫ সালে ৫ই মে পর্য্যন্ত লণ্ডনে থেকে তিনি আবার নিউইয়র্কে যাত্রা করবেন। ৬ই মে ১৯১৫ তিনি নিউইয়র্কের জন্যে যাত্রা করবেন প্রসিদ্ধ জাহাজ লুসিটোনিয়ায়। ৬ই মে টিকিট কেনার সব ঠিক—ইংলণ্ডের বন্দর থেকে জাহাজে উঠতে হবে। টিকিট কিনতে যাচ্ছেন এমন সময় পেছন থেকে যেন দৃঢ়ভাবে কে নিষেধ করলেন—স্বামিপাদ এদিকে ওদিক দেখলেন কাউকেও দেখতে পেলেন না। এতে হতচকিত হয়ে প্রথমে মনে করলেন মনের ভুল—আবার টিকিট কিনতে গেলেন—সেবারেও সেইরকম তখন বাসায় ফিরে এসে ঠিক করলেন,—কাল ফিরবেন।

পরদিন সকালে কাগজ খুলে বিস্মিত হয়ে গেলেন। ঠাকুরের করুণা কথা ভেবে নেমে এল দুই চোখে জল—দেখলেন, "S. S. Lusitania is no more." জার্ম্মাণদের সাবমেরিণের আক্রমণে এই জাহাজডুবি হয়।

বার্কশায়ার আশ্রমে বাস করবার সময় স্বামিপাদ কাঠ চেরাই, ধানকাটা, ধান জড়ো করা এই সব কাজ সকলের সঙ্গেই করতেন। কোন কাজকে ছোট বলে মনে করা তাঁর জীবন-বেদে ছিল না। বার্কসায়ারের আশ্রমে টাকা না থাকায় এই আশ্রমটি স্বামিপাদই কিনে নেন। ১৯২০ সালের ৫ই মে তিনি নিউইয়র্ক ত্যাগ করে স্থায়ীভাবে বার্কসায়ারে বাস স্বরু করেন। এখানকার জীবন ছিল বড় মধুর ও অনাড়ম্বর! ১৯.০ সাল থেকে ১৯২১ পর্য্যন্ত তিনি অসংখ্য নরনারীদের এখানে শান্তির কথা শুনিয়েছেন।

বার্কশায়ার হিলের শান্তির নীড়ে তখন অনেকেই যেতেন। বেদান্ত ম্যাগাজিনের রিপোটারের কথা আমরা তুলে দিলাম, আমাদের সেই ছোট তাঁবুতে একটা পিয়াজা যোগ করে দেওয়া হল। গাছের নীচে আমরা বাস করতে লাগলুম। সেখানে বসে চিঠি এই সব লেখা, বই পড়া রান্না খাওয়া সব চলতে লাগলো। অপরাপর বন্ধু বান্ধবেরা এসে জুটতো আর গান ও আনন্দে সময় কাটতো। আবার রাত্রে সেখানেই শুয়ে পড়তুম। ভোর ছয়টায় জেগে উঠে, সুইমিং পুলে স্নান করে কোন নির্জ্জন স্থানে ভগবানের উপাসনায় বসতুম। বেলা নটার সময় কিছু শাকসব্জি তুলে নিয়ে রান্নার পালা। বারোটার সময় খাবার ঘণ্টা পড়ত।

এ ছাড়া বিকেলে কখন একা বেড়ানো, কখন সুইমিং পুলে সাঁতার, কখন আশ্রমের কাজে সাহায্য করা। ১০টার সময় উপত্যকা ধরে 'রামকৃষ্ণ শিখর' দেখে আশ্রমে ফিরে আসা, কোন দিন সেখানে বনভোজনে সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়া, একসঙ্গে ধ্যান ধারণা চিন্তার স্বাধীনতা দিয়ে আমাদের সময় কাটে।

পুরাণো কালীতপস্বীর যেন এখানে নূতন করেই দিয়েছিল দেখা। এখানে নিজেই তিনি চাষ আবাদ দেখতেন, কলের লাঙ্গল চালাতেন, কাঁটার বেড় তাও নিজেই দিয়েছেন। আশ্রমের গাছের ফল সংরক্ষণ তাও তিনি করতেন। রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করেছেন। আবার তার পরেই হয়তো ধ্যানের ক্লাসে বসে নিস্তরঙ্গ মনের দিয়েছেন পরিচয়। গীতার কর্ম্মযোগীর এমন অদ্ভুত ব্যবহারিক প্রয়োগ আমরা আর কোথায় পাবো! মুক্ত আকাশের নীচে মুক্তিব্রতী প্রাণ

নিয়ে সকলে সেখানে থাকত। সমাজের গণ্ডীবদ্ধ জীবনের শেষ পৈঠায় এসে অনেকেই ফেলত শান্তির নিশ্বাস।

এখানেই মিসেস্ লাপেজকে স্বামিপাদ একদিন বলেছিলেন—মনে রেখো মিসেস্ যদি অপর মায়ের সন্তানকে তোমার সন্তানের মত ভাল না বাসতে পার তবে তুমি তোমার সন্তানকে মোটেই ভালবাস না। লাপেজ লিখেছেন,—যখনই আমার মন কারো উপর শ্রদ্ধাহীন হয়ে পড়েছে তখনই আমার মনে এই বাণী কি রূপান্তর এনে দিত……নীরস কর্ত্তব্য সরস সজীব আর মধুময় হয়ে উঠত। এমনি মন্ত্রমধুরে দশটি বছর কেটে গেছে এই পাহাড়ী আশ্রমে।

মার্কিণে স্বামিপাদের কৃতিত্বের বিষয় আজ আমাদের ভাববার দিন এসেছে। ওদেশের ওয়েলডেল টমাস তাঁর পুস্তকে লিখেছেন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে,—"এখানকার কার্য্যস্থান দুটিতে আমরা বুঝতে পারি যে স্বামী অভেদানন্দ বেদান্তকে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় গ্রথিত করতে তাঁর পথপদর্শক অপেক্ষা বেশী কাজ করেছেন। উচ্ছ্বাসপূর্ণ বক্তৃতায় পরাভূত করার থেকে তিনি মিষ্ট অথচ যুক্তিপূর্ণ কথায় ও বহু নূতন বিচিত্র ভাবধারায় আমাদের বোঝাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি বিবেকানন্দের মত স্পিরিচ্যুয়্যালিজিম্‌কে হালকা আমেরিকার ব্যাপার বলে ঘৃণা করেন না। যদিও তিনি বলেন,—পাশ্চাত্ত্য মিডিয়মের মাধ্যমে মৃত আত্মাদের কথায় তিনি বিশেষ কিছু জ্ঞানের খোরাক পেয়েছেন। মনে হয় তারা পৃথিবীরই জীব ও অজ্ঞ। পুনর্জন্মবাদের বিষয়ে তিনি সত্যদ্রষ্টা ও যুগোপযোগী বলেই মনে হয়। কর্মবাদে পাশ্চাত্ত্য মতের সঙ্গে তাঁর মিল আছে। স্বামিপাদ বলেন যে,—সব ভাল আর নিঃস্বার্থ কর্ম্মই পরিণামে শান্তি, স্বস্বাস্থ্য, উন্নতি ও সুখ নিয়ে আঁসে। সভ্য সংখ্যা কমে যাওয়ার কারণ দেখাতে তিনি বলেন যে,—বোধ হয় নূতনত্ব কমে যাওয়া, আর অভেদানন্দের এখান থেকে অবসর গ্রহণ করাই কারণ বলে মনে হয়। অভেদানন্দ আমেরিকার সংস্থাগুলির সঙ্গে তাঁর বাণী ও কর্ম্মপদ্ধতিকে একসুরে মিলিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁর বেদান্ত বুলেটিনের সভ্য সংখ্যা ছিল ৩০০০। (Hindusim—Invades America পৃঃ ১১১-১৩)

মন্ত্রমধুর নদী এতদিন চলেছিল উপলিত হয়ে কোথায় আল্পস, কোথায় ক্যাটস্কিল, কোথায় মোহাঙ্ক পর্ব্বত—ভারতের তীর্থতীরে আজ তাঁর গতিভঙ্গের দিন। ব্রহ্মানন্দ মহারাজের একান্ত আকুল ডাক—ফিরতে হবে ভারতে। অতি আদরের বার্কশায়ার আশ্রম—ছিন্ন হল তার সম্বন্ধ। ১৯২১ সালের ২৭শে জুলাই

সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো বন্দরে এসে দাঁড়ালেন স্বামিপাদ—সামনে অনন্ত প্রশান্তির প্রশান্ত মহাসাগর—পিছনে ছেয়ে আছে দীর্ঘ পচিশ বৎসরের কর্ম্মতীর্থ মার্কিণ···হয়ত বিগত দিনের কথা নিস্পলকেই দেখেছিলেন—হয়ত মার্কিণকে একদিন ভালই বেসেছিলেন। নাগরিক হবার পত্রে সই করতে গিয়ে ফিরে এসেছেন একাধিক বার। শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতে কলম দিয়েছেন রেখে। আজ বিদায় লগ্নে সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোর শেষ কথাটিও অচঞ্চলে যায় হারিয়ে...প্রাচ্যের ব্যূহ মুখে জনাকীর্ণ সান্‌ফ্রান্সিস্কো বন্দর যেন আবছা হয়ে আসে তাঁর কাছে—ভাবেন তিনি—

উতল উদধী—আজিকে অশান্ত কেন
ফিরে চাওয়া এ পথিকে হেরি—
কত না উপলছন্দা কঙ্করিত বেলা
লঙ্ঘিয়া চলেছি আজ শান্ত নীড়ে ফিরি—
হয়তো শুধাবে—

উত্তাল নির্ঝর মন নিয়ে
শুধুই কি ছুটে গেছো
দেশ দেশান্তরে

হে সন্ন্যাসী! কিছুই কি করনি সঞ্চয়—
জীবনের রিক্ত পাত্র ভ'রে॥

•সুদীর্ঘ বর্ষের ছবি সায়াহ্নের ম্লান ছায়া সম
মিলাইয়া যাবে তব বিদায়ের গোধূলি আকাশে
তারকার দ্বীপপুঞ্জ হ'তে স্বর্ণ মেঘ সম।
ভুলি নাই হে নীলাক্ষী--
রৌদ্রসিক্ত বসন্তের সোনালী প্রাঙ্গণে
কেটে গেছে কত বেলা ধ্যান মৌন মনে

সায়াহ্নের বিস্মিত নয়নে
মনে হয় আজো স্বপ্নময়
কর্ম্মবীর অভেদের শ্রমস্বিন্নরূপ
আনন্দ তন্ময়।

ম্যাপেলের শীর্ণ বক্ষে মধু আহরিয়া
রাখিয়াছি স্মরণের মধুচক্র ভ'রি
তুষার হ্রদের স্নিগ্ধ শীকর প্রলেপ
আতপ্ত ললাটে মোর আজো পড়ে ঝরি
ছায়াময় চেরী কুঞ্জে শান্ত অধ্যয়নে
সেই লগ্নগুলি আজো যেন ফিরে আসে
বেদান্ত শিক্ষার কালে চারি পাশে ঘিরে থাকা
মুগ্ধ মুখগুলি
নূতন করিয়া যেন আজ ভালবাসে।
এ স্মৃতির সেতুবন্ধ পূবে ও পশ্চিমে
কোনদিন ভাঙ্গিবে না
বলে যাই বিদায়ের ক্ষণে
হেথাকার হাসিকান্না—জয়মাল্যে গাঁথি
সবই তো লয়েছি সাথে
সমর্পিতে প্রভুর চরণে ॥

হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের রাজধানী হনলুলুতে তাঁকে থামতে হয় কয়েক দিনের জন্যে। প্যানপ্যাসিফিক এড়কেসন কনফারেন্সের বৈঠক তখন চলছিল। তিনি ছিলেন সেখানকার ভারতের প্রতিনিধি। ১১ই আগষ্ট তিনি এই সভায় দেন যোগ কিন্তু চলতি পথ তাকে কোনদিনই দেয় না ছেড়ে তাই বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে পথও দিল ডাক। আগ্নেয়গিরির লাভা ছড়ান বিস্তীর্ণ ভূমি, গন্ধকের উৎস, আগ্নেয়গিরির মুখ এই সব ভয়রম্য স্থানগুলি বেড়ালেন দেখে; কি ভারতে, কি মার্কিণে, কি সাগরপথে—স্বামিপাদের মায়াতীত দুটি চোখে কি মায়ার কাজলই দিয়েছিল এঁকে কে জানে! বার বার তাই দুচোখ ভরেই দেখেছেন আর ভরপুর হয়ে গেছেন শিব-সুন্দরকে দেখে; কবি সাহিত্যিকের দৃষ্টি এ নয়—এ দৃষ্টি তৃষিতের দৃষ্টি—নিষ্পাপ শিশুর অহৈতুকী ভালবাসা...

হনলুলু ত্যাগ করে তিনি ইয়োকাহামাতে একবার নেমে পড়েন। কামাকারুর বিরাট বুদ্ধ মূর্ত্তি, টোকিওর রাজপ্রাসাদ, মিউজিয়াম, এই সব দেখে বেড়ান। কিয়াটোতেও বৌদ্ধ মন্দিরগুলি দেখলেন। এখান থেকে নাগাসাকি ম্যানিলা হয়ে ক্যাণ্টনে এসে দেখেন ডকে ভারতীয়দের ভীড়— অভিনন্দন দিতে

এসে পড়েছেন সকলে, ভিক্টোরিয়া হলে প্রায় তিন সহস্র লোকের সভায় প্রগতিশীল 'হিন্দুধর্ম্ম-সনাতন ধর্ম্ম' এই বক্তৃতা সেখানে দিলেন। এর পর কোয়ালালামপুরে আবার তাঁর অভিনন্দনের পালা। রাত্রে দীপাবলীর আয়োজন, স্বামিপাদকে নিয়ে সহর প্রদক্ষিণ। চীন নাগরিকগণের আহ্বানে তিনি 'সার্ব্বভৌম বেদান্ত ও তার সঙ্গে তাও ও কনফুসিয়স ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্পর্ক' এই নিয়ে বক্তৃতা দেন। অক্টোবরের ১২ তারিখে রেঙ্গুনে পৌছালেন। জুবিলি হলে তাঁকে অভিনন্দিত করা হল। তালাউ নামক স্থানে ৩০০০ ফুট উঁচুতে একটি নির্ম্মল নীল হ্রদ আছে। মন হারান এই হ্রদে নৌকা নিয়ে বেড়ানোর আবেদন স্বামিপাদ পারেন না ছাড়তে। যাই হোক ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয়ে তাকে বিরাট অভিনন্দনে নন্দিত করা হয়।

নভেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে স্বামিপাদ এলেন কলিকাতায়। দীর্ঘ দিন পরে পতিতোদ্ধারিণী, হরিদ্বার-হৃষিকেশ-বারাণসী বাহিনী গঙ্গা দেখে স্বামিপাদ নর্মচঞ্চলে নেমে পড়েন গঙ্গায়। বোধহয় ঘরে ফেরা ছেলেকেও মার পড়ে যায় মনে। নগ্নপদে কত ফিরেছেন মার কুলে কুলে, স্বপ্নের মত সে সব সাধন সদনের কথা নূতন আবেগের মত ভেসে আসে মনে। এলেন বেলুড় মঠে। এদেশে এসেই আবার সেই সহজ মানুষ—সহজ সাধুর মতই সুরু হল, জীবন। পাশ্চাত্ত্যের শ্রেষ্ঠ মহাদেশের মোহ তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি একটুও।

কলিকাতার নাগরিকরা তাঁকে সম্বর্দ্ধিত করেন ডিসেম্বরের ২রা তারিখে। ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটুউটে স্যার দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের সভাপতিত্বে এই সভা হয়। চরৈবেতী মন্ত্রের ঋষির কিন্তু শান্তিতে হয় না থাকা—রওনা হলেন জামসেদপুরে। এখানেও বৃহৎ এক জনতা তাঁকে করল অভিনন্দিত। ১৯২২ সালের ফ্রেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মার পূজা দিতে যান কালীঘাটে। মা ভবতারিণীর প্রসাদপ্রপন্ন জীবন, তাই যেখানে গেছেন মার পূজা করেছেন। ঢাকায় শ্রীশ্রীঢাকেশ্বরী মার পূজা দেন, গৌহাটিতে মা কামাখ্যাদেবীর ষোড়শোপচারে অর্চ্চনা করেন। সৌভাগ্য কুণ্ডে স্নান করলেন দশমহাবিদ্যার পূজা পীঠগুলিও বহু আয়াসে করেন দর্শন। জ্ঞানবৃদ্ধ বৈদান্তিকের মধ্যে যেন ঘুমিয়েছিল মা'র মুখাপেক্ষী এক শরণশিশু।

মঠে স্থানাভাব ঘটায় রাখাল মহারাজ গেষ্ট হাউসের উপরে নিজ ব্যয়ে ঘর করে নিতে বলেন। তিনি স্বামী শঙ্করানন্দের হাতে টাকা দিয়ে দেন ঘরের জন্তে।

এরপর তাঁর লক্ষ্য হল শিলং। পঁচিশে এপ্রিল শিলং-এ পৌঁছানোর পর কুইণ্টন হলে তাঁকে অভিনন্দিত করা হয় আর তিনি প্রত্যুত্তরে 'সনাতন ধর্ম্মে বেদান্তবাণী' বিষয়ে দুইটি বক্তৃতা দেন। বশিষ্ঠাশ্রমে ত্রিধারা স্নান করে অশ্বক্রান্তি দর্শন করেন।

পঞ্চতরণী পার হয়ে স্বামিপাদর অমর গঙ্গা বা দুধ গঙ্গায় গিয়ে পড়েন। এর জল খরস্রোতে বয়ে চলেছে। অমরনাথ গুহার ছাদ হতে বিন্দু বিন্দু জল পড়ে জমে যায়। পূর্ণিমায় এই মূর্ত্তির পূর্ণ প্রকাশ। চন্দ্রনাথের হ্রাস বৃদ্ধি চন্দ্রের সঙ্গেই যেন গ্রথিত। দুটি কৃষ্ণ কপোত এই গুহাতেই থাকে। দেব রক্ষক এরা।

এর পর কাশ্মীর হয়ে ক্ষীর ভবানীতে স্বামিপাদ যাত্রা করেন। এখানে পাহাড়ী সঙ্গীত শুনে স্বামিপাদ বলেন যে, সুইডেন, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি পাহাড়ী দেশের সঙ্গে এদেশের সুরের মিল আছে।

ওর পর তাঁদের বিশেষ দর্শনীয় স্থান তুলমূল গ্রামে ক্ষীর ভবানীমূর্ত্তি। এই মূর্ত্তি লক্ষ্মীনারায়ণের যুগল মূর্ত্তি। একটি ৮০ – ৯০ হাত ত্রিকোণ জমি তার তিন দিকে তিনটি পরিষ্কার জলের স্রোত তিন মাইল দূরে গিয়ে সিন্ধু নদে পড়েছে। তিব্বতের পথে একমৌলব্য চম্বা নামক স্থানে জপমালা কমণ্ডলু হস্তে একটি দেড়তল্লা বিষ্ণুমূর্ত্তি আছে—নাম চম্বা। সাধারণ তীর্থে ত্রিরত্ন বা পরমেশ্বরী, অবলোকিতেশ্বর, শাক্যস্থবীর, শাক্যমুনি, এইসব দেবতাদের পূজা হয়। ইহাদের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের নাম করঞ্জুর ও তালজুর। (ত্রিপিটক ও তার ভাষ্য।) পাঁচ বার এঁদের পূজাপদ্ধতি -ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে, সকাল নয়টায়, দ্বিপ্রহরে, বৈকাল তিনটায় আর সন্ধ্যায়। মাখন দিয়া ইহারা আরতি করেন। প্রত্যেক তিব্বতীকেই একটি একটি ছেলেকে সাধু হবার জন্য মঠে দিতে হয়। তাকে ব্রহ্মচর্য্য ও পূজাদি শিখতে হবে। পরে মঠের অধ্যক্ষ মনোনীত হলে প্রধান মঠে যাবে। ধর্ম্ম গ্রন্থাদি পাঠ ও উপদেশ লাভের পর পুরাতন মঠে এসে বারো বৎসর নয় দিন নির্জ্জনে একাকী উপাসনা ও যোগসাধন করতে হয়। কৃতকার্য্য হলে সে কুসাক বা জগৎগুরু পদে প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর গুম্ফা-রাজধানী লে হয়ে হিমিশ গুম্ফায় এসে পৌঁছান।

যে অনির্ব্বাণ শিখা নিয়ে তিনি সারা বিশ্বের পথিক হয়েছিলেন আজ তার উদ্‌যাপনের দিন। তিনি কাশ্মীরে হিমতীর্থ অমরনাথ দর্শন করে পায়ে হেঁটেই গন্ধবলি হয়ে ১৫০০০০ ফুট উঁচু জোভিনো পরিপথে হিমালয় পার হয়ে তিব্বতে

উপস্থিত হলেন। তাঁর পর্য্যটক নোটোভিচের লেখা, দি আননোন লাইফ অফ জিসাস প্রচুর পড়া ছিল। তিনি এই সুযোগে সেই পুস্তকে নোটোভিচ লিখিত ভগবান ঈশামসির ভারত আগমনের কাহিনী যে পুস্তক হতে পাওয়া যায়, সেই পুস্তকের সন্ধানে হিমিশ মাঠে এসে উপস্থিত হলেন। জনৈক লামার সাহায্যে তিনি সেই পুস্তকের কিছুটা অনুবাদ করে নেন। তাঁর তিব্বত ও কাশ্মীর পুস্তকের কিছু অংশ আমরা উদ্ধৃত করে দিলাম।

"ক্রমে ঈশা ত্রয়োদশ বৎসরে পদার্পণ করিলেন। এই বয়সে ইস্রাইলেরা জাতীয় প্রথা অনুযায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈশা বিবাহ করতে নারাজ ছিলেন। বিবাহের কথায় তিনি পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিতে সংকল্প করিলেন।

তিনি জেরুজালেম পরিত্যাগ করিয়া একদল সওদাগরের সঙ্গে সিন্ধুদেশ রওনা হইলেন। তিনি চৌদ্দ বৎসর বয়সে সিন্ধুদেশ অতিক্রম করিয়া পবিত্র আর্য্যভূমে আগমন করিলেন। তিনি ক্রমে ব্যাস কৃষ্ণের লীলাভূমি জগন্নাথ-ধামে উপস্থিত হইলেন। এবং ব্রাহ্মণগণের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। অতঃপর তিনি রাজগৃহ রাঁচী প্রভৃতি তীর্থস্থানে ছয় বৎসর অতিবাহিত করিয়া বুদ্ধের জন্মভূমি কপিলাবস্তু গমন করিলেন সেখানে বৌদ্ধশাস্ত্র সমূহ অধ্যয়ন করিতে লাগিলেন। সেখান হইতে নেপাল, হিমালয় পরিক্রমা করিয়া পশ্চিমদিকে যাত্রা করিলেন ও অত্যাচার প্রপীড়িত স্বজনগণের মধ্যে শান্তির বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন। এই বিবৃতি নটোভিচের লেখা দি লাইফের সদৃশ। লামাদের নিকট স্বামিপাদ আরো শুনিলেন যে, পুনরুত্থানের পর তিনি গোপনে কাশ্মীরে আসেন ও বহু শিষ্যসহ মঠে বাস করেন।" সেস্থান হয়ে স্বামিপাদেরা রাওলপিণ্ডি আসেন ও বক্তৃতা দেন। সেখান থেকে ব্রহ্মশীলা দেখতে যান। আর এখানে ক্ষুর, পুঁতির মালা আর কাঁচের ব্যবহার দেখে বুঝতে পারেন যে ভারত সত্যিই এ বিষয়ে জগতের অগ্রণী।

স্বামিপাদ দুর্গম আফগানিস্থান বৃটিশ সীমার শেষ পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। এর পর লাহোরে স্বামিপাদ আর্য্যসমাজ কলেজে এক বিরাট সভায় বক্তৃতা দেন। পরের বক্তৃতা ফোরম্যান খৃশ্চান কলেজে হয়। এর অধ্যক্ষ মিঃ লুকাস স্বামিপাদের বক্তৃতা শুনে বলেন,— ভারতের সমস্ত বিখ্যাত মনীষীদের বক্তৃতা শুনেছি কিন্তু আজ আমার স্পষ্টই মনে হয়েছে এঁর তুল্য বক্তা ভারতে আর নাই। ইনি মার্কিণের অধিবাসী। অমৃত সহরেও স্বামিপাদ দরবার সাহেব

দেখিয়া জালিওয়ানাবাগ হয়ে নানকানা যান। এর পর কুরুক্ষেত্র, হরিদ্বার হৃষিকেশ কনখল ও কাশীধাম হয়ে তিনি বেলুড় এসে পৌছান। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুলাই থেকে ১১ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত প্রায় ছয় মাস এই বিখ্যাত ভ্রমণ শেষ করেন। স্বামিপাদের সারা জীবনের এই বিচিত্র ও বিরাট অভিজ্ঞতা সম্পুট সামান্ত মাত্রই ধরে রাখা হয়েছে তাঁর পুস্তকগুলির মধ্যে।

বেলুড়ে তাঁহার স্থান না হওয়ায় তিনি মেছুয়াবাজারে এক ভাড়াটে বাড়ীতে প্রথম শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তিটি নিয়ে আসেন। এটি ১৯২৩ এর ২০শে ফেব্রুয়ারীর ঘটনা এর আগে জনৈক লোক তাঁহার নিকট এক হাজার টাকা নিয়ে গৃহ ঠিক করে দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু ওদেশের অভিজ্ঞতা এদেশে কার্য্যকরী হয়নি। ভদ্রলোকটি আর এ বিষয়ে কিছুই করেন নি। স্বামিপাদ নীরবে সেকথা মন থেকে মুছে ফেলেছেন।

২৪শে ফেব্রুয়ারী শ্রীঠাকুরের তিথিপূজার পরমলগ্ন এসে গেল। কিন্তু এই উৎসবের দিন আকাশে মেঘাড়ম্বর জেগে ওঠে স্বামী শিবানন্দ দেখেন উৎসব পণ্ডমুখে, স্বামিপাদকে ডেকে বলেন,—কালিভাই ঠাকুরকে বলে মেঘ দূর করে দাও। তিনিও প্রার্থনা করলেন—মেঘমুক্ত আকাশ দেখে সকলের মুখেই আবার প্রসন্নতা ফিরে এল। তাঁর প্রার্থনা ঠাকুর শুনতেন এর প্রমাণ আগেও দেখেছি মার্কিণে। আবার ব্রহ্মানন্দ স্বামিজীর কলেরা রোগের সময়ও তিনি প্রার্থনা করতে গেছেন আরোগ্য কামনায়—কিন্তু দিব্য এক অনুভূতিতে সে প্রার্থনা তিনি পরিত্যাগ করেন। এক দৈববাণী তিনি শুনতে পান, আরোগ্য প্রার্থনা যে করবে তার এ রোগ গ্রহণ করতে হবে। আর একবার অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তখন মঠ কলিকাতায়। বাঙ্গলার রাজ্যপাল তখন মনীষী লর্ড লিটন। তিনি বেদান্ত মঠ দেখতে আসবেন এই স্থির হয়েছিল। কিন্তু আগের দিন থেকে সুরু হয় মুষলধারে ধারা বর্ষণ। সব পণ্ড হয় ভেবে সকলে হলেন শঙ্কিত। কিন্তু অভেদ মহারাজ দেন আশ্বাস। তোমরা প্রস্তুত হও, মেঘ কেটে যাবে। মহাপুরুষের বাক্য মিথ্যা হয়নি। আরো একদিনের কথা, সেদিন স্বামিপাদ শ্রীঠাকুরকে জানাচ্ছেন মৌন নিবেদন। অনেকদিন তোমার দর্শন পাইনি ঠাকুর, আমাদের ভুলেই গেলে। সহজ প্রাণের আকুতি, শ্রীঠাকুর না শুনে পারেন না। দুপুরে নিজের ঘরে বসে আছেন, সামান্য তন্দ্রা নেমেছে চোখে। দেখেন শ্রীঠাকুর এসে বলছেন,—"সেদিনের কথা মনে আছে কালী, সেই নীলকণ্ঠের যাত্রা শুনতে

যাওয়া, লোক না থাকায় যাত্রা জমেনি।” মনে পড়ে কালিদাসের কথা—‘যো যস্য মিত্রং নহি তস্য দূরং।’ দার্জ্জিলিং রামকৃষ্ণ আশ্রমের প্রথম প্রকাশ ১৯২০ সালের কার্ত্তিকে। নগর সংকীর্ত্তন, দরিদ্র নারায়ণ ও ভক্ত নারায়ণদের পরিতোষ পূর্ব্বক সেবা, বক্তৃতা ও পাঠ প্রভৃতি এই উৎসবের অঙ্গ ছিল। স্বামিপাদ কলিকাতায় ফিরে এলে স্বামী নিশ্চয়ানন্দ আশ্রমের ভার নেন। দুইটি অনাথ বালক আশ্রমে পালিত হতে থাকে। একটি হোমিওপ্যাথিক দাতব্য চিকিৎসালয় ও একটি অবৈতনিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, আর তার সঙ্গে মিস্ত্রীকাজের শিক্ষার ব্যবস্থাও করা হয়।

১৯২৬ সালে ‘বিশ্ববাণী’ নামে বেদান্ত সমিতির মুখপত্র—সঙ্ঘের কল্যাণে এর প্রতিষ্ঠা। বর্তমান লেখক তখন এতে বিচিত্র বৈজ্ঞানিক সংবাদগুলি লেখার ভার নিয়েছিল। বিলাতী পত্রিকা হতে সে সংবাদ গৃহীত হত। শ্রীরামকৃষ্ণ ‘বেদান্ত মঠ’ প্রথম পরিকল্পনা হয় ১৯২৭ সালে এলবার্ট হলে—এক বিরাট জনসভায়। আশ্রম তখন বিডনষ্ট্রীটে ভাড়ার বাড়ীতে। ১৯২৮ সালে তিনি চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে বাড়বাকুণ্ড, অনাদিনাথ বৌদ্ধমন্দির, চন্দ্রনাথ সীতাকুণ্ড প্রভৃতি দর্শন করেন।

১৯২৮ সালে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের মাতৃমূর্ত্তিখানি নিয়ে একটি দিব্য মধুর ঘটনা ঘটে। শ্রীমার এক দিব্য তৈলচিত্র এসে পড়ে কলিকাতার কাষ্টমস্ অফিসে। এটি প্রসিদ্ধ চিত্রী ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা। ইনি স্বামিপাদের শিষ্য। তাঁর শেষ ইচ্ছা ছিল যে ছবিটী শ্রীঠাকুরের ছবির পাশে থাকে। তাই তাঁর ভগ্নি হেলেনা ডোরাক ভায়ের সেই অন্তিম ইচ্ছা পূরণ করতেই পাঠিয়েছেন এই তৈল চিত্র। এই চিত্রকর ভাইবোন দুটির ছিল অদ্ভুত জীবন। এঁদের জীবন চিরদিনই দুটি মঙ্গল শিখার মতই ছিল পবিত্র, ছিল উজ্জ্বল। শ্রীঠাকুরের দিব্য দর্শনে এঁরা হন ধন্য আর সেইদিন থেকে শ্রীঠাকুর আর তাঁর পার্ষদদের নিয়ে দিব্য শিল্প সৃষ্টি করাই এঁদের জীবনের রঙ্গিন স্বপ্ন হয়ে ওঠে। শ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতি যখন আসে তখন স্বামিপাদ মঠে ছিলেন না। কাষ্টমসের মাশুল একটু বেশী হওয়ায় মঠের কর্তৃপক্ষ দেন ফিরিয়ে। স্বামিপাদ শুনতে পেয়ে চিত্রটি নিয়ে নেন। এবার শ্রীমার প্রতিকৃতি এসেছে। Art কলেজের অধ্যক্ষকে সঙ্গে করে তিনি যান ছবির মূল্য যাচাই করতে। মাশুল ঠিক হয় ৭৫৲ টাকা কিন্তু তখন স্বামিপাদের

সঙ্গে এত টাকা নেই। সহসা দেখা হয়ে গেল গনেন মহারাজের সঙ্গে। তিনি পকেট খুঁজে দেখলেন ঠিক ঐ পরিমাণের টাকাই রয়েছে।

১৯২৯ সাল এনেছিল বহন করে যোগ ও ক্ষেম। রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীটে 'ন' কাঠা জমি ২০,০০০ টাকায় কেনা হয়। বেলুড়ের নূতন মঠের ভিত্তিও এই বৎসর স্থাপিত হয়। এই সময় থেকে তিনি সাধারণতঃ দার্জিলিং আশ্রমেই থাকতেন।

মন্দির শ্বেত মর্ম্মরে মণ্ডিতকরা প্রয়োজন। মন্দিরের মধ্যে মর্ম্মর প্রস্তরের ব্যবস্থা করতে বর্ত্তমান লেখক স্বামিপাদকে কাশীপুরে নিয়ে আসেন।

সাধুদের সঙ্গে নিয়ে স্বামিপাদ শুভাগমন করেন। এই সূত্রে স্বামিপাদ কাশীপুর শ্মশানেও একবার পদার্পণ করেন। যাত্রাপথে মোটরগাড়ী একটু বিকল হওয়ায় কিছুটা পদব্রজেই যান, স্বামিপাদ এই দিন বলেন—সেই সব প্রথম দিনের কথা মনে হচ্ছে –সে দিন এই পথ পায়ে হেঁটে কতই না গেছি। যাই হোক, সেদিন্ প্রসাদের ব্যবস্থাও করা হয়। অতি সামান্য আহার্য্যই ছিল তার চিরাচরিত প্রথা। 'কিছুই গ্রহণ করেন নি'—এই প্রশ্নে অঙ্গনে ভোজনরত সাধুদের দেখিয়ে বলেন,—এই যে এত মুখে খাচ্ছি। যাবার সময় মন্দির নির্ম্মাণের অর্থ নিয়ে যান। সিংহাসন রূপার পরিবর্ত্তে চন্দন কাঠের করা হয়। ঠাকুর যে ধাতু স্পর্শ করতে পারতেন না।

এই সময় শতবার্ষিকীতে আহুত 'পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজিয়নের' এক অধিবেশন সুরু হয়। স্যার ইয়ং হাসব্যাণ্ড প্রভৃতি দূরাগত নিমন্ত্রিত অতিথিরাও আসেন। স্যার ব্রজেন শীল মহাশয় মূল সভার সভাপতি হন। স্বামিপাদকেও একটি সভার সভাপতি করা হয়।

সভার মধ্যে শীল মহাশয় অসুস্থ হওয়ায় স্বামিপাদকে সভাপতি করা হয়, এতক্ষণে যেন শ্রীঠাকুরের ইঙ্গিতেই যথাস্থানে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদিত হল। এ দিনের বক্তৃতা দিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না, তবু সে বক্তৃতা শুনে সকলেই বিশেষ আনন্দিত হন। এদিন দুটি বক্তৃতা তাঁকে দিতে হয়। পরের দিন একটি লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শত দীপস্তিতায় শেষ দীপের এই ছিল সমাপ্তি সঙ্গীত। এর পর আর তাঁর বক্তৃতা শুনবার সৌভাগ্য হয় নি।

শতবর্ষের ফাল্গুনী দ্বিতীয়া—বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠার দিন। ১৯৩৬ সালের ২রা মার্চ্চ পূজান্তে স্বামিপাদ শ্রীমূর্ত্তির সঙ্গে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন। প্রদক্ষিণ

শেষ হলে তিনি ফ্রাঙ্ক ডোরাকের অঙ্কিত মূর্ত্তি দুটি স্থাপন করলেন। প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারিত হল লোককল্যাণে—"ঠাকুর তুমি যাবচ্চন্দ্র দিবাকর থাক।"

দার্জিলিং আশ্রম দেবোত্তর করা হয়েছে, কিন্তু শ্রীঠাকুরের প্রতিষ্ঠা করা হয়নি। মে মাসে তিনি দার্জিলিং-এ শুভযাত্রা করলেন। মন্দির মিণ্টন টাইলে মণ্ডিত করা হল। ২৯শে আগষ্ট—শ্রীঠাকুরের পূজা ষোড়শোপচারে সমাপনান্তে তিনি শ্রীঠাকুরের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করলেন।

লেখকের সিউড়ী যাওয়া হয় ১৯শে বা ২০শে অক্টোবরে। যাবার আগে স্বামিপাদের সঙ্গে হয় দেখা। স্বামিপাদ নিষেধ করেন যেতে। কিন্তু আমার তখন যাবার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। নানা কারণে আর আমার ফেরা হয় না। সিউড়ীতে ৭ই সেপ্টেম্বর সহসা মার নির্দ্দেশ—কলকাতায় ফিরতে হবে। রাত্রের গাড়ীতেই ফিরে আসি কলকাতায়। এসে সকাল বেলাতেই মর্ম্মান্তিক টেলিফোন সংবাদ পেলাম—স্বামিপাদ আর ইহ-জগতে নাই। ইতিমধ্যে জেনেছিলাম যে তিনি আর বেশীদিন ইহধামে থাকবেন না। যাই হোক এই সংবাদ পেয়েই আমি মঠে চলে যাই। সেখানে দেখি পদ্মপলাশনেত্র চিরদিনের জন্যই মুদিত হয়ে গেছে...তবু সেই ঈষৎ হাসির রেখা মৃত্যুও মুছে দিতে পারে নি......বেলুর মঠের কেহ কেহ এসে পড়েছিলেন। তাঁদের ইচ্ছা মঠেই স্বামিপাদের শেষকৃত্য হয়। কারণ ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এই ঘটনা কিছু ক্ষতিকর হয়েই থাকবে। স্বামিপাদ যে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীরই একজন সেটি খণ্ডিত হবে। অথচ স্বামিপাদের শেষ ইচ্ছা ছিল,—শ্রীঠাকুরের চরণ তলেই আমায় রাখবি। যাই হোক লক্ষ্মণ মহারাজ আমায় বলেন,—চলুন আমরা গিয়ে দেখি কি করতে পারি। গাড়ী সঙ্গেই ছিল। সেজ ভাই গাড়ী করে তখনই চলে আসে কাশীপুর। পিতৃদেবকে বলামাত্র তিনি কাশীপুর মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনারকে নিয়ে চিফ একৃসিকিউটিভ অফিসারের গৃহে যান। বেলা তখন প্রায় ৩টা। তিনি লিখিত অনুমতি দিলেন। সেই অনুমতি নিয়ে প্রায় অবসন্ন বেলায় মঠে পৌঁছাই। তখন শ্মশানযাত্রা সুরু করা হয়। আমরা পায়ে হেঁটেই কাশীপুরে আসি। সেই সঙ্গে একটি সিনেমা ফিল্ম তোলা হয়। আধমণ গাওয়া ঘিয়ের ব্যবস্থা কাশীপুর থেকে করা হয়। গৃহের সামনে একবার কিছুক্ষণের জন্যে গতি স্তিমিত করা হয়। পুষ্পমাল্য এসব দেওয়ার পর আমরা পৌঁছাই মহা-সমাধি পীঠে। সেদিন সেখানে কীর্ত্তন মহোৎসব ছিল। স্বামিপাদের শিয়রে

অনিমেষে শেষ দর্শন বহুক্ষণ ধরে করেছি। কেহ কেহ শ্রীঠাকুরের স্মৃতি-মন্দিরের ক্ষতি হতে পারে এইরূপ বিরুদ্ধতা করেন কিন্তু টিন ও মাটি দিয়ে সেদিক বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর পর হোমাদি শেষকৃত্য সুরু হয়। শেষ পর্য্যায়ের দৃশ্য সহ্য করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রায় ১-৩০ রাত্রে আমি ফিরে আসি।

* * * *

তুষার মানস গঙ্গা নেমে এসেছিল ভগীরথের শঙ্খে আর প্রমিথিয়াসের প্রেমে জ্বলেছে জ্ঞানের বর্ত্তি। এ দুয়ের সমন্বয়ে ভারত তথা জগৎ হয়েছে ধন্য দক্ষিণেশ্বরে তীর্থপথে যে পদচিহ্ন পড়েছিল একদিন সে চিহ্ন রচনা করেছে মধুচক্র—ইয়োরোপ আমেরিকায়...

* * * একদিন ভারতের ধারা—এশিয়ার সীমারেখা পার হয়ে গ্রীসের তটেও তুলেছিল আবর্ত্ত। আবার সেই দিন এসেছে ফিরে—বাঙ্গালীর ছেলে কালীর প্রসাদ প্রাচ্যে প্রতীচ্যে এনেছে যে মিলন মাঙ্গলিক...মহাকালের মন্দিরে তার শিখা অনির্ব্বাণ ··তার লিখা অমোঘ·········
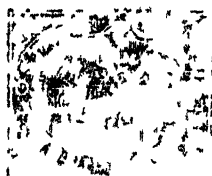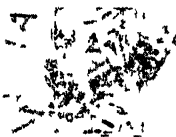
স্মৃতি সঞ্চয়

স্মৃতি সঞ্চয়

বহুদিনের ফেলে আসা দিন—একটি একটি করে কুড়িয়ে আনা স্মৃতির সঞ্চয়ে রেখে বুক ভরে না—

প্রথম দর্শন মনে পড়ে—নানা সাধুসন্তের দিশায় ফিরে গিয়েছি কলকাতার এক কেন্দ্রে—বৌবাজারে। স্বামিপাদ তখন বেলুড় থেকে চলে এসেছেন—বেদান্তমঠের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে সুরু। দুটি চারটি ছেলে আসে যায়। একটা ঘরের মাঝখানে ফ্রাঙ্ক ডোরাকের আঁকা শ্রীঠাকুরের মূর্ত্তিখানি রাখা আছে দেখলে গা ছম্‌ছম্ করে—জীবন্ত জাগ্রত মূর্ত্তি। সেক্রেটারীর মত একটি ছেলে থাকে, বি. এ. পাশ। আমাদের প্রশ্নের উত্তর তিনিই দিতেন। স্বামিপাদকে এই এই প্রথম দর্শন। এর পর মঠ উঠে আসে ইডেন হস্পিট্যাল রোডে—তখন স্বামিপাদের গীতা, উপনিষদের ক্লাস সুরু হয়ে গেছে। ছোট খাটো তিন চারটি ঘর নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে স্বামিপাদ থাকেন। বর্ত্তমানের মহারাজরা তখন আসতে সুরু করে দিয়েছেন। একদিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরতে দেখি গঙ্গার ধারের রাস্তা দিয়ে চলেছেন স্বামিপাদ একা—নিঃসঙ্গ নির্ব্বিরোধ সন্ন্যাসী—কে বলবে এঁকেই হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি ইংরাজী অধ্যাপনার ভার দিতে চেয়েছিল।

একদিন গেছি—স্বামিপাদের প্রসাদ এনে দিলেন একটি ব্রহ্মচারী—শুকনো রুটী মাত্র। শুনলাম শুকনো রুটী রাত্রে খান আর দিনে আতপ চালের ভাত। ভক্তটী জানাল স্বামিপাদের কথা—কেমন করে তিনি করেছিলেন তিরস্কার জনৈক ব্রহ্মচারীকে। সে যখন জানায় এ তিরস্কার তাকে বৃথা করা হয়েছে, স্বামিপাদ তখন বলেন যে এ তিরস্কারে তার কুষ্ঠির যে দুর্ভোগ ছিল সেটি গেল কেটে।

সে এক শীতের সন্ধ্যা—কল্পচোখে ভেসে আসে স্বামিপাদ বসে আছেন। সাবিত্রী—স্বামিপাদের বিদেশী মেয়ে—স্বামিপাদের সঙ্গে কথা বলেছেন। স্বামিপাদের জন্য তিনি দুর কাশ্মীর থেকে ফুল পাঠিয়ে দেন—জপ করে করে গলাবন্ধ তৈরী কোরে পাঠিয়ে দেন—অনেক জায়গা ঘুরে স্বামিপাদের আশ্রয় নিয়েছেন। মন্দির প্রাঙ্গণে ভাল ভাল পাখী ছেড়ে দিয়ে বলেন,—হে ঠাকুর, এদের যেমন আমি মুক্তি দিলাম তেমনি মুক্তি আমাকেও তুমি দিও। সেই সঙ্গে মনে পড়ে—বর্ষণ

মুখরিত বিদায়ের দিন ! স্বামিপাদের ফেলে যাওয়া দেহের অনুগমন করছেন—নয়ন অশ্রুসিক্ত—হাতে একগোছা জ্বলন্ত ধূপ। খালি পায়ে অনুগমন করেছেন, অসহ ব্যথায় আপনহারা…

দুজন আচার্য্য (Doctor) গেছেন দেখা করতে—স্বামিপাদকে জিজ্ঞাসা করলেন,—আত্মার যদি এত শক্তি, যদি আত্মার অতিন্দ্রিয় দর্শনাদির ক্ষমতা আছে তবে আমরা বুঝতে পারি না কেন ? স্বামিপাদ তাঁকে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বুঝিয়ে দিলেন,—ক্যামেরাতে যদি দুটো ছিদ্র থাকে তাহলে ছবি ওঠে না—তেমনি আত্মায় বহুমুখীনতার জন্য আত্মার শক্তি ব্যাহত হয়ে যায়।

তখন আশ্রম-গৃহ নির্ম্মাণ সুরু হয়নি—অর্থের চেষ্টা চলছে। স্বামিপাদকে একটু লেখা হল ইউনিভার্সিটির 'Fellowship lecture'-এ দাঁড়ালে গৃহ নির্ম্মাণ কল্পে কিছু পাওয়া যায়। স্বামিপাদ লিখলেন কখনও মূল্য নিয়ে লেকচার দিই নাই—আমার বক্তৃতা সব Free gift to humanity

অসুস্থ অবস্থায় নেতাজী গেছেন দেখা করতে। আচার্য্যপাদ বলেন,—সুভাষ তুমি আমায় আলিঙ্গন কর। এটি বোধ হয় নেতাজীর ভারত থেকে শেষ বিদায়ের আসন্ন লগ্ন।

ভক্ত প্রশ্ন করছে,—আমরা যা প্রাথনা জানাই মনে মনে, তাকি জানতে পারেন ? উত্তরে বলেন,—যখন দুইমন একমুখী হয় তখন বুঝতে পারি। প্রশ্ন জাগে নির্ব্বিকল্প কখন হয়েছিল ? স্বামিপাদ উত্তর দেন—একবার ভারতে আর একবার মার্কিণের হ্রদের তীরে।

মনে পড়ে বেদান্ত মঠের প্রথমদিকের সে একদিন—প্রথম আবেগের একমুঠো মোহ-মেদুরতা। তখন চোখে সবই ভাল লাগে। পুরোণো টেবিল, ফ্ল্যাটের ধূপ-সুরভিত ঠাকুরঘর সবই। এর আগে ভোলাগিরি মহারাজের কাছে গেছি, জনৈক সহপাঠী গেছে নিয়ে। মধ্য কলকাতার ছোট্ট একটি ঘর, ভক্তের সংঘট্ট—কোন রকমে পিছনে দাঁড়িয়ে আছি, মনে জাগে ইনি যদি অন্তর্যামী হন তবে আমায় ডাকবেন। রাত হয়ে আসে—বাড়ীতে পড়ার তাগিদও রয়েছে, অভিভাবকদের ভয়ও আছে। মন দুটানায় দুলছে, আরতি সুরু হয়ে গেছে—শ্রীগিরিমহারাজেরই আরতি। সুন্দর শুভ্র দেহে গৈরিক বস্ত্র, চোখে কালো

চশমা ; ধর্ম্মপুস্তকে নানা ঐশীকথা পড়ে মনে তারি অনুরণন। যাই হোক ফিরে আসি শুষ্ক মুখেই, তেষ্টা তখন অনেকটাই‥ ‥

বেলুড়ে শ্রীঠাকুরের, স্বামিপাদের মন্দিরেও গেছি—ধ্যান জপ নিষয়ে কেটেছে সে সব দিন। ওপারটা তখন মনে হত আলোর দেশ—আমায় পার হয়ে যেতে হবে—বাগবাজারের ঘাটে বসে এমনি চিন্তায় দিন গেছে কেটে।

যাই হোক, সেদিন গিয়ে দেখি এক অল্পবয়সী সাধু স্বামিপাদের কাছে এসেছেন—দীক্ষাপ্রার্থী ; একটিমাত্র কাপড় গলায় গ্রন্থি দিয়ে পরা ইংরাজীতেই বলেন—আমি এমনি করে একবস্ত্রে মাদ্রাজ থেকে এসেছি। সেখানে ছিলেন শিক্ষাব্রতী, প্রাণের তাগিদে ঘর ছেড়ে পড়েছেন বেরিয়ে দূর মাদ্রাজ থেকে অন্যত্র স্থান পাননি। স্বামিপাদ দাক্ষিণ্যভরা দুটি আঁখি মেলে বললেন—আমি তোমায় আশ্রয় দেব। এঁর সঙ্গে দেখা এরপর অনেকবারই হয়েছে। দেখেছি ঘরের কোণে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে করছেন জপ—তপোখিন্ন তাঁর দেহ। কোন বাক্‌বিতণ্ডায় তাঁর স্পৃহা ছিল না সেসব দিনে। এরপরও দেখা—সেবার হিমালয়ে যাবার জন্যে মনে আকুল আগ্রহ। স্বামিপাদ বললেন,—যা ওকে জিজ্ঞেস করে আয়। মাদ্রাজের সেই সতীর্থ। তাকে বলতেই বলে,—যদি অর্থ থাকে যাও না হলে মারা যাবে। সেখানে সত্রের আটা ময়দায় পাথর গুঁড়ো মেশান—শরীর থাকা মুস্কিল। ছেলেটির জীবনেও তাই ঘটেছিল—ক্ষয়রোগে তাঁর মৃত্যু হয়।

অনেক নদীর ধারা এমনি করেই শুকিয়ে যায় মধ্যপথে। হিম-কান্তারের ডাক এমনিভাবেই হারিয়ে গিয়েছিল সেদিন। তবে স্বামিপাদ বলতেন সবাইকে,—কোথায় যাবি, এইখানেই তপস্যার আগুন জ্বেলে দে। ঘুরে ঘুরে আমাদের শরীরের ত এই অবস্থা‥‥দেখেছি হঠাৎ পা ফুলে উঠতো। শরীরের অযথা মেদ বৃদ্ধি হয়ে পড়েছে। বলতেন,—এদেশে এসে আমার শরীর এমন হয়ে গেল। এখানে জল খেলেও মোটা হচ্ছি। রুটী খেতেন, অতি শুকনো পাতলা রুটী। শুনতাম ২।৷৹ সের চালে তাঁর সারা মাস চলে। রুটীও তেমনি। তবে Balanced diet-এ থাকতেন, খুব নিয়মেই থাকতেন। ওদেশের পঁচিশ বৎসরের ব্যবস্থা ছেড়ে দেওয়া যায় না একেবারে। মার্কিণী স্বাস্থ্যের কথা বলতে বলেছেন, তোরা কি করছিস—না যোগ না ভোগ। এই শরীরে কি করবি—আর খাবারে আছে কি যে এত বাছ-বিচার করবি ?

শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্ম-বার্ষিকীতে রেকর্ড করে এলেন। সেদিন বেশ ক্লান্ত মনে হল। রেকর্ডটি শুনান হল। বড় ভাল লেগেছিল শ্রীশ্রীঠাকুরের কথা শুনতে তাঁর প্রধান এক পার্ষদের মুখে—মৃদুস্বরে সে আবৃত্তি আর একবার শুনেছি জনৈক ভক্তের আকুতিতে—আপনার শ্রীমুখে শুনবো প্রকৃতিম্ পরমাং স্তোত্রটি। শোনালেন তখনি, কোন দ্বিধা না করেই······

কত যে কৃপা অযাচিত হয়েই এসেছে। জনৈক মাদ্রাজী দীক্ষার পর পড়েছে দ্বন্দ্বে—ইষ্ট নিয়ে তার এই দ্বন্দ্ব। পাঠিয়ে দিয়েছেন আমার কাছে - যা ওর কাছে করে নে তোর মীমাংসা। আর একদিন গেছি। একটি ছোট ছেলের মৃত্যুযোগ—তাদের বিশ্বাস দৈবের কৃপায় যদি কিছু হয়। বলে দিয়েছেন একটি মন্ত্র—ছেলেটির মৃত্যুযোগ গিয়েছিল কেটে। সেবার সিউড়ীতে আশ্রম করবার কথা নিয়ে গেছি। সিউড়ীর আশ্রমে তখন কেউ থাকত না। হিমালয়ের নিভৃতিতে যেতে না পেয়ে ওখানে থাকি তখন, মাঝে মাঝে চলেও আসি। কথা পাড়ায় বলেন—ওরে আশ্রম করতে গিয়ে লোক দেউলে হয়ে গেছে। কিজন্যে বলেছেন আজও বুঝি নাই।

এপারে ওপারে অমৃতময় এই বিস্তৃতি—মধ্যে মহাকালের ব্যবধান - চেয়ে থাকি উধাও হয়ে - কোথায় এর শেষ

আর একদিন স্বামিপাদের কাছে গেছি। শ্রীঅরবিন্দের লেখা একটি বই পড়ে আমার মনে কোন একটি বিষয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়—আমি তা স্বামিপাদকে জানালাম ; স্বামিপাদ একটু গম্ভীর হয়ে বললেন,—আমার এই বইখানার অমুক পাতা খুলে দেখ্, ওতেই সব দেওয়া আছে। তোরা সব আমার বই পড়বিনা তো কি হবে বল ? আমার বই পড়বি, ওতেই সব দেওয়া আছে ? পড়ে দেখ। "ভক্তানুকম্পা ধৃতবিগ্রহং বৈ।"

আরেক দিন স্বামিপাদের কাছে গেছি। স্বামিপাদ ভক্ত সঙ্গে সানন্দে কথোপকথন করছেন। কথায় কথায় আমেরিকার কথা উঠল। স্বামিপাদ আমেরিকায় থাকাকালীন যা ঘটেছিল তা বলতে গিয়ে বললেন,—আমি যখন আমেরিকায় ছিলাম তখন ওখানকার লোকেরা আমাকে আমেরিকার Citizenship নেবার জন্য অনুরোধ করেছিল, কিন্তু আমি তা নিইনি। আমরা হচ্ছি Citizens of the world, ক্ষুদ্র আমেরিকা আমাদের দেশ নয়। যে citizenship পাবার জন্য সাধারণ লোক উন্মুখ হয়ে থাকে সেই citizenship

অযাচিত ভাবে সেখানকার লোকেরা তাঁকে দিতে চেয়েছিল—কিন্তু নেননি। অদ্ভুত স্বামিজীর ভূমা বোধ!

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আমরা মান, যশ লাভের বিপুল চেষ্টা দেখতে পাই। কিন্তু স্বামিপাদের জীবনে তা ছিল না। আমেরিকাবাসী বিজ্ঞেরা স্বামিপাদকে হার্ভার্ড ইউনিভারসিটির ইংরাজী সাহিত্যের চেয়ার দিতে চেয়েছিল, কিন্তু সন্ন্যাসীর কোন পদে অধিকার থাকা উচিত নয়—সেই জন্য তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন।

একদিন স্বামিপাদের কাছে গিয়ে দেখি স্বামিপাদের মুখে দিব্য বিভা। আমাদের সঙ্গে কথাবার্ত্তার পর এ্যালবাম বের করে আমেরিকার সাহেবদের তোলা সব সুন্দর সুন্দর ছবি দেখাতে লাগলেন। একটি ছবি দেখিয়ে বললেন যে,—ওখানে সাহেবরা অনেক ছবি তুলেছিল। আমি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ একটি অচেনা সাহেব আমাকে দেখে বলল,—মহাশয় আপনার ফিগারটি খুব সুন্দর, আর্য্যজাতি সুলভ। আমি একটি ছবি তুলবো। আমি রাজী হওয়ায় লোকটি তুলল—এই সেই ছবি। আমি দেখলাম ছবিখানি খুব সুন্দর।

স্বামিপাদের তেজোদ্দীপ্ত বিশাল দেহ দেখলেই রাজা মহারাজা মনে হত। একদিনের কথা মনে পড়ে যায়। স্বামিপাদ আমাদের কথায় কথায় বললেন,—আমি একদিন রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, কতকগুলি লোক আমার শরীর দেখে বলতে লাগল—আরে কোই রাজা মহারাজ হ্যায়, বহুত পেস্তা, বাদাম খাতে হোগা। আমি মনে মনে একটু হাসলাম—খেতে পাই কিনা কেউ দেখে না—বাদাম, পেস্তা কে দেয় বল?

স্মৃতির কল্পলোকে ভেসে আসা দিনগুলি যেন পদ্মের দল...মনে পড়ে তখন কলেজে পড়ি এসে পড়েছি চরণান্তিকে—স্বামিপাদ যেন কৃপামূর্ত্তি। দীক্ষার জন্য বলেন, আমি ত তোদের জন্যেই বসে আছি। না হলে গঙ্গার ধারে হরিদ্বারে এসব স্থানে থাকলেই হত···কৃপা মুহূর্ত্তেই হয়—এর পর এসেছিল দীক্ষার লগ্ন তবে সেটা ১৯২৪ সালের এক পরম লগ্নে! মনে পড়ে সেই সৌম্য শান্ত গম্ভীর মূর্ত্তি—বাইরের সকল আড়ম্বরহীন—বসে আছেন ইডেন হস্পিট্যাল রোডের দ্বিতলে... গীতার আলোচনা চলছে—ছোট হলটিতে বহু লোক—জ্ঞান ঘন মূর্ত্তি—একাধারে

চুপ করে বসে আছেন— কে বলবে ইনিই দেশ দেশান্তরের পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ –

তখনও আশ্রমের নিজস্ব গৃহ হয়নি—কত চেষ্টা কত সাধনা—কত বুক ভাঙ্গা ব্যথা বর্ত্তমান আশ্রমের পিছনে যে আছে সে কথা আজ অনেকেরই মনে নাই—কত ধনীর দুয়ারে স্বামিপাদের আকুতি জেগেছে, ফিরে এসেছে ব্যর্থতায়।

তেমনি বিহার ভূমিকম্পের দিনে বসে আছেন অভীমন্ত্রের ঋষি নিজের ঘরে—নেমে আসবার চেষ্টা মাত্র নাই—

মনে পড়ে জ্ঞানের নব নব প্রকাশে শিশুর মত আকুলতায় নব প্রকাশিত তত্ত্বপুস্তক পাবার আকুতি ভক্তের কাছে।

মনে পড়ে—প্রজ্ঞাঘন মূর্তি—ললাটে বিচ্ছুরিত দ্যুতি বসে আছেন বিংশ শতাব্দীর শঙ্কর—ভক্তদের দেখে মুখ ঈষৎ হাসির আলোয় আলো...স্মৃতির অন্ধকার উছলিত হয়ে ওঠে—ক্লান্ত কর্ম্মপরায়ণ, জন্মোৎসবের দিন ভক্তের জন্য স্নেহ-বিগলিত হৃদয়ে প্রশ্ন—কিছু খেয়েছিস—ক্ষিদে পায়না...

মনে পড়ে ভক্তের সামান্য উপহৃত একটি Water man fountain pen পেয়ে আনন্দোজ্জ্বল নয়নে বলা—ওরে নূতন তো, ঠাকুরকে নিবেদন করা যাবে তো ?—তা না হলে শুদ্ধ করে নেব।

মঠের আরতির সময় বাজাবার জন্য বর্ম্মা থেকে একটি বড় Gong 'দাদা' (Dr. সত্যসাধন মুখার্জি) আনিয়ে দিয়েছিলেন বড় বড় মাছ আর নানারকম বড় বাজারের দই, সন্দেশ নিজেও নিয়ে গেছি আবার লোক দিয়েও পাঠিয়েছি। বাড়ীর তৈরী খাবারও নিয়ে গেছি বহুবার সকলেই আনন্দ করে নিয়েছেন। আর একবার বাইশ রকমের চাটনি নিয়ে গেছি স্বামিজী সেগুলি দেখে বলছেন,—ওরে আমি কখনও এত রকমের চাটনি দেখিনি।

আবার কোন কোন দিন হয়তো নিজের হাতের কাজ দেখিয়ে বলছেন,—দেখ, ওদের কাছ থেকে শিখে ওদেরি ওপর গুরুগিরি করেছি—না হলে কি গুরু বলে ওরা মানতো ?—

আর একদিনের কথা—বলছেন,—আমরা ভগবানকে দর্শন করেছি—আর এই হাতে তাঁর সেবা করেছি—এই আমাদের জীবনে পরম সৌভাগ্য...জীবনের নানা কথা বলতে বলতে বলছেন—একটা দৈত্য দানার মত বিনা পয়সায় ঘুরে এসেছি সারা বিশ্ব—ইতালীর বিখ্যাত আঁকিয়েদের আঁকা চিত্রগুলি নিজের চোখে

দেখতে ইচ্ছা হল—একলাই গেছি চলে ইতালীতে আবার এই তো সেদিন ঘুরে এলুম পায়ে হেঁটে এই বৃদ্ধ বয়সে— তিব্বতের হিমীশ মঠ থেকে জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রেরণায়···

মনে পড়ে ভক্তের কাছে ছোট হয়ে সমপ্রাণ হয়ে বলা,—ওরে একদিনে কি হয়? সময় নেবে—চাক্ষুষ দর্শন কলিতে সহজ নয়। আমিই সেদিন প্রার্থনা করছি—ঠাকুর! বুঝি ছবি হয়ে গেলে?—আমাদের ভুলে গেলে?···এই টেবিলেই তন্দ্রিত হয়েছি, দেখি ঠাকুর এসে বলছেন—কালী; মনে আছে—সেই নীলকণ্ঠের যাত্রা দেখতে যাওয়া—লোক বেশী না থাকায় যাত্রা জমল না···

বেদান্ত মঠে অসুস্থতায় প্রার্থনা, এই গোলমালের স্থান থেকে যদি সরে যেতে চান নির্জ্জন গঙ্গাতীরে···সানন্দে সম্মতি দেন···চেষ্টা করে দেখ— সেদিন সম্ভব হয়নি তবে তাঁর সে ইচ্ছায় আজ তাঁর পুণ্যপীঠ হয়েছে বরানগরে 'শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন।' আবার স্থিতপ্রজ্ঞ—কবিরাজ ইত্যাদি দেখাবার কথায় বলেন—না, চিকিৎসা সঙ্কট করার প্রয়োজন নাই। যার হাতে আছি সেই যা বলবে তাই হবে—শ্রীঠাকুরের এই ইঙ্গিত···

ভক্ত স্বামিপাদের তৈলচিত্র আঁকছে, এখন যেটি ঠাকুর ঘরে আছে।·ডেকে বলছেন,—দেখতো কেমন হচ্ছে—মুখে অপার্থিব দিব্য হাসি একটু ছুঁয়ে গেছে। আর একদিন স্বামিপাদের কাছে গেছি সঙ্গে ক্যামেরা. ইচ্ছা স্বামিজীর ফটো তোলা—স্বামিজী চা খাচ্ছিলেন। বললেন—দাঁড়া চা খেয়ে নি। তার পর ভক্তকে বলছেন,—কত লোকে ছবি তোলে. এক কপি দেয় না —তা তুই এক কপি দিবিতো। এই বলে স্বামিপাদ চাদর গায়ে দিয়ে তাঁর যে লাঠি নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরে এসেছেন সেটা নিয়ে পরিব্রাজকের ভঙ্গীতে দাঁড়ালেন। ছবি তোলা হলে বললেন,—আমার মন হিমালয়ে চলে গিয়েছিল। একখানি বসা ছবিও নেওয়া হয়। এটি খালি গায়ে বিবেকস্বামীর মত। এটি 'আমার জীবনকথা'য় দেওয়া আছে।

জনৈক ভক্ত করে চলেছে অজস্র প্রশংসা—তুল্য নিন্দা স্তুতি-মৌনী—থামিয়ে দিয়ে বললেন,—তোমার না আজ কোথায় কণ্ট্রাক্ট পাবার কথা আছে—শিগ্‌গির সেরে এসোগে···

ভক্তের আকুতি নিয়ে প্রার্থনা হয়তো জাগে, ঘরটা ঠাণ্ডা করার একটা উপায় হয় না রুমকুলার দিয়ে?...আমেরিকায় দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর থাকার পরও দিব্য

শিশুর কাছে এ তত্ত্ব অজ্ঞাত। বলেন,—কলকাতার গরমে বড় কষ্ট হয়...পা-টা ফুলে যাচ্ছে...কিন্তু এমন দিন গেছে পয়সা ছুঁতুম না—কারু বাড়ীতে থাকতুম না...বীরভূমের পাশ দিয়ে গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে মহুয়া খেতে খেতে চলে গেছি—গীতার অনিকেত মূর্ত্তি দেখে ভক্ত...

দ্বিধা সঙ্কুচিত বুকে জাগে—দীন সাধককে এগিয়ে দিতে কত প্রেরণা—বলেন, —আমরা রজোগুণী, আর এই দেখ সত্ত্বগুণী ছেলে—ছাতে থাকে, দুধ খেয়ে থাকে, এমনি কত কথা—অশ্রুসজল স্মৃতির তীর্থে মনে পড়ে...সেদিন কর্ম্মবীর চরৈবেতী মন্ত্রের মূর্ত্ত প্রতীক শুয়ে শুয়ে কাটাচ্ছেন দীর্ঘ দিন—উপর হতে আর নামতে অক্ষম—নেমে এসেছে বিদায়ের আসন্ন লগ্ন—ভক্ত শোনাচ্ছে সঙ্গীত,— দিলীপ কুমারের প্রসিদ্ধ ভজন—'জলবার মন্ত্র দিলে মোরে'—শুনে সে এক দ্রষ্টার হাসি—মনে পড়ে সেই রোগ কাতর দেহে রাত্র দুই তিন প্রহর পর্য্যন্ত জেগে নিজের লেখাগুলি ঠিক করে দেওয়া...আবার তেমনি অসুস্থতায় দীক্ষার্থীদের কপাল মোচনের ব্যবস্থা...মনে পড়ে ভক্তের কাছে চিরবিদায় সন্ধ্যায় নিষেধ বাক্য,—চলে যাচ্ছিস—আমার যে দরকার ছিল...শিগগির ফিরে আসিস। একথা আমরা অন্যত্র বলেছি।

সেদিনের ঘটনা—আজো বেশ মনে আছে। স্বামিপাদ এসে বসেছেন বেদান্ত মঠে তাঁর বসবার ঘরটিতে। আলমারীতে একধারে বই সব রাখা আছে। ঘরে আছে কয়েকটি ছেলে—তাঁর দিকে চেয়ে আছে উৎসুক চোখে—বোঝেনি কত বড় চিন্তাশীল, কত বড় কর্ম্মী, আর Dynamic সে Personality. শিশুর মত স্বচ্ছ দিব্য-হাসি নিয়ে জনৈককে ডেকে বলেন,—দেখ রাধাকৃষ্ণাণ আমার কথা লিখেছে তার বইতে—'Contemporary Indian philosophy' দেখেছিস ?—মূঢ় দৃষ্টিতে থাকে চেয়ে—বইটি আলমারী থেকে নিয়ে বলেন,— পড় দেখি। পড়া হয় তখনকার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক স্বামিপাদকে দার্শনিকের পর্য্যায়ে স্থান দিয়েছেন—নিয়েছেন তাঁর লেখা "Hindu philosophy in India—" সঙ্গেই রয়েছে তাঁর নিজের লেখা জীবন-বেদ। দীর্ঘদিনের ব্যবধানে আজ মনে পড়ে—তাঁর মর্য্যাদা দেওয়া হয়নি সেদিন। মনে পড়ে আর একদিনের কথা —বক্তৃতা দিচ্ছেন স্বামিপাদ—কত মুক্তা মাণিক পড়ছে ছড়িয়ে তাঁর কথায়—আর মূঢ় দর্শক করছে বৃথা গল্প।

আবার আর একদিন গিয়ে দেখি বিচ্ছুরিত-বিভায় একখানা বই নিয়ে বসে আছেন।······প্রসাদ প্রসন্নমুখে বলেন,—আয় কেমন আছিস—তারপরেই হয়ত ভুলে গেলেন সব মনীষার কথা। বলছেন, দেখ, নিজ হাতে টুপি সেলাই করতে পারি—এনে দেখান খদ্দরের টুপি সুন্দর সুদৃশ্য। বলছেন—দেখ, যখন যেমন তখন তেমন চলতে হবে। নিজেই ইস্তিরী করে সুট পরে কাজ করতে হয়। সেদিন Imperial Bank-এ দরকার ছিল গেছি—বেশ ভাল পাটকরা সুট পরে—সেক্রেটারী হাসিমুখে দেয় কাজ সেরে আর সেখানে ঐ মহারাজ গেছে খদ্দরের পোষাক পরে, সাহেব দিয়েছে আপিসের বাইরে পাঠিয়ে। কাজ নিয়ে কথা। এমনি শত কথা উপদেশে দিয়েছেন জীবন অমিতায়িত করে—আজ স্মৃতির তীর্থ দীর্ঘশ্বাসে যায় ভরে...

একদিনের কথা বেশ মনে পড়ে, আমরা স্বামিপাদের কাছে গেছি উৎসব উপলক্ষ্যে। স্বামিপাদ ভক্তপরিবেষ্টিত হয়ে বসে আছেন। 'শ্রীম' ও এসেছেন নিমন্ত্রিত হয়ে। স্বামিপাদ নমস্কার করলেন তিনিও প্রতিনমস্কার করলেন। তারপর তাঁর সঙ্গে স্বামিপাদের কথা হল। 'কথামৃতে' স্বামিপাদের নাম খুব কম আছে বলে স্বামিপাদ বললেন,—আমরা 'ইত্যাদির' দলে পড়ে গেছি। জনৈক ভক্ত 'শ্রীম'কে প্রণাম করতে গেলে 'শ্রীম' পেছিয়ে গেলেন দেখে 'শ্রীম'কে স্বামিপাদ বললেন,—মশায় আমরা ঠাকুরের সন্তান, দিকে দিকে ঠাকুরকে ছড়িয়ে দিতে এগিয়ে পড়তে হবে পেছিয়ে গেলে চলবে কেন ?

মাষ্টার মশায় খুব শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন। কথা খুব কম বলা তাঁর স্বভাব ছিল। মূর্ত্তি ঋষিদের মত সৌম্য শান্ত। স্বামিপাদের কথায় চুপ করে রইলেন।

স্বামিপাদ আরও বললেন,—আমি প্রয়োজন বোধে মাষ্টার মশায়ের "কথামৃত" 'Memories of Ramkrishna' নাম দিয়ে আমেরিকাতে প্রকাশ করেছি। কারণ ওদের দেশের লোকেরা 'কথামৃত' যেভাবে আছে—তা নিতে পারবে না। আশা করি মাষ্টার মশায় তার জন্য আমায় ক্ষমা করেছেন।

বেদান্ত সোসাইটি তখনও ইডেন হসপিট্যাল রোডে,—একদিন কলেজের পর স্বামিপাদের দর্শনে গেছি, সঙ্গে একটি ডেস্ক ক্যালেণ্ডার। জনৈক ব্রহ্মচারী

গিয়ে স্বামিপাদকে খবর দিতে তিনি বলে পাঠালেন তিনি ক্যালেণ্ডার কিনবেন না কারণ তিনি ভেবে ছিলেন কেউ ক্যালেণ্ডার বিক্রী করতে এসেছে। তারপর ঠিক খবর দেওয়া হলে তিনি ক্যালেণ্ডারটি খুসি্ হয়ে গ্রহণ করলেন ও আশীর্ব্বাদ করলেন। আর একদিন—তখন বেদান্ত সোসাইটী বীডন ষ্ট্রীটে—স্বামিপাদ একটি উচ্চ আসনে বসে আছেন। জলধর সেন, রসরাজ, অমৃতলাল বসু এঁরাও সব আছেন। সকলেই বক্তৃতা দিতে এসেছেন। সেন মশায় বলছেন, আমি যখন খবরের কাগজে পড়তাম যে আপনি আমেরিকার নগরে নগরে বেদান্ত প্রচার করছেন তখন মনে হত হায় অভাগা ভারতবর্ষ! কবে আবার তোমার বুকে এঁদের চরণধূলি পড়বে। এইভাবে কত দুঃখ করতাম। রসরাজ বসু মশায় ছাড়বার পাত্র নন। তিনিও বেশ মিষ্টি করে বলছেন,—দেখ ভায়া আমাদের দেশের এই ধান্যেশ্বরী যখন আমাদের দেশে তৈরী হয় তখন তার কোন দামই থাকে না। তখন তাকে আমরা পচুই বলে ঠাট্টা করি। কিন্তু যখন ওদেশে থেকে জাহাজে চেপে আসে, আর ভাল ভাল লেবেল দেওয়া থাকে তখন আনন্দের সঙ্গে বেশী দাম দিয়ে কিনি। তেমন এই স্বামিপাদেরা যখন ভারতের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়িয়েছেন তখন আমরা কেয়ার করিনি। তখন লেটো, কালী, নরেন এই ছিল পরিচয়—কিন্তু আজ যখন এঁরা ওদেশের বিদগ্ধমণ্ডলীদের কাছে বিশেষভাবে সম্মানিত হলেন তখন তাঁদেরকে আমরা বলছি—বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ।

আর এই হতভাগা আমরা যখন ঠাকুরের কাছে গেছি তখন ঠাকুরকে ধরতে পারিনি তখন আমরা ছেলেমানুষ। গিরিশ ঘোষের সঙ্গে কাশীপুর বাগানে গিয়ে নীচে বসে গল্প করতাম। ঠাকুর যখন ডেকে পাঠাতেন তখন বলতাম তোমাদের পরমহংস মশায়কে গিয়ে বলো ঠোঁটটা আরেকটু লম্বা করে আমাদের এখান থেকে তুলে নেবে। তখন কে জানতো যে তাঁর 'ঠোঁট' এত লম্বা যে বিলেত, আমেরিকা, ফ্রান্সের লোকদেরও ধরে ধরে আনবেন। এখন তাঁরই নাম নিয়ে জীবনের শেষটুকু কাটিয়ে দিচ্ছি।

আরেকদিন গেছি বেদান্তমঠে। দেখি স্বামিপাদ ওপরে নিজের ঘরে বসে আছেন। অনেক ভক্তরাও এসেছেন। আমরা গিয়ে প্রণাম করে বসলাম। একজন উগ্র স্বভাবের লোক এসে খুব অকথ্য ভাষায় স্বামিপাদকে গালাগালি করতে লাগলো। আমার সঙ্গে আমার দাদাও ছিলেন—তিনি অন্যায় সহ্য

করতে পারতেন না মোটেই। বললেন,—আদেশ দিন না—এটাকে ঘাড় ধরে নিয়ে নীচে দিয়ে আসি। স্বামিপাদ বারণ করলেন। —বললেন, ওকে কেউ নীচে নিয়ে যাও।

সেই সমস্ত গালাগালি নীরবে সহ্য করলেন এবং ভক্তদের সঙ্গে প্রশান্ত মুখে পূর্ব্বকথায় ফিরে গেলেন—

সে অনেক দিনের আগেকার কথা। স্বামিজী তখন ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকতেন। (বীডন ষ্ট্রীট)। আমি গেছি তখন শ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব। সঙ্গীত রচনার তখন প্রত্যক-লগ্ন। গানটি এই ঃ—

"যুগে যুগে একি করুণা ভ'রে, এসেছো আজ ধূলার ঘরে।"

স্বামিপাদ স্মিত হাস্যে গানখানি শুনলেন।

বহু সজ্জন সমাগতি হয়েছে। শুনলাম দরিদ্র নারায়ণের সেবা হবে। কলিকাতায় দরিদ্রনারায়ণ সেবা করতে হলে একটু ব্যবস্থা করতে হয়। দরিদ্রনারায়ণদের একজন করে প্রধান থাকে তার মাধ্যমে ব্যবস্থা করতে হয়। যতদূর মনে আছে আমি দরিদ্র নারায়ণদের বোঁদের ব্যবস্থা করবার জন্য একটা হিসেব চাই। টাকার পরিমাণ জেনে আমার সঙ্গে যে একজন ছিল তাকে বাড়ী থেকে টাকা আনতে পাঠাই।

খুব সম্ভব স্বামিজীর ভাই (মহেন্দ্রনাথ দত্ত) ও কয়েকজন সাধুসন্তও বসে ছিলেন। প্রথম আলাপ হল তাঁর সঙ্গে। ফটোতে যেমন তাঁর ছবি দেখা যায় এসময় তাঁর শরীর এর থেকে ভাল ছিল। তিনি আমার পিতৃ পরিচয়, তোমরা অমুক জায়গায় থাকতে এইসব কথা বলে আলাপ করলেন। বলা বাহুল্য, সেবার দরিদ্রনারায়ণ সেবায় বেশ সুবিধা হয়নি। তারা একটু রাগারাগি করেছিল।

প্রসঙ্গতঃ আর একদিনের কথা মনে পড়ে। স্বামিজীর আর এক ভাই ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত সদ্য এসেছেন জার্ম্মান থেকে ফেরার পর। স্বামিজীর সম্বন্ধে লেকচার দিলেন। এটাও হয়েছিল বীডন ষ্ট্রীটে ভাড়াবাড়ীর আশ্রমে। দত্ত মহাশয়ের হাতে একটি বেত। তিনি সেটি পিছন দিকে ঘুরিয়ে কথা বলছিলেন। একটি কথা বেশ বলেছিলেন,—স্বামিজী আর যাই করুন বা নাই করুন—বিদেশে আমাদের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন। ভূপেন দত্ত পুরোনো দিনের অনুশীলন সমিতির বিশিষ্ট কর্ম্মী ছিলেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি স্বামিজীর একটি জীবন

আলেখ্য লিখেছিলেন,—'দি পেট্রিয়ট প্রফেট্ অফ্ ইণ্ডিয়া'—তাতেও স্বামিজীকে এইভাবেই চিত্রিত করা হয়েছিল।

লেকচার দেওয়ার পর দত্তমশায় প্রসাদ পেতে বসলেন। ফল, মিষ্টি দেওয়া হয়েছে। বড় বড় ছুটি হাত পেতে বলছেন,—আমাকে এতগুলো প্রসাদ দিতে হবে। সেই সময়ই তাঁর জুতা জোড়াটি খোওয়া গিয়েছিল।

এরপর স্বামিপাদের সঙ্গে দেখা। স্বামিপাদ যে কেবল দ্রষ্টাসাক্ষীর মত আমাদের কথা শুনতেন সে কথা আজও আমাদের মনে আছে। একদিন ধর্ম্ম প্রসঙ্গ হচ্ছে, স্বামিপাদের কাছে বসে আছি—ওদেশ থেকে আনা সেই টেবিলের ধারে। হঠাৎ স্বামিপাদ হাতের দিকে নজর করে বললেন—অমন কোরনা ওটা ছিঁড়ে যাবে। আমি অন্যমনস্ক হয়ে টেবিলের ওপর আঙ্গুল ঘষছিলাম, ওপরের রেক্সিনের আস্তরণটা হয়তো ছিঁড়েই যেত।

স্বামিপাদের শেষ অসুখের কথা। যেমন করেই হোক আমরা বুঝতে পেরেছিলাম তাঁর অসুখ হয়তো আর সারবেই না। তাই যাদের দীক্ষা হয়নি তাদের স্বামিপাদের কাছে পৌঁছে দেবার একটা চেষ্টা হয়েছিল। স্বামিপাদের কল্যাণে কিছু করা হচ্ছিল আশ্রমে। আমাদেরও ইচ্ছা ছিল তাতে যোগ দি. কিন্তু শুনলাম বাইরের লোকদের নেওয়া হবে না। ভাদ্রের শেষ সন্ধ্যা বর্ষণমুখর...সেদিনের কথা ভুলবার নয়—আকাশ আর মাটীর সে কান্না বুক নিঙড়েই জেগেছিল...আর তার সঙ্গে জেগেছিল একটি বরষণ সঙ্গীত—নিশীথের একটি তারার মতই তার আবেদন ঃ—

প্রাণের ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর
আবার এস ফিরে এস
কান্ত করুণ চন্দ্রমুখে শঙ্কাহরণ
তেমনি হেসো ॥
জানি কঠিন ধরার ধুলি
নেয়নি তো কেউ বুকে তুলি
ভালবেসে গেছো ভুলি
তেমনি আবার ভালবেসো ॥

ধ্যানেই গড়া প্রেমে ধরা
দেহের প্রেমে দাও হে ধরা
শান্ত চিদানন্দরূপে
অভেদজ্ঞানে ভ্রান্তি নেশো ॥
যাবার বেলা গেছ হেসে
তাই চোখের জলে যাই যে ভেসে
কান্না হাসির মাণিক হ'য়ে
তেমনি প্রেমানন্দে ভেসো ॥

স্বামী অভেদানন্দের দর্শনের কয়েকটি কথা

অভেদস্বামীর নিজের লেখা 'আমার জীবন-কথায়' ১৮৮৬ সালের কলকাতার এই পরিচয় পাই। সেই সময় কলিকাতা নগরীতে কোন জলের কল, গ্যাস অথবা বৈদ্যুতিক আলো ছিল না। রাস্তায় লণ্ঠনের মধ্যে রাখিয়া তৈল প্রদীপ জ্বালানোর ব্যবস্থা ছিল। তখন দিয়াশালাইয়ের ব্যবহার ছিল না। চকমকি পাথর ঠুকিয়া পোড়ানো শোলায় অগ্নিকণা করিয়া কাঠকয়লার টিকা ধরানো হইত, তাহার পর টিকা হইতে গন্ধকের দিয়াশালাই জ্বালাইয়া প্রদীপ জ্বালানো হইত। সেই প্রদীপের আলোয় রাত্রে সমস্ত গৃহকর্ম ও লেখাপড়া করা হইত। তখন কেরোসিন তৈল ভারতে আসে নাই, রেড়ির তৈলেরই ব্যবহার ছিল, কাপড়ের সলিতা করিয়া রেড়ির তৈলে ভিজাইয়া প্রদীপ জ্বালানো হইত। তাহার অনেক দিন পরে তবে কেরোসিন তৈলের প্রচলন হয়।

আবার রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলাতে' পাই—তখন সহরে না ছিল গ্যাস না ছিল বিজলী বাতি। কেরোসিনের আলো পরে যখন এলো, তখন তার তেজ দেখে আমরা তো অবাক। সন্ধ্যে বেলা ঘরে ঘরে ফরাস এসে জ্বালিয়ে যেত রেড়ির তেলের আলো, মাষ্টার মশাই মিটমিটে আলোতে পড়াতেন প্যারি সরকারের ফার্ষ্ট বুক। এই আলোতেই বড় হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ, বড় হয়েছেন বিবেকানন্দ, অভেদানন্দ এঁরা সব। বাইরের আলোয় মনের আলো স্তিমিত হয়ে যায় না কি এটি ভাববার কথা। তবে ব্যাবৃত চক্ষুঃ না হলে, অন্তর্মুখী মন না পেলে অন্তরের ঐশ্বর্য্য প্রকাশিত হয় না।

যাই হোক এখানে আমরা অভেদপাদের দর্শনের মূল্যায়ণের সামান্য মাত্র চেষ্টা করব। তিনি বর্ত্তমান যুগের দার্শনিকদের অন্যতম ছিলেন, এর স্বীকৃতি রয়েছে ডাঃ রাধা কৃষ্ণাণের ও ডাঃ ময়ার হেড্ সম্পাদিত 'The Contemporary Indian Philosophers' নামে পুস্তকের Hindu Philosophy in India নামক প্রবন্ধে। বেদান্তের কথাই তিনি বলেছেন এতে।

অভেদপাদের দর্শনের একটি নূতন অবদান—'পরলোক রহস্য'। মৃত্যুর পরের অবস্থা কোন দার্শনিকই বলতে পারেনি আজ পর্য্যন্ত। স্বামিপাদ মৃত্যুর রহস্য যবনিকা ভেদ করবার চেষ্টায় সফল হয়েছেন অনেকটাই। মার্কিণের লিলিডেল নামক স্থানে বহু প্রেতচক্রের অনুষ্ঠানে তাঁর বিরাট অভিজ্ঞতার কথা—'Life beyond deatn' নামক পুস্তকে তিনি দিয়ে গেছেন। তিনি বলেন যে,—যারা আত্মহত্যা করে তাদের মৃত্যুর পর জানতে পারে না যে তারা কোথায় আছে। তাদের একটা আত্মিক গোলমাল সৃষ্টি হয়, সেটা পরলোকেও থাকে। প্রেতেরা সূর্য্যালোক পছন্দ করে না, সে কারণে তারা দিনে দেখা দেয় না। তার কারণও তিনি দেখিয়েছেন। তিনি বলেন,—সূর্য্যালোকের স্পন্দনের সঙ্গে প্রেতলোকের স্পন্দনের পার্থক্য আছে। এর প্রমাণ স্বরূপ—তিনি দেখান যে প্রেতচক্রে মিডিয়ম্‌রা নিদ্রিত বা অর্দ্ধচেতন হয়ে পড়ে। তারা বাইরের জগৎ থেকে তখন পৃথক হয়ে দাঁড়ায়। তখন তাদের সামনে একটা ছায়ার মত পর্দ্দা দেখা যায়, তার পরে প্রেতদের দেখা যায়, আকার মাত্র। এমনি আরো কত কথা তিনি আমাদের জানিয়ে গেছেন তাঁর বইতে।

স্বামিপাদ আমাদের চেতনাকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। প্রথম হচ্ছে Cosmic mind বা সমষ্টি চেতনা। এর থেকেই যত ব্যষ্টি চেতনার উদ্ভব। একেই আবার তিনি subconscious বা অবচেতন বলেছেন,—এটি বিরাট। এর থেকেই আমরা ব্যষ্টি চেতনার প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর মতে অতি মানবগণ এই সমষ্টি চেতনা থেকেই তাদের বিশেষ শক্তি পেয়ে থাকেন। মনঃ সংযমের দ্বারা এইভাবে শক্তি অর্জ্জিত হয়। স্বামিপাদ একটি সত্য ঘটনা তাঁর 'Our relation to the Absolute' পুস্তকে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি একদিন একজন প্রসিদ্ধ ডাক্তারের গৃহে নিমন্ত্রণে গেছেন। বোষ্টনের এই ঘটনা। ডাক্তার তাঁকে বলেন,—আমার একটি ক্ষমতা আছে আপনি তাকে কি বলবেন? স্বামিপাদ তাঁকে দেখাতে বলেন। তাঁরা তখন তাঁদের খাবার ঘরে গেলেন। এখানে একটা টেবিল ছিল। বড় বড় পায়াওয়ালা সেই টেবিল—চারজনে নাড়াতে পারে না। তাঁরা সেই টেবিলে হাত রেখে কথা বলছেন। এমন সময় দেখা গেল টেবিলটা নড়ছে। টেবিলটা যত তাদের দিকে এগিয়ে আসে তত তাঁরা তাঁদের চেয়ার সরিয়ে নেন। শেষে তাঁরা দেয়ালে এসে আটকে পড়লেন। টেবিলটি সোজাই এসেছিল। স্বামিপাদ বলেন, এটি মনের জোরেই সম্ভব হয়েছিল।

অভেদস্বামী মনের দুটি বিভাগ করেছেন। Subjective আর Objective. মনের সঙ্গে যার যোগ সেটি হচ্ছে Subject mind আর বাইরের জগতের সঙ্গে যার যোগ সেটা Objective mind. অবশ্য মনের এক অখণ্ড সত্তা বা Absolute Substance-কে তিনি ধরেছেন। তিনি তাঁর 'Our relation to the Absolute' পুস্তকে বলেছেন যে জগৎটা একটা বিরাট চুম্বক। এর একদিকে রয়েছে মানস সত্তা (Subjective self), আর অন্যদিকে রয়েছে জড় সত্তা (Objective self)—এর মধ্যে আবার রয়েছে মাধ্যমিক সত্তা (Neutral substance)। আগের দুটি এই পরেরটির উপর নির্ভরও করে আবার এটি সম্বন্ধবিহীনও বটে। বর্ত্তমানে রাসেলীয় দর্শনেও এই কথা পাই। Neutral monism তাঁর মতে,—By neutral monism, I understand the theory that mind and matter are not two radically different kinds of entities, but that both are constructed 'out of the same 'stuff'. There is only differerce of relations between them. The neutral entities, are neither mental nor physical entities apart from their relations, but when arranged in one way is matter and arranged in another set of relations is mind.[1] সহজ কথায় ইনি বলেন যে,—একটি নিরপেক্ষ সত্তা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কখন মন, কখন বা বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়। স্বামিপাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে আমাদের কাছে আরো বেশী পরিস্ফুট বলেই মনে হয়।

স্বামিপাদ আর একটি নূতন তত্ত্ব এনেছেন। তিনি বলেন,—যাদের আমরা বিকৃত মস্তিষ্ক বলি তারা আমাদের থেকে অন্য একটি মানসকম্পন বোধ করে। সাধারণ মানুষ আলোকের বা শব্দের কতকটা মাত্র স্পন্দন বোধ করতে পারে। কিন্তু যাদের আমরা পাগল বলে মনে করি তারা হয়ত শব্দের সব তরঙ্গ ধরতে পারে যা আমরা পারি না, আর তারই জন্যে তাদের বিকৃত মস্তিষ্ক মনে করি। হয়ত তাদের শ্রবণ শক্তি বেড়ে গেছে। সত্যকার মনোবিজ্ঞানে Abnormal আর Normal psychology-র প্রভেদ এই ভাবে ছাখে যে, এগুলি আত্মার

1. The Philosophy of B. Russel. Edt. P. A. Schilp, P. 353.

বিভিন্ন কম্পন মাত্র। এই দৃষ্টিকোণ থেকে দেখে আরও গবেষণা করলে আমরা হয়তো পাগলের চিকিৎসা ভাল ভাবে করতে পারবো।

তিনি দেখিয়েছেন যে আমাদের মন এক একটি eddy বা ঘূর্ণি—বিরাট বিশ্বমন নদীর মত। এই বিরাট বিশ্বমন বা অবচেতন (Unconscious বা subconscious) থেকেই আমরা সমস্ত শক্তি পাই। এই অবচেতনের জগৎটি বিরাট।[1]

তিনি বলেন,—সৃষ্টির আগে (Before evolution) এক বিশ্বমানস সত্তাই ছিলেন কিন্তু ইনি অপ্রকাশ রূপে ছিলেন। বাসনাবিহীন সমগ্র ব্যক্তিচেতনার মূলেও এই বাসনা। এটি হচ্ছে সৃজনীশক্তি (Creative power)—এই বাসনা হচ্ছে শক্তির মূল। এই জীবনটা যেন storage battery-এর শক্তি নিঃশেষিত না হলে যন্ত্র অচল হবে না। কিন্তু শক্তি সীমায়িত।

তিনি আরো বলেন,—বহির্জগতে আমরা যা কিছু দেখি সবই Motion বা গতির প্রকাশ। আবার মানস লোকেও সেই গতি প্রকাশিত হচ্ছে Emotion বা সুখে-দুখে।

তিনি Polarisation নামে একটি মানসতত্ত্বের কথা বলেছেন। যখনই কোন emotion বা ভাব বেশী হয়, তখনই তার বিপরীত একটি ভাব সৃষ্টি হয়। অত্যধিক প্রীতি ঘৃণা নিয়ে আসে। তা সে ভালবাসার পাত্রেই প্রীতি হোক বা অন্য কারো প্রতিই হোক।[2] এই Polarity তত্ত্ববিষয়ে Dr. Freud'ও লিখেছেন, সেটি অন্য পুস্তক থেকে উদ্ধৃত করে দেওয়া হল। Freudians speak also of the polarisation. Objective-subjective, pleasure-pain, love-hate.[3] এই Polarity যে Conflict সৃষ্টি করে সেকথা স্বামিপাদ ও ফ্রয়েড দুই জনেই স্বীকার করেছেন।

Mind substance বা মনরূপ পদার্থ হচ্ছে সূক্ষ্ম অণুপরমাণুর সমন্বয়। আর এগুলি সর্বদা ক্রিয়াশীল। আমরা জানি যে Physiological psychologyতে মনকে পদার্থ বলে স্বীকার করেছে।[4]

1. Our Relation etc. P. 48,
2, Our relation etc, P, 91.
3. Psychodynamics of abnormal behaviour. By G. R. Brown P, 161.
4. Ency, Br. P, 716 Vol. 18.

পূর্ব্বে আলোচিত Unconscious (স্বামীজীর কথায় Subconcious) বা অবচেতন সম্বন্ধে আমাদের বর্ত্তমান ধারণার সঙ্গে আমরা তুলনা করতে চেষ্টা করব। Coffkaর Gestalt Psychology-র মতে আমাদের ব্যবহারিক জীবন (Behaviour) James & Linge কথিত Stimulus Response Theoryর উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ বাইরের অভিঘাতে ভিতরের প্রত্যভিঘাতের যে সৃষ্টি হয় তার উপর নির্ভর করে। যেমন চোখে আলো পড়লে চোখ বুজে যায়। এটি নির্ভর করে একটি Field বা ক্ষেত্রের উপর। এগুলির উপর বিভিন্ন শক্তির খেলা থাকে আর এগুলির ছক পালটে গেলেও এদের স্বরূপ ঠিক থাকে। এদের মতে চেতন অবচেতনের মধ্যে স্থির কোন পার্থক্য নাই, আর চেতন বোধের উপর অবচেতনের প্রভাবও থাকতে পারে। এর কার্য্যাবলী হচ্ছে Psycho Physical অথবা Molecular.[1]

Freud এর Unconsciousগুলির মধ্যে প্রধান ভাবে রয়েছে Motives. এই সব পদ্ধতিতে রয়েছে Strong but unfulfilled wishes. এটি সাধারণতঃ আমাদের ধরা ছোঁয়ার বাইরে, চেতন সত্ত্বার আধোদেশে থাকে। Yung মনে করেন যে অবচেতনের স্তর ভেদ আছে। ব্যক্তিগত অবচেতন (Unconscious) এর গভীরে রয়েছে জাতিগত অবচেতন Racial or Collective, Unconscious. Common Ground Work of humanity থেকেই ব্যষ্টিগত চেতন ও অবচেতন গড়ে ওঠে। এটি আবার আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশানুক্রমিকে অর্জ্জন করি।

William Stern তার Personalistic Psychology-তে Convergence তত্ত্ব নিয়ে এসেছেন এই অবচেতনের ভিতর। এর অর্থ শিশুদের বহু Drives (প্রেরণা) আছে। সেগুলি ব্যক্তি সত্ত্বায় প্রকাশিত হয়। Converge in his unitary personality.

উপরে আমরা বর্ত্তমান জগতের অবচেতনের প্রধান প্রধান তত্ত্বগুলি দিলাম কিন্তু স্বামিপাদের চিন্তা জগতে সেগুলি দিব্যতার উৎসে নিহিত।

স্বামিপাদের আবির্ভাবের শতবর্ষ পূর্ত্তিতে তাঁর দর্শনের এই অতি ক্ষুদ্র পরিচিতি এখানে দেবার চেষ্টা করা হল। মার্কিণে তাঁর দার্শনিকতার পরিচয়েই

1. Cont. School of Psycho. P. 137—Wood Worth.

অধ্যাপক পার্কার, অধ্যাপক ল্যানমান, অধ্যাপক জেনস্, অধ্যাপক জ্যাকসন প্রভৃতি বিশিষ্ট বিদগ্ধজনেরা তাঁকে বন্ধু পদবীতেই গ্রহণ করেছিল। আর হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে তাঁদের অধ্যাপকের পদে গ্রহণ করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বলা বাহুল্য সে পদ সন্ন্যাসী হিসাবে তিনি গ্রহণ করেননি। আরো যত বৎসর তিনি ব্রুকলিন ইনষ্টিটিউটে বক্তৃতা দিয়েছেন তত বারই তার নামের সঙ্গে তারা P. H D. পদবী যুক্ত করে দিয়েছিল। বাঙ্গলায় মাত্র এন্‌ট্রান্স্‌ ক্লাসের একটি ছাত্রের পক্ষে এটি যে বিশেষ গৌরবের, একথা অনস্বীকার্য্য।

বেদছন্দা

(প্রথম পর্ব্ব)

শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের সপ্তচত্বারিংশৎ শুভজন্ম তিথিপূজা উপলক্ষে এই অমৃতবাণী সঞ্চয়ন। প্রভুর বাণীগুলি ভক্তপ্রাণে জাগাইয়া তুলিবে আনন্দ—আধ্যাত্মিক ক্ষুধায় এই বাণী হইবে অমৃতধারা। এগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে শ্রীসাধনাপুরী, শ্রীশরণাপুরী, শ্রীঅর্চনাপুরীর দিনলিপি হইতে।

প্রকাশিকা
শ্রীসুমনাপুরী

৩য় সংস্করণ : গুরু পূর্ণিমা, :৩৭৭ সাল
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, মাতৃমন্দির,
সিউড়ী।

বেদছন্দা

প্রঃ—জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

উঃ—"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ" (শ্রীঠাকুর)—জীবন ধারণ করতে হলেই আমাদের কতকগুলো কাজ করতে হয়, তার কতকগুলো উদ্দেশ্য থাকা চাই। প্রায় লোককে জিজ্ঞাসা কর যদি, কেন পড়ছ ? বলে, "জানিনা। দেখা যাক্ কিছু করা যাবে। পথে চলতে চলতে যেখানে হোক থামা যাবে।" উদ্দেশ্য সবারি আছে কিন্তু জানেনা। সবাই আপনার তৃপ্তির জন্য ছুটছে—কিন্তু এই আপনাকে খুঁজতে গিয়ে তিনিই বেরিয়ে পড়েন। এইজন্য ঠাকুর এক জায়গায় বলেছেন "তুমি কে বল দেখি—তুমি তিনিই।"

কাজেই তাঁকে লাভ করাই জীবনের উদ্দেশ্য করা উচিত। তাঁকে লাভ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে সংসারে চলা উচিত। তাঁকে লাভ করলেই সব লাভ করা হবে। আর তাঁকে ছাড়লেই কোন জিনিষই দাঁড়াবে না। জগৎটা তাঁতেই বিধৃত।

১। প্রঃ—গুরু কৃপা তো রয়েছেই তবে কেন বলে গুরু কৃপা না হলে এ হবে না. ও হবে না ?

উঃ—গুরু কৃপা মানে সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে সচ্চিদানন্দের কৃপা, তিনিই গুরু। আর—যেমন বৃষ্টি তো পড়ছেই তবে যেখানে গর্ত্ত আছে সেখানে জল জমে, তেমনি কৃপা তো আছেই তবে যার যেমন আধার সে তেমনিই ধরতে পারবে। অবশ্য মানুষ গুরু বা সদ্‌গুরুকে সচ্চিদানন্দের স্বরূপ মনে করতে হবে।

২। প্রঃ—তিনি বিরাট না স্বরাট ?

উঃ—দেখ, তিনি এই সৃষ্টির ভিতরে-বাহিরে বিরাট হয়ে আছেন আবার এই ছোট্ট বুকে তিনি ছোট্ট হয়ে আছেন সৃষ্টিরূপে।

৩। প্রঃ—ঠাকুরকে বেশী ভালবাসে ভক্ত, না ভক্তকে বেশী ভালবাসেন ঠাকুর ?

উঃ—ভক্ত ভগবানের সমান টান। "তুম জ্যায়সা রাম পর তুম পর ওইসা রাম।" কখনও ভক্ত হয় চুম্বক, কখনও বা ভগবান চুম্বক হয়ে ভক্তকে টানছেন। ঠাকুর যদি বেশী ভালবাসতেন তাহলে ভক্তকে তো তখনি বুকে টেনে নিতেন, তাহলে তো লীলা চলে না। প্রলয় হয়ে যেত। আর তা ছাড়া ভক্ত ভগবান কেউ কাউকে ছাড়া থাকতে পারে না। নিউটনের নিয়ম (Each action has an equal and opposite reaction) প্রত্যেক শক্তির পিছনে ঠিক সম পরিমাণ একটি বিপরীত শক্তির খেলা দেখা যায়।

কাজেই ভগবানের টান যতটুকু ভক্তের টানও ততটুকু হবে।

৪। প্রঃ—সুযোগ সুবিধা না পেলে কি ভালবাসা যায়?

উঃ—বল কি? ভালবাসার আবার সুযোগ? তবে ভালবাসা বলছ কাকে? ভাল তো আপনিই সবাইকে বাসবে। তার আবার scope কি? আচ্ছা ঠাকুরের কথামৃত পড়েছো তো—একাঙ্গী প্রেমের কথা, হাঁস জলকে চায়, অথচ জল হাঁসকে চায় না। জল কি হাঁসকে আপনি ডাকে, না হাঁস নিজে গিয়ে জলে পড়ে। তেমনি লেগে পড়।

৫। প্রঃ—প্রকৃত শরণাগত কে? একজন কেঁদে চাইছে, আর একজন ঠাকুর যা দিচ্ছেন তাই নিয়ে সন্তুষ্ট হচ্ছে।

উঃ—এক রকম আছে ম্যাদাটে ভক্তি, তখন কাঁচা ভক্তি। সে জানেই না যে কিছু চাইবার আছে কি না, সে অবস্থায় সে বলে ঠাকুর যা করছেন। একে শরণাগতি বলে না—ম্যাদাটে ভক্তি বলে। ক্রমে যখন ভক্তি পাকতে লাগল তখন ঠাকুরের ওপর জোর করবে, অভিমান আসবে; সে অবস্থায় যা চাইবে তা যদি না পায়—কান্না আসে। তারপর যখন সবের পারে গেল তখন সর্ব্বভূতে ঠাকুর বিরাজ করছেন—সব ঠাকুর। তখন তার চাইবার কিছু থাকে না। ঠাকুর যে রকম অবস্থায় রাখেন তাতেই তার আনন্দ। সেই অবস্থাকে পূর্ণ শরণাগতি বলে।

৬। প্রঃ—ভক্তকে কি তিনি পরীক্ষা করেন? না তার সঙ্গে লীলা করেন?

উঃ—পরীক্ষা লীলার ভেতরেই, আবার যতক্ষণ কাঁচা ভক্তি—ততক্ষণই পরীক্ষা আর লীলা আলাদা বোধ হয়, কিন্তু পাকা ভক্তি হলে তখন সব লীলা।

৭। প্রঃ—ঠাকুরের চেয়েও কি তাঁর কৃপা বড়—যে, তাঁর কাছে থাকলেও কিছু হবে না?

উঃ—দেখনা, হাজরা কতদিন ঠাকুরের কাছে রইল কিন্তু কি হল ? শেষের দিকে বোধ হয় একটু কিছু হয়েছিল। তাই ঠাকুর যখন দেহ ধারণ করেন, তখন তাঁরও স্থূল মন আছে : সেই মন যদি বিরূপ হয়, তাহলে কেমন করে হবে। তাই দেহ থাকতে যতক্ষণ না তাঁর মন হচ্ছে ততক্ষণ হবে না। কিন্তু দেহ ছাড়লে তখন মূর্ত্তির কাছে থাকলে ফল পাবে। কারণ মানুষ, দেহ থাকতে তাঁর মর্য্যাদা দিতে পারে না। দেহ না থাকলে তখন কিছু বুঝতে পারে। তবে কাছে থাকলে কিছু হবে।

৮। প্রঃ—মনের ক্ষুদ্রতা কেন হয় ?

উঃ—মনের ভূমার সাধনের অভাব। প্রত্যেকে নিজের চশমা নিয়েই দেখে কিন্তু যদি অন্যের চশমা নেওয়া যায় তবে উদারতা বেড়ে যায়। সবার চশমা যদি পরা যায়, ভূমার চশমা পরতে পারলে, প্রেমের চশমা পরতে পারলে ভগবৎ লাভ হয়। "বাসুদেব সর্ব্বম্।"

৯। প্রঃ—ভক্তের ধ্যান আর জ্ঞানীর ধ্যানের প্রভেদ কি ?

উঃ—ভক্তের রূপের ধ্যান, সারসিক ধ্যান ; সে ধ্যানে ঠাকুরকে নিয়ে বিলাস করে, লীলা করে—আনন্দ করে। ভক্ত কখনও শ্রীকৃষ্ণকে পূজা করছে, কখনও সাজাচ্ছে, আরতি করছে কখনও বা খাওয়াচ্ছে আবার ঠাকুরের লীলার স্মরণ করছে। আর জ্ঞানীরা একটা জিনিষ ধরে বসে থাকে, তারা লীলার ধ্যান করে না। তার পূজো করতে ভাল লাগে না। আর জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি যাদের, তারা দুই করে। যেমন ঠাকুরের মূর্ত্তি বা চরণ যেন একটা জ্যোতিতে ঘিরে রয়েছে। অথবা "সচ্চিদানন্দ সাগরে মীন হয়ে বিচরণ করা।"

১০। প্রঃ—ধ্যানের সময় নানা জিনিষ মনে কেন ওঠে ? আর কি করে তা তাড়ানো যায় ?

উঃ—এটা স্বাভাবিক। মানুষ যা করে, ইচ্ছা না থাকলেও সেই চিন্তাগুলো আবার মনে ওঠে, নির্জ্জান মন থেকে, সংস্কার বশে ; ধ্যানের সময় সেগুলো তাড়াতে হবে। যেই মনে উঠবে অমনি ঠাকুরকে বলবে, এই নাও তোমার চরণে রইলো তুমি দেখো—বলে ধ্যান করতে লাগবে। যা যা মনে উঠবে ঠাকুরকে দিয়ে দেবে। এই রকমে মন যখন একটু স্থির হবে তখন ঠাকুরকে পাবার জন্য, দর্শন পাবার জন্য ব্যাকুলতা আনবে। একটি মালা দিয়ে ঠ্যকুরকে খুব করে বাঁধবে। কিছুতেই যেতে দেবে না। তীব্র চাহিদা আনতে হবে।

এমনি করে দেখবে মন স্থির হবে যাবে। তারপর শেষের দিকে সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে তো সমাধিস্থ হবেই।

২১। প্রঃ—প্রাণায়াম সম্বন্ধে কিছু বলুন।

উঃ—ধ্যান জমে গেলে তো নিঃশ্বাস শিথিল হয়ে আসে। আমি বলি সেটা ধ্যান করতে বসেই, চেষ্টা করে, আস্তে আস্তে কমিয়ে আনতে। প্রত্যেক লোকের নিঃশ্বাসের একটা ছন্দ আছে—ঘুমোবার সময় বেশ বোঝা যায়। এবারে এ লোকটার ঘুম আসছে। তেমনি ধ্যান করবার আগে নিঃশ্বাসটাকে ধ্যান ছন্দে নিয়ে আসতে হবে ; সেটি প্রত্যেকের নিজের নিজের দেখে ঠিক করে নিতে হবে কোন নিঃশ্বাসটি তার ধ্যান ছন্দের নিঃশ্বাস।

১২। প্রঃ—বিদেহ যোগ কি ?

উঃ—দেহ থেকে আত্মা আলাদা নিত্য ভাবতে ভাবতে এবং সহস্রার ছাড়িয়ে অর্থাৎ শরীরের উর্দ্ধে ধ্যান করতে করতে একটা অবস্থা আসে, যখন দেহটাকে ফেলে রেখে দিয়ে যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। বিদেহ যোগ হলে দেখবে শরীর দূরে পড়ে আছে।

১৩। প্রঃ—সুরযোগ কি ?

উঃ—গানের সুরে সুরে আপনাকে তাঁর চরণে লীলায়িত করাকে বলে সুরযোগ। সুরশিল্পীদের এতে সুবিধা হয়।

১৪। প্রঃ—ছন্দযোগ কি ?

উঃ—নৃত্যের দ্বারা ঠাকুরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। যারা নৃত্য ভালবাসে তারা এটি করতে পারে।

১৫। প্রঃ—শ্রীযোগ কি ?

উঃ—নিজেকে সুন্দর রূপে ফুটিয়ে তুলে চির-সুন্দরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া শ্রীযোগ।

১৬। প্রঃ—সর্ব্বযোগ কি ?

উঃ—সকলের ভিতর ঈশ্বর আছেন জেনে সকলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া, এর নাম সর্ব্বযোগ।

১৭। প্রঃ—অসীমকে আমরা কেমন করে ধারণা করি ?

উঃ—একদল (ডেকার্ট ইত্যাদি) বলছেন অসীম সত্ত্বা আমাদের ভেতরই আছেন। আর একদল (লক প্রভৃতি) বলছেন এই বাইরের জগৎ দেখেই

আমরা অসীম সত্তাকে ধারণা করি। আমার মনে হয় দুই-ই সত্য। জীবের ভেতরের আত্মস্বরূপ জীবকে বাইরের দিকে ঠেলছে আর বাইরে ভূমা-সত্তা রয়েছেন তিনি অদৃশ্য হাতছানি দিয়ে ডাকছেন অর্থাৎ ভিতরের সসীম ঠাকুর জীবকে ঠেলছেন অসীমে মিলবার জন্য আর বাইরের বিরাট অসীম সত্তা জীবকে ডাকছেন আয় বলে। জীবের ভিতরে আত্যন্তিক একটা ক্রন্দন আছে অসীমকে জানবার জন্য, তাঁতে মিলবার জন্য।

১৮। প্রঃ—মানুষকে কি জানা যায় মানুষের মধ্যে দিয়েই ? না ভগবানকে জানলে তবে জানা যাবে ?

উঃ—দেখ, আমি বলি একটা ক্ষুদ্র তৃণকে যদি পূর্ণভাবে ঠিক ঠিক জানতে পারা যায় তাহলে ভগবানকেও জানতে পারা যায়।

১৯। প্রঃ—বৈজ্ঞানিকেরা ত কত জিনিষ জানছে, তারা কি ভগবানকে জানতে পারছে ?

উঃ—তারা কিছুকেই ঠিক জানছে না। আমরা প্রায়ই কিছুকে পূর্ণভাবে জানতে পারি না। যাকে জানছি তাকে আংশিক ভাবে জানছি ; আর বাসনা নিয়ে জানছি, যেমন অর্থ, মান, যশ এই সব বাসনা। পূর্ণভাবে জানলে ভগবানকে জানা যাবে। তাই আমার মনে হয় দুই সত্য ; মানুষের মধ্য দিয়ে মানুষকেও জানা যায় আবার ভগবানকেও জানা যায়। আর ভগবানকে জানলে তো সব জানা যাবেই।

২০। প্রঃ—তিনটি মতবাদ আছে—একটি বার্গশ'র Elan vital—এ মতে অনন্ত গতি আর একটি হেগেলের absolute বা অদ্বৈত। এমতে সমস্তই অদ্বৈত সত্তায় বিধৃত। আর ক্রোচের 'চক্রাকারে অগ্রগতি' (Recurrence of cycles)। কোন্‌টি সত্য ?

উঃ—তিনটিই সত্য। যার প্রসারশীল মন সে দেখছে অনন্ত ভাবে সব এগিয়ে চলছে—এটি অনন্ত অগ্রগতি। আর যার স্থিতিশীল মন সে দেখছে যে ঠাকুরের চরণেই ত সব বিধৃত হয়ে আছে, এটি অনন্ত বিধৃতি। আর যে এই দুইয়ের মধ্যে আছে সে বলছে গতির আকার চক্রাকারে অর্থাৎ গতি-স্থিতির মধ্যের অবস্থা। ঠাকুরের দিকে দেখলে সবই স্থিতি, আমাদের দিক থেকে সবই গতি আর দুই দিক থেকে তার মাঝেই গতি-স্থিতি। আসলে তিনটিই একেরি

প্রকাশ, সবাই নিজের নিজের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখছে। প্রাগ্‌মাটিকেরা অনেকটা এইরকম বলে, কিন্তু তারা সব মতের সামঞ্জস্য করতে পারেনি।

২১। প্রঃ—ব্রহ্ম কি চির স্থির ?

উঃ—আমার একটী জিনিষ মনে হচ্ছে যে, ব্রহ্ম নিত্য এগিয়ে চলেছেন, নিজের ভেতর নিজে এগিয়ে চলেছেন। কারণ জীব যদি নিত্য এগিয়ে চলেছে তবে জীবের স্রষ্টা কেন এগিয়ে যাবেন না ? কারণ তাঁর ভিতর যা নেই তা তাঁর সৃষ্ট জীবের ভিতর থাকবে কেমন করে ?

২২। প্রঃ—কার্য্য ও কারণ কোন্‌টি আগে ?

উঃ—আধ্যাত্মিক জগতে চিন্তা এবং কার্য্য বা Thought and action এক সঙ্গে।

২৩। প্রঃ—ব্রহ্ম আগে চিন্তা করেছেন, তবে ত সৃষ্টি হয়েছে ?

উঃ—তাহলে ব্রহ্মকে ছোট করা হয়। বিরাট ব্রহ্ম মনে যে মুহূর্ত্তে চিন্তা হলো সেই মুহূর্ত্তে সৃষ্টি হলো। তবে ব্যবহারিক ভাবে কোন্‌টা আগে কোন্‌টা পরে। কখনও চিন্তা আগে কার্য্য পরে, কখনও কার্য্য আগে চিন্তা পরে; ঠিক বলা যায় না।

২৪। প্রঃ—আকাশ কয় প্রকার ?

উঃ—এদের (বেদান্তের) আকাশ অনেকগুলি—একটি মহাকাশ অর্থাৎ এই আকাশ (যা আমরা দেখছি), একটি চিত্তাকাশ (মেণ্টাল) আর চিদাকাশ, (স্পিরিচুয়্যাল)। আমার কিন্তু আরও দু' একটি আকাশের কথা মনে হচ্ছে—একটি দিব্যাকাশ, আর একটি লীলকোশ। অর্থাৎ এই জগতে থেকে এক একজন মানুষ হয়তো উচ্চস্তরে মনকে তুলে রেখেছেন, ঠাকুরময় হয়ে আছেন। সেই ঠাকুরময় আকাশটি দিব্যাকাশ। আর লীলাকাশটি আলাদা—সেটিতে অবতারাদি থাকতে পারেন। সাধারণ মানুষ অত উচ্চে উঠতে পারে না। রামকৃষ্ণলোক লীলাকাশের মধ্যমণি।

২৫। প্রঃ—মনকে উর্দ্ধমুখী কি করে করা যায় ?

উঃ—দেখ, যদি সব জিনিষের উঁচুতে উঠতে চাও তবে বিষয়ের ঢেউএর সঙ্গে যুদ্ধ না করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দাও। সব জিনিষের মধ্যে ঠাকুরকে দেখতে চেষ্টা করো। ঝগড়া, গোলমাল, হিজিবিজি সবেরি মধ্যে জানবে ঠাকুর আছেন।

আর যা কিছু উঁচু জিনিষ, যা কিছু ভাল জিনিষ, যা কিছু সত্য, শিব, সুন্দর তাতেই মন রেখে দাও।

২৬। প্রঃ—অভ্যাস সব সময় কেমন করে রাখা যায় ?

উঃ— নিয়ত অভ্যাস করে যাচ্ছো এ একরকম আবার অভ্যাস যোগ বজায় রেখে নানা গোলমালের মধ্যে তাকে ফেলে দিতে হয়, অভ্যাসটাকে স্থির রাখবার জন্য। ধর ফুটবল খেলতে গিয়েছো—ঠাকুরকে দলে নিয়ে খেলবে, পড়ছো—ঠাকুরকে সামনে রেখে পড়বে, ঠাকুরকে শোনাচ্ছি মনে করে। ক্রিকেট খেলছো—মনে মনে তাঁকে সঙ্গী করে নেবে, বেড়াতে যাচ্ছো, মনে মনে সেখানেও তাঁকে সঙ্গী করে নেবে। তাহ'লে গোলমালেও আর অভ্যাসের বিচ্যুতি হবে না, জোর বাড়বে।

২৭। প্রঃ - সর্ব্বদা আমাদের কি চেষ্টা করা উচিত ?

উঃ—সর্ব্বরূপে তাঁর প্রিয় হবার চেষ্টা করবে।

২৮। প্রঃ—জীবের যদি প্রেমাভক্তি না হয়—আর প্রেমাভক্তি না হলে যদি ঈশ্বর লাভ না হয়, তবে জীবের কি ঈশ্বর লাভ হবে না ?

উঃ—প্রেম, ভক্তি বা ভালবাসা সকলেরই আছে। এটা ঠাকুরেরই দেওয়া, যেমন কুঁকুরের প্রভু-ভক্তি। প্রেম ভক্তি সমস্ত কিছুর ভিতরেই আছে, তবে যেখানে অভাবনীয় ভাবে জমাট বেঁধে আছে তার নাম প্রেমাভক্তি। এটা ঈশ্বরকোটীর হয়। এটি জীবের হয় না।

২৯। প্রঃ—সকলের ভিতর যে প্রেম ভক্তি আছে তার দ্বারা তাহ'লে ভগবৎ লাভ হবে ?

উঃ—হ্যাঁ। এই প্রেম ভক্তি যার যতটুকু আছে ষোল আনা দিতে হবে।

৩০। প্রঃ—আচ্ছা কার দায় ? আমাদের না তাঁর ?

উঃ—তাঁরি দায়—মা যখন প্রসব করেছেন, সৃষ্টি করেছেন, তখন দায় তাঁরি বেশী। দেখ, সব সময় ভগবান ব্যাকুল হয়ে থাকেন ভক্তকে টানবার জন্য। আবার আমাদের দায়, কারণ আমাদেরও ত' তাঁকে না হলে পিপাসা মিটবে না। প্রাণ বাঁচে না। নদী ত' সাগরে না গেলে বাঁচবে না।

৩১। প্রঃ—ভক্ত ও ভগবান, কে বড় ? যেমন সমুদ্র আর ঢেউ, সমুদ্রকেই ত আমরা বড় বলি।

উঃ—কিন্তু ঢেউ নিয়েই ত' সমুদ্র। আমি বলি বাপু, সমুদ্রকে যদি শুধানো যায়, তাহলে সে বলবে আমার এই তরঙ্গ এই ফেনায়িত বীচিমালাই সত্য, এই নিয়েই আমার বিস্তার। তেমনি ভগবান বলবেন ভক্ত আমার চেয়েও বড় এবং সত্য, আর ভক্ত বলবেন ভগবানই একমাত্র সত্য।

৩২। প্রঃ—তাঁর কাছে কি উঁচু নীচুর প্রভেদ আছে ?

উঃ—দেখ, হিমালয় পাহাড়ের কাছে আমাদের ভারতের কুঁড়ে ঘর আর আমেরিকার সবচেয়ে উচু বাড়ী—সব প্রায় সমান। তেমনি তাঁর কাছে বহু দিন তপস্যা করে খানিক এগোনো ও একজন মহাপাপী যে পিছিয়ে আছে এ প্রায় সমান। তবে যারা তপস্যা করছে তাদের একটা আকুতি আছে, সেই আকুতিটি তাঁর প্রিয়। কাজেই সুবিধা হয়ে যায়। জলের তৃষ্ণাটা থাকলে জল পাবার সুবিধা হয়ে যায়, আর পেলেও ভাল লাগে। তপস্যার প্রয়োজন আছে। যতক্ষণ তিনি ভক্তের ভগবান ততক্ষণ তিনি আমাদের প্রার্থনা শোনেন। 'তবে কৃপাই প্রধান।

৩৩। প্রঃ—আজকালকার লোক এত নিম্নমুখ কেন ?

উঃ—কি জান, মহাকালের চাকা ওই ধারেই ঘুরছে। এখন ওই চলবে। যেমন ধরো, মাঠে যে পথে বহু লোক চলে সেই পথটিই সুস্পষ্ট হয়। সেই রকম আগেকার ধর্ম্মের পথ আজকাল মুছে যাচ্ছে। এখনকার মাপকাঠিতে একে অধর্ম্ম বলবে না। এখনকার লোক বলবে, এ নোতুন ধর্ম্ম—বিশ্বধর্ম্ম, মানবতার ধর্ম্ম। এর পিছনে প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিগত সুখবাদ। তোমরা খুব নাম করে যাও।

৩৪। প্রঃ—আমরা উন্নতি করছি না অবনতি করছি ?

উঃ—তাঁর দিক থেকে দেখলে আমরা তাঁর হাতের দাবাবোড়ের ছক। একটি বিরাট লীলা। উন্নতি অবনতির কোন কথা আসে না। আর আমাদের দিক থেকে দেখলেও উন্নতি অবনতির নিরিখ করা যায় না। সব সময়ের জন্য, সব স্থানের জন্য, সব লোকের জন্য উন্নতি অবনতির একটা মাপকাঠি নেই। আমরা কোন বিষয়ে এগোচ্ছি, কোন বিষয়ে পেছোচ্ছি। এই মাপকাঠি পালটে যাচ্ছে। বৈদিক যুগে ধর্ম্মের এক মাপকাঠি ছিল এখন ধর্ম্মের মাপকাঠি অন্য হয়েছে। কতকগুলো বিষয়ে মাপকাঠি করাই যায় না। যেমন যুদ্ধ করা—কেউ বলবে ভাল, কেউ বলবে খারাপ।

৩৫। প্রঃ—কি করলে জগতের ঠিক কল্যাণ হয় ?

উঃ—সৎ অসতের মাপকাঠি ত ঠিক করে কিছু বলা যায় না। এ যদি ছেড়ে দেওয়া যায় তাহলেও যদি স্বার্থহীন প্রাণ থেকে কোন স্পন্দন ছাড়া যায় তাহ'লে তাতেই জগতের কল্যাণ হবে। আর সেই স্পন্দন চারিদিক থেকে আরও similar waves পাবে এবং multiply করবে। আর তাতেই এগিয়ে নিয়ে যাবে। তাই জগতের কল্যাণের জন্য নিঃসার্থ স্পন্দনের সৃষ্টি করতে হয়।

৩৬। প্রঃ—তিনি ত' এক, তবে সৃষ্টির এত বৈচিত্র্য কেন ?

উঃ—সব জিনিষই দূর থেকে, উঁচু থেকে সমান লাগে, তার মধ্যে অসমতা আছে বলে বোধ হয় না। তেমনি ব্রহ্মকে যখন সৃষ্টি হতে দূরে রাখি, তখন তাঁর মধ্যে বিসমতা আছে বলে বোধ হয় না। কিন্তু যত তিনি নিকট হন সগুণ ব্রহ্ম, চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, জীব, জগৎ ইত্যাদি রূপে ততই তাঁর লীলা-বৈচিত্র্য ধরা পড়ে।

৩৭। প্রঃ—ভাববাদ আর বস্তুবাদ এই দুটি মতবাদের মধ্যে কোনটি সত্য ?

উঃ—দুটিই সত্য—সূক্ষ্মে যা ভাব, স্থূলে তাই বস্তু। সূক্ষ্মে যিনি সগুণ ব্রহ্ম—তিনিই স্থূলে চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, জীব, জগৎ হয়েছেন।

৩৮। প্রঃ—ধর্ম্ম বা পূজাদির সৃষ্টি কি ভয় থেকেই ?

উঃ—ধর্ম্ম বা পূজাদির আদি সৃষ্টি লীলা থেকে, আনন্দ থেকে, প্রেম থেকে। ঠাকুর যখন নিজেকেও ভুলে ছিলেন তখন সৃষ্টি ছিল না। কিন্তু যেই নিজের প্রতি দৃষ্টি এল তখন আত্মরতি এল—নিজের প্রতি প্রেম এল। তখন লীলার আনন্দে ভরপুর হয়ে সৃষ্টি করলেন, নিজেকে বিলসিত করলেন। এই যে ব্রহ্মের নিজের প্রতি প্রীতি এটি ঘটে ঘটে বিরাজিত। প্রত্যেকেই নিজেকে খুব ভালবাসে। এই ভালবাসাই হচ্ছে সৃষ্টির মূল। আমরা নিজেকে ভালবাসি বলেই ভয় পাই, অসহায় বোধ করি, নিজেদের রক্ষা করবার জন্য উচ্চশক্তির আশ্রয় নিতে দৌড়োই। পাশ্চাত্ত্য মতে এগুলি থেকেই ধর্ম্মের উদ্ভব। আবার আমরা নিজেদের ভালবাসি বলেই মানুষকে ভালবাসি—দেবতাকে, ঠাকুরকে ভালবাসি।

৩৯। প্রঃ—সকাল সন্ধ্যায় মানুষের মনে একটা ধর্ম্মভাব কেন জাগে ? আর ঐ দুটি সময় তাঁকে ডাকার প্রশস্ত সময় কেন ?

উঃ—মনোবিজ্ঞান অনুসারে বলা যায়, সন্ধ্যাবেলা মানুষের মনে হঠাৎ দিনের আলো নিভে যাওয়াতে ভয়ের সৃষ্টি হতো সেই আদিম যুগে। তখন তারা একটি উচ্চশক্তির কাছে শরণ নিতে চাইতো। আর সন্ধ্যাবেলা কাজের শেষ হয়ে যায়, কাজেই সন্ধ্যাবেলা, সারাদিন কর্ম্মচঞ্চলতার পর সেই অবসাদের সময়, আর কি করবে—তারা পরলোকগত আত্মাদের চিন্তাই করতো। সেইটিই মনের সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে। আর সন্ধ্যাবেলা প্রকৃতির এই দীপ্তিহীন শান্তভাবের সঙ্গে জড়িয়ে মনও বাধ্য হয়ে শান্ত হতো। আর সকালবেলা রাত্রির অন্ধকারের পর আলোর উৎসারে মনে আপনিই আনন্দের ভাব, ধর্মের ভাব জেগে ওঠে, যেমন পাখীর বুকে জেগে ওঠে গান। বৈদিক ঋষিদের কণ্ঠেও আপনি ফুটে উঠেছিল "আয়া হি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনী।"

৪০। প্রঃ—শাস্ত্র কি এমনি পড়লেই হয়?

উঃ—শাস্ত্র সব গুরু মুখে শ্রবণ করতে হয়, এমনি পড়লে কাজ হয় না।

৪১। প্রঃ—ভাল জায়গায় ভাল চিন্তা আর মন্দ জায়গায় মন্দ চিন্তা আসে কেন?

উঃ—যেখানে চিৎবিদ্যুতিনের যে রকম খেলা হয় সেখানে গেলে মনের অবস্থা সেই রকম হয়। যেমন, যেখানে অবতারপুরুষ বা সাধুপুরুষরা থাকেন সেখানকার চিৎবিদ্যুতিন সৎভাবে প্রকাশিত। সেখানে গেলেই মন আপনি অন্যরকম হয়ে যায়। আবার যদি বায়স্কোপ, টকিতে যাও তখন আবার মন অন্যরকম হয়ে যায়। সেখানে যারা ওই সব করে তাদের শরীরে চিৎবিদ্যুতিনে ওখানকার আবহাওয়া charged হয়ে থাকে। চিৎবিদ্যুতিনের একটা আকর্ষণ আছে—সৎ চিৎবিদ্যুতিন সৎকে আকর্ষণ করে।

৪২। প্রঃ—চিৎবিদ্যুতিন কি?

উঃ—ইলেকট্রন প্রোটন যেমন জড়রাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ তেমনি চিৎবিদ্যুতিন হচ্ছে চেতন রাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। এগুলি আমাদের সকলেরই আত্মা থেকে অল্পবিস্তর বর্ষিত হয়।

৪৩। প্রঃ—আচ্ছা সাধু মহাপুরুষদের মূর্ত্তি দেখলেই কেন মাথা নত হয়, ভাল লাগে?

উঃ—কি জান? প্রথম হচ্ছে তোমার চিৎবিদ্যুতিন সৎভাবে প্রকাশিত, সেইজন্য কোন সাধুর সৎমূর্ত্তি দেখলেই তোমার ওই রকম হয়। আর একটা

হচ্ছে কোন সাধুর যখন ছবি তোলা হয় সেই ছবির সঙ্গে সাধুর শরীর থেকে যে দিব্য তপস্যা-প্রসূত চিৎবিদ্যুতিন বেরোয় সেটাও ওই সঙ্গে থেকে যায়। তবে ছবিটা দেখা যায়—আর ওই চিৎবিদ্যুতিন দেখতে পাই না। সেইজন্য তুমি যখন সাধুর ছবি দেখ তখন সেই সাধুর অঙ্গের চিৎবিদ্যুতিন এবং তোমার চিৎবিদ্যু-তিনে একটা মিতালি হয় বলে অত ভাল লাগে।

আর একটা আছে যে, সৎ জিনিষ, সুন্দর জিনিষ সকলেরই ভাল লাগে, সেটা Social standpoint অনুসারে। যেমন, সমাজে সুন্দর জিনিষ সকলেরই ভাল লাগে, সকলেরই চিত্তাকর্ষণ করে। কিন্তু নর্দ্দমাকে কেউ ভাল বলে না। সেই হিসাবে আমাদের মনে আগে থাকতেই কতকগুলি সৎসুন্দরের একটি ছাঁচ থাকে—যেমন, সবারি আকাশ ভাল লাগে, ফুল ভাল লাগে।

৪৪। প্রঃ—ভাল মন্দের নিরিখ কি ?

উঃ—সৃষ্টিতে একটাই আছে, সবই ভাল। চোর যখন চুরি করছে তার স্থান কাল পাত্রে সে ঠিকই করছে, কিন্তু অন্য স্থান কাল পাত্রে তা মন্দ হয়ে যায়। ভগবানের রাজ্যে মন্দ কিছুই নাই। এ কিন্তু এক দিক দিয়ে। আর একটা আছে—সগুণ ব্রহ্মের সিসৃক্ষা যাতে ধৃত হয় তাই সৎ।

৪৫। প্রঃ—পরলোকে কার কি গতি হবে ?

উঃ—পরকাল সূক্ষ্মের রাজত্ব, কাজেই যাদের স্থূল মন তারা পরকালে গিয়ে শান্তি পায় না। কিন্তু যারা ধ্যান জপাদি দ্বারা মনের সূক্ষ্মতা অর্জন করছে তারা পরকালে কতকটা সুবিধা করতে পারে। ইন্দ্রিয়জ ভোগ করে করে আমরা ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছি, মন হয়ে গেছে ভারি—পরকালে তাই অস্বস্তি হয়। ধ্যানজপাদি করে এই মনকে করতে হবে সূক্ষ্ম।

৪৬। প্রঃ—পরলোক থেকেই আত্মা মুক্তিলাভ করতে পারে না কেন ?

উঃ—আমার মনে হয় কি জান ? দেহ ও আত্মা বা সৃষ্টি ও আত্মার মধ্যে একটা নিবিড় সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে। এইজন্য আমরা নিয়তই দেখতে পাচ্ছি, জীবাত্মা চলে যাওয়ার পর দেহ আর বেশীক্ষণ ঠিক থাকে না। আর জীবাত্মাও দেহবিহীন হয়ে কোন তপস্যাদি করতে পারে না। বাসনা নিয়ে আর কর্ম্মফল অনুসারে, নূতন দেহ গ্রহণ করবার জন্য ঘুরে বেড়ায় আর তার ফল গ্রহণ করেও। যেমন, ভগবান তাঁর সৃষ্টি ছাড়া থাকতে পারেন না। ভগবান আর তাঁর এই সৃষ্টির সঙ্গে একটা নিত্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। তেমনি দেহ ছাড়া আত্মা বেশীদিন

থাকতে পারে না। এগুলি ভোগ-বাসনা জড়িত মনের। অর্থাৎ স্থূল মনের স্থূল দেহ দরকার, সূক্ষ্মমনের সূক্ষ্মদেহেই কাজ হয়। এসব মনকে আর আসতে হয় না। ক্রমমুক্তি এদের হবে।

৪৭। প্রঃ—বিধির নিয়ম অখণ্ডনীয়—কিন্তু তিনি নিজে কাটতে পারেন কিনা ?

উঃ—তিনি যদি সব বিধি কাটেন তাহ'লে সব গোলমাল লেগে যাবে। যেমন গভর্ণরের নিয়ম, তিনি একটা লিখে দিলেন—সেটা কি তিনি কাটতে পারেন না, তা নয়—কিন্তু সহজে কাটেন না। তেমনি ঠাকুর কাটতে পারেন, কিন্তু নিজে ইচ্ছা করেই সব কাটেন না। এটা তাঁরই আইন কিনা তাই এতটা জোর দিচ্ছি।

৪৮। পুরুষকার আর দৈব কোন্‌টি বড় ?

উঃ—আসলে একটি বস্তুই আছে, তাকে পুরুষকার বলতেও পার আবার দৈব বলতেও পার। দৈব অর্থাৎ সব ঠাকুরের দেওয়া আছে, সব ঠিক করা আছে এই তো ? এখন যদি পুরুষোত্তমের দিকে তাকাও তাহ'লে দেখবে সবই দৈব—সব তিনি ঠিক করে রেখেছেন আর কিছু করবার নাই। আবার তিনি স্বাধীন "পুরুষং-মহান্তম্।" তাঁর স্বাধীন ইচ্ছা ত' আছেই, কেউ বাধা দিতে পারে না। আবার সৃষ্টির দিকে তাকাও—দেখবে ঘটে ঘটে তিনিই আছেন। কাজেই এখানেও তিনি সব ঠিক করে রেখেছেন—এও সত্য। এখানেও দৈব পুরুষকার এক।

৪৯। প্রঃ—ভক্তের মনের এত অবস্থা পালটায় কেন ?

উঃ—তাঁর লীলার মাঝে নানা রকম অবস্থা আছে। ভক্তেরও তাই সব সময় এক রকম অবস্থা থাকে না জোয়ার-ভাটা, হাসি-কান্না। কিন্তু ব্রহ্মের মাঝে এক।

৫০। প্রঃ—সাধারণভাবে সবারি কি প্রার্থনা করা উচিত ?

উঃ—আমরা যেন ভাল হয়ে চলতে পারি, তোমার চরণে যেন ফুলের মত ফুটে থাকতে পারি, ঠিক ঠিক তোমার ছেলেমেয়ে হতে পারি—আর আমাদের কল্যাণ কর, আমাদের গৃহের কল্যাণ কর—দেশের কল্যাণ কর—জগতের কল্যাণ কর। সকলের কল্যাণ প্রার্থনা করবে।

৫১। প্রঃ—ঠাকুরকে পাবার সহজ উপায় কি ?

উঃ—নিত্য ঠাকুরের সঙ্গ করতে চেষ্টা কর। চারিদিকে ঠাকুরের মূর্ত্তি রেখে, তাঁর নাম অঙ্গে লিখে, তাঁর মূর্ত্তি বুকে মাথায় রেখে—যেমন করে হোক তাঁর সঙ্গ করতে চেষ্টা কর। তাঁর কথা নিত্য সঙ্গী হোক্। এক কথায় কায়মনোবাক্যে তাঁকে রাখো।

৫২। প্রঃ—এ যুগের কথা কি ?

উঃ—এ যুগের কথা পবিত্রতা। পবিত্রতা লাভ করলেই সব হবে।

৫৩। প্রঃ—এ যুগে মানবের স্বধর্ম্ম—যুগধর্ম্ম কি ?

উঃ—যুগাবতারের শরণাগতিই যুগধর্ম্ম, যুগমানবের স্বধর্ম্ম।

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণম্।

বেদছন্দা
(দ্বিতীয় পর্ব্ব)

প্রথম কথা

শ্রীঠাকুরের কথা, "মনেতেই বদ্ধ, মনেতেই মুক্ত—মন নিয়েই কথা, ভগবান মন দেখেন.... তাই আগে দরকার চিত্তশুদ্ধি .... চিত্তশুদ্ধি হলে ভগবান পবিত্র আসনে এসে বসবেন......শুদ্ধ মন, শুদ্ধ বুদ্ধি, শুদ্ধ আত্মা এক—কেননা তিনি বই শুদ্ধ আর কেউ নাই।" শ্রীঠাকুর আরো বলেছেন, যিনি অবাঙ্‌মনসোগোচর... "তিনি শুদ্ধ মনের গোচর"—বিষয়াসক্ত মনের গোচর তিনি নন।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

স্মরণাতীত কাল থেকে তাই শুদ্ধ মনের সাধন সাধনার ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয়স্থান অধিকার করে আছে। শাস্ত্র, সিদ্ধপুরুষ, আধিকারিকপুরুষ, অবতারপুরুষ, দেশ কাল পাত্রের উপযোগী করে এই সাধনের বহু শিক্ষাই দিয়ে আসছেন পরমার্থচিন্তার আদিম ঊষা হতে। আজও সে অমৃতধারা বেগবতী। জগজ্জননী আদ্যাশক্তির অবিদ্যামায়া—বিদ্যামায়ার দ্বন্দ্ব লীলাময়ী মা'র এক অপূর্ব্ব আত্মক্রীড়া।

এই মনস্তত্ত্ব মানুষের চিন্তাশক্তির বিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজ ব্যাপক ও বিরাট হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর মনোবিজ্ঞান নানা শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ। মনোরহস্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস আজ বহুরূপী, বহুমুখী, বহুব্যাপী। শুধু ধর্ম্মের ক্ষেত্রে নয়, মনোগতির প্রহেলিকা নিরসন হলে নীতি, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য, সমাজ—সর্বক্ষেত্রে উন্নতির পথে বাধা ও বিঘ্নাগমের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক মানুষের কাছে প্রকাশ হবে—মনস্তত্ত্বান্বেষীরা এই আশা পোষণ করেন।

কিন্তু মানবের আত্যন্তিক কল্যাণ কোন্ পথে? কোন্ পথে সৃষ্টির সুষমা মনোহর মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করবে—দেশে দেশে, সমাজে সমাজে সমন্বয় সাধিত হয়ে বৈষম্য দূরে যাবে, কল্যাণ-শ্রীতে ধরিত্রী সমৃদ্ধ হবে? এ প্রশ্ন চিরন্তন হলেও সর্বকালে মানবমঙ্গলের মরমী সাধকগণ সত্য-শিব-সুন্দরের সেবাই এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট পন্থা নির্দ্দেশ করেছেন।

যুগ-ঈশ্বর শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় সব দেশের সব শ্রেণীর সবজাতির সব সমাজের লোকের কল্যাণ-চিন্তা বহু রাষ্ট্রনেতা, সমাজসেবী, চিন্তাবীর আজ কমবেশী সমষ্টির দৃষ্টি-কোণ থেকে করছেন। এঁদের কেউ কেউ একমাত্র নৈতিক চেতনার উপর বিশ্বাস স্থাপনা করে তাঁদের চেষ্টা কেন্দ্রীভূত করলেও বেশী সংখ্যক ব্যক্তি ভগবৎ-

কৃপাই সকল কল্যাণের উৎস একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করছেন। Hydrogen bomb, Atom bomb, Communism, Imperialism, Barbarism, Animalism—এসব থেকে রক্ষা পেতে Divinismই একমাত্র মার্গ ·· নান্যপন্থাবিদ্যতে আয়নায়।

তাই এই পৃথিবীর বুকে লোকোত্তর এমন মহাপুরুষও আছেন যাঁরা মানবের যা কিছু আবিষ্কার ভোগদ্বারকেই প্রশস্ত করে দিচ্ছে তাদের মোড় ফিরিয়ে দিয়ে ভগবৎমুখী করতে তিলে তিলে আত্মদান করছেন তপস্যার তুষানলে—শুধু তাই নয়, ব্যবহারিকভাবে মনোবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের নবতম তথ্যগুলিকে কার্য্যক্ষেত্রে ধর্ম্মজীবন গঠনে প্রয়োগের প্রয়াস পাচ্ছেন।

বর্ত্তমান পুস্তিকা এরই নিদর্শন। মনের স্বল্পপ্রকাশ, অপ্রকাশ, ক্রমপ্রকাশমান প্রভৃতি বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে বিংশ শতাব্দীর Functional, Structural, Associationistic, Behaviouristic, Holistic, Hormic, Individual (Adler), Analytical (Jung), Gestalt Psychology, Freudএর Psychoanalysis-এর আধুনিকতম সিদ্ধান্ত-সহায়ে এক এবং অদ্বিতীয় চৈতন্য বস্তুর আবরণ উন্মোচনের, দিব্য জীবন গঠনের উপযোগী সম্পূর্ণ মৌলিক সাধন-সিদ্ধান্ত এই পুস্তিকায় প্রকাশ পেয়েছে।

সংঘগুরু শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের এই মহাবাণীর কতকগুলি সূত্রাকারে পূর্ব্বে সংঘের মুখপত্র 'ভাবমুখে'তে প্রকাশিত হয়েছিল। অনুসন্ধিৎসু সাধকদের সেবা-পরিপ্রশ্ন-পথে উত্তর দান কালে সূত্রগুলির মর্ম্মার্থ এবং সাধনক্রম শ্রীগুরুদেবই ব্যক্ত করেন। শ্রীঅর্চ্চনাপুরী কর্ত্তৃক অনুলিখিত সসূত্র সেই-সবই বেদছন্দা—দ্বিতীয় পর্ব্বে, প্রকাশিত হ'ল।

Power-Politics আছে—মানব জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও Power Programme নেওয়া হচ্ছে। ধর্ম্মেই সাধনেই বা Power-Practice-এর স্থান হবেনা কেন——যাতে করে গড়ে উঠবে Power-religion, Power—Spiritualism—শক্তিমান জীবন্ত ধর্ম্ম? ভক্তির, জ্ঞানের, ইচ্ছার, কর্ম্মের প্রবল শক্তিতে মনের সব অশুভ সংস্কার সমূলে নাশ করতে হবে——এই রকম একটি আদর্শ এর পিছনে আছে, তারও পিছনে আছে শক্তিনিষ্ঠা ও বিশ্বাস——শ্রীশ্রীমা'র চরণে আদর্শ শরণাগতি।

বেদছন্দা

(১)

ইন্দ্রিয়ের অনুলোম-বিলোম সাধন

তিনিই মন বুদ্ধি অহংকার চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন

(শ্রীশ্রীঠাকুর)

তাই একাদশ ইন্দ্রিয় তাঁরি স্বরূপ.........

.........শুদ্ধ রূপে।

প্রার্থনা, নাম, ধ্যান, নিষ্কাম কর্ম্ম ইত্যাদি সহায়ে ইন্দ্রিয়দের শুদ্ধ করতে হবে, সূক্ষ্ম করতে হবে অনুলোম সাধনে.........

সেই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়দের আবার সূক্ষ্ম প্রকাশমুখে

আনতে হবে বিলোম সাধনে.........

এই ইন্দ্রিয়ে ভগবৎ-আস্বাদন হয়।

শ্রীঠাকুরের বাণী "তিনিই মন বুদ্ধি অহংকার চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন।" তাঁর এই স্থূল প্রকাশের পথ বিলোম মার্গে। কিন্তু এই যে মন বুদ্ধি অহং-এর প্রকাশ হয়েছে এর দ্বারা স্থূল ভোগই সম্ভব। কারণ স্থূল বাসনার বীজ নিয়েই তিনিই স্থূল রূপে প্রকাশিত হয়েছেন। আমরা যদি এই স্থূলত্ব ছেড়ে ভগবৎ-রস আস্বাদন করতে চাই তাহলে এই স্থূল ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুলোম মার্গের সাধনে, প্রার্থনা ধ্যান জপ সহায়ে, নিষ্কাম কর্ম্মের মধ্য দিয়ে, সূক্ষ্ম করে নিতে হবে—যথা ইন্দ্রিয়ের লয় হবে মনে, মনের লয় অহংকারে,—অহংকারের লয় বুদ্ধিতে এবং বুদ্ধির লয় হবে ভগবৎ-তত্ত্বে। কিন্তু সমস্ত লয় হলে আস্বাদ করবে কে আর কাকেই বা করবে? তাই আবার এই সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়গুলিকে ফিরিয়ে আনতে হবে তাদের শুদ্ধ প্রকাশমুখে। শুদ্ধ মন যখন শুধু বোধে বোধমাত্র ক'রে তৃপ্ত হয় না তখনই শুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ ভক্তের তৃপ্তির জন্য প্রয়োজন। তখন দৃঢ় ইচ্ছা সহায়ে মনকে হস্তাদিরূপে পুনঃপ্রকাশের চেষ্টা করতে হয়। প্রার্থনা নাম ধ্যান সহায়ে দৃঢ় ইচ্ছায় মনে শুদ্ধহস্তাদির পুনঃপ্রকাশ হয় ও ভগবৎ-অনুভূতির

আনন্দ লাভ হয়। সাধনকালে কিছু শুদ্ধতা যখন লাভ হয় তখন দূরদর্শন, দূর-শ্রবণ ইত্যাদি হয়ে থাকে এবং যোগীদের নানারূপ সিদ্ধাই এসে পড়ে। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে (ফ্রয়েড প্রভৃতির মতে) এই দূরদর্শনাদিকে অবচেতন মনের কার্য্য বলে এবং আরও বলে যে সমষ্টির অবচেতনা (ডাঃ জুঙ প্রভৃতির মতে) আমাদের ব্যক্তিগত অবচেতনায় মিশে আছে তাই এই সব ঘটনা কারো কারো মধ্যে প্রকাশিত হয়। কিন্তু সেগুলির প্রকাশের পথ প্রস্তুত হওয়া চাই—আবার তা পরিষ্কার থাকাও চাই। প্রাচ্য মন-যোগ-বিজ্ঞানে তার উপায়গুলিই পরীক্ষিত সাধনাঙ্গ, এক্সপেরিমেণ্টাল স্পিরিচুয়্যাল সাইকোলজী। এ পথে ভগবৎ-রস আস্বাদনের জন্য যে শুদ্ধ ইন্দ্রিয়াদি তৈরী হয় সে পথ, সে পথ পরিক্রমা, পথচারী প্রতীচির ঐসব সিদ্ধান্তের পারে।

(২)

মনের সমতা সাধন

তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।
তাই মনকে করতে হবে শুদ্ধ।
মনের অসাম্যের কারণ—
এর তিনটি বৃত্তি.........
অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছা।
মনোবিজ্ঞানের মতে ... ..
এদের সখ্য আছে, বৈরতা আছে।
এই সূত্রে.........
ভাগবত মুখে.........
এদের আনতে হবে.........
সমতায়.........শুদ্ধতায়.........
সেই শুদ্ধ মনই তিনি।

পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান অনুসারে মনের তিনটি বৃত্তি—চিন্তা, ইচ্ছা এবং অনুভূতি। এই বৃত্তি তিনটি মনের মাঝে সর্ব্বদাই একসঙ্গে অবস্থান করছে। এদিক দিয়ে দেখলে এদের মাঝে রয়েছে নিবিড় সখ্য। কিন্তু অপরদিকে আবার বৈরতাও আছে অর্থাৎ এরা কখনও তিনটি একসঙ্গে প্রবল থাকতে পারে না।

কখন চিন্তা হয় প্রবল কখনও ইচ্ছা হয় প্রবল, কখনও বা অনুভূতি হয় প্রবল। আবার একটি বৃত্তি যদি অতি প্রবল হয়ে ওঠে তখন আর দুটি হয়ে যায় ক্ষীণ। কিন্তু একেবারে মুছে কেউই যায় না। এই যে এদের মধ্যে সখ্য এবং বৈরতার খেলা চলেছে এতে আমাদের মনে আসছে অসাম্য। সাধন রাজ্যে মনকে আনতে হবে সাম্যে। তার উপায় প্রথম প্রথম আমাদের এই তিনটি বৃত্তির মধ্যে যে সখ্য আছে সেটি ভেঙে ফেলতে হবে। যেমন মনকে যে কোন একটি বৃত্তিতে স্থির রাখা। অর্থাৎ জ্ঞানী বা ভক্ত বা যোগী প্রথম প্রথম নিজের নিজের ভাব অনুসারে কেউ হয়তো ইচ্ছারূপ বৃত্তি দ্বারা মন স্থির রাখবেন এবং ঐ একটি বৃত্তি ছাড়া যাতে অন্য বৃত্তি না আসে সে বিষয়ে খুবই লক্ষ্য রাখবেন। যেমন কেউ হয়তো চিন্তারূপ বৃত্তির দ্বারা ভগবৎ চিন্তায় মনকে রেখেছেন স্থির করে—সেখানে হঠাৎ এসে দেখা দিল অনুভূতি বা ইচ্ছা। এই সময় এই বৃত্তিগুলিকে দমিত করবার চেষ্টা করতে হবে। ক্রমে ঐ একট বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে তখন এদের মাঝে যে বৈরতা আছে সেটিকেও ভেঙে ফেলতে হবে। কারণ সাম্য যেখানে, সেখানে বৈরতা সখ্য উভয়ই বর্জ্জনীয়। তখন সেই প্রতিষ্ঠিত বৃত্তির মধ্যে অপর দুটি বৃত্তিকে যুক্ত করে দিতে হবে। যেমন জ্ঞানী যিনি শুদ্ধ চিন্তা মাত্র নিয়ে পড়েছিলেন তিনি এই বৃত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে এনে যুক্ত করবেন অনুভূতিকে। অর্থাৎ চিন্তার বস্তুটিকে বোধ করতে চেষ্টা করবেন। তখন অনুভূতিই হয়ে যাবে চিন্তা-স্বরূপ। আবার ভক্ত যিনি কেবলমাত্র অনুভূতি নিয়ে পড়ে আছেন অর্থাৎ কেবলমাত্র ভজনাদিকেই মুখ্য বলে ধরে আছেন তিনিও এতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানে যুক্ত করবেন চিন্তাকে, ইচ্ছাকে। তাঁর প্রবল নাম ও ভজনের সমান তালে চলবে রূপচিন্তা এবং তাতে থাকবে প্রবল ইচ্ছা। এই ভাবে এখানেও সবেরই সম্মিলন ঘটবে। এবং যোগী যিনি প্রবল ইচ্ছাশক্তি সহায়ে একটি চক্রে ধারণা নিয়ে পড়ে আছেন তিনিও তাতে প্রতিষ্ঠিত হলে সেই ধারণার মাঝে আনবেন রূপচিন্তা এবং ক্রমে তাঁকে বোধ করার চেষ্টা করে অনুভূতি বৃত্তিকে এনে সেখানে যুক্ত করবেন। এই ভাবে আমরা যদি এই বৃত্তি-ত্রয়ের মূল স্বভাব দুটিকে ভেঙে ফেলতে পারি তা হলে আমাদের মনেও আসবে সমতা। এই সম-মনই শুদ্ধ-মন এবং এই শুদ্ধ-মনেই তিনি প্রকাশিত হন। এই শুদ্ধমনই তাঁর স্বরূপ। "যস্মিন বিশুদ্ধে বিভবত্যেষ আত্মা"। (মুণ্ডক ৩।১।৯)

যদিও এই কার্য্যগুলি কতক কতক সাধারণ ভাবে সাধকের হয়তো আপনিই এসে পড়ে তবু এগুলি কেন হয় জানা প্রয়োজন এবং এইরূপে মনোবিজ্ঞান সম্মত ভাবে নিজে চেষ্টা করে করলে সাধন রাজ্যে বেশী সুফল পাওয়া যাবে।

(৩)

সমন্বষ্টি

মন-দেহের যন্ত্রস্বরূপ যা কিছু
সমান ছন্দে চলে,
উদ্দেশ্য বিশেষে তাই হয়ে যায়
তার সঙ্গে অভেদ......
তাই অসমান ছন্দে চালিত সত্তাদের
সমছন্দে আনতে হবে, ভাগবত যন্ত্র হিসাবে···
তখন মন-দেহ-জগৎ হবে
এক ছন্দে ভগবৎ লাভের যন্ত্র···

মনোবিজ্ঞানে একটি মতবাদ (ষ্টাউট) আছে যে, কোন একটি যন্ত্র যথা একটি কলম—যতক্ষণ সেটি আমাদের মনের মতন কাজ দেয় ততক্ষণ সেটি আমাদের দেহ-মনের নিজস্ব হয়ে যায়। তার সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন থাকি না। কিন্তু যেই তার এই কাজ দেওয়ার বিচ্যুতি ঘটে অমনি আমাদের মন তার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে এবং সঙ্গে সঙ্গে আসে বিরক্তি। এমনকি ফেলে দিতেও ইচ্ছে করে। আবার যখন সাইকেল চড়ে বেড়াতে বেড়িয়েছি মনে তখন আনন্দ আসে—মনে হয় আমি বেশ বেড়াচ্ছি। কিন্তু যখন সেটি অচল হয়ে পড়ে তখন সাইকেলটারই কথা মনে বড় হয়ে উঠে। জগতে এমনি প্রতিটি জিনিষ যতক্ষণ আমার তালে তাল মিলিয়ে চলেছে ততক্ষণ আমি তার সঙ্গে যেন অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত থাকি। এতটুকু তাল কাটলেই ভাব যায় ভেঙে, মন হয়ে উঠে ক্ষুব্ধ। আমাদের এই ভাবটি ভেঙে ফেলতে হবে। যে যেমন (Stout Manual of Psychology p. 435) ছন্দে চলেছে চলুক, আমি আমার ছন্দে তাকে মিলিয়ে নেব এই হবে আমাদের সাধনা। কারণ, আমাদের জগৎটা হচ্ছে ভাবের জগৎ আজকালকার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ভাববাদে এসে পড়েছে (আইডিয়ালিষ্টিক্)।

এর ভাল-মন্দে কোন চিন্তাই স্থান দেব না, তা হলে জগতের সুখ দুঃখ আর আমাদের মনকে বিক্ষিপ্ত করতে পারবে না। এই উদাসীন মনে তখন সবই ভগবৎ-লাভের ছন্দে ছন্দিত হতে থাকবে এবং আমাদের এই দৃষ্টিভঙ্গীতে জগৎ ব্যাপারের সবকিছুই ভগবৎ-লাভের সহায়ক রূপে প্রতীয়মান হবে। তখনই উপনিষদের ঋষিদের মত বলতে পারব—সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম……শান্ত উপাসীত।
(ছাঃ ৩।১৪।১)

(৪)

অচঞ্চল মন-দেহ-জগৎ ব্রহ্ম

মনের চাঞ্চল্যে দেহ জগৎ—চঞ্চল
আবার দেহ জগতের চাঞ্চল্যে মনের চাঞ্চল্য…
অপরিণত মন সহজে দেহ জগতে প্রকাশিত হয়….
মনের পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে
তার প্রকাশ যায় কমে…
পূর্ণ পরিণত মন নিরুদ্ধ-প্রকাশ ··
এই নিরুদ্ধ-মনই ব্রহ্ম……

দেহের চঞ্চলতা মনে আঘাত ক'রে মনকে চঞ্চল করে এবং মনের চাঞ্চল্য মস্তিষ্ক কেন্দ্র হতে দেহে হয় প্রকাশিত—এইটি মনোবিজ্ঞানের মত—ইণ্টার-এক্সানিজম্। যেমন দৈহিক অসুস্থতায় মনে এনে দেয় অশান্তির চাঞ্চল্য এবং মনে যখন কোন বৃত্তির উদয় হয় যথা ক্রোধ—তখনই এটি দেহে প্রকাশিত না হয়ে পারে না। পশু এবং শিশুর মনে এটি সহজেই ঘটতে দেখা যায়। মনের এই বহিঃপ্রকাশগুলি যে মন যত অক্ষম যত অপরিণত সেই মনেরই তত বেশী হয়ে থাকে। আদিম মানবেরা ভাব গোপনে একান্ত অক্ষম ছিল। পরিণত ধীশক্তি সম্পন্ন শান্ত মনের বহিঃপ্রকাশ কমই হয়ে থাকে। যোগী ঋষিরা সর্বকালে ও সর্বদেশেই অপ্রকাশশীল। আবার বর্ত্তমান পদার্থ-বিজ্ঞান যে বিশ্বমনের কথা বলছেন তাও আমাদের মত মুখর নয়। হিন্দু দর্শনেও ব্রহ্ম লক্ষিত হয়েছেন মৌন নামে। মৌনং ইত্যাচক্ষতে (উপনিষদ্)। তাই আমাদের দেহমনকে চেষ্টা করে অচঞ্চল করতে হবে, দেহমনের পরস্পর পরস্পরের প্রতি চঞ্চল প্রতিক্রিয়া বন্ধ করতে হবে। তখন জগৎও অচঞ্চল রূপে প্রতিভাত হবে কারণ ভাবময় জগৎ সম্বন্ধে জ্ঞান বা প্রতীতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে।

স্থিত ধীর শান্ত সমাহিত দৃষ্টিতে মন-দেহ-জগৎ এক অখণ্ড শান্ত ব্রহ্মস্বরূপ। আর সেই পূর্ণ পরিণত অচঞ্চল শুদ্ধ দেহে-মনে-জগতে, এই সাধর্ম্ম্যের পথে, ব্রহ্মের প্রকাশ খুব সহজ হবে।

(৫)

অচেতনের চেতন

প্রকাশ-চৈতন্যকে অভিভূত করেছে
এক অপ্রকাশ-চৈতন্য...
একে কেউ বলছেন অবচেতন...
কেউ বলছেন সংস্কার...
কেউ বলছেন সহজাত প্রবৃত্তি...
এই অপ্রকাশ-চৈতন্যকে
প্রকাশ-চৈতন্যে পরিণত করতে হবে
সাধন সহায়ে...
তখনই আমাদের সত্ত্বা
এক অখণ্ড চৈতন্যরূপে প্রকাশিত হবে...।

আমাদের প্রত্যেক কর্ম্মের পিছনে খেলা করছে কয়েকটি শক্তি—তাঁরাই আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে, নিয়ন্ত্রিত করছে—তারাই আমাদের সমস্ত কর্ম্মের উৎস (springs of action)। কেউ বলেন অবচেতন মনই আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছে (ফ্রয়েড)। কেউ বলেন ইহা 'ড্রাইভ' অর্থাৎ অন্তর্নিহিত শক্তির খেলা (উড্ওয়ার্থ)। কেউ বলেন এটি সহজাত প্রবৃত্তি (ম্যাগডুগ্যাল)—আমাদের শাস্ত্র মতে ইহা ইহ-পরকালের সংস্কার। মনুষ্যত্ব লাভ করতে হলে এদের দমন করা, এদের মোড় ফিরিয়ে দেওয়া খুবই প্রয়োজন। প্রার্থনায় নামে ধ্যানে ব্রহ্মচর্য্যে মনঃশক্তিতে এদের জয় করতে হবে, কল্যাণমুখী করে তুলতে হবে। এবং সেইখানেই আমাদের মনুষ্যত্ব।

অবচেতনকে অবচেতনের দ্বারাই জয় করতে হবে। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক তুলে ফেলতে হয়। তাই স্বপ্ন, স্খলন, প্রবৃত্তি এই সব অবচেতনের প্রকাশগুলির জয় দ্বারাই অবচেতনকে জয় করতে হবে। এ বিষয়ে পারস্পরিকতা reciprocity দেখা যায়।

অবচেতনের কিছু প্রকাশ হয় স্বপ্নে, তন্দ্রায়। এই অবচেতনে ইড্ বা পশুত্বের বৃত্তি অনেকখানিই আছে। তারই কিছু কিছু স্বপ্নের মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা, নিদ্রার পূর্ব্বে সৎ চিন্তার দ্বারা জপাদির দ্বারা এর মোড় ফিরোবার চেষ্টা করতে হবে। এমন কি নিদ্রার ভেতরেও ইড্ বা পশুত্বকে জয় করতে শক্তিশালী ইগো বা সদসৎ বিচারকে প্রহরী স্বরূপ রেখে, জপ এবং ধ্যান জাগ্রত রেখে অবচেতনের কিছুটা করে তুলতে হবে চৈতন্যময়। এই অবচেতনের আর একটা দিক অখণ্ড স্মৃতি। পাশ্চাত্য দেশে হিপ্‌নটিসমের সহায়তায় অবচেতনে নিহিত অখণ্ড স্মৃতির উদ্ধারের বহু ঘটনা প্রকাশিত হয়েছে। আমাদের দেশেও দেখা যায় মহাপুরুষ বুদ্ধ প্রমুখ অবতারেরা পূর্ব্বজন্ম স্মরণে আনতে পারতেন। এরূপ ঘটনা আজও শুনা যায়। এঁদের অবচেতন বলে কিছু ছিল না বা থাকে না। এঁরা পূর্ণপ্রজ্ঞ। তাই অবচেতনকে জয় করতে হলে আমাদের স্মৃতিশক্তি করে তুলতে হবে অতি প্রখর। সেই প্রখর স্মৃতির উজ্জ্বল আলোক-পাতে আমরা দেখতে পাব অবচেতনে কি জমা হয়ে আছে। এতে জমা হয়ে থাকে দেহ মনের পূর্ব্বেকার ক্রিয়াকলাপের ছাপ বা দাগ বা চিহ্ন। পুনরুত্থিত হবার এদের একটি শক্তি আছে। তাকেই জয় করা বা মোড় ফেরান দরকার। কিন্তু অবচেতন মন চির অন্ধকারময় বলেই সেখানে একে জয় করা তো দূরের কথা এর ধরা ছোঁওয়াও পাই না। তাই তারা অবচেতনের অন্ধকার অবকাশ হতে তাদের সম্মোহন শক্তিতে হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন চেতনা বিলুপ্ত হয়। উজ্জ্বল স্মৃতি সহায়ে মনের দৃঢ়তা সহায়ে এই সম্মোহন শক্তির বিরুদ্ধে আমাদের চেতন সত্তা জাগ্রত রাখতে পারলে অবচেতনের উপর কিছু ক্ষমতা আসতে পারে। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানের মতে দূরদর্শন দূরশ্রবণ ইত্যাদি বিভূতি এই অবচেতনের শক্তিতেই প্রকাশিত হয়। এটি আমাদের যোগশাস্ত্রেও আছে। প্রথম প্রথম এগুলিরও সাধনা রাখতে হবে সাধকদের, শুধু অবচেতনকে চেতন করার উদ্দেশ্য নিয়েই।

তারপর সংস্কার—এই সংস্কারের মধ্যে মন্দ সংস্কার যেগুলি সেগুলিকে সৎ-সুন্দর সংস্কারের সৃষ্টি ক'রে মোড় ফিরিয়ে দিতে হবে বা মুছে ফেলতে হবে। পাতঞ্জলি এর জন্য সূত্র করেছেন, 'বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষ ভাবনম্' (সাধনপাদ ৩৩)। সহজাত প্রবৃত্তি হচ্ছে ভয়, লোভ, ক্রোধ ও ভালবাসা। কেউ কেউ বলেন এগুলি অবচেতন মনেরই বস্তু, কেউ বলেন এরা স্বপ্রধান। প্রথমতঃ ভয়

—মানুষ নিজেকে ভালবাসে বলেই সে নিজেকে চায় সর্ব্বদা রক্ষা করতে, তাই এই ভয়ের সৃষ্টি। এই নিজেকে রক্ষা করার ভাবটি ভেঙে ফেলা খুবই প্রয়োজন। এর একটি উপায় নিজের মৃত্যু চিন্তা করা। লোভকেও ত্যাগ করতে হবে। এবং ভালবাসতে হবে যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর তাকেই। আর যা কিছু সত্য-শিব-সুন্দর তাদের আমাদের স্বল্পচেতন, অর্দ্ধচেতন (Subconscious, preconscious) ও উর্দ্ধচেতনাতে (Superconscious) ধরে রাখতে হবে যাতে এগুলি অবচেতনায় যেয়ে জমতে পারে ও অবচেতনকে দিব্যতায় ভরে দিতে পারে। ডাঃ জারমেন ডি, এস-সি. এই অবচেতন মন ও অনুভবকারী মনকে একই বলেছেন। তাই একে জয় করার আর একটি উপায় বেসাল্‌গ্যাংগ্‌লিয়া ও থালামাস বলে যে অনুভূতির কেন্দ্র মস্তিষ্কে আছে সেখানে মনঃসংযোগ করা। আরও কয়েকটি দিক আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে—যেমন অল্প কিছু উত্তেজকে উত্তেজিত না হওয়া। কি স্বপ্নে কি জাগরণে যেগুলিতে আমরা অল্পে উত্তেজিত হই সেগুলি সহজাত প্রবৃত্তির পরিচায়ক।

তারপর সমস্ত ইন্দ্রিয়ের স্খলন (Slip) সম্বন্ধে আমাদের খুব সচেতন থাকতে হবে। যেমন চক্ষু যেন এতটুকু বাসনায় বস্তুর দিকে না যায়। এমনকি অনেক সময় দেখা যায় সুন্দর রচনার মধ্যেও এসে পড়েছে অসুন্দরের ছাপ। এ আর কিছু নয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের স্খলন। কখন হয়তো ভাল কথার মাঝে হঠাৎ এসে পড়ল একটা অশিব কথা। এও আমাদের স্খলন। এগুলি সম্বন্ধে আমাদের সচেতন থাকতে হবে। এই অন্ধকারময় অবচেতন সম্বন্ধে, একে জানতে আজ বেশই চেষ্টা চলছে। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ একে বিরাট শক্তির কেন্দ্র বলেছেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ একে মহাকালীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। তাই এই মহা-অবচেতনকে জয় করতে হলে, মোড় ফিরিয়ে দিতে হলে আমাদের উর্দ্ধ-চৈতন্যকে জাগ্রত করতে হবে—যাকে পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে (ফ্রয়েড) সুপারইগো বলেছে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বলেছেন 'Subconscious mind-ই conscious mind-এর কারণ' It is the vast field that contains the germs··· greater than the mind in the conscious plane

(৬)

ধর্ম্মে কনডিসান্‌ড্‌ রেসপন্‌স্‌

পশু-জগতে 'কন্‌ডিসান্‌ড্‌ রেসপন্‌স্‌'
স্মৃষ্টি করা হচ্ছে......
ধর্ম্ম-জগতে অনুরূপ সৃষ্টি করতে হবে
শৈশবের অবচেতনে যা প্রবেশ করে
তাই হয়ে যায় স্থায়ী ..
কাজেই শৈশবেই ঐ প্রচেষ্টা ভাল .....

আধুনিক মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ (পাভলভ প্রভৃতি) "কনডিসনড রেসপন্‌সের" ফল ব্যবহারিক জগতেই দেখেছেন। তাঁরা পরীক্ষা করেছেন—একটা কুকুরকে একটুকরো খাবার জিনিস দেওয়া হল এবং তার সঙ্গে চলতে লাগলো যে কোন একটি ঘণ্টাধ্বনি ; বার বার এই ঘণ্টাধ্বনি এবং খাবার দেওয়া চল্‌তে চল্‌তে শেষে দেখা গেল যে খাবার না দিয়ে কেবলমাত্র যন্ত্রটি বাজালেই কুকুরটির মুখ হতে খাবার সময় যে রূপ লালা নি.সরণ ইত্যাদি ক্রিয়া আরম্ভ হয় সে সবই আরম্ভ হয়ে গেছে। এই কনডিশন্‌ড্‌ রেসপন্‌সকে ধর্ম্মনীতির জগতে কাজে লাগাতে হবে। যেমন একটি ছোট্ট শিশুর সম্মুখে ধরা হল সুন্দর একটি ঠাকুরের মূর্ত্তি এবং তার সঙ্গে তার অঙ্গে কোন সুকোমল পদার্থের স্পর্শ দেওয়া যেতে লাগলো, সেই স্পর্শে তার আনন্দই হবে। এইরূপ বার বার চলতে থাকলে সেই সুখকর স্পর্শের আনন্দের সঙ্গে সঙ্গে বিজড়িত হয়ে থাকবে ঠাকুরের রূপ শিশুর অবচেতন মনে—সম্ভবত যা সে সারা জীবন ভুলতে পারবে না। তখন ঠাকুরের মূর্ত্তি দেখলেই সে দেহমনে পাবে সুখস্পর্শের অনুভূতি এবং সুখস্পর্শের আনন্দের মাঝে ফুটে উঠবে ঠাকুরের মূর্ত্তি। ভয়ের দ্বারাও এ কাজ সম্ভব এবং এটিও কোন কোন স্থানে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। শৈশবের ভয় অবচেতনে চির দিনের জন্য লুকিয়ে থাকে ও কার্য্যকরী থাকে। ভগবৎ-ভীতি এই ভাবে মনে ঢুকিয়ে দিতে পারলে সেটি সারা জীবনেই দিব্য প্রেরণা দেবে। শিশুকালে ভয় রাগ ও ভালবাসা এই তিনটি মাত্র প্রবৃত্তি আদিম প্রবৃত্তি রূপে দেখা যায়। ম্যাক্‌ডুগালের মতে ১৪টি সহজাত প্রবৃত্তি—ওয়াট্‌সনের মতে ৩টি - ভয়, ক্রোধ ও ভালবাসা। এই বৃত্তিগুলির মধ্য দিয়েই শিশুদের অবচেতন মনে ছাপ দিতে হবে - ধর্ম্মের ও

সৎনীতির। এবং এই সব ছেলেরাই কালে ধার্ম্মিক ও সৎ-স্বভাবযুক্ত হয়ে উঠবে আশা করা যায়। আবার, সাধারণতঃ ধ্যানে যে যে অবস্থায় ইষ্টের প্রকাশ হয়, অল্প বা বেশী যে কোন রকমই হোক, সে সব condition বা অবস্থা মনে রাখা ও পুনঃপ্রকাশের জন্য সেই সব অবস্থার সৃষ্টি করা বিশেষ দরকার।

(৭)

প্রতিক্রিয়ায় নাম ও ধ্যান

অবস্থান্তরে নাম ও ধ্যানের প্রতিক্রিয়া হয়……

এই প্রতিক্রিয়া

ভাল মন্দ উভয়ই হতে পারে……..

ভাল প্রতিক্রিয়াকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে……

মন্দ প্রতিক্রিয়াকে ফেলতে হবে মুছে……

প্রচলিত একটি কথা আছে যে, 'বাধা পেলে বেগ ওঠে বেড়ে'—এ ঘটনা দেখাও যায় বহু ক্ষেত্রে। এখন সাধনরাজ্যে এ প্রমাণ আমাদের পেতে হবে এবং পেতে হলে নানা প্রতিক্রিয়ার মধ্যে ঠিক রাখতে হবে আমাদের গুরু, ইষ্ট, ধ্যান এবং নাম। এর দ্বারা প্রমাণিত হবে যে নাম ও ধ্যান আমাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে কিনা। যেমন :দ্রুত এবং প্রবল চলেছে যে নামের গতি হঠাৎ তার গতি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া হল—কিছু পরে আবার তাকে গতি দিলে তার গতি আরো প্রবল হয়ে উঠে কিনা এটি লক্ষ্য রাখতে হবে। আবার, ধীরে ধীরে যে নামের ধারা চলেছে তাকে ইচ্ছামাত্র তীব্র গতিসম্পন্ন করে তুলতে হবে। কখনও কখনও একসঙ্গে দুটি জপ হয়তো চালাতে হবে, যেমন ইষ্ট নাম এবং তার সঙ্গে 'শরণাগত' এই বাণীটি। আবার আছে কথার মাঝে জপ চলছে কিনা লক্ষ্য রাখা। ব্যাধির যন্ত্রণার মাঝে, গভীর দুঃখের মাঝে—এমনকি ইচ্ছাকৃত নানা যন্ত্রণার সৃষ্টি করে সেখানে নাম ও ধ্যানের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা আছে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। ধ্যানের মাঝেও ঐ ধ্যান দ্বারাই নানারূপ জটিলতার সৃষ্টি করতে হবে—সাধারণতঃ আমরা গুরু অথবা ইষ্টের মধ্যে যে কোন একটির চিন্তাই করে থাকি। সেখানে একই ক্ষণে গুরু ইষ্টের চিন্তা একসঙ্গে করতে হবে এবং মানস পূজাদিও করতে হবে উভয়কে। আবার একটি চিন্তার পরিবর্ত্তে ঐ গুরু ইষ্টের রূপেরই আন্‌তে হবে একাধিক চিন্তা একসঙ্গে। যেমন তিনিই বিরাট রূপে

সৃষ্টিতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছেন—আবার তিনিই অণু রূপে, অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রূপে সৃষ্টি জুড়ে বিরাজ করেছেন। এর সঙ্গে আমাদের নিজস্ব ধ্যানের রূপটিও বর্ত্তমান থাকবে। এই তিনটি ভাবের ধ্যান একসঙ্গে করতে হবে। কখনও হয়ত নামের লয় করতে হবে নামীতে কখনও নামীর লয় করতে হবে নামে। এইভাবে নাম ও ধ্যানের মাঝে নিজেকে নিযুক্ত রাখতে পারলে নাম ও ধ্যানে আমরা দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হব।

(৮)

সুখ দুঃখ ভিত্তি-সমীকার

সুখ দুঃখের ব্যাপক ভিত্তির ব্যবধান
হ্রাস করতে হবে……
সুখের ব্যবধান, দুঃখের ব্যবধান……
সুখের এবং দুঃখের ব্যবধানকে
সমীকরণ করতে হবে …
তখন একটিমাত্র অনুভূতি থাকবে—
অনুভূতি-ব্রহ্ম……

দুঃখ এবং সুখের একটা ব্যাপক ভিত্তিভূমি আছে—প্রত্যেক মানুষের জীবনে স্বতন্ত্র ভাবে। যেমন একটি লোকের দশটি সন্দেশ পেলে সুখ হয় এবং এই সুখের গতি চলে তার কুড়িটি সন্দেশ খাওয়া পর্য্যন্ত। তার সুখের ভিত্তিভূমি হল দশটি থেকে কুড়িটি পর্য্যন্ত ব্যাপক এবং দশটি সন্দেশের নীচে হলেই তার দুঃখের সুরু হবে। আবার আর একজনের পাঁচটি পেলেই সুখ এবং দশটিতে সুখের শেষ হবে। কাজেই এর ভিত্তিভূমি কম ব্যাপক। দুঃখের দিক থেকেও এমনি একটা সহ্যশক্তির ব্যাপকতা আছে। এইভাবে প্রত্যেক মানুষের সাধারণ ভাবে সমষ্টি-সুখের, সমষ্টি-দুঃখের দুটি ব্যাপক ভূমি আছে। এবং প্রত্যেক মানুষের জীবনে এই দুটি ভিত্তি ভূমির কম বেশীর পার্থক্য আছে। জাতীয় জীবনেও তাই।

সাধনরাজ্যে এদের ব্যবধান বাড়াতে কমাতে হবে। সুখের সবচেয়ে ঊর্দ্ধরেখাকে নামিয়ে আনতে হবে সর্ব নিম্নে ও দুঃখের সর্ব নিম্ন রেখাকে নিয়ে যেতে হবে সর্ব উচ্চে। আবার সুখের ভিত্তিভূমির সবচেয়ে নিম্ন রেখা থেকে

তাকে আরও কমাতে হবে এবং দুঃখের ভিত্তিভূমির সবচেয়ে ঊর্দ্ধ রেখা থেকে তাকে আরও বাড়িয়ে যেতে হবে। সুখ দুঃখ তখন এক ভূমিতে এসে পড়বে। অর্থাৎ এইভাবে বাড়ানো কমানোর ফলে মনে একটা এমন অবস্থা উপস্থিত হবে যে সাধক সুখে দুঃখে সমভাবাপন্ন হয়ে যাবে। এই মনেই তাঁর কৃপায় ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। এই সমরসই সম-ব্রহ্ম।

Physics-এর ভাষায় Hpl = Hpn. অর্থাৎ Constant pleasure ও pain ভেদে বা ভেদ-রাহিত্যে এক।

(৯)

দুঃখভূমা

সুখ মাত্রাধিক্যে দুঃখে বিবর্ত্তিত হয়......
সাধারণতঃ দুঃখের স্বরূপ অপরিবর্ত্তনীয়—
মনোবিজ্ঞানের এই মত. ....
তাই বিবর্ত্তনশীল সুখ
ব্রহ্মাভিমুখী মনের সহায়ক হতে পারে না.......
দুঃখভূমাই ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়......

সুখ এবং দুঃখ মনের দুটি অবস্থার মধ্যে দুঃখের পথেই ভগবৎ-লাভ করা যায়, সুখের পথে নয়। সোপেনহাওয়ার প্রভৃতির মতে দুঃখই মূল ও বাস্তবিক অনুভূতি—সুখ-এর অভাব মাত্র। আবার বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানের মতে (যথা ষ্টাউট্) দেখা যাচ্ছে যে সুখের শেষ পরিণতি দুঃখে। যেমন কোন মিষ্টি জিনিষ খেতে খেতে ক্রমে তার মিষ্টতা মিষ্ট-অমিষ্টের মধ্যস্থানে এসে পড়ে এবং এর পরে আর এতটুকু খেলেই ঐটি প্রীতিকর আর থাকবে না, পরিণত হবে অপ্রীতিতে। যে কোন সুখের পরিণামই দুঃখে, অপ্রীতিতে। কাজেই পার্থিব সুখ কখন ভূমা —কখনও অসীম বা অনন্ত হতে পারে না। এবং এর দ্বারা ভগবৎ-লাভ হয় না। কিন্তু দুঃখের পথে অসীমের একটা আলো পাওয়া যায়, দেখা যায় দুঃখকে আমরা যতই বাড়িয়ে যাই না কেন সেটা দুঃখই থাকবে। কাজেই অসীমের একটা আভাস এতে আছে। আর মানুষ যারা অমৃতের সন্ধানে চলেছেন তাদের মধ্যে বেশীর ভাগই একটা না একটা আঘাত, দুঃখ পেয়েই ছুটেছেন।

ব্রহ্ম নিজে দুঃখ বা দহনের সূত্রে সৃষ্টি বিলসিত করেছেন। 'সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা'—গীতা। তাই প্রতি সৃষ্টির মূলে আছে বেদনা—তাই তাঁকে পেতে হলে আমাদের দুঃখের পথে চলতে হবে। তাঁকে না পাওয়ার বেদনাকে তীব্র ও ব্যাপকতর ভাবে বোধ করতে হবে—দুঃখ সৃষ্টি এবং বৃদ্ধি করতে হবে তপস্যাদি দ্বারা।

এই তপস্যার পথে চাওয়ার শেষে যখন পাব তখন সেই পাওয়া অসীমের আনন্ত্যের পূর্ণতার সত্তায় সেই দুঃখই হবে ভূমার স্বরূপ—তখন দুঃখই হয়ে যাবে আনন্দম্।

(১০)

সংঘাত ব্রহ্ম

নিশ্চল ব্রহ্মে লীলা-সংঘাতে এই সৃষ্টি......
আমাদের মধ্যে যিনি নিশ্চল
তাতে সৎ-সংঘাতে কল্যাণের সৃষ্টি . ...
তাই প্রার্থনা, নাম, ধ্যান, তপস্যার
সংঘাত প্রয়োজন......

দর্শক ও বিজ্ঞানের আধুনিক মত এই যে কোন জ্ঞানই আমরা বাইরে থেকে লাভ করি না। আমাদের অন্তরে সমস্ত জ্ঞানই বর্ত্তমান আছে, বাইরে থেকে আসে কেবল তরঙ্গ। (ওয়েভ)—ইলেকট্রন প্রোটনের তরঙ্গ অথবা দর্শনের দৃষ্টিতে সেন্সডেটা। এই পরমাণুগুলি কেউ কাউকে ছুঁচ্ছে না। কাছে এলেই বৈদ্যুতিক সংঘাত হয়। সেই তরঙ্গ মস্তিষ্কের চৈতন্যে এনে দেয় সংঘাত। তারি ফলে আমরা বহির্জগতের বিষয় জানতে পারি। আমাদের দেহের যে পুষ্টি সেও বাহিরের খাদ্যে যে ইলেকট্রন প্রোটনের তরঙ্গ, তার সঙ্গে দেহের প্রাণকোষের ইলেকট্রন প্রোটনের সংঘাত। রসায়ন বিদ্যায়ও এই প্রকারের কথা এসে পড়েছে।

এই সংঘাতেই সৃষ্টির সুরু, সৃষ্টিতেই সর্ব্বত্রই এই সংঘাত বা Shock-এর বিলাস। কারণ ব্রহ্ম, যিনি অচল অটল সুমেরুবৎ—তাঁরি ইচ্ছা-সংঘাতে এই সৃষ্টির বিকাশ হয়েছে। নদী যেমন সংঘাতে শক্তিমান হয় তেমনি অসীম ব্রহ্ম সংঘাতে সংঘাতে বৃংহিত হচ্ছেন।

আমাদের মধ্যেও ইনি নিশ্চল হয়ে আছেন আর এখানেও এঁকে সংঘাত-চঞ্চল করে তুলতে হবে। অবশ্য এখানে সৎবিষয়ের সংঘাত সৃষ্টি করতে হবে—জ্ঞান ভক্তি ইত্যাদির সংঘাত। এ সবই আমাদের ভিতরে আছে; কারণ আমরা ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বা অংশ। তবে আমাদের প্রয়োজন ধাক্কা দেওয়া। যোগদর্শনেও অনুরূপ কথাই আছে যে কুলকুণ্ডলিনীকে জাগ্রত করতে হলে প্রাণায়াম সহকারে তাঁকে ধাক্কা দিতে হয়। সেইজন্য জ্ঞান ভক্তি মুক্তি ইত্যাদি পেতে হলে অন্তর থেকে নাম ধ্যান ইত্যাদি এবং বাহিরে দৈহিক তপস্যাদি সহায়ে তাঁকে সংঘাত-চঞ্চল করে তুলতে হবে। তখন তাঁর কৃপাতে সমস্তই আমরা লাভ করতে পারব।

সংঘাত-ব্রহ্ম মতবাদে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানতত্ত্বের কথা নিহিত আছে। ফাংসানিষ্টদের মতবাদে যে উদ্দেশ্য আছে, হফ্‌ডিং-এর ইচ্ছা প্রাধান্যতত্ত্ব, জেম্‌স্-এর ডিনামিক তত্ত, স্টাউটের এ্যাকটিভিটি ও প্রসেস্ তত্ত্ব, ম্যাক্‌ডুগালের বৌদ্ধিক টেলিওলজি, জেষ্টাল্‌টের প্যাটার্ণ ও অখণ্ড তত্ত্ব হরমিক মতবাদের বুদ্ধি-প্রাধান্য তত্ত্ব, আর হলিস্টিক মতবাদের ব্যক্তিগততত্ত্ব এর মধ্যে আছে। মেরী ক্যালকিন্‌স এর মতে যে আত্মিক তত্ত্বের উপর জোর দেওয়া আছে সেটিও সংঘাত-তত্ত্বে গভীরতর ভাবে আছে।

(১১)

ব্যষ্টি-সমষ্টি-ব্রহ্ম সাপেক্ষ

সমষ্টি-ব্রহ্ম ব্যষ্টি-ব্রহ্মে সাপেক্ষকতা আছে......
স্থূল ব্যষ্টি-সমষ্টিতে এটি স্থূল
সূক্ষ্ম ব্যষ্টি-সমষ্টিতে এটি সূক্ষ্ম ...

প্রত্যেক সমাজই গড়ে উঠেছে অনুকরণের মধ্য দিয়ে, আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে—মনুষ্যসমাজ, পশুসমাজ, সমস্ত সমাজই।

তার মধ্যে পশুসমাজ কেবলমাত্র তাদের ইন্দ্রিয়জ কর্ম্মের দ্বারা এবং সহজাত সংস্কার-এর প্রভাবে তাদের সমাজ গড়ে তুলেছে—যথা খেলা করা, শিকার করা ইত্যাদি। দেখা যায় একটি কুকুর ছানা তার মায়ের কাছে এবং অন্যান্য কুকুরদের দেখে শিখল খেলা, শিকার ইত্যাদি এবং সে আবার যখন বড় হল তখন সেও তার সন্তানকে দিল সেই একই শিক্ষা। কিন্তু মনুষ্য সমাজ গড়ে

উঠেছে চিন্তার মধ্য দিয়ে, বৌদ্ধিকতার মধ্য দিয়ে। খেলা ধূলা শিকার ইত্যাদি থাকলেও তার আসল অনুকরণ বা আদান প্রদানের ব্যাপার ঘটে থাকে নব নব চিন্তা ধারায়, যদিচ ইন্দ্রিয়ের সহযোগীতায়। যেমন একজন শিল্পী একটা কিছু তৈরী করল এবং পরবর্ত্তী একজন শিল্পী হয়ত সেই বস্তুই তৈরী করল কিন্তু তার মাঝে আরও নূতন কিছু দিয়ে সে রেখে দিল তার নিজস্ব অবদান। পশুসমাজে এরূপ দেখা যায় না। মানুষের মধ্যেই আবার আরও সূক্ষ্ম চিন্তাশীল যাঁরা, যথা দার্শনিকগণ, এঁদের ভেতরও এই আদান প্রদানের খেলা চলেছে। এইভাবে মানবসমাজে তথা তার প্রতি স্তরে এইরূপ আদান প্রদান হওয়ার ফলে ক্রমে সমাজ অগ্রগতির পথেই চলেছে এবং বিরাট ও জটিলতর ভাবে গড়ে উঠছে। এইরূপ ভাবে আরও সূক্ষ্ম এবং শুদ্ধ চিন্তা, ভগবৎ চিন্তা নিয়ে যে মহাপুরুষ সাধকগণ পড়ে আছেন তাঁদের মধ্যেও যদি এইভাবে আদান প্রদান চলে তাহলে এ সমাজও যে দিন দিন উন্নতির পথেই অগ্রসর হবে এবং কালে যে এক সুউন্নত বিরাট সাধুসমাজ গড়ে উঠবে তাতে কোন সন্দেহ নাই—যেখানে থাকবে কেবলমাত্র নৈতিকতা, পবিত্রতা, কল্যাণ-চিন্তা ধর্ম্ম ইত্যাদি। তবে এঁদের আদান প্রদান হবে সূক্ষ্মরাজ্যে ভাবের আদান প্রদান। অবশ্য এই আদান প্রদান সম্ভব তাঁদেরই যাঁরা ঠিক ঠিক আপন ভাবরাজ্যে হয়েছেন প্রতিষ্ঠিত। এইরূপ আদান প্রদানে শুধু সাধু সমাজের কল্যাণ তা নয় তাঁদের নিজেদের কল্যাণও এতে সাধিত হয়, সাধুত্ব পরিপুষ্ট হয়। কারণ ব্যষ্টির অগ্রগতিতে ব্যষ্টির কল্যাণে যেমন সমষ্টির অগ্রগতি—সমষ্টির কল্যাণ সাধিত হয় তেমনি সমষ্টির অগ্রগতিতে সমষ্টির কল্যাণে ব্যষ্টির অগ্রগতি, ব্যষ্টির কল্যাণ। ব্যষ্টি-ব্রহ্ম, সমষ্টি-ব্রহ্ম পরস্পর পরস্পরের সহায়তা নিয়েই চলেছেন ; তাই একের কল্যাণে একের অগ্রগতিতে অপরের কল্যাণ অপরের অগ্রগতি। সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক শক্তি-সম্পন্ন সাধু মহাপুরুষেরা যদি পরস্পরের সহযোগীতায় এগিয়ে চলেন তাহলে প্রকাশ-ব্রহ্ম আরও মহীয়ান হয়ে উঠবেন।

(১২)

ব্রহ্ম আত্মকাম

ব্রহ্ম সৃষ্টিমুখে হলেন আত্মকাম.. ...
এই দ্বিত্ব, এর থেকে বহুত্ব......

স্বষ্টিতে তিনি অনুস্যূত
তাই স্বষ্টিও আত্মকাম... ..

স্বষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ছিলেন স্বানুভবানন্দে। আমরা যাকে চেতনা বলি সে চেতনা তখন তাঁতে ছিলনা—এমনকি নিজের সম্বন্ধেও নয়। সমাধিস্থ মানবের মাঝে এই অবস্থা দেখে তার কিছু আভাস আমরা পেয়ে থাকি। মনোবিজ্ঞানের 'ল অফ্ রিলেটিভিটি'র মতে চৈতন্যের প্রকাশ বুঝতে হলে কতকগুলি অবস্থা আবশ্যক, যেমন পরিবর্ত্তন, বিভিন্নতা এবং বিরুদ্ধভাব। এইগুলি আছে বলেই জগৎভূমিতে আমরা চৈতন্যের প্রকাশ অনুভব করি। তা না হলে 'যা আছে তাই' বলা ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। জাগতিক সব চেতনার ভিতরই ভেদমূলক এইগুলি আছে বলেই তাদের নাম হয়েছে চেতন-সত্তা। তাই ব্রহ্ম যখন ছিলেন আমাদের চেতনার উর্দ্ধে তখন তাঁর সম্বন্ধে মৌনাবলম্বনই ভাল। আর না হয় এই মাত্র বলা যেতে পারে—যা ছিলেন তাই।

এই স্বানুভবানন্দ অবস্থার মাঝে ধীরে জেগে উঠল আত্মচৈতন্য। প্রথম চেতনা হল তাঁর নিজের সম্বন্ধে আত্মকাম। এই আত্মকাম, এই অহং-চেতনাটিই স্বষ্টির মূল. এইটিই আদি-অহং। এর থেকেই স্বষ্টি বিলসিত হ'ল। এই চেতনাটি জীব-জগৎ সারা-বিশ্বসংসারে ওতপ্রোত হয়ে গেল অর্থাৎ তিনিই ঘটে ঘটে হয়ে হইলেন আত্মকাম।

বিদ্যুতিনের আবর্ত্তন চলেছে প্রোটনকে ঘিরে। সেখানেও এই আত্মকামনা। স্বর্য্যকে ঘিরে ঘুরে চলেছে গ্রহদল—সেখানেও এই আত্মকামনা। মানুষ গোষ্ঠীভাবে সমাজবদ্ধ ভাবে বাস করছে—সেখানেও এই আত্মকামনা। সকলেই নিজের সম্বন্ধে সচেতন। সকলেই চাচ্ছে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে। তাই সে অন্যকে চাচ্ছে, অন্যকে ভালবাসছে। অন্যকে ঘিরে, বাঁচিয়ে রাখছে সে নিজেকেই—কেউ হয়তো ভালতে কেউ হয়তো মন্দতে।

আজ যদি প্রতিটি অণু পরমাণু থেকে স্বরু করে মানুষ পর্য্যন্ত নিজের সম্বন্ধে এই সচেতন ভাব একেবারে মুছে ফেলে তাহলে স্বষ্টি-লীলা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ আত্মকামে স্বষ্টি, অনাত্মকামে প্রলয়। কিন্তু একেবারে সকলের অনাত্মকাম হওয়া সম্ভব কখনই নয় যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম রয়েছেন আত্মকাম। তাই মহাপ্রলয় ব্রহ্মাধীন।

(১৩)

ব্যাকুলতা সাধন

একটি স্থান-কাল-পাত্রে সুরের লীলা একটি মাত্র।
স্থান-কাল-পাত্রে ভূমার প্রকাশ হলে
সুরও হয়ে যায় ভূমার স্বরূপ।
এই ভূমার সুরই বিশ্বলীলার সুর……
পুরুষোত্তমের বংশীধ্বনি।
চির পুরাতন অথচ চির নূতন……
চির অচল অথচ চির চঞ্চল
চির আপন হয়েও চির গোপন
প্রাণপুরে বাজে…আবার বাজে বহুদূরে
এরই অসীম চাওয়া…এরই অসীন পাওয়া।
ব্যাকুল হলে অসীম চাওয়া,
হ'য়ে যাবে অসীম পাওয়া।
তাই দক্ষিণেশ্বরে পুরুষোত্তম ব'লেছেন—

……চাই ব্যাকুলতা……

অসীম ব্যাকুলতা—

কোন একটি দেশ, কাল বা পাত্রে যে সুর বাজছে, সেটি খণ্ড সুর, ব্যষ্টি সুর। সকালে প্রভাতী, সন্ধ্যায় পূরবী—কোন লোকের কাছে সুখের সুর, কারো কাছে দুঃখের কাহিনী সুরু হয়েছে। এই ভাবে যে খণ্ড সুর জগৎ জুড়ে বাজছে এর পিছনে বিরাট দেশ-কালে এক অখণ্ড সুর আছে, সেটি বিশ্বলীলার সুর, পুরুষোত্তমের সুর। আমাদের এই খণ্ড দেশ-কালকে ভূমায় নিয়ে যেতে হবে, তখনই আমাদের খণ্ডসুর অসীম হয়ে পড়বে। আমরা যদি প্রভাতের সুরকে সারা দিনই রাখতে পারি তবে সারা দিনে এক অখণ্ড প্রভাত-ই, এক অখণ্ড সুরই থেকে যাবে। আবার সেই সুরকে প্রসারিত করে যদি সারা জীবনেই রাখতে পারি, তবে জীবনের সুর হয়ে যাবে এক অখণ্ড প্রভাতী সুর। আমরা যদি আনন্দের সুর সারা জীবনেই রাখতে পারি দেশ কাল পাত্র নিরপেক্ষে, তবে সেই আনন্দম্, সেই নিত্য বৃন্দাবন, নিত্য

কৃষ্ণ, নিত্যলীলা, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। আমাদের দেশ ও কাল ও পাত্রে যদি ভূমার প্রকাশ হয়, তবে খণ্ড সুরই অখণ্ড অসীম—পুরুষোত্তমের বংশীধ্বনিতে রূপায়িত হবে।

তিনি সৃষ্টি-লীলায় এই খণ্ডসুরের বিলাস করছেন কিন্তু আমাদের এই খণ্ড-সুরের বিলাস না চেয়ে সেই অখণ্ড সুরের বিলাসই চাইতে হবে। জীবনে এই বৃহৎ এই ভূমার সুর বাজাতে হলে চাই ব্যাকুলতা।

এই ভূমার সুর, এই সুরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের বংশীধ্বনি।

এ সুর অসীম—এ সুর অনন্ত, এর বিচ্ছেদ নাই। এ সুর বাজছে বহুদূরে—আবার অতি নিকটে, প্রাণের মাঝে, এ সুরই আবার অখণ্ডে ওতঃপ্রোত। শ্রীঠাকুরের কথায় "এই সুরই শব্দ ব্রহ্ম...অনাহত শব্দ। এই শব্দ-কল্লোল ধরে ধরে গেলে, তার প্রতিপাদ্য ব্রহ্ম তার কাছে পৌছান যায়—তাকেই পরমপদ বলেছে" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত) 'যত্র নাদ বিলীয়তে'—উপনিষদ।

এ সুরই বিশ্বাতীত, এ সুরই বিশ্বানুগত। এই চির-চঞ্চলকে পাশ্চাত্যের দার্শনিক বার্গশ নাম দিয়েছেন ইলানভাইট্যাল। একে শুধু ধরে নেওয়া চাই—আর তার জন্যে চাই অসীম ব্যাকুলতা। কারণ অসীম-পাওয়া যেখানে, সেখানে একান্ত প্রয়োজন অসীম চাওয়ার। শ্রীঠাকুর তাই বলেছেন, 'এগিয়ে পড়'। আমাদের এগিয়ে পড়তে হবে এবং এই অসীম চাওয়ার সৃষ্টি করতে হবে—গুরু ইষ্ট প্রার্থনা নাম ধ্যান ও তপস্যা সহায়ে। নিত্য বলতে হবে আমি চাইনা এই খণ্ডসুরের লীলা যা নিত্য ভেঙে যাচ্ছে, আমি চাই সেই সুর যে সুর কখনও ভাঙ্গে না, কখনও হারায় না, ফুরায় না—অনন্ত যার বিস্তার, অসীম যার প্রকাশ।

(১৪)

ছায়াবাদ

চিদ্-ব্রহ্মে সৃষ্টি চিন্ময়।
বহিঃ-প্রক্ষেপের পূর্ব্বে
এর স্থান ব্রহ্ম-মনে।
ব্রহ্মসত্তা আর চিন্ময় সৃষ্টি—
যেন চিত্র-গ্রহণাগার (Studio) ও চিত্র-গ্রহণ (Shooting)
মায়ার কায়া এই চিৎএর চিত্রছায়া—

বিচিত্র জগৎ........

ব্রহ্মই এর দ্রষ্টা—সাক্ষীরূপে......

আবার তিনিই দৃশ্য···নামে-রূপে···ক্ষণে-ক্ষণে

—চিদাভাসে।

দ্রষ্টারূপে তিনি বসে আছেন...লীলানন্দে।

এই জগৎ ব্রহ্মের কথাচিত্র। ব্রহ্মই একাধারে এই চিত্রের অভিনেতা, গ্রহণাগার, পরিচালক সবই। তিনি পূর্ণ ও সত্য-সঙ্কল্প, তাই তাঁর সঙ্কল্প-মাত্র চিত্র বিলসিত হয়েছে এবং হচ্ছে তাঁতেই, লীলাভিনয়ও করছেন তিনিই। এই সৃষ্টির স্থিতি কালে তিনিই আবার দ্রষ্টা সাক্ষীস্বরূপ হয়ে তাঁর নিজের অভিনয় নিজেই দেখেছেন, উপভোগ করছেন। যেমন কথাচিত্রের অভিনেতা কথাচিত্র তোলা হবার পর তাঁর নিজের অভিনয় দেখেন আর আনন্দ করেন, তেমনি ব্রহ্মও দৃশ্যসৃষ্টিরূপে প্রকাশমূর্ত্তিতে এবং দ্রষ্টা সাক্ষী হয়ে স্বানুভবানন্দে অধিষ্ঠিত আছেন, সৃষ্টির বাইরে ও ভিতরের ওতঃপ্রোতরূপে। জগৎকে এই কথাচিত্রের সঙ্গে তুলনা করার কারণ বেদান্তের প্রতিবিম্ববাদ ইত্যাদির চেয়ে—বর্ত্তমান যুগে এর ধারণা সহজেই আনতে পারা যায়। এই মতবাদের আভাস বার্গশ প্রভৃতির মতবাদেও পাওয়া যায়। এঁরা বলেন ছায়া-চিত্রে যেমন একটি ছবি সরে যাচ্ছে আর তার স্থানে আর একটি এসে দাঁড়াচ্ছে এবং এই পরিবর্ত্তনেই চলমান ছায়াচিত্র দেখছি, তেমনি জগৎটাও ইলেকট্রন প্রোটনের আবির্ভাব ও বিনাশের আবর্ত্তনে চলমান জগৎরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে। কথাচিত্র বলতে আর একটা কথা আসে যে এই কথাচিত্রের অভিনেতা ব্রহ্ম নিজে হলেও এগুলি তাঁরই রূপবাণীর ছায়া মাত্র। সত্য সেই চিন্ময় সত্তা ব্রহ্ম নিজে, সাক্ষী-দ্রষ্টা-শ্রোতা-ভোক্তা স্বরূপে। আমরাও যদি জগৎ-বিলাস দেখে অন্ততঃ একবারও মনে রাখতে পারি যে যিনি সাক্ষী স্বরূপ আছেন এসব তাঁরি কথাচিত্র, আর তিনিই দেখছেন, শুনছেন, উপভোগ করছেন আপন আনন্দে সাক্ষী হয়ে—তাহলে ক্ষণিকের জন্যও আমাদের ভিতরে সাক্ষীর আনন্দ ও শান্তি জেগে উঠবে—যা নিত্য ও সত্য।

(১৫)

দহনযোগ

স্বষ্টিই
দহন ·····
এই দহনে
আমরাও ইন্ধন যোগাচ্ছি······
যোগাতেই হবে······
এই দহন-লীলায়
আনন্দে
স্বেচ্ছায়
যোগ দিতে হবে—
জ্বলে যেতে হবে—
নিঃশব্দে-নিঃশেষে······
বিরাটের
বিশ্ব-ব্যাপী আরাত্রিকে
ধূপের মত—
শ্রীপ্রভুর প্রীত্যর্থে....

স্বষ্টির আদিতে স্বরু হয়েছে এই দহন-লীলা। উপনিষদে দেখা যায় যে স্বষ্টির জন্য তপস্যা করেছিলেন স্বষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজে। "প্রজাকামো বৈ প্রজাপতিঃ স তপোঽতপ্যত।" প্রঃ উঃ ১-৪। এই তপস্যাই দহন। কাজেই স্বষ্টিকর্ত্তা স্বষ্টির অণুপরমাণুতে দিয়ে রেখেছেন জ্বলবার মন্ত্র। কি প্রাকৃতিক ব্যাপারে কি জৈব দেহে কি মনোরাজ্য সর্ব্বত্রই এই দহনলীলা চলেছে। যেমন অণুপরমাণুর ঘুরবার বেগে তাদের অঙ্গ থেকে বিকিরিত হয়ে যাচ্ছে শক্তি এবং এই ভাবে তারা নিত্য পুড়ে যাচ্ছে তেমনি আমাদের দেহের মধ্যেও প্রতিটি কোষ জ্বলে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। আর মনোরাজ্যে ত দুঃখের খেলা চলেছে নিত্য। শিল্পী কবির স্বষ্টির মুখেও বেদনার অনুপ্রেরণাই বেশী। সাংসারিক রাজ্যেও চলেছে নিত্য দহনযোগ। তবে এই যে জ্বলবার মন্ত্র আমাদের প্রতিটি অণুপরমাণু পেয়েছে আমরা ধরে নিই যে একে জোর করে আমাদের অজ্ঞাতসারে আমাদের দেওয়া হয়েছে। তাই এতটুকু দহনের প্রকাশ পেলেই আমরা হয়ে উঠি অশান্ত, হয়ে

উঠি চঞ্চল। কিন্তু যতই অশান্ত হয়ে উঠিনা কেন তাঁর সৃষ্টি-লীলায় যখন পড়তে হয়েছে তখন জ্বলতে আমাদের হবেই। তার উপর অশান্তি ডেকে এনে আমরা দুঃখ আরও বাড়িয়ে তুলি। তাই জ্বলতেই যখন হবে তখন এ খেলায় স্বেচ্ছায় আনন্দ করে যোগ দেওয়াই ভালো। স্বেচ্ছায় যোগ দিলে তখন দুঃখই হবে আনন্দ। যেমন সাংসারিক জীবনে আমরা নিয়তই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আঘাতে দুঃখ পেয়ে থাকি, বিরক্তি প্রকাশ করি—কিন্তু একজন দেশপ্রেমিক তিনি কত দুঃখ বরণ করে নেন হাসিমুখে, কারণ তিনি স্বেচ্ছায় এ খেলায় যোগ দিয়েছেন।

এই যে আমরা দুঃখ পাচ্ছি এ কেবলমাত্র আমরা ক্ষুদ্র স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দুঃখটাকে দেখছি বলেই দুঃখ পাচ্ছি। আমাদের এই ক্ষুদ্র-স্বার্থ-দৃষ্টিটাকে ভূমার দিকে ফিরিয়ে নিতে হবে। তখন দুঃখ হয়ে যাবে ভূমার স্বরূপ—আর ভূমার মাঝে যা কিছু এসে মিলে তাই হয়ে যায় আনন্দম্। "ভূমৈব সুখম্।"

নিয়ত আমাদের মনে এই চিন্তাই জাগিয়ে রাখতে হবে যে আমরা ভূমার অংশ এবং তিনি স্বেচ্ছায় সগুণব্রহ্মরূপে সৃষ্টি রক্ষাকল্পে আদি হতে জ্বলে যাচ্ছেন—যাকে উপনিষদে তপস্যা বলেছে। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বম সৃজত।' তৈঃ ২।৬। তাই আমরাও তাঁর অংশ স্বরূপে তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর পূজা-আরতিতে সৃষ্টিযজ্ঞের হোমাগ্নি শিখা মুখে আমাদের নিত্য বেদনার দহনে জ্বলছি এবং জ্বলব আনন্দ করে, স্বেচ্ছায়। "ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণাহুতং ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্ম্ম সমাধিনা"—(গীতা)। এই চিন্তা যদি আমরা প্রতিক্ষণে রাখি তা হলে দুঃখ এসে আর আমাদিগকে ক্ষুব্ধ অশান্ত করতে পারবে না। সৃষ্টিকর্ত্তার দহনযোগে নিত্যযুক্ত হয়ে আমরা দুঃখ-ব্যথায় আনন্দই পাব, জ্বলবার আনন্দ। এই সাধন গ্রহণ করতে হলে আমাদের কতকগুলি স্বেচ্ছাকৃত দহনের সৃষ্টি করতে হবে দেহমনের তপস্যায়। এই তপস্যার দহনই আমাদের বিরাটদৃষ্টি খুলে দেবে। স্বার্থের ক্ষুদ্র গণ্ডী দেবে ভেঙ্গে। উপনিষদের ঋষি ভৃগুর মত আমাদের বার বার শুনতে হবে "তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাসস্ব। তপো ব্রহ্মেতি।" (তৈঃ ৩।২)

বেদছন্দ

(তৃতীয় পর্ব্ব)

প্রথম কথা

মানুষের জীবনে জড়িয়ে আছে বহু চাহিদা। এই চাহিদা নিয়েই সে বেঁচে আছে। এই চাহিদাই তার দৈনন্দিন কর্ম্মের প্রবর্ত্তক—এ হ'তেই তার সমস্ত জীবনের গতি। এই চাওয়াই তাকে অতীত হ'তে নিয়ে এসেছে বর্ত্তমানে, আবার ঠেলে নিয়ে যাবে ভবিষ্যতে। এই চাওয়ার মাঝে জেগে আছে সীমা আর অসীমার চাওয়া—ক্ষুদ্র এবং ভূমার চাওয়া। তার মধ্যে ক্ষুদ্র চাওয়ার নেশাতেই মানুষ হয় পার্থিব সুখের প্রার্থী, অর্থ প্রার্থী, যশঃ প্রার্থী। বেশীর ভাগ মানুষ এই ক্ষুদ্র চাওয়ার স্রোতেই গা ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে। কিন্তু এই চাওয়া, এই প্রয়োজনের পিছনে আছে এক বিরাট চাওয়া, এক অসীম প্রয়োজন। সে চাওয়া মানুষের অন্তরের অন্তরতম লোকে বাসা বেঁধে আছে। কিন্তু ক্ষুদ্র চাওয়ার প্রবলতায় সে চাহিদা গেছে চাপা প'ড়ে। অবশ্য এই বিরাট চাওয়াই দিচ্ছে সমস্ত ক্ষুদ্র চাওয়ার প্রেরণা, সব সহজাত প্রবৃত্তির প্রেরণা।

মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে এই আদি–অসীম ভূমার ক্ষুধাটিকে এবং এর দ্বারাই সে হ'তে পারবে সত্যিকারের মানুষ, দিব্য মানুষ।

মানুষের এই দিব্য চাহিদা জাগিয়ে তুলতেই এবং এই ক্ষুধা মেটাতেই যুগে যুগে এসেছেন কত মহাপুরুষ, অবতার পুরুষ। তাঁরা তাঁদের অপূর্ব্ব দিব্য জীবনকে বলি দিয়ে, তিল তিল করে বিলিয়ে দিয়ে দেখিয়ে গেছেন দিব্য জীবনের আদর্শ—ক'রে গেছেন দিব্য ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা। তাঁদের সেই আদর্শের উপর ভিত্তি ক'রে গড়ে উঠেছে কত শত আশ্রম, কত শত বিদ্যানিকেতন।

প্রাচীনতম বৈদিক যুগ হ'তেই সুরু হয়েছে এই অপূর্ব্ব প্রচেষ্টা। সেই যুগ হ'তে এ যুগের সমস্ত অবতার পুরুষ—সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনের সাধনা এরি জন্য, এই দিব্য চাহিদার তৃপ্তির জন্য—দিব্যতার প্রতিষ্ঠার জন্য। এবং এরি জন্য তাঁরা তাঁদের অনুভূতিকে, তাঁদের আদর্শকে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁদের অমৃতময়ী বাণীর মধ্য দিয়ে। যদিও এই অনুভূতি, আদর্শ ও বাণীর ধারা প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন রূপে, তবু এর প্রয়োজন আছে। কারণ বৈচিত্র্যময়ী প্রকৃতির গড়া মানুষের রুচিও, বৈচিত্র্যে—বিভিন্নতায় পূর্ণ। তাই সম্ভবতঃ একটি মহাপুরুষের অনুভূতি, আদর্শ, এবং বাণীর ধারা সকলের তৃষ্ণা নিবারণ ক'রতে পারে না।

তাই বিভিন্নতারও প্রয়োজন আছে। তাইই বুঝি বেদছন্দার বাণীগুলির মধ্যে রয়েছে বহু দিব্য মতেরই স্থান। অবশ্য বিভিন্ন মতের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও সমস্ত প্রচেষ্টার মূলেই আছে একটি ঐক্য—আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা, দিব্যতার প্রতিষ্ঠা, ভগবৎ প্রতিষ্ঠা। এই বেদছন্দার বুকে যাঁর অমৃতময়ী বাণীগুলি ধ'রে দেওয়া হয়েছে তিনি তপস্যায়, সাধনায়, লোক-কল্যাণের কর্ম্মে নিজেকে তিল তিল করে আজও বিলিয়ে দিচ্ছেন—জগতের বুকে দিব্যতার প্রতিষ্ঠাকল্পে, যুগদেবতা ভগবান রামকৃষ্ণের নাম রূপ ভাবের ভাতি স্বরূপে।

তাঁর বাণীর সবগুলি ধরে রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে না, অক্ষমতায়। তবু যেটুকু তাঁর কৃপায় ধ'রে রাখা সম্ভব হ'য়েছে ভক্তদের দিনলিপিতে, সেগুলি সংগ্রথিত করেই প্রকাশিত হ'ল এই বেদছন্দা—তাঁর শুভ-জন্মতিথি উপলক্ষ্যে। তাঁর এই অমৃতময়ী মহাবাণীগুলি যেন হয়, আমাদের দিব্য জীবনের সাধনায় আলো অন্ধকারের দিশারী। এই আমাদের সমবেত প্রার্থনা তাঁর চরণে।

"যশ্ছন্দসামৃষভো বিশ্বরূপ। ছন্দোভোঽধ্যমৃতাৎ সম্বভূব। স মেন্দ্রো মেধয়া স্পৃণোতু। অমৃতস্য দেব ধারণো ভূয়াসম।" (তৈঃ উঃ ১।৪।১)

"যিনি সর্ব্বদেবের প্রধান, সমস্ত শব্দে ব্যাপ্ত এবং অমৃত-স্বরূপ বেদের সার-রূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, সেই পরমেশ্বর আমাকে প্রজ্ঞার দ্বারা তৃপ্ত করুন। হে দেব, আমি যেন অমরত্বের কারণ ব্রহ্মজ্ঞানের আধার হইতে পারি।"

শ্রীরামকৃষ্ণার্পণমস্তু

ব্রহ্মবাদিনী

বেদছন্দা

১। পূজা করতে হয়। ঠাকুর চেয়েছেন পূজা। সৃষ্টির উদ্দেশ্য হ'চ্ছে ভগবৎ প্রতিষ্ঠা। ঠাকুরের কথা, একদিন ফুল তুলতে গিয়ে দেখিয়ে দিলে—গাছে ফুল ফুটে আছে, যেন সম্মুখে বিরাট—পূজা হয়ে গেছে, বিরাটের মাথায় ফুলে তোড়া।

২। একদিক দিয়ে ধ্যান জপ করাটাও স্বার্থপরতা। ঠাকুর, আমায় পবিত্র কর - আমায় লোভ মোহ বিমুক্ত কর, আমায় শান্তি দাও, এই সব ইচ্ছা নিয়েই ত আমরা ধ্যান জপ করি—কিন্তু পূজা আরতি শুধু তাঁর সেবা করা, তাঁর প্রীতির জন্য করা চলে—অহং-এর দিকে দৃষ্টি না দিয়েও।

৩। হাততালি দিয়ে নাম করা কেন? যতক্ষণ মানুষ স্থূল আছে, তার তমোগুণ যখন প্রবল, ততক্ষণ স্থূল নামেই ভাল ফল দেবে—কারণ তখন সূক্ষ্ম ভাবে মনে মনে জপ ক'রতে গেলে ঝিমিয়ে প'ড়বে, পারবে না।

আর একটা দিক আছে—সমষ্টি কল্যাণ এবং ব্যষ্টির কল্যাণ। মনে মনে নাম ক'রলে, আত্মায় আত্মায় নাম ক'রলে তার আত্মার খুব উন্নতি হবে। কিন্তু সমষ্টির কল্যাণ আবার আছে—সেখানে যাতে সকলে শুনতে পায়, এমন ভাবে করা। সে নাম তাদের ওপর কাজ করবে খুব তাড়াতাড়ি। মনে মনে নাম ক'রলে, স্থূলভাবে তাদের কাজ দেবে না।

Group Mind বলে একটা কথা আছে (Le Bon)। একস্থানে যখন অনেকে নাম করে তখন নামের একটি আলাদা সত্তা প্রকাশ হয়। অনেক সময় পাঁচজনে জপ ধ্যান ভাল হয়। কারণ সেখানে সমষ্টি মনের একটা ছোঁয়াচ আছে।

৪। যা কিছুতে ক্ষুদ্রতা, যা কিছুতে হীনতা, তাকে মহীয়ান ক'রতে হবে নাম-রূপের কম্পনে।

৫। অবচেতন মনকে চেতন ক'রতে হবে। চেতন মনকে প্রসারিত ক'রতে হবে, ইষ্ট নাম সহায়ে।

৬। মনের ওপর নজর রাখবে, যেন ইষ্ট স'রে না যায়।

৭। এক একটি বাসনার বিরুদ্ধে নামকে প্রয়োগ ক'রতে হয়।

৮। আমাদের অহং-এর মূল্য বা পরিমাণ আমরা যত বাড়াই, ঠাকুরের কৃপার মূল্য বা পরিমাণ তত ক'মে যায়।

৯। আমাদের বাহিরের চাহিদা যত বেড়ে যাচ্ছে, ভিতরের চাহিদা ততই ক'মে যাচ্ছে।

১০। ঠাকুরকে ঠিক মর্য্যাদা দিতে হ'লে, জানতে হ'লে ঠাকুরের স্বরূপ হ'তে হবে।

তাই "ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি"।

১১। ঠাকুর যে কৃপা ক'রবেন তার জন্য কোন কিছু প্রয়োজন নাই। কৃপা নিত্য, আমরাও নিত্য কৃপা পাচ্ছি। কিন্তু যখন আমাদের মনের মত কৃপা চাই, তখন আমাদের প্রার্থনা তপস্যা ক'রতে হয়। অর্থাৎ কৃপাটি আমাদের মনের মত যেন তিনি করেন।

১২। ব্রহ্মচারীদের একটি জিনিষ মনে রাখতে হবে যে, তোমারা জীবনকে কখনও ভালবেসো না; ঠাকুরের দাস হ'তে হ'লে, ঠাকুরকে পেতে হ'লে মৃত্যুপণ ক'রতে হবে, মরণকে-ই ভালবাসতে হবে।

১৩। দেখ—তোমরা মনে ক্ষোভ রেখো না, মনে কোন ক্ষোভ থাকলেই সেটি কাঁটার মত খুচ্ খুচ্ ক'রবে। কিছুতেই শান্তি পাবে না। যেমন কাঁটা ফুটলে সে জায়গা খুচ্ খুচ্ করে। তাকে সাত ঝাঁটা মেরে তাড়াবে। তোমরা নিজেরাই একটু লক্ষ্য ক'রলে বুঝতে পারবে। দেখবে যার কাপড় জামায় লোভ আছে, তার একটি ভাল কাপড় দেখলেই সেদিকে ঠিক নজর পড়বে। যার খাবারে লোভ, তার ঠিক খাবারে একবার অন্ততঃ নজর প'ড়ে যাবে। যারা ও সবের লোভ মোহ কাটাতে পেরেছে, তাদের ওদিকে ভ্রূক্ষেপ থাকে না। যেন মাটীর ঢেলা প'ড়ে আছে। "সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ"।

কাঁটা ফুটলে যেমন মনে হয় এটা বার ক'রলে ভাল হয়, তেমনি মনে ক্ষোভ থাকলে মনে হবে এটা বার ক'রলে—অর্থাৎ ভোগ মিটাতে পারলে ভাল হয়; আর তখনই সাধকের পতন। এ একটা দিক—অর্থাৎ কাঁটাকে তুলে ফেলে দিতে হবে, নির্ম্মূল ক'রতে হবে– তাকে আদর ক'রে রেখো না।

১৪। মহামায়া রঙীন ঠুলি দিয়ে জগৎটাকে ভালবাসতে শেখান, আবার রঙীন ঠুলি ভেঙ্গে জগৎ সম্বন্ধে বিরক্ত ক'রে তোলেন। ছোট ছেলে যখন প্রথম সংসারে জন্মায়, তখন খুব আনন্দ—যত বয়স হয়, তত আনন্দ বাড়ে। কিন্তু

যেই বয়স প'ড়ে যায়, তখন যন্ত্রণা। মহাপুরুষদেরও তাই—স্বামিজী যখন প্রথম কাজে নামলেন তখন খুব একটা আন্তরিকতা নিয়েই নামলেন, মা-ই নামালেন। কিন্তু সেইটিই আবার মহামায়া ভেঙে দিলেন; যার পরিণতি ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে। তাই মহামায়া হচ্ছেন ভোগাপবর্গদা।

১৫। সব কাজের মাঝে মাঝে, একবার ক'রে জগৎ থেকে মনকে সুইচ-অফ ক'রে দেবে। দেখবে মন ঠিক ইষ্টমুখী আছে কি-না।

১৬। আবহাওয়ার খবর রাখবার জন্য যেমন ব্যারোমিটার (Barometer) থাকে, তেমনি মনে একটা মিটার রাখতে হয়। জপ চিন্তা ইত্যাদি কেমন হ'চ্ছে এই সব লক্ষ্য রাখতে হয়। অর্থাৎ জপের রিডিং (reading) কতটা উঠছে—এইটি লক্ষ্য রাখতে হয়।

১৭। কায়-মন-বাক্যে তাঁর অভিমুখী হ'তে হয়। দেহ তাঁর মূর্ত্তির দিকে থাকবে, মনে তাঁর চিন্তা, বাক্যে তাঁর কথা।

১৮। ইষ্টমূর্ত্তি সর্ব্বদা সঙ্গে রাখলেও মহা ফল। যন্ত্রবৎ ক'রলেও বস্তু-গুণ আছেই।

১৯। সকলেই এ প্রার্থনা ক'রতে পারে—"ঠাকুর! তুমি নিজের কৃপায় নিজেই এগিয়ে এস। আরও মূর্ত্ত হয়ে ওঠো......"

২০। মাঝে মাঝে নামের স্রোতটা বাড়িয়ে দিতে হয়। যেমন কোথাও যেতে হ'লে তাড়াতাড়ি পা চালাতে হয়। মহাপ্রস্থান একদিন ক'রতেই হবে।

২১। শেষের দিকে কষ্ট হবেই, তখন নামটা যেন অব্যাহত থাকে। ঠাকুর ব'লেছেন সুঁদরী কাঠের কথা। তাই শেষের দিকে কফ্ বায়ুতে ঘিরবেই। ছোটবেলা থেকে নামটা গেঁথে নিতে পারলে হয়।

২২। ধ্যান চিন্তা এগুলি সূক্ষ্ম কিন্তু এদের সূক্ষ্মতর ক'রে তোলা যায়—প্রার্থনা এবং আকুলতার দ্বারা।

২৩। আমাদের অবচেতনের বস্তু যেমন হঠাৎ প্রকাশ হ'য়ে পড়ে, তেমনি, দিব্য বিষয়গুলি মাঝে মাঝে শ্লিপ ক'রেই অবচেতনে দিতে হয়। দেখবে, অবচেতন ঠিক গ্রহণ ক'রবে—এমনি সোজাসুজি ত গ্রহণ ক'রবে না। যেমন ধরো—কথামৃত পাঠ চ'লছে, আমি অন্য কথা ব'লছি কি অন্য কাজ ক'রছি। এমনি জিজ্ঞাসা ক'রলে হয়তো ব'লতে পারব না, কিন্তু অবচেতন ঠিক সেটিকে গোপনে রেখে দিয়েছে। তারপর, আনাচে কানাচে ঠাকুরের মূর্ত্তি রেখে

দেওয়া—একটু হয়তো দেখা যাচ্ছে। এমনি সামনে মূর্ত্তি থাকলে হয়তো অনেক সময় ঠাকুরকে মন নেবে না; কিন্তু ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছে না—একটু দেখা যাচ্ছে, তখন ঠিক স্লিপ ক'রে অবচেতনে এসে ঢুকবেন।

২৪। দেখ, মানুষের অহঙ্কার বেড়ে ওঠে, তার পরিস্থিতি-গণ্ডীর বাইরে গেলে। একটু বাইরে যাও, কি একটু ভাল কাপড় পর, অমনি নিজের সম্বন্ধে সচেতন হ'চ্ছ। তাই সাধুদের নিজের গণ্ডীর বাইরে বিশেষ যেতে নাই। নিজের গণ্ডীতে সে সহজ ভাবে থাকতে পারে।

২৫। বড় হ'তে হ'লে একজন বড় শক্তির আশ্রয় নিতে হয়। তা'হলে সহজ হয়।

২৬। সর্ব্বদা ভোগের মধ্যে থাকা, তাই একজন অগ্নি-স্বরূপের কাছে থাকলে সুবিধা হয়।

২৭। এইটি জেনো, একটি ভোগ আর একটিকে আনে। তাই প্রথম থেকে এই ভোগকে কৃমি-কীটের বস্তু, হেয় বস্তু ভেবে যখন ত্যাগ ক'রে চ'লবে তখন দেখবে এতে আর আনন্দ পাবে না। একবার সত্য-শিব-সুন্দরের টান সৃষ্টি ক'রতে পারলে আর হেয় জিনিষে লোভ হবে না। যেমন ঠাকুর ব'লতেন, মিছরির পানা খেলে চিটে গুড়ের পানা তুচ্ছ হ'য়ে যায়। তোমরা যত এই মাটির ঊর্দ্ধে উঠবে তত দেখবে—কত আনন্দ ঊর্দ্ধলোকের।

২৮। যিনি ভিতরে শিব আছেন তিনি চান না যে পদদলিত হবেন। তাই আমরা সব ক্ষেত্রে জয়ী হ'তে চাই, এগিয়ে যেতে চাই।

২৯। সর্ব্বদা মনে রাখবে—একটি সর্ব্বোত্তম তত্ত্ব তোমাদিকে লক্ষ্য ক'রছেন গাইড ক'রছেন। এইটি মনে রেখে চলবে।

৩০। সব কিছু ইষ্ট-দৃষ্টি-ভঙ্গীতে দেখতে হয়। কথামৃতে যেমন আছে—বাবলা গাছ দেখে ভক্তটির ভাব হ'ল যে এতে রাধাকান্তের বাগানের কোদালের বাঁট হয়। তেমনি একটা ফুল দেখলে, অমনি মনে ক'রলে এতে বেশ পূজা হ'তে পারে। একটা কিছু খাবার জিনিষ দেখলে, মনে ক'রবে ঠাকুরের ভোগ হ'তে পারে।

৩১। সৃষ্টি তাঁর প্রকাশ ও বিলাস, যেন বৃত্ত ও তার কেন্দ্র। কেন্দ্র হচ্ছেন তিনি।

৩২। উপরে একটি, সুপ্রীম উইল (Supreme will) ভগবৎ-শক্তি আছেন। তিনি কখনও চেতন থেকে অবচেতনে হ'চ্ছেন প্রকাশিত, কখনও অবচেতন থেকে চেতনে হ'চ্ছেন প্রকাশিত।

৩৩। প্রত্যেকটি মানুষ তাদের নিজের নিজের জগৎ, ভাবের জগৎ নিয়ে ঘুরছে। সেই সব জগতের পরস্পরের ঠোকাঠুকিতে আর একটি কিছু তৈরী হ'চ্ছে। এমনি ক'রেই ভাবের অভিব্যক্তি চ'লেছে প্রত্যেক মানুষের।

৩৪। সংস্কার হচ্ছে ইম্‌প্রেসন্ (Impression)। খুব জটিল জিনিষ এটি। এতে হেরিডিটিও (Heredity) আছে, আবার রেস ইন্‌স্টিংট্-ও (Race instinct) আছে। আবার নিজস্ব সংস্কারও আছে—এবং তার সঙ্গে আছে ঠাকুরের কৃপার দান। (রেস ইন্‌স্টিংট্ হ'চ্ছে জাতিগত সংস্কার)

৩৫। শরীর মন আলাদা নয়, সেই একেরই প্রকাশ। মনের স্থূল প্রকাশ শরীর—শরীরের সূক্ষ্ম প্রকাশ মন।

৩৬। মানুষের চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা—এদের চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন 'তিনি'। এককথায় বা এক আইনে তাঁকে ধরা যায় না। তাই মনোবিজ্ঞানে নিয়ম সবসময় ঠিক হয় না। সব নিয়মের মত এও অ্যাভারেজ—খুব বেশী অ্যাভারেজ (গড়ে সত্য)।

৩৭। ব্রহ্ম বহু হবেন মনে ক'রেছেন ব'লে, এ ইচ্ছা করেন নাই যে আর কখনও এক হবেন না। তাঁর দুটি দিকই আছে। একটি বহির্মুখী টান, একটি অন্তর্মুখী টান। সাধারণ মনের তাই বহির্মুখী টান বেশী, কিন্তু অসাধারণ মনে টান অন্তর্মুখী—ভগবৎমুখী টান বেশী। আমাদের অসাধারণ হ'তে হবে।

গায়রোস্কোপ গাড়ী দেখেছ, এক লাইনের উপর চলতে পারে—যদি একদিকে ভার পড়ে তবে অন্য দিকে ঝুঁকে ভারসাম্য রাখে। এই রকম গায়রোস্কোপ যন্ত্রের মত হ'তে হবে। ভোগের দিকে মন যেতে যাবে কিন্তু আমাদের ঝোঁক (ব্যালান্স) ঠিক রাখতে হবে। এক চুলও unbalanced হ'তে, নড়তে দেবে না।

৩৮। কথাটা হচ্ছে এই যে, আমাদের বাইরের টান, ভেতরের টান, এর কোন্‌টা বেশী? সমষ্টিভাবে বহির্দিকের টান বেশী। কিন্তু ব্যষ্টিগত ভাবে অন্তরের। তাই সাধনা ক'রলে ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে পাবার চেষ্টা চলে, কিন্তু সমষ্টি ভাবে সমস্ত জগৎ তাঁকে পেতে চেষ্টা করে না। সমষ্টিতে তিনি

চেয়েছেন সৃষ্টির বিলাস। কিন্তু ব্যষ্টিতে তিনি চেয়েছেন স্ব-স্বরূপের দিকে গতি। যেন তাঁকে ছেড়ে না যায়। মা ছেলেকে খেলতে পাঠালেও, এ চান না যে ছেলে তাঁকে একেবারে ভুলে যাক।

৩৯। খেলা একটু-আধটুই ভাল। বেশী খেলা ভাল নয়—খেলা ত পশুত্ব। দেখ না—গরু ছাগল রাতদিন ঘুরে বেড়ায়, খেলে বেড়ায়।

৪০। ভাগবৎ যারা প'ড়বে, যারা ব'লবে, তাদের কিছু সাধনা দরকার। সাধনা ক'রে তাদের ভাগবৎ সম্বন্ধে কিছু বোধ আসবে, যথা ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু এই বোধ। এই বোধ হ'লে কথার ভেতর সেই বোধ, সেই প্রতীতি আসবে—তবেই লোকে সেটি অনুভব ক'রবে।

৪১। মেঘ যখন বর্ষণ করে তখন ঘন হ'য়ে আসে। তেমনি ধর্ম্ম-মেঘের যদি বর্ষণ চাও, তা'হলে ঘন হওয়া প্রয়োজন। ধর্ম্ম কথা, ভগবৎ কথা যেখানে হয়, সেখানে সুফল পেতে হ'লে শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে ব'সতে হয়। এবং সব এক জায়গায় ঘন হ'য়ে বসা দরকার। দেখ না, আসরে ভীড় না হ'লে যাত্রা বা অভিনয় জমে না।

৪২। মানুষের মনে সর্ব্বদাই একটা না একটা ভার থাকে। সেটা সাধারণতঃ জাগতিক ভার—যেমন কারও কাজের চিন্তা, কারও ভোগের চিন্তা। তেমনি ভগবৎ-বোঝা রাখতে পারলে একটু কাজের হয়। এই জাগতিক ভারটি যখন প'ড়ে যায়, তখন বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগে। তাই পরলোকের আত্মারা মহাপুরুষদের কাছে এসে বলে, ভাল লাগছে না। তার কারণ বোঝা নেই। তাই যতক্ষণ বোঁঝা থাকবেই, ততক্ষণ দিব্য বোঝা রাখতে হয়। তা'হলে শেষ যাত্রার সময় সুবিধা হয়। তা না হ'লে বড় ফাঁকা লাগে—আর কষ্ট হয়। ক্রমমুক্তি যা উপনিষদে ব'লেছে তা এই ভাবেই সম্ভব। তা না হ'লে এই বোঝাটুকু হারিয়ে, আবার বোঝার জন্য চেষ্টা জাগে। ফের সংসারে আসতে ইচ্ছা হয়।

৪৩। মনের নিয়ম হ'চ্ছে, যদি তাকে অন্তর্ম্মুখী ক'রতে যাও সে হবে বহির্ম্মুখী। বহির্ম্মুখে থাকবার সময় বরং হয়। যেমন সৎ প্রসঙ্গ, ভজন, কীর্ত্তন এই সব হ'চ্ছে—তখন হয়তো মন অন্তমুখী হ'ল। কিন্তু তাকে একটু চুপ ক'রে ব'সে অন্তর্ম্মুখী ক'রতে যাও—অমনি সে বাইরের দিকে ছুটবে। দৃঢ় অভ্যাসেই মনের এই উল্টো চলা ঘুচাতে পারা যায়।

৪৪। জলন্ত বিশ্বাস নিয়ে ডাকা চাই। যেমন ধর, গদাধর বা মোহন ব'লে ডাকছ; সে পাশের ঘরে কিংবা কোথাও না কোথাও আছে—সে শুনছে ও শুনতে পেলেই আসবে, এ বিশ্বাস বেশ আছে। শুধু 'হরে কিষ্ট হরে কিষ্ট' ব'ললে হবে না—জলন্ত বিশ্বাস চাই যে, তিনি শুনছেন।

৪৫। এ যুগের ঠাকুর বড় বেশী কৃপাময়। একটু ক'রলেই ঠাকুর কৃপা ক'রবেন। এ যুগ কৃপার যুগ; কারণ এ যুগে বাইরের টান তিনিই বেশী ক'রেছেন, তাই কৃপাও বেশী ক'রতে হবে।

৪৬। আমরা যখন বিচার করি, আমাদের অবচেতনে একটা মাপ বা Standard থাকে। বর্ত্তমানের দেশ কালটিই আমাদের মনে একটি ছাপ রেখেছে। কিন্তু এই বর্ত্তমানের মধ্যেও পূর্ব্বেকার ছাপ রয়েছে। সর্ব্বোপরি আত্মার পূর্ব্ব সংস্কার বা ছাপ তো আছেই। ঋষিদের যুগটা আমরা ঠিক বুঝতে পারব না, কারণ আমরা সে যুগ থেকে স'রে এসেছি। এটা ঠাকুরের যুগ। সর্ব্বভাবে তাঁর আদর্শই আমাদের গ্রহণ ক'রতে হ'বে। ঠাকুরের আলোতে আমরা চারপাশ দেখবার চেষ্টা ক'রব। এখন অখণ্ড জগৎ, তাই ঠাকুরও সেই ভাবেই অগ্রদূত হ'য়ে এসেছিলেন—মহাসমন্বয়াচার্য্য-রূপে। ধর্ম্ম-চক্র যাঁর হাতে, তিনি ঠিকই পাঠাচ্ছেন। এগুলি সমাজ গঠনের পক্ষে প্রয়োজন। আমার মনে হয়, একটা ব্যালান্স আছে।

আচার্য্য শঙ্করের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম খুব উঁচুতে উঠল, প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এই জ্ঞানময় অবস্থা র'ইল না, প'ড়ে গেল। আসলে ঠাকুরের কথা, বুড়ির খেলা চলুক। তাঁর ঠিক করা আছে—যখন যেমন প্রয়োজন তেমনি পাঠাচ্ছেন। মহাকালের চক্রে ঘুরে ঘুরে এলে, লীলা চলে না। যেমন একটি লোক যদি ক্রমাগত এক অবস্থায় থাকে, ভাল লাগে না। তাই কখন হাসি—কখন কান্না। ঠাকুরেরও সেই লীলা। একজন এসে একটি ধর্ম্মকে তুলে ধ'রলেন, আবার প'ড়ে গেল—আবার একজন এসে তুলে দিলেন। লীলা-বিলাস চ'লেছে যুগ যুগ ধ'রে।

৪৭। ঠাকুরের এই ব্যালেন্স নিয়ে লীলা। ছেলে যদি শুধু বই নিয়ে পড়ে, তা'হলে মা বাপের ভাল লাগে না। আবার শুধু খেলে বেড়ালেও ভাল লাগে না। ঠাকুরের বেলায়ও তেমনি। আমরা শুধু যদি বনে বনে সন্ন্যাসী হ'য়ে ঘুরে বেড়াই, এও ঠাকুরের ভাল লাগে না—কি ব্যষ্টি, কি সমষ্টি সব বিষয়ে।

এমনি ক'রে ঠাকুরের ব্যালান্স নিয়ে খেলা চ'লছে। ভাল–মন্দ হ'চ্ছে মন্দ—ভাল হ'চ্ছে। "বুড়ির খেলা চ'ললেই আনন্দ"—শ্রীঠাকুর।

৪৮। কার্য্য-করণ-সম্বন্ধ ধ'রতে পারলে ডিটারমিনেসি (Determinacy) বলি। না ধরতে পারলে বলি ইনডিটারমিনেসি (Indeterminacy)—যা হাইসেনবার্গ বা ডিরাক্ এরা ব'লেছেন। বিশ্বাসের চরম সত্য ব'লে এটা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর ক'রছে। তাঁর কাছে সব স্থিরীকৃত হ'য়ে আছে। আর আমাদের কাছে সব অজ্ঞাত রহস্য।

৪৯। তিনি "জীবভূত সনাতন" রূপে এগিয়ে যাচ্ছেন আর পুরুষোত্তম রূপে, সর্ব্বাতীত রূপে, তিনি টেনে নিচ্ছেন কাছে। একেই অ্যারিষ্টটল 'প্রাইম মুভার' (Prime mover) ব'লেছেন। আর প্লেটো আমাদের দর্শনে অনুপ্রাণিত হ'য়ে আদর্শের টান ব'লেছেন (Pull of the Forms)। এটি কিন্তু সব ঘটে হ'চ্ছে। আর সত্য প্রকাশ সব যুগের ঋষিদের কাছেই হ'য়েছে।

৫০। জগৎ কতকগুলো ছায়ার সমষ্টি—পরমাত্মার ওপরে। কতকগুলো জটিল সম্বন্ধের সমষ্টি নিয়ে একটি ব্যষ্টি, এই আত্মা।

৫১। মানুষের মনের গতি সত্য-শিব-সুন্দরের দিকে। জগতে 'ইভলিউসন্ (বিবর্ত্তবাদের) মতে বুদ্ধির জয় হ'য়েছে মানুষের জয়ের সঙ্গে সঙ্গে। বুদ্ধির লক্ষ্য, বোধির লক্ষ্য শ্রেয়র প্রতি, প্রেয়র প্রতি নয়। তাই ফ্রয়েড্ প্রভৃতির মত, ঠিক মনে হয় না। মনে হয় না, সব অবচেতনের খেলা মাত্র।

৫২। ফুল নিয়ে একটা সাধনা আছে। সারা জীবনটা এই ফুলের মত গ'ড়ে তুলে, যেদিন যাত্রা ক'রব সেদিন এই ফুলের মতই ঠাকুরের চরণে ঝরে প'ড়ব।

৫৩। ভক্তের জন্য ভগবানের চির চঞ্চলতা। যেমন মা'র ছেলের জন্য চিন্তা চিরকাল।

৫৪। দক্ষিণেশ্বরে ধূলি রেখে দেবে। মাথায় ঠেকাবে। যে জায়গায় ভগবান বুক নিঙ্ড়ে তপস্যা ক'রেছেন সেখানকার মাটি পূততম, charged হ'য়ে আছে। সেটি রোজ দ্বিজল চক্রে লাগানো উচিৎ।

৫৫। তিনি কৃপা ক'রে, জোর ক'রে, নিয়ে চলুন তাঁর দিকে। এই প্রার্থনা "হে ঠাকুর, তুমি তেষ্টাও জাগাও, সব জোগাড় ক'রেও দাও, তোমার যত আছে সব কর"—এই প্রার্থনা।

৫৬। মানুষের আনন্দের স্তর বিভাগ আছে। এক টাকা, দু' টাকা, যখন রোজগার করে তখন তাতে তার আনন্দের পূর্ণতা হয় না। তাই আরো চেষ্টা করে—পরে হয়তো পায় এবং আনন্দও বেশী হয়। কিন্তু ঠাকুর ব'লেছেন ঈশ্বর-আনন্দ সর্ব্বোত্তম স্তর। সে আনন্দ সে পায় নি—তাই এই ক্ষুদ্র বিষয়ে আনন্দ পেতে চায়; কিন্তু আনন্দ ঠিক পায় না।

তাই আমাদের প্রার্থনা করা—"হে ঠাকুর! তোমার আনন্দের নেশাটি দাও।"

৫৭। তাঁর কাছে ঠিক ঠিক চাইলে, ঠিক ঠিক পাবে। ঠাকুরই এদিক ওদিক ক'রে ঠিক ক'রে নেবেন।

কিন্তু খাঁটি হ'তে হবে। আর নাম ক'রে যাও। মনে রেখো, তোমাদের নিজেদের জন্যে শুধু নয়। একটা দাগ রেখে যেতে হ'বে। বহুর কল্যাণের সঙ্গে তোমরা জড়িয়ে আছো—একটা বড় আদর্শ থাকলে, সহজে নীচে নেমে যেতে পারবে না।

৫৮। বাইরে কিছু ঘটবার আগে অন্তর্লোকে সূক্ষ্ম লোকে সেটি ঘটে। হোঁচট খাবার আগে মনটা প'ড়বার জন্য তৈরী হ'য়ে থাকে। প্রত্যেকটি ভোগের আগে মনটি প্রথমে ফোঁস ক'রে ওঠে, কিন্তু পরে ধীরে ধীরে নেমে আসে। শ্রীঠাকুরের কথা "কেল্লায় নেমে যাওয়ার মত।" গভীর রাত্রে উঠে বিচার ক'রবে "মন কি চাস"? বুক নিঙড়ে ক'রবে ঠাকুরকে লাভ ক'রবার প্রার্থনা। প্রত্যেকেই জান, নিজের মনের কোণে কোথায় ভোগের জন্যে সূক্ষ্ম বাসনা সব কাঁটার মত খচ্ খচ্ ক'রছে।

৫৯। যার যে বিষয়ে হীনতা আছে তার সেই বিষয়ে আগে থেকে সচেতন থাকতে হয়। যেমন যার ক্রোধ বেশী তার আগে থেকে ক্রোধের বিরুদ্ধে মনকে তৈরী রাখতে হয়—বিচার এই সব ক'রে।

৬০। মানুষ গ'ড়তে যাওয়া, মানুষের ভাল ক'রতে যাওয়া বৃথা আমাদের। শিব গ'ড়তে বানর হ'য়ে যাবে। মানুষ গ'ড়ছেন ঠাকুর নিজে। আমাদের কাজ, বড় জোর তাঁর দাস হ'য়ে কাজ করা।

৬১। ভগবৎ লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত দিব্য কাজ হয় না, তার আগে বাসনা কামনার কাজ। ভগবৎ লাভের পর তখন ভগবৎ কাজ; তাঁর কাজ—তাঁরই প্রেরণা। তার আগে মানুষ তবে কি ক'রবে? তখন গুরু নির্দ্দেশ। ঠাকুরের

বলা আছে, এও কর্ম্মযোগ। আর আছে—তাঁর নাম চিন্তা ক'রে, প্রার্থনা ক'রে কাজ ক'রে যাওয়া।

৬২। ব্রহ্মচর্য্য পালনের চেষ্টা—এটিও ঠাকুরের কাজই করা হ'চ্ছে।

৬৩। মানুষের মনে দু'টি শক্তি নিয়ত খেলা ক'রছে। একটি তাকে বহির্মুখে, আর একটি অন্তর্মুখে বা সূক্ষ্ম দিকে টানছে। বহির্মুখের টান আপাততঃ জোর হ'লেও সূক্ষ্মের টান ভবিষ্যতে জয়ী হয়। আত্যন্তিকে সবই ব্রহ্মস্থ হবে।

৬৪। ধ্যান হ'চ্ছে সূক্ষ্ম রাজ্যে প্রবেশ। এই সূক্ষ্ম রাজ্যে সবাই প্রবেশ ক'রতে চাচ্ছে। সায়েন্স, আর্ট, সকলের চেষ্টাই এই সূক্ষ্ম তত্ত্বে প্রবেশ। কিন্তু ভগবৎ চাওয়াটি অপেক্ষাকৃত সূক্ষ্ম।

৬৫। আইডিয়ালিস্‌ম্‌ বা ভাববাদ শুধু প'ড়ে গেলে হবে না। বা মুখে ব'ললে হবে না। এটি সাধনা ক'রতে হয়। সন্দেশটা বা ভোগের জিনিষটা কি ?—না সত্যি ক'রে একটা ভাব বা মনের গ্রহণভঙ্গী। ভাল মনে ক'রে নিয়েছি, তাই সেটি ভাল। শ্রেয়টি যদি ভাল ব'লে ঠিক ক'রে নিই, তা'হলে আর প্রেয় জিনিষ ভাল লাগবে না। আজকালকার বিজ্ঞানও বস্তুকে বস্তু ব'লছে না। একটা ভাবমাত্রই ব'লছে।

৬৬। জগতের কল্যাণ বল'তে যে কি বলা হয় বোঝা মুস্কিল। কেউ বলেন সুখই কল্যাণকর। অর্থাৎ সব মানুষই যখন সুখ চায়, তখন যত পার সুখের আয়োজন ক'রে যাও। কেউ বলেন নিজের সুখ (চার্ব্বাক ইত্যাদি)। কেউ বলেন সবারই সুখ। কেউ বলেন (স্পেনসার) "দীর্ঘ কর্ম্মময় জীবন"। কেউ বলেন utility (বেনথাম), greatest happiness of the greatest number—প্রয়োজনোপযোগিতা, আবার বৃহত্তম সংখ্যার বৃহত্তম সুখ। কেউ বলেন (কাণ্ট) "ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা"—অর্থাৎ ভোগের ইচ্ছা হ'চ্ছে ভোগ ক'রব না—কারণ তা ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা নয়, তা আমাদের কর্ত্তব্য নয়। এইটিকেই কাণ্ট পূর্ণ মঙ্গল ব'লেছেন। আর এইটিই ধর্ম্ম। কেউ বলেন আত্মার পূর্ণ বিকাশ (self-realisation)—প্লেটো, গ্রীণ. এঁদের এই সব মত। তারপর (highest good) ন্যায়সঙ্গত চিন্তাশীল মানবের পূর্ণ পরিতৃপ্তি—যত প্রকার মূল্য আছে তাদের পূর্ণ পরিণতি। এ সবই কাজের সময় গোলমেলে মনে হয়। কাজেই জগতের কল্যাণ যে কি সেটি আমরা ঠিক বুঝব না। সত্যকার কল্যাণ হয় ভগবৎপথে, ইষ্টপথে যদি পড়া যায়। পবিত্রতা, ত্যাগ—এই সবে প্রকৃত কল্যাণ।

স্বার্থ ত্যাগ ক'রতে পারলে সবারই কিছু কল্যাণ করা যায়। আসল কথা, অপরের কল্যাণ ক'রতে হ'লে আগে নিজের 'অকল্যাণ' ক'রতে হবে। না হলে অপরের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া ঠিকমত বিশ্বের কল্যাণ একমাত্র তিনিই ক'রতে পারেন। তাই বিশ্বের কল্যাণ ক'রতে হ'লে আগে সেই পরম কল্যাণতম সত্ত্বাকে লাভ ক'রতে হবে।

৬৭। আমার মনে হয় ইলানভাইট্যাল বা যে দিব্যশক্তি আমাদের চালাচ্ছেন সে শক্তি আমাদেরই ভেতর আছে। সেই শক্তি দিয়ে আমরা মানুষকে ব'দলে দিতে পারব। সমাজবিজ্ঞানীদের কেউ বলেন, পারিপার্শ্বিকের শক্তি বড়—কেউ বলেন বংশপরম্পরাগত দোষগুণই বড়, কেউ বলেন জাতিগত শক্তি (Race instinct) বড়। কিন্তু আসলে সেই এক ইলানভাইট্যালই এ সবের ভিতর খেলা ক'রছেন, আমাদের তৈরী ক'রছেন। কোনটি ভেতরের, কোনটি বাইরের—কোনটি স্থূল, কোনটি সূক্ষ্ম।

৬৮। মনকে ঊর্দ্ধমুখী ক'রতে হবে। কি বহির্বিষয়ে, কি অন্তর্বিষয়ে—কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে ; সর্ব্বদা ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, উচ্চ চিন্তা, এই সব রাখতে হবে।

৬৯। (ভোগে তৃপ্তি হয় না কেন এবং কে ভোগ ক'রছে ?)—ভোগ ক'রছেন তিনিই। কিন্তু যে বোধটা হ'চ্ছে সেটা ত তাঁর বোধ নয়—বোধ হচ্ছে আমাদের। এই আমিটা হ'চ্ছে তাঁর লীলা-সৃষ্ট সত্ত্বা। কিন্তু এই সত্ত্বার তৃপ্তি হয় না। কারণ সে তো আর ভোগ ক'রছে না।

এখন ধর, একটা নল দিয়ে চৌবাচ্চায় জল ঢালা হ'চ্ছে, তাতে পূর্ণ হ'চ্ছে চৌবাচ্চাটাই—কিন্তু মধ্যখান থেকে নলটার গায়ে একটা আভাষ থেকে যাচ্ছে। তাতে নলটার হয়তো চঞ্চলতা বেড়ে যাচ্ছে, কিন্তু নলটা ঐ জন্যই আছে। যেমন জিভে তুমি রসগোল্লা দিলে জিভের একটু চঞ্চলতা হ'ল মাত্র—কিন্তু ভ'রলো পেট। তেমনি এই সত্ত্বাটিও তাঁর লীলার সহায়ক হ'য়ে আছে। এর অতৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা এসব তাঁরই দেওয়া—সে কখনও তৃপ্ত হ'তে পারে না। তিনি নিজেই আনন্দ ক'রছেন, মাঝখানে রেখে দিয়েছেন এই সত্ত্বাকে। কাজেই আমাদের এই সত্ত্বাটি তৃপ্ত হবে কেমন ক'রে।

৭০। মনোবিজ্ঞানে (ওয়েবার) একটা কথা আছে—উদ্বোধক বাড়িয়ে গেলে সংবৃত্তি সেই পরিমাণে বাড়ে না। কোন এক জায়গায় আঘাত দিচ্ছি—আরও দাও—আরও দাও, ক্রমে দেখবে আর লাগছে না। মিষ্টি খাচ্ছ, বাড়িয়ে

যাও—দেখবে মুখ তেতো হ'য়ে গেছে। তাই আবছা ভোগ ভাল। ধর একটা ফুল দেখলাম, একটু আনন্দ হ'ল—কিন্তু তাকে সবলে ধরতে যেও না, ঝরে প'ড়বে। ভোগের কাছে এগিয়ে যেও না, ভোগ সুখ বেশী ক'রতে চেও না—তাহ'লেই সেটি কম হ'য়ে যাবে। বিষিয়ে যাবে।

৭১। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান ব'লছে দেহ এবং মন দুটো পাশাপাশি চলে। দেহের কিছু হ'লে মন পাল্‌টে যায় এবং মনের কিছু হ'লে দেহ পাল্‌টে যায়। আমার কিন্তু মনে হ'চ্ছে এক আত্মা এই দুটি হ'য়েছেন দেহ এবং মন। কাজেই তিনি যখন যেমন থাকেন দেহমন ঠিক তেমনি হ'য়ে যায়। যেমন শরীরের একটা অংশ নড়লে অপর অংশগুলিও নড়বে। তেমনি আত্মা যদি 'কাদা'তে ডুবতে যায় তবে দেহ মন তেমনি মলিন হ'য়ে যাবে। আর আত্মা যদি জ্যোতির দিকে যায় তবে দেহ মনও জ্যোতিস্বরূপ হ'য়ে যাবে। দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুর যেমন ব'লেছেন "চৈতন্য বায়ু যেমনে নিয়ে যাবে"।

৭২। বিশ্বাস মনের একটি অবস্থা। এমন একটি ভাইব্রেসন্ (vibration) যা মনকে ঊর্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধমুখে নিয়ে যায়। যেমন কাল সূর্য্য উঠবে এটি যদি আমরা বিশ্বাস না করি তা'হলে কালকের জন্য যে কাজ রাখা আছে তা আর হ'ল না। কারণ কালকের দিনটা আসবে কিনা তারই ত স্থিরতা নাই। কোন কাজই তাহ'লে হয় না, চুপচাপ বসে থাকতে হয়। প্রত্যেকটি জিনিষের বিশ্বাস আমাদিগকে ঊর্দ্ধ হতে ঊর্দ্ধপানে নিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বাস ও জ্ঞান এক; এবং বিশ্বাস ও ঠাকুর এক। শ্রীঠাকুর ব'লেছেন "বিশ্বাসে মিলায় বস্তু।" সবেরি আদিতে বিশ্বাস, অন্তেও তাই। তবে যা কিছু সৎ, চিৎ ও আনন্দ তাতেই বিশ্বাস রাখতে হয়।

৭৩। মনকে যত কমপ্লেক্স বা জটিল করা যায় তত বাঁধুনি দেওয়া হয়। সরল মনে ভগবান লাভ হয় একথা ঠিকই—কিন্তু আমাদের মন ত সরল নয়। আমাদের মনে ত জটিলতা এমনিই আছে, সহজে এ জটিলতা কাটেও না। কাজেই একে আরও জটিল ক'রে ঠাকুরকে বাঁধবার দড়ি তৈরী ক'রতে হয়। জটিলতার দ্বারাই জটিলতা নষ্ট হয়। যেমন শ্রীঠাকুরের কথা, জ্ঞান কাঁটা দিয়ে অজ্ঞান কাঁটা তোলা।

৭৪। (সমাধিতে কি জগৎ-বোধ থাকে না?) প্রথম, সবিকল্পে সমাধিতে তো থাকেই। আর নির্ব্বিকল্প সমাধিতেও জগৎ-বোধ থাকে। সবই

থাকে ক্ষীণতম ভাবে। জগৎ-জ্ঞান ব্রহ্মে রয়েছে, জীব তো তার একটা অংশ। আর জীবের সমাধিতে জগৎ-জ্ঞান গেলেও, ব্রহ্মের ত আর যায়নি। কাজেই জীব যখন তাতেই যুক্ত হয় তখন তার জগৎ-বোধও থাকে। কেবলমাত্র দৃষ্টিভঙ্গী পালটে যায়। ক্ষুদ্র দৃষ্টি ভূমায় পরিণত হয়। তবে শঙ্কর মতে এটি নয়।

৭৫। জগৎটা আত্যন্তিকে ব্রহ্মস্বরূপ—অনাত্যন্তিকেও ব্রহ্মস্বরূপ। এক আছে ব্রহ্ম। যা আছে তাই আছে। ধরো, এক চ্যাঙরা খাবার আছে—আমরা যদি নাড়ু পাকিয়ে খাই, তাকে তো নাড়ু সবাই বলে না। সেই রকম আমরা সুবিধা খুঁজি বলে সেই রকম নিয়ম বা Law দেখতে পাই ; তাই সেটা প্রকৃতির উপর চাপিয়ে দেই। প্রকৃতিতে যে Law বলি, তা আমাদের মনের দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। আছে একটি জিনিষ—তাকে আমরা নিজের সুবিধা মত যাই বলি না কেন।

৭৬। রামকৃষ্ণ লোক হচ্ছে সূক্ষ্মতম লোক। বাতাসের স্থূল স্তর, সূক্ষ্ম ও সূক্ষ্মতর স্তর আছে—তেমনি সৃষ্টির অন্তরতম দেশ হচ্ছে এই লোক।

৭৭। সবই আপেক্ষিক, তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে পুরো সত্য ব'লে প্রতীতি হয় মাত্র। যেমন ধরো, চোর যখন চুরি করে তখন মন মুখ এক ক'রে ভাবতে চেষ্টা করে—আমি ঠিক কাজ করছি। অভাবে পড়ে সেই স্থান-কাল-পাত্রে সে কাজটা ঠিক ভেবে নেয়। কিন্তু পরে সেই চোরই ভাবে, আমি ভুল ক'রেছি। এখানে ভুল। তেমনই স্থান-কাল-পাত্র ভেদে সত্য বদলে যায়। এই হচ্ছে রিলেটিভ বা আপেক্ষিক সত্যের রূপ। অ্যাবসলিউট্ বা অনাপেক্ষিক সত্য হ'চ্ছে প্রতীতিবিহীন বোধস্বরূপ। যেমন মাটির জিনিষ আর মাটি।

৭৮। শ্রীঠাকুরের 'তিনি'-তত্ত্ব হ'চ্ছেন রঙ্গ তত্ত্ব—লীলা তত্ত্ব। তিনি নিজেই শঙ্করের মধ্যে থেকে শঙ্করকে বলাচ্ছেন ব্রহ্ম নির্গুণ, আবার রামানুজের ভিতর থেকে বলাচ্ছেন—আমি সগুণ। এইরকম ক'রে তিনি তাঁর অনন্ত তত্ত্ব অনন্ত রূপে বা ভাবে প্রকাশ ক'রে গেছেন, যাচ্ছেন—যাবেন। তাঁর ভাবেরও ইতি নেই—তত্ত্বেরও ইতি নেই। শ্রীঠাকুরও বলতেন, তাঁর ইতি করোনা। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের 'তিনি'-তত্ত্ব দর্শনের উচ্চতম তত্ত্ব—ঠাকুর ব'লেছেন, তিনি সাকার-নিরাকার আরো কত কি। তাঁকে বেদে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম ব'লেছে, পুরাণে সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ ব'লেছে, তন্ত্রে সচ্চিদানন্দ শিব ব'লেছে। ঠাকুর অনেক স্থানেই

তাঁকে 'তিনি' বলেছেন—নামহীন রূপহীন, আবার ব'লেছেন তাঁর নিত্য সাকার রূপও আছে।

৭৯। ঠাকুরের বিরহ-মিলন-লীলা থেকেই স্মৃষ্টি। ঠাকুরই সব হ'য়ে আছেন। কখনও মিলন ক'রছেন আবার কখনও বিচ্ছেদ—বিরহ করছেন। যেমন জড় চাচ্ছে চৈতন্যময় মানুষকে আবার মানুষও চাচ্ছে এই জড়জগৎকে জানতে। কিন্তু ঠাকুরই জড়জগৎ বা মেটিরিয়েল ওয়ার্লড আবার মানুষ, সবই হ'য়েছেন। আবার দেখো ইলেকট্রন প্রোটন চাচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে। তাই নিয়ে বস্তু স্মৃষ্টি হ'চ্ছে। আবার ছুটে বেরিয়েও যাচ্ছে—আলো রূপে, আর ধ্বংস লীলা ক'রছে। কিন্তু এ সবই ঠাকুর। বিরহ তিনি ক'রেছেন—মিলনও তিনি ক'রছেন। যেমন ঠাকুরই একরূপে মেঘ হ'য়ে চাচ্ছেন ধরার বুকে ঝরতে, আর এক রূপে পৃথিবী হ'য়ে চাচ্ছেন মেঘকে। মেঘও জল হ'য়ে ঝরছে পৃথিবীর বুকে, হ'চ্ছে মিলন—আবার জল শুকিয়ে গিয়ে বিরহের স্মৃষ্টি ক'রছে। এমনি ক'রে চলেছে বিরহ-মিলন-লীলা। ঠাকুর একরূপে রাধা হ'য়ে চাচ্ছেন শ্যামকে, আবার শ্যাম হ'য়ে চাচ্ছেন রাধাকে। বিরহী হ'য়ে চাচ্ছেন মিলনকে—আবার মিলনে চাচ্ছেন বিরহী হ'তে।

৮০। আমাদের মনকে ক'রতে হবে absorbent, আকর্ষণী শক্তিময়। আমাদের মনে স্মৃষ্টি ক'রতে হবে বিরাট প্রেমের আকর্ষণী শক্তির। যা কিছু সৎ, সুন্দর, দিব্য, পবিত্র, মহান্—তাই প্রাণায়াম ও নাম সহায়ে, মনের জোর ক'রে আমাদের সত্তায় টেনে নিতে হবে। যেমন এই আকাশ থেকে উদারতা টেনে নিতে হবে। ফুঁলের থেকে পবিত্রতা টেনে নিতে হবে—ঠাকুরের কাছে থেকেও খানিকটা শক্তিও টেনে নিতে হবে।

৮১। যার যেমন মনের আলো সে সেই রকম আলো তাঁর উপর ফেলে, বলছে তিনি এই রকম। কেউ তাঁর খণ্ডের আলো ফেলে বলছে তিনি খণ্ড, কেউ অখণ্ডের আলো ফেলে বলছে তিনি অখণ্ড। আমরা তাঁর সম্বন্ধে যা কিছু জানি তা অতি সামান্য, আর তা হ'চ্ছে আপেক্ষিক—রিলেটিভ। কারণ আমরা তাঁকে দেখছি আমাদের অহং-এর আলো দিয়ে। কাজেই সে জানা হচ্ছে রিলেটিভ। আমরা তাঁকে অখণ্ড বলছি—সেও তো আমাদের চিন্তা দিয়ে। কাজেই অনন্ত বললেও ঠিক বলা হয় না। শ্রীঠাকুরের কথা, ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সে মনে করেছে, ঈশ্বর এমনি আর কিছু নয়।

৮২। প্রত্যেক অবতারের নিত্য লীলা, নিত্য ধাম যদি থাকে তবে নিত্য ধাম বহু হয়। কিন্তু নিত্য বৃন্দাবন এক। এই নিত্যলীলা যেখানে হ'চ্ছে, সেখানে এক নিত্যরূপ তত্ত্ব আছে। সেখানে তিনি অনন্ত রূপে শান্ত হ'য়ে বর্ত্তমান। সেখানে শিবভক্ত তাঁকে শিব দেখবে, রামভক্ত রাম দেখবে, রামকৃষ্ণ ভক্ত রামকৃষ্ণ দেখবে। সব লোক সেই এককেই দেখবে। সেখানে তিনি নিত্য রূপে বর্ত্তমান। এই নিত্য বৃন্দাবন, এখানেই নিত্যলীলা। ঠাকুরের যেমন বলা আছে, এমন জায়গা আছে যেখানে বরফ গলে না– স্ফটিকের আকার।

৮৩। সন্ধ্যা দেখে কি মনে হয় জান। সন্ধ্যা যেন যোগসূত্র। ইহ-পরকালের মধ্যে, সৃষ্টির ও স্রষ্টার মধ্যে, অনন্তের সহিত শান্তের, সীমার সহিত ভূমার যে একটা যোগসূত্র আছে সে এই সন্ধ্যাকে দেখলেই বেশ বুঝতে পারা যায়। কোন কিছুই বিচ্ছিন্ন নয়; সবের মধ্যেই একটা যোগসূত্র আছে।

৮৪। পরিবর্ত্তন বা চেঞ্জ ভিন্ন মানুষ বাঁচতে পারে না। এই সৃষ্টির মানেই পরিবর্ত্তন। এই পরিবর্ত্তন যে মন থেকে উঠিয়ে দিতে পারবে সেই সৃষ্টির পারে চলে যাবে।

৮৫। আমাদের মন গতিশীল, সেইজন্য ব্রহ্মের ওপর পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম এই সব চিন্তা করে। বার্গশর ইলানভাইট্যাল নিত্য "ইমার্জ" ক'রে চ'লেছেন, এটাও আমাদের মন গতিশীল ব'লে—এসেছে। আমাদের মন স্থির থাকতে পারেনা ব'লে আমরা এই রকম চিন্তা করি। কিন্তু আমাদের মন যখন স্থির হ'য়ে যাবে তখন তিনিও আমাদের কাছে অচল অটল সুমেরুবৎ চিরস্থির হ'য়ে যাবেন।

৮৬। নিরপেক্ষ সত্ত্বা (এ্যাবসলিউট) সাপেক্ষ সত্ত্বা (রিলেটিভ) দুটোই এক—অভেদ। একটা জিনিষেরই দুটো দিক। এ্যাবসলিউট ভাবলে রিলেটিভকে ভাবতে হয়। আবার রিলেটিভ থেকেও এ্যাবসলিউটকে বাদ দেওয়া যায় না। আমরা যত রকম ভাবের কথা বা যে কথাই বলি সেগুলি পরস্পর যুক্ত (relative)। ঠিক নিরপেক্ষ সত্ত্বার কথা বলা যায় না, ভাবা যায় না।

৮৭। প্রেম, ভালবাসা কি অত সোজা জিনিষ! Love is death. সমস্ত কিছু থেকে মন সরে যাবে, তখনই হবে প্রেম। ঠাকুর ব'লেছেন, দেহ ভুল হ'য়ে যাবে।

৮৮। ঠাকুর এখন লীলা ক'রছেন তাই চাচ্ছেন, আমার সৃষ্টি বিলসিত হোক। আবার যখন সৃষ্টি তিনি নিজের ভিতর গুটিয়ে নেবেন, ব'লবেন—না আর থাক্, শান্ত হবেন, সেইদিনই প্রলয় হবে—সব গোলমাল মিটে যাবে। তাই সৃষ্টিতে এত গোলমাল, আমরাও নিম্নমুখী।

৮৯। অসুখের যেমন বীজাণু (Germs) আছে, তেমনি মনের অসুখেরও বীজাণু আছে।

৯০। মনকে বড় বড় তত্ত্বে তুলে রাখবার চেষ্টা ক'রবে। দিনে অন্ততঃ একবারও রামকৃষ্ণ লোকের চিন্তা ক'রবে। অনুভূতি না হোক, দিনে একবারও 'সর্ব্বভূতে ঠাকুর' ভাববে—তা হলেই অনেক কাজ হবে।

৯১। মহাপুরুষরা এমন কাজ করেন না, ক্ষমতা থাকেতও, যা লোকে গ্রহণ ক'রে সামাজিক বিপ্লব আনতে পারে। তাঁরা যা আচরণ ক'রবেন লোকে তাই নেবে। তাই তাঁরা অন্যায় আচরণও, এমন কি মনেও, করেন না। যেমন, ব্রহ্মজ্ঞের কাছে সত্য মিথ্যা সব সমান—কিন্তু তবু মিথ্যা আচরণ করেন না, যাতে না লোকে এটিই গ্রহণ করে ফেলে। মহাপুরুষদের আচরণ সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা কল্যাণমুখী—বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়।

৯২। দক্ষিণেশ্বরের ধূলিতে গড়াগড়ি দিলে জ্ঞান, ভক্তি, বিবেক, বৈরাগ্য, সব হয়। এখানে স্বয়ং ঠাকুর মাথাকাটা তপস্যা ক'রেছেন—সব রকমে।

৯৩। Fineries come from fineness, from grossness comes grossness. •

৯৪। গুরুর আদেশে কাজ করাই তপস্যা। প্রথম গুহায় ব'সে কি জপ ধ্যান ক'রতে পারা যায়—তাই কাজ ও জপ ধ্যান দুই চাই। তৈরী হ'লে তবে শ্রীঠাকুরই কাজ কমিয়ে দেন।

৯৫। ঠাকুর সূক্ষ্ম, তাই স্থূল মন তাঁকে চায় না, পায়ও না। ঠাকুর যদি সন্দেশ হ'তেন তা'হলে চাহিদা দেখতে। আমাদের মন স্থূল কিনা, তাই সূক্ষ্ম-ভাব-রূপ ঠাকুরকে চাওয়া হয় না।

৯৬। ঠাকুরের কাজ যা ক'রছ উত্তম তপস্যা। ঠাকুরের মনে যদি একবার হয় যে ছেলেটা আমার জন্য খেটে খেটে গেল তা'হলে তোমার চৌদ্দ জনম ধন্য হবে।

৯৭। ঠাকুরই শ্রেয় এবং ঠাকুরই প্রেয় হোক, এই চেষ্টা কর—প্রার্থনা কর। শ্রেয় আর প্রেয়র মাঝে যে দ্বন্দ্ব আমরা নিত্য অনুভব করি সেটি তা'হলে মিটে যাবে।

৯৮। নানা গোলমালের মধ্যে ঠাকুরকে মনে রাখা চাই, এইখানেই মনের পরীক্ষা।

৯৯। ঠাকুরকে যত আনা মন দিতে চাও তত আনা মন সংসারে থেকে সরিয়ে আনতে হবে।

১০০। ঠাকুরের সর্ব্ব-ধর্ম্ম-সমন্বয় যদি আমরা মেনে নিই, তা'হলে সব ধর্ম্মের কল্যাণতম ভাবগুলি আমাদের নেওয়া উচিৎ। যেমন খৃষ্টানদের প্রার্থনা, বৈষ্ণবদের নাম, বৈদান্তিকদের বিচার, বৌদ্ধদের নৈতিকতা।

১০১। "ঠাকুর! গঙ্গাজলের মত পবিত্রতা দাও—আমাকে এবং সবাইকে"—যা কিছু পবিত্র ও কল্যাণময় তাই দেখে এই প্রার্থনা ক'রতে হয়।

১০২। "কথামৃত" শোনবার সময় দৃঢ়ভাবে মনে রাখতে হবে—কথামৃত হচ্ছে শ্রবণ-মঙ্গল। কানে শুনলেও মঙ্গল হয়। আর কল্মষাপহম্ – অর্থাৎ সমস্ত পাপ হরণ করে।

১০৩। আমাদের অজ্ঞাতসারে আমরা যখন ধর্ম্মমুখী, সত্য-শিব-সুন্দরমুখী হ'তে পারব তখন বুঝতে হবে আমরা ধর্ম্মরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'তে পেরেছি।

১০৪। সব জিনিষ আমাদের আকর্ষণ ক'রছে—আবার বিকর্ষণ ক'রছে। এটি আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত। তাই যেখানে আকর্ষণ সেখানেই বিকর্ষণ হবে। 'সাধু সাবধান'—শ্রীঠাকুর।

১০৫। সর্ব্বদা নাম ক'রবে। বর্ত্তমানে নামাপরাধে জগতের এই দুর্দ্দিন।

১০৬। শ্রীঠাকুর ব'লেছেন, সর্ব্বদা স্মরণ মনন রাখা উচিৎ—এতে প্রতিষ্ঠিত হ'লে মনে স্মরণ ত হ'বেই, দেহের অণুপরমাণুও স্মরণে উচ্ছ্বসিত হবে।

১০৭। হরিময় হও। হরি চরণাশ্রিত হও—কায়মনোবাক্যে।

ইচ্ছা-ব্রহ্ম

ইচ্ছা-ব্রহ্ম আপনাকে বোধ-ব্রহ্মে, বিলাস-ব্রহ্মে রূপায়িত ক'রেছেন···সৃষ্টি তাই বহু-বোধের বিলাস...এই এক-বহু বোধ-ব্রহ্মকে ইচ্ছা-ব্রহ্মে আনতে হবে··· প্রার্থনা, নাম, ধ্যান সহায়ে ইচ্ছা-বোধ থেকে ইচ্ছা-ব্রহ্মকে পৃথক ক'রতে হবে... শুদ্ধ-ইচ্ছা রূপে···

মনোবিজ্ঞানে তিনটি তত্ত্ব—চিন্তা, অনুভূতি, ইচ্ছা। তার মধ্যে অনুভূতি বা বোধতত্ত্বটিকে কেহ কেহ আদিতত্ত্ব বলেন। পশুমনে এটী সবচেয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। এই বোধতত্ত্ব থেকে বিলাস-তত্ত্ব। নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা প্রভৃতি instinctগুলি ঐ বিলাসের জন্য।

কিন্তু ব্রহ্মের সিসৃক্ষাই আদি তত্ত্ব। ব্রহ্মের সিসৃক্ষা থেকেই সৃষ্টি! সোঽকাময়ত (তৈঃ উঃ-২—৬)। "তিনিই ইচ্ছা ক'রলেন সৃষ্টি বিলসিত হোক"। যখনি তাঁর ইচ্ছা জাগল তখনি তিনি নিজের সম্বন্ধে সচেতন হ'লেন। এই অহং-বোধ হলেই তখন বিলাস প্রয়োজন। তখন একাকী—বিলাসহীনতা এসব ভাল লাগে না। উপনিষদে আছে 'একাকী ন রমতে'। তখন বহু প্রয়োজন, অন্ততঃ দ্বিতীয় প্রয়োজন। কারণ বোধ ক'রতে হ'লে কি বোধ ক'রবে—তাই দ্বিতীয় প্রয়োজন (Relativity of feeling)। উপনিষৎ মতে দেখা যাচ্ছে ব্রহ্মের সিসৃক্ষা বা ইচ্ছাই আদি। জীব-মনে বোধ-তত্ত্ব আদি বা বড় ব'লে মনে হ'লেও, দেখা যাচ্ছে সমষ্টি-ক্ষেত্রে ইচ্ছাটাই হ'চ্ছে জয়যুক্ত। মনোবিজ্ঞানে ইচ্ছা-তত্ত্বই কার্য্যক্ষম তত্ত্ব সবচেয়ে।

তিনি বিলাস চেয়েছেন, বিলাসের ইচ্ছা করেছেন, তাই প্রতি ঘটে ঘটে তিনি বিলাসের জন্য বোধ-স্বরূপ হ'য়ে র'য়েছেন। তাই প্রত্যেকেই চাচ্ছে নিজেকে রক্ষা ইত্যাদি ক'রতে। এবং চাচ্ছে বহু ভোগ। এগুলি তাদের সহজাত প্রবৃত্তি। এসব ব্রহ্মের সিসৃক্ষা থেকেই এসেছে।

কিন্তু প্রতি সৃষ্ট পদার্থের ভেতর তিনি একত্ব হারান নি। ঘটে ঘটে, বিলাস করবার ইচ্ছাও আছে—আবার স্বরূপে একরূপের অবস্থানের ইচ্ছাও আছে। তাই ইচ্ছা ও বোধ স্বরূপে তিনি বিলাস চাচ্ছেন, আবার স্বরূপে এক হ'তে চাচ্ছেন।

এই ব্রাহ্মী সিসৃক্ষাকে আবার যদি আদিম এক ইচ্ছা-স্বরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হয় তাহ'লে সেই সিঁড়ি দিয়েই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে, সে সিড়ি বেয়ে

তিনি নেমেছেন। তার জন্য বিলাস-ব্রহ্মকে নিয়ে যেতে হবে বোধ-ব্রহ্মে—বোধ-ব্রহ্মকে নিয়ে যেতে হবে ইচ্ছা-ব্রহ্মে এবং বিচ্ছিন্ন ক'রে রাখতে হবে কেবল শুদ্ধ-ইচ্ছা স্বরূপে—Supreme will-এ—গুরু-উপদেশ, জপ, ধ্যান সহায়ে। সমস্ত জীবনে বিরাট ইচ্ছাশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। সেখানে বোধের বিলাসের কোন স্থানই থাকবে না।

বোধ এবং ইচ্ছা জড়িয়ে গেছে ব্রহ্ম-মনে। তাই ঘটে ঘটে চলেছে বিলাসের ইচ্ছা। এই বিলাস-তত্ত্বকে ইচ্ছা থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রতে হবে। এবং ব্রহ্ম-মনে যে বোধের ইচ্ছা হয়েছিল, সেখানে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, সেখানেও ইচ্ছা থেকে বোধকে সরিয়ে দিতে হবে। এই চেষ্টা থাকবে প্রথম থেকে, যদিও আমরা এর ধারণা এখন কিছুই ক'রতে পারব না।

প্রথমে বহুর সম্বন্ধে বিলাস এবং বোধটি গুটিয়ে আনতে হবে। তার সঙ্গে বহুর ইচ্ছাও। অর্থাৎ বহু বিষয়ে ভোগেচ্ছা। তখন থাকবে এক বোধ-ইচ্ছা। পরে এক-বোধকেও (feeling self or ego-কে) সরিয়ে কেবল শুদ্ধ-ইচ্ছায় Pure will-এ প্রতিষ্ঠিত ক'রতে হবে। এই Supra Will, Pure Will, বা শুদ্ধ ইচ্ছা ইষ্ট-দর্শনে সমর্থ হন। শ্রীঠাকুর বলেছেন, তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।

ক্যাণ্ট মনের ক্রিয়াকে তিনটি ভাগ ক'রেছেন। ইন্দ্রিয়গণ (Senses) বুদ্ধি, ইচ্ছা। ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি, সত্য জ্ঞানের প্রত্যক্ষ নির্দ্দেশ দিতে পারে না। কিন্তু যখনই আমরা ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা করি (will some thing) তখনই আমরা অতীন্দ্রিয় লোকের সত্য জ্ঞান পেতে পারি। শুদ্ধ ইচ্ছা (Good Will) হ'চ্ছে ন্যায়সঙ্গত ইচ্ছা (Rational Will) ইহা স্বাধীন। ইন্দ্রিয়জ ও বুদ্ধিজ জ্ঞান জাগতিক জ্ঞানের পারে যেতে পারে না। কারণ ইহারা স্বাধীন নয়। শুদ্ধ ইচ্ছার ভিতর বোধ বা অনুভূতির স্থান নাই।

সোপেনহাওয়ারের মত, জগৎটা ইচ্ছাময় (world as will) আমাদের বাঁচবার ইচ্ছা আছে।

৩। Relativity of feeling—অনুভূতিগুলি আপেক্ষিক। এরা নির্ভর করে আমাদের পূর্ব্বানুভূত অনুভূতির উপর, সংস্কারের উপর অথবা বোধের অন্য বিষয়ের উপর। মনোবিজ্ঞানে এ তত্ত্বটি আজো ঠিক বলা হয় নাই। প্রফেসর স্টাউট তাঁর পুস্তকে এ বিষয় সামান্য কিছু উল্লেখ করেছেন।

Supra Irrelavancy

ঈশ্বর শিশু-স্বভাব ··(শ্রীঠাকুর)

তাই উচ্চ মহাপুরুষরা শিশু-স্বভাব হ'য়ে যান ·····

সেই অবস্থায় ভক্ত ভগবানের লীলাও Irrelevant হ'য়ে যায়......

Supra Irrelavancy সাধনের প্রয়োজন আছে...

Relevant ধ্যানাদির পরিপাকে······

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন, ঈশ্বর শিশু-স্বভাব। ওদেশের মনীষিরাও ঈশ্বরের কথা ব'লতে গিয়ে বলেছেন Highest Irrationality (হোয়াইট হেড)। অবশ্য জিন্‌স্‌ প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক দার্শনিকেরা ঈশ্বরকে গণিতজ্ঞ ব'লতে চেয়েছেন। তবে আমাদের ভাষায় তাঁকে যাই বলি—সেটা আমাদের মতবাদ ছাড়া আর কিছু নয়। তবে শিশুদের খেয়াল যেমন কিছুই জানা যায় না, তেমনি ঠাকুরের সম্বন্ধেও আমরা কিছু বলতে পারি না। তাই আমাদের ব'লতে হয় তিনি কার্য্য-কারণ-বাদের বহু উর্দ্ধে। বর্ত্তমান বিজ্ঞানের শেষ কথা যে রিলেটিভিটি—তাতেও কার্য্য-কারণ-বাদ এক রকম পরিত্যক্ত হ'য়েছে। অনির্দ্দিষ্টবাদ, Pr bability, Average-এ সব এসে পড়েছে।

কাজেই দেখা যাচ্ছে ঈশ্বর সম্বন্ধে যদি কিছু বলা যায়, তা'হলে তাঁকে শিশুর মত লীলা-চঞ্চল বলাই কতকটা ঠিক কথা। অবশ্য আমরা যতক্ষণ কার্য্য-কারণ-বাদের ভিতর আছি, ততক্ষণ আমাদের সেই মত চ'লতে হবে। এবং আমাদের ঈশ্বরও কার্য্য-কারণ-বাদী। আমরা যখন কার্য্য-কারণের উর্দ্ধে উঠব তখন তিনিও তার উর্দ্ধে। দেখা যায় যাঁরা ঈশ্বর লাভ ক'রেছেন তাঁরা শিশু-স্বভাব হ'য়ে যান। মনের সব বন্ধন প'ড়ে যাওয়াতে তাঁরা শিশু ভোলানাথের মত হ'য়ে যান। আর আমরা যখন এমনি শিশু ভোলানাথের মত হ'তে পারব তখন সুখ-দুঃখ ভাল-মন্দ সব দ্বন্দ্বের পারে চ'লে যাবো। যাই হোক আমরা যখন ভগবৎ লাভ ক'রে শিশুর মত হ'য়ে যাই আর ভগবান যখন বিরাট শিশু, এই দুইয়ের লীলা তখন এক বিরাট অনিয়মের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। ঠাকুরও বিরাট খেয়াল খুশীর ঠাকুর, ভক্তও খেয়াল খুশীর শিশু—তখন চলে এক বিরাট খেয়াল খুশীর খেলা। কাজেই আমাদের মধ্যে যাঁরা ভক্ত-ভগবানের লীলার রাজ্যে প্রবেশের যোগ্যতা লাভ ক'রেছেন তাঁদের এমনি-খেয়ালের সাধনা করতে হবে। অবশ্য উচ্চতা লাভ করার আগে এ সাধনা করা বিপজ্জনক। খেয়ালের

সাধনা যেমন দক্ষিণেশ্বরের লীলায় দেখা গেছে, হঠাৎ ত্নপুর রাত্রিতে উঠে ঠাকুর ব'ললেন খিদে পেয়েছে—অথচ তার কিছু আগেই ঠাকুর হয়তো খেয়ে শুয়েছেন। এমন ঘটনা হ'য়েছে বহুবার। এগুলি 'Supra Irrelevarcy'. মায়ের সঙ্গে ঠাকুরের শিশু লীলা বহু হ'য়েছে। ঠাকুর যেমন বলেছেন, ওদেশে যাচ্ছি বর্দ্ধমান-থেকে নেমে। আমি গরুর-গাড়ীতে বসে, এমন সময় ঝড় বৃষ্টি। আবার গাড়ীর সামনে কোথেকে লোক এসে জুটলো। আমার সঙ্গের লোকেরা বল্‌লে এরা ডাকাত! আমি তখন ঈশ্বরের নাম করতে লাগলাম। কিন্তু কখনও রাম রাম বলছি, কখনও কালী কালী— কখনও হনুমান হনুমান, সব রকমই ব'ল্‌ছি—এ কিরকম বল দেখি।

প্রসার ব্রহ্ম

পশুদের সিদ্ধি বর্ত্তমানকে নিয়ে............................ ...

মানবের সিদ্ধি বর্ত্তমানকে অতিক্রম করে..............................

অতি-মানবদের দৃষ্টি অতি প্রসারিত... ....

ব্রহ্মজ্ঞের দৃষ্টি-সিদ্ধি ভূমাতে......অ-সীমাতে...............................

তাই প্রসারতা ব্রহ্মজ্ঞানের সহায়।

বিবর্ত্তনবাদে (Evolution Theory) দেখা যায় পশুস্তর থেকে মানুষের উদ্ভব দূর-দর্শিতার ফলে। পশুরা বর্ত্তমানের Instinct বা ক্ষুধা-তৃষ্ণাদি নিয়ে পরিতৃপ্ত। কালকের চিন্তা তাদের নাই। অনেকে (Mc Dougall প্রভৃতি) অবশ্য আমাদের সমস্ত কর্ম্মের পিছনে Instinct বা সহজাত প্রবৃত্তি দেখেন। কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তি মাত্র সম্বল হ'লে আমাদের বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা সম্ভব হ'ত না। আমাদের সহজাত প্রবৃত্তগুলি বুদ্ধি ও প্রজ্ঞাতে পরিণত হ'চ্ছে। যার ফলে মানবের মনে দেবত্বের উদ্ভব।

আমাদের বুদ্ধির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে আমরা ভবিষ্যত চিন্তা ক'রতে শিখেছি। তার ফলে আমাদের এই সামাজিক উন্নতি। যতই আমরা উন্নতি করি ততই আমাদের দৃষ্টি দুই দিকেই প্রসারিত হয়। অতীত ও ভবিষ্যত বহুদূর দেখতে আমাদের চেষ্টা জাগে। এইভাবে মানব যত উন্নত হয়, তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়। কাজেই অতি-মানবের দৃষ্টি ভূমাতে স্থাপিত। সমস্ত সীমাকে সে অতিক্রম ক'রতে চায়। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যে জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান তা অসীমে প্রসারিত। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি'। তাই আমরা যদি অতি-মানবতা লাভ ক'রতে চাই তাহ'লে আমাদের দৃষ্টি ক্রমশঃ প্রসারিত ক'রতে হবে। স্তরে স্তরে উঠে মন ভূমাতে প্রতিষ্ঠিত হ'লে, 'ভূমৈব ব্রহ্ম' বুঝতে পারলে, আমরা আমাদের সব বন্ধন বিমুক্ত হ'য়ে ব্রহ্মজ্ঞ হব, ভগবৎ-প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রব। কাজেই চলার পথে নিত্য প্রসারশীলতা অভ্যাস ক'রতে হবে। মন যেন দিন দিন প্রসারতার দিকে অগ্রসর হয়। ঋগ্বেদে একটি বিখ্যাত ঋক্ "চরৈবৈতি—" এই প্রসারতার গুণগানে প্রবৃত্ত। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে 'যো বৈ ভূমা তদমৃতমথ

যদল্পং তন্মর্ত্যং'। ভূমার উপদেশ উপনিষদে এক অপরূপ অধ্যায়। আর শ্রীঠাকুরের কথা—এগিয়ে পড়……।

রামকৃষ্ণলোক

Mental ও Physical dimension এর অতীত……

স্থূল সূক্ষ্ম কারণের অতীত………

পঞ্চকোষ পঞ্চস্কন্দের অতীত………

নাম রূপাতীত—চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত………

সর্ব্বাতীত…সর্ব্বাশ্রয়…শুদ্ধ কৃপার এই লোক।

পদার্থ বিজ্ঞানের শেষ কথা, চারিটি মাত্রায়, সবকিছু ঘটছে বা আছে। দেশ বা দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-উচ্চতা আর কাল। বেদান্তে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ পঞ্চকোষে অবস্থিত। যথা—অন্নময়, প্রাণময় (স্থূল দেহ) মনোময়, বিজ্ঞানময় (সূক্ষ্ম দেহ) এবং আনন্দময় (কারণ দেহ) কোষ। বৌদ্ধমতে সৃষ্টির বন্ধন পাঁচটি স্কন্দ—রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংখ্যার (সংস্কার), বিজ্ঞান। সাংখ্যের চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব প্রকৃতির রাজ্য। এই সমস্ত এবং মনোমাত্রা বা mental dimension অতিক্রম ক'রে গেলে রামকৃষ্ণলোকে প্রবেশ সম্ভব। অবশ্য এ রাজ্য সর্ব্বাতীত হ'য়েও সর্ব্বময়। স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ, নামরূপের অতীত—এ লোক সব মত-পথের লক্ষ্য। নিত্য ঈশ্বর নিত্য ধাম (শ্রীঠাকুর)। শুদ্ধ কৃপালভ্য নিত্য বৃন্দাবন এ লোক।

বেদছন্দা

(চতুর্থ পর্ব্ব)

সূচনা

ওঁ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায় নমঃ ওঁ ॥

—বেদচ্ছন্দা—শ্রীশ্রীসত্যানন্দ বাণী

শ্রীশ্রীঠাকুরের বাণী পাঠ করিলাম। বিষয়াসক্ত ক্ষুদ্রজীব আমি। এই বাণী সমূহের রহস্য ও তাৎপর্য্য পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই নাই। তবে যখন পাঠ করি তখন চিত্তে একটা উদ্দীপনা অনুভব করি। ভারতবর্ষ—বিশেষতঃ বাংলাদেশের সৌভাগ্য যে, মহাপুরুষগণের শ্রীচরণারবিন্দস্পর্শে দেশের ভূমি পুনঃ পুনঃ বিশুদ্ধি লাভ করে। যখনই অবিশ্বাস ও মলিন ভোগস্পৃহা দেশের বাতাবরণকে কলুষিত করে তখনই কোন লোকোত্তর মহাপুরুষের আবির্ভাবে এবং তাঁহার দিব্য-দেহস্পর্শে বিশোধিত হয় আধ্যাত্মিক বায়ুমণ্ডল। আমার অবিকম্পিত বিশ্বাস যে ভারতবর্ষের অধ্যাত্মবিভূতি কখনই জড়বাদ ও ভোগবাদের দ্বারা অভিভূত হইবে না। তাহার প্রমাণ লেকোত্তিগ জ্ঞান-বৈরাগ্য-প্রেমময় অপরোক্ষ অনুভূতি সম্পন্ন ধর্ম্মপ্রবক্তা পুনঃ পুনঃ ভারতভূমিতে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। তাঁহাদের সংস্পর্শে যাঁহারা আসিবেন বা তাঁহাদের বাণী শ্রদ্ধার সহিত অধ্যয়ন করিবেন ও মনন করিবেন তাঁহারা এই মহাপুরুষদের আধ্যাত্মিকতার উষ্ণ স্পর্শ অতিক্রম করিতে পারিবেন না। শ্রীশ্রী১০০৮ ঠাকুর সত্যানন্দের বাণী সংকলন করিয়া ভক্তবৃন্দ প্রচার করিতেছেন জগতের কল্যাণার্থে। এই মহনীয় অবদানের যাথার্থ্য ও রহস্য সকলেই যে সমগ্রভাবে উপলব্ধি করিবেন তাহা সম্ভব নয়। তবে যাহার যেরূপ আধার তাহাতে ইহা বৈদ্যুতিক শক্তির ক্রীড়ার ন্যায় কল্যাণ-বুদ্ধির বিন্দুমণ্ডল সৃষ্টি করিবে। মহাপুরুষদের বাণীর মধ্যে যে "একটি ঐক্য, আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠা, দিব্যতার প্রতিষ্ঠা" বিরাজমান তাহা অনপহ্নবনীয়। কিন্তু বৈশিষ্ট্যও বিরাজমান। এই বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে। বিচিত্ররুচি মানবের বিচিত্র সমস্যা ও সংশয় নব নব আকার ও প্রকারে উদিত হইয়া তাহাকে যখন পীড়িত করে, অভিভূত করে, বিভ্রান্ত করে; যখনই দুঃখদারিদ্র, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অব্যবস্থা, প্রমাদ ও অবিচার মানবচিত্তকে বিদ্রোহী ও ব্যাকুলিত করে এবং তাহার প্রতিক্রিয়ারূপে জাগতিক কল্যাণের মৌলিক আধারের প্রতি তাহার চিত্ত অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধায় কলুষিত হয় তখনও এইরূপ অধ্যাত্ম প্রেরণার নবীন রূপে সৃষ্টির আবশ্যকতা দেখা দেয়।

যাঁহারা ভক্ত ও শ্রদ্ধা-সম্পন্ন তাঁহারা নবীন প্রেরণা লাভ করিবেন তাঁহাদের জীবনের সাধনার পথে। এখন বিশেষভাবে আবশ্যক হইয়াছে ভক্তিপূত

আচারনিষ্ঠ শ্রদ্ধাপূর্ণ গৃহস্থের পারিবারিক সংঘটন। অবিশ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও লঘুচিত্ততা আজ হিন্দু তরুণ সমাজে যেরূপ উদগ্রমূর্ত্তিতে প্রকটিত হইয়াছে তাহা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না। পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মবোধ, নীতিবোধ, সংযম ও ত্যাগের দৃষ্টান্ত ক্ষীণ হইয়াছে এবং বিদ্যালয় ও শিক্ষাকেন্দ্রে যে শিক্ষা প্রদত্ত হইতেছে তাহা ভোগস্পৃহাকেই উদ্দীপিত করে। আজ জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও শাসনতন্ত্রের মধ্যে যে অনাচার ও লোলুপতা দৈত্যের তাণ্ডবনৃত্যে দেশ বিহ্বল হইতেছে তাহার মূলে এই ধর্মবুদ্ধির অভাবই নিহিত। স্বামিজী পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন-- ভারতবর্ষের অভ্যুত্থান ধর্ম্মের অভ্যুত্থানেই সম্ভব হইবে, অন্য উপায়ে নহে। ভারত আজ রাষ্ট্রতন্ত্র প্রতীচীর অনুকরণ করিতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষের ধাতুতে ইহা সহিবে কিনা বুঝিতে পারিতেছি না। ইতিহাসে দেখা যায় ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থান ধর্ম্মপ্রেরণার দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল। বিজয়নগর সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার অন্তরালে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী বিদ্যাতীর্থ ও ভারতীতীর্থের প্রভাব এবং ছত্রপতি শিবাজীর মহারাষ্ট্র সৃষ্টির মূলে সমর্থ রামদাসস্বামীর প্রেরণা ও মহারাজ রণজিৎসিংহের পশ্চিম ভারতে শিখসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মূলে গুরু নানক হইতে গুরু গোবিন্দসিংহের আধ্যাত্মিক আলোড়নের কথা ভুলিলে অকল্যাণ ও বিনিপাতের মার্গই রচিত হইবে।

ভারতবর্ষের দুর্দ্দিনে ধর্ম্মের গ্লানির সংকট মুহূর্ত্তে ভগবান্ রামকৃষ্ণ পাশ্চাত্ত্য ভাববিমুগ্ধ দেশবাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, হিন্দুধর্ম্মের কোন অনুষ্ঠানেই লজ্জা বা অগৌরব বা হীনতাবোধের কোন হেতু নাই। আজ আমরা তাহা ভুলিতে বসিয়াছি। তাহার কারণ যে-শিক্ষাপ্রণালী ঈদৃশ হীনম্মন্যতার সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা আজও অব্যাহত রহিয়াছে। সত্য কথা বলিবার মত সৎসাহস আজ বিলুপ্ত প্রায়। আমরা এখন জাগরণ ও সুষুপ্তির মধ্যবর্তী স্বপ্নলোকে বিচরণ করিতেছি। জাতীয় চেতনার এই মুহ্যমান অবস্থা আজ যে সংকটের সূত্রপাত করিতেছে তাহার অবসান ঘটিবে আধ্যাত্মিক জাগরণে এবং সে জাগরণের পটহনিনাদ শ্রীরামকৃষ্ণাশ্রম হইতেই ধ্বনিত হইবে—ইহাই আমার দৃঢ়বিশ্বাস।

শ্রীসাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম্. এ., পি. এইচ্. ডি ;
প্রাক্তন আশুতোষ অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ, সংস্কৃত বিভাগ,
অধ্যাপক, পালি ও দর্শন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও
প্রাক্তন ডিরেক্টার নব-নালন্দা, বিহার।

বেদছন্দা

১। আমার অহংটি ইষ্টের চরণের ছায়া। অর্থাৎ আমার আর অন্য সত্তা নাই, ইষ্টের সত্তাতেই আমার সত্তা। আমার সুখ দুঃখ ভাল মন্দ যিনি উপলব্ধি করাচ্ছেন তিনিই আমার ইষ্ট।

২। ভগবতী কথা আর বাজে কথার তফাৎ এইখানেই যে, বৃথা কথা প্রথমে ভাল মনে হয়, ভাগবতী কথা প্রথমে নিতে কষ্ট হয়। ভাগবতী কথা, সৎ কথা, পরে এমন সহজ ও কল্যাণকর হ'য়ে যায় যে, আত্মা তাকে সহজে আপন ক'রে নিতে পারে। এতটুকু কষ্ট হয় না।

৩। মহামায়ার "মোমেনটাম" অর্থাৎ ভরবেগ আছে, যাতে চলার পথে গতি বেড়ে যায়, তাই মহামায়ার গতি সেই সত্য যুগে যা ছিল এখন কলিযুগে তার চেয়ে বেড়ে গেছে। আমরা নিজেরা এটি লক্ষ্য ক'রলেই পাব। তাই এই পথে যদি চ'লতে হয় তবে একমাত্র নাম এবং রাম সহায়। সেই কৃপাময়ীর কৃপাই সম্বল।

৪। দার্শনিক জোড্ ব'লেছেন প্যানথিষ্টিক্ মতটি, "সবই ভগবান"—ভাল মন্দ সবই তিনি, মতটি—ভক্তরা নিতে পারে না। কিন্তু "বাসুদেব সর্ব্বম্" যখন হয় তখন তার কাছে মন্দ ব'লেই কিছু থাকে না, তখন সব কিছুতেই ঠাকুর। এই ভক্তের চক্ষু যা কিছু নীচ, যা কিছু ক্ষুদ্র তা'তে যেতে পারে না।

৫। গোপীরা বৃন্দাবন ছেড়ে ঐটুকু দূর মথুরা যেতে পারলেন না কেন? তার কারণ আছে। তাঁরা ঐ বৃন্দাবন ছেড়ে গেলেন না, গেলে তাঁদের ঐ ভাবটি যেত চূর্ণ হয়ে। বৃন্দাবনের ঐ মধুরতর ভাবটি নিয়েই তাঁরা বেঁচে ছিলেন। ঐ রাজসমারোহ, হৈ চৈ এর ভেতরে তাঁরা কিছুতেই থাকতে পারতেন না।

৬। দুঃখ কষ্ট—এগুলি ভক্তরা নেবে ঠাকুরের দান ব'লে। তারা ব'লবে "আঘাত সে যে পরশ তব"। মানুষ যদি না আঘাত পায় তা'হলে ভগবানকে ডাকবে না। ভোগের চুষিকাঠি দিয়েই তিনি ভুলিয়ে দেন, এগুলি বেশী হ'লে ঠাকুরকে ভুলে যাবে। কেউ অসুখে প'ড়ল কি কিছু বিপদ হ'ল—তাই তিনি মনে করিয়ে দেন কৃপা ক'রে। নিজেরাই দেখনা—দাঁত পড়ছে, হাত ভাঙছে

কিনা শেষের দিন ঘনাচ্ছে। এগুলি ঠাকুরের কাছে যাবার দূরাগত নির্দ্দেশ। মানুষ যদি বুঝতে পারে এটি —তবে সুবিধা হয়।

তাঁকে যে কেউ চাচ্ছে না। তারা চাচ্ছে দেহটি যাতে থাকে…সুখ শান্তি বজায় থাকে। তিনি ত' আমাদের দরজায় ব'সে আছেন কিন্তু কই লোকে ত' কেবল 'টকি' দেখতে যাচ্ছে, একবার হৃদয় মন্দিরে ত' তাকিয়ে দেখে না! তিনি ত 'টকি' করে গেছেন, এই যে বৃন্দাবন লীলা আর সব লীলা এগুলি তো ভাল 'টকি'। এগুলি ত' কই লোকে দেখতে চেষ্টা করে না।

ঠাকুরের দিকে আমাদের দৃষ্টি নেই, তা থাকলে দুঃখেও আনন্দ। আসল কথা নাম ক'রে যাও, আর পবিত্র হও। তাহলে কষ্ট পেলেও বুঝতে পারবে। তিনিই পবিত্র হৃদয়ে ছায়া ফেলবেন যে, এই জন্য কষ্ট দিচ্ছি। "শুদ্ধ মনে যা উঠবে তা তাঁরই বাণী" এ ঠাকুরেরই বাণী।

৭। দেহের শুদ্ধির দরকার, মনের শুদ্ধির দরকার। দেহের দ্বারা যা গ্রহণ ক'রবে তাও বিশুদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আর মনের শুদ্ধি আচার্য্য শংকর ত' ব'লেছেন, মনের দ্বারা যা গ্রহণ ক'রবে তা যেন শুদ্ধ হয়। দেহের মনের পারে যে বুদ্ধি, অহংকার সেগুলিরও অশুদ্ধতা দূর করতে হবে। যেমন বুদ্ধিকে যদি সাধারণ ভাবে ধরি যা' দ্বারা আমরা নানারকম আলোচনা করি সে আলোচনাও আমরা অপবিত্র আলোচনা ক'রব না। তার পারে যে অহংকার তাকেও আমাদের শুদ্ধ ক'রতে হবে। আমাদের অহং সত্ত্বা যেন সর্ব্ব ভাবে শুভ বিষয় নিয়ে থাকে। তাই শ্বেতাশ্বতরে ঋষিদের প্রার্থনা "স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু।"

৮। শ্রীমা বলতেন, "ঘট পট ছায়া কায়া সমান।" তাই ঘট কি পট অথবা ছায়াকে ধ'রে, কায়া বা দেবতাকে ধরা যায়। তাই স্বপ্নে তার যে ছায়া পাওয়া যায় সেও সত্য। তাও স্মরণ করা ভাল।

৯। বর্ত্তমান মনোবিজ্ঞানী Soltman বলেন বাছুর আর মানবশিশুর তুলনা ক'রলে দেখা যায় মানবশিশুর তুলনায় বাছুরের চঞ্চলতা বেশী। কাজেই চঞ্চলতা পশুধর্ম্ম। আমাদের দেখতে হবে আমরা যেন বৃথা চঞ্চল হ'য়ে না পড়ি। স্থিরতা দিব্যতার লক্ষণ। ধর্ম্ম ক'রতে এসে কিছুদিন শিব পূজো কিছুদিন ইতু পূজো ক'রলে, ফল কি হবে? একটাতে দৃঢ়নিষ্ঠ হ'তে হবে।

১০। প্রঃ—ঠাকুরের এক মূর্ত্তিই ধ্যান করা উচিত কিনা?

উঃ—এই বিষয়ে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিতে হবে। যদি দেখা যায় কখনও দাঁড়ানো মূর্ত্তি বা বসা মূর্ত্তি ভাল লাগছে, তেমনি ক'রবে ; তবে একরকম ভাবে ধ্যান ক'রতে পারলে ভাল।

১১। ঠাকুরকে ভালবাসা এত শক্ত জিনিষ যে কোটিতে দুটো-একটারই হয়। অবতার হ'য়ে শ্রীকৃষ্ণের মত এসে দাঁড়ালে ত' সব ভুল হ'য়ে যাবেই। সে সুন্দরতম রূপের যে অসীম আকর্ষণী শক্তি! কিন্তু সে ব্যবস্থা ত' সহজে করেন না। তা হ'লে লীলা চলে না। তাঁকে মানুষ পায়না ব'লেই তো এই সব বৃথা জিনিষ নিয়ে থাকে। তাঁকে ভালবাসতে পারে না।

আমাদের ঠাকুর কিন্তু গোপন হ'য়ে এলেন, ঠাকুরের গোপন হওয়ার কারণ শীঘ্র একটা কিছু না করা। যেটা গোপন করা যায় সেটা বেশী শক্তিযুক্ত হয়। আর এটি ঠাকুরের লীলার একটি দিক। গোপনের ওপর একবার ভালবাসা এলে সহজে যায় না।

জগন্নাথের অমর রূপ কেন হল? এই প্রশ্নের উত্তরে অনেকে বলেন যদি ঐ মূর্ত্তিতে কেউ মন একবার বসিয়ে নিতে পারে, তবে সে মন আর অন্যদিকে যেতে পারে না।

তাই সাধারণভাবে ব'লতে গেলে, প্রার্থনা ছাড়া ঠাকুরকে ভালবাসার আর উপায় নেই। বল, "হে ঠাকুর! মনের পর্দ্দাখানা তুলে দাও—অনেক বাসনা কামনা আছে"। বল, "এই সব আড়াল তুলে আমায় ভালবাসাও"। তবে আরও পদ্ধতি আছে, যেমন 'সব ছোড়ে ত সব পাওয়ে' এই মুহূর্ত্তে সব ছেড়ে দাও দেখবে ঠাকুরকে ভালবাসা ছাড়া উপায় নেই।

১২। ভাল কাজের প্রেরণা আসবা মাত্র কাজটা ক'রে ফেলা ভাল। আর মন্দের প্রেরণাকে কাজে লাগাতে নেই। তাকে ভালদিকে মোড় ফিরিয়ে দিতে হয় অথবা সময় দিতে হয়। যেমন কারো ওপর রাগ হয়েছে তখন খানিকটা ছুটে এলে এমনি।

১৩। আমাদের মনের চুরিটি কি ধ'রতে হবে এবং চোর মনকে শাসন করে ঠিক ক'রতে হবে। আবার তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা ক'রে ঠিক ক'রে নিতে হবে। মনের চুরি কেমন জান—মনের কোণে আত্মীয়দের উপকার করবার ইচ্ছা আছে, ওপরে হয়ত এমন একটা কাজ ক'রলে যাতে ওপর

ওপর লোকের কল্যাণকর কাজ মনে হবে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত তাতে আত্মীয়দের উপকার বই আর কিছু নয়।

১৪। আমাদের বাসনা যেন অক্টোপাস—ভোগের বস্তু দেখলেই শত বাহু মেলে জড়িয়ে ধ'রবে। তীক্ষ্ণ ছুরী দিয়ে ডুবুরীরা তার বাঁধন কাটে। তেমনি আমাদের বাসনার অক্টোপাসও কেটে ফেলতে হবে—তাঁর 'নামে', তাঁর চরণে 'প্রার্থনা' ক'রে।

১৫। এটি ভবসাগর ; কখন ঢেউটা উঠছে কখন ঢেউটা নামছে। কখনও লোকে ব'লবে ভাল, কখন বলবে মন্দ। কাজেই লোকের দিকে তাকালে চ'লবে না—আমাদের সমরসে থাকতে হবে। মনটাকে উঁচু সুরে বেঁধে রাখতে হবে। উঁচু সুরে বাঁধা থাকলে নীচের কথা বা ভাবনা আর কি ক'রে করবে ? মনে ক'রবে আমাদের ঠাই এখানে নয় অন্য রাজ্যে, আমাদের বাড়ী আনন্দের রাজ্যে—জ্যোতির রাজ্যে—তখন হীন বিষয়ে মন যাবে না।

১৬। মনে মনে বিচার ক'রবে কতখানি উন্নতি হ'ল। জপ ধ্যান চ'লছে কিনা ? আর মনের গতি কোন্ দিকে ? ভোগমুখী না ত্যাগমুখী ? মনের স্থান কোন্ চক্রে ?

১৭। কেন আমরা ছোট হব ? ধূলির ওপর না উঠতে পারলে দেবতা হওয়া যায় না।

১৮। যা কিছু করতে হয় কৃষ্ণার্পণম্ ক'রে ক'রতে হয়। ইষ্টার্পণম্ ক'রে ক'রলে ভয় থাকে না—হেলা ভরেই হোক বা শ্রদ্ধা ভরেই হোক…। তিনি ত জানেন আমরা ঠিক পারি না—আমরা তাঁর অক্ষম ছেলে।—গীতায় ভগবান শিখিয়ে দিয়েছেন "তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্"।

১৯। এত জিনিষ এত ঘটনা স্থূল জগতের পিছনে সূক্ষ্ম জগতে ঘটে যাচ্ছে আমরা ধারণা ক'রতে পারি না। এই যে কথা ব'লছি—কাজ ক'রছি—সেটা অন্য রাজ্যে রেকর্ড হ'য়ে যাচ্ছে। এখানে আমরা কথা ব'লছি, তখন কোন মহাপুরুষ হয়তো সূক্ষ্মদেহে দেখে চ'লে গেলেন—দেখে গেলেন কি ক'রছি। যেমন কোন তীর্থস্থানে, কি ভাল জায়গা দেখলে সাধু-সন্তরা ব'সে একটু জপ ধ্যান ক'রে যান, তেমনি কোথাও ভাল কীর্ত্তন, হোম, জপ হ'চ্ছে দেখলে মহাপুরুষরা সূক্ষ্মদেহে এসে উপস্থিত হন। সেইজন্য কীর্ত্তন, হোম, সৎকাজ, সৎকথা ইত্যাদি দিয়ে

জায়গাটাকে জাগিয়ে রাখতে হয়, তীর্থ ক'রে তুলতে হয়। কি বাড়ী, কি আশ্রম প্রত্যেক স্থানে এই রকম হওয়া উচিত।

২০। জগতে এক একটা মুহূর্ত্ত আসে, আর ফিরে পাওয়া যায় না। দিব্য মুহূর্ত্ত, যেমন একটা দর্শন কি কোন মহাপুরুষের সঙ্গ, সে মুহূর্ত আর পাওয়া যায় না। সেক্সপিয়ার বলেছেন জগতে এক একটা ঢেউ আসে সেই ঢেউয়ের সঙ্গে চ'লতে হয়। শ্রীমা ব'লেছেন, প্রথম মনের কথা শুনতে হয়। এ অবশ্য বাসনামুখী বাসনাদিগ্ধ মনের নয়—শুভ মনের কথা। যারা একটু হয়তো জপ-পরায়ণ কি দিব্যমানুষ, তাদের প্রথম মনে হয়তো দপ ক'রে একটা কিছু উঠলো তারপর চারপাশের অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে পিছিয়ে গেল। তারি কথা শ্রীমা বলেছেন—"মনের প্রথম কথা শুনতে হয়"।

২১। জগতে নানারকম আছে। এর বিচিত্রতা দেখে আনন্দ করা উচিত। ফুটবলের মাঠে কোন দল হেরেছে দেখে কারো যদি খাওয়াতে অরুচি হয় তবে সেটা হাসির কথা—তেমনি বড় জোর ৬০।৭০ বৎসরের জন্যে এই খেলা, হার জিত আছেই—কখন এটা হবে কখন ওটা হবে।

২২। প্রথম যে ছেলে 'অ আ ক খ' পড়ছে তখন তাকে যদি জিওমেট্রির কথা বলা যায় সে বুঝতে পারবে না। কিন্তু আমাদের বললে আমরা বুঝতে পারব। শক্ত শক্ত লেখা বই আমাদের বানান ক'রে পড়তে হয় না, একেবারেই প'ড়ে নি। এর কারণ হ'চ্ছে ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে আমাদের মনে সেই সব বিষয়ে একটা ভিত্তি সৃষ্টি হয়—তাই জটিল কথা একবার দেখলেই ধারণা ক'রে নিতে পারি। তেমনি সাকার রূপ ধ্যান ক'রতে ক'রতে, ধাপে ধাপে উঠতে উঠতে, এক সময় আমাদের মন সহসা একটা ভূমায় গিয়ে পড়ে, একটা ভূমার বোধ সে হঠাৎ পায়। সেটিই নিরাকার ব্রহ্ম—এটি মুখে বলা যায় না, যে বোধ ক'রেছে সেই জানে।

২৩। মানুষ ছাড়া আমরা আর কিছু ভাবতে পারি না তা নয়, সাধারণতঃ আমাদের সর্ব্বোত্তম চিন্তা আমাদের নিজেদের ছাড়া আর এগোয় না। কিন্তু নিম্নস্তরের লোকেরা সূর্য ইত্যাদির পূজা করে। এরা তথাকথিত অল্পবুদ্ধি। কিন্তু মানুষের বুদ্ধির বিকাশ যখন হ'ল তখন সে নিজের স্বরূপে দাঁড়াতে চেষ্টা ক'রতে লাগল। আর নিজের স্বরূপে তাঁকে চিন্তা ক'রল—তারপর ব্রহ্মচিন্তা। শ্রীঠাকুর যেমন ব'লেছেন, "মানুষের ভিতর যখন ঈশ্বর দর্শন হবে তখন পূর্ণজ্ঞান হবে"।

২৪। মানুষের ভিতরে একটা প্রবৃত্তি আছে, স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়া—সমুদ্রের ঢেউয়ের বিরুদ্ধে সাঁতার দেব—পাহাড়ের ওপর উঠব—প্রকৃতিকে জয় ক'রব—নিজেকে প্রতিষ্ঠিত ক'রব। ছোট ছেলে হাত পা নাড়ছে, এ একটা জয় ক'রবার প্রবৃত্তি থেকে। আমাদের ভেতর ব্রহ্ম র'য়েছেন, জাগ্রত ভগবান র'য়েছেন—তিনি যে বিশ্বের অধিরাজ স্বয়ম্ভু।

২৫। প্রথম গুরুদত্ত নাম ক'রে যাওয়া, যেটি দিয়ে গুরু ধরা প'ড়েছেন। জেনে হোক, অজানায় হোক—যেমন ক'রে হোক। একটু চালাক হ'তে হবে এবং সেই চালাকিটি দিব্যচালাকি। ফাঁকে ফাঁকে একটু নাম ক'রে যাওয়া। বৃথা কথা বলা ছেড়ে নাম ক'রে যাওয়া। মনের সঙ্গে একটু দিব্য চালাকি খেলতে হবে। "যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্—" দক্ষিণেশ্বরের শ্রীঠাকুর বলেছেন, "তিনের কৃপা হ'লো—একের কৃপা বিনা জীব ছারেখারে গেল"। জীবের কৃপাই হয় না। মনকে বলবে একদিন তো যেতেই হবে, তার জন্যে অন্ততঃ কিছু পরলোকের insurance-এর ব্যবস্থা ক'রে নে।

২৬। নাম ক'রে যাও, ঠাকুরকে ডেকে যাও, পরে দেখবে, কৃপা কা'কে বলে। ব্যবসা ক'রতে হ'লে চাকরি করতে হলে কিছুদিন এমনি খাটতে হয়, তারপর লাভের কথা—শ্রীঠাকুর ব'লেছেন—"নাম কর আর সঙ্গে সঙ্গে প্রার্থনা কর যাতে ঈশ্বরেতে অনুরাগ হয়"।

২৭। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সর্ব্বদা শুষ্ক ক'রে রাখবে। জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় দুই-ই। বিশেষ ক'রে জ্ঞানেন্দ্রিয়। ধর রসগোল্লা খেলে, তা'রি রসে মনটা বেশ কিছুক্ষণ রসিয়ে রইল। তাই ত' উদ্দীপন হয় না। ভাগবৎ রস আনতে হ'লে অন্য রস ভুলে যেতে হবে, তবে ত' হবে। তাই ধর্ম্মপথে এত দেরী হয়। দেখা, শোনা, খাওয়া সব বিষয়ে সব মিষ্টতাকে নষ্ট ক'রলে তবে ভাগবৎ মিষ্টতা ঠিক ভাবে পাবে। এই যে লুব্ধ হ'য়ে দেখছ—তোমার এই দেখার মিষ্টতাটুকু তখন আর থাকবে না। এবং এই ভাবে মনকে অন্য মিষ্টতা থেকে সরিয়ে শুষ্ক করতে পারলে তখন ভাগবৎ মিষ্টতা লাভের যোগ্য হবে, তারপরে তাঁর কৃপাতে তাঁকে ধ'রতে পারবে। শ্রীঠাকুরের বাণী—"মন থেকে সব ত্যাগ না হ'লে ঈশ্বর লাভ হয় না"।

২৮। (ভাগবৎ রাজ্যে কেন মিষ্টতা ঘুচে যায় না?) সেখানে একটি আছে ঠাকুরের কৃপা, তিনি মিষ্টতা জুগিয়ে যাচ্ছেন। তিনি যে অমৃত স্বরূপ,

আনন্দ স্বরূপ—তিনি যে সব মিষ্টতার খনি। কিন্তু বিষয়ের মিষ্টতা চিরদিন থাকে না।

২৯। ধর্মরাজ্যে কতকগুলো কাজ আছে, সেগুলো নিয়মিত ক'রে যেতে হয়। যেমন ঔষধ তিক্ত লাগলেও খেতে হয়, অসুখ না সারা পর্য্যন্ত। অত ভূত ভবিষ্যত বর্তমান ভাবতে গেলে চলে না। আবার ফিলিং তত্বটিরও উর্দ্ধে যেতে হবে। যেমন ধর সৎকাজ ক'রতে গেছ, কেউ বিরক্ত হ'য়ে কিছু ব'ললে অমনি তুমি কাঁদতে বসলে, সে ক'রলে হবে না। এই জগতের সমস্ত ফিলিং তত্ত্ব থেকে, ভাবপ্রবণতা থেকে মনকে না তুলে রাখলে সাধু হওয়া মুস্কিল।

৩০। সুখের সময়, ভালর সময়, আমাদের ব'লতে হবে—খারাপ সময় একদিন আসবে, ঠাকুর সেদিনটিকেও যেন তোমার দান ব'লে নিতে পারি। সেগুলিকে অতিক্রম ক'রে যেন তোমার দিকে এগিয়ে যেতে পারি। এতে দুঃখের দিন অতিক্রম করবার শক্তি আসবে।

৩১। মনোবিজ্ঞান মতে আমাদের মনের চিন্তাগুলো মৌনকথা মাত্র। মনে চিন্তা করছি অর্থাৎ মনে মনে কথা বলছি, জপটাও তাই মনের কথা। এই জপটি যখন অভ্যাস হয়ে যায়, তখন জপ চ'ললেও আর একটা কথা তার নীচে এসে পড়ে; আমাদের মন চোর তো! তা যেমন চোর মন তার উপায়ও ক'রতে হবে। যেই অন্য কথা আসবে, অমনি অন্য একটি দিব্য কথা বা চিন্তা এনে বেড়া দিতে হবে। নাম করছি "হরি রামকৃষ্ণ", যেই অন্য কথা এল অমনি "শরণাগত" এইটি হয়তো নামের সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে, তখন মনের ক্ষমতা হয়ছে—কাজেই দুটো চিন্তা অনায়াসেই ক'রতে পারবে। এমনি ক'রে মনের নীচে নীচে বন্ধন দিতে হবে। অবশ্য প্রথম প্রথম শ্রীঠাকুরের নাম ক'রে গেলে বাজে চিন্তার পিছনে এই নাম পুলিশের কাজ করে, পরে চোর মন যখন বেশী চালাক হয় তখন পুলিশকেও চালাক হ'তে হয়।

৩২। গীতা পড়লে দেখতে পাবে কোন্ দিকে ঠাকুর নিয়ে যেতে চাচ্ছেন, অর্জ্জুনকে সব ব'লে তারপর ব'ল্লেন—"শরণং ব্রজ"। শরণাগতি তো নির্গুণ ব্রহ্মের কাছে হ'তে পারে না। এটি ভক্তির কথা, দ্বৈতবাদের কথা। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করার পর পরাভক্তি লাভ ক'রতে ব'লেছেন। মানুষ কি নিয়ে থাকে, শুষ্ক মরুজীবনে তাই এনে দিলেন ভক্তি মন্দাকিনী। দেখনা প্রত্যেক অধ্যায়ে উচ্চ তত্ত্বজ্ঞানের কথা ব'লতে ব'লতে নেমে আসছেন 'ভক্তিতত্ত্বে'। একমাত্র সাংখ্য

যোগটি ছাড়া সমস্ত গীতাটি প'ড়লে এটি বোঝা যায়। ! ধরা দিতেই আসেন কি না ?

৩৩। সমস্ত জিনিষের ভাল দিক আছে, মন্দ দিক আছে। কাজ ক'রতে গেলেই গোলমাল আছেই—তাই ব'লে কাজ না ক'রে কত থাকবে ? গুরু ইষ্টকে সামনে রেখে, গুরু নির্দ্দেশে কাজ ক'রলে ভয় নেই। গীতায় তো তিনি ব'লেছেন, নিষ্ক্রিয় থাকতে পারো না—তোমার প্রকৃতিই তোমায় কাজ করাবে। এই কাজ ভাগবতী বুদ্ধিতে কর'লে নৈষ্কর্ম হবে। তবে কর্মের ভেতর সীমা থাকা দরকার। "This far and no further"

৩৪। এমন রাজ্য আছে যেখানে শুদ্ধ নামমাত্র আছে, রূপই নাই—নাদব্রহ্ম। ওঁকারে গিয়ে মিলে যাবে। নাম ব্রহ্ম—এর দর্শনও হয়।

৩৫। ব্রহ্মের বেশীর ভাগই আমাদের কাছে অপ্রকাশ; তার কিছুটা আমাদের কাছে প্রকাশিত হ'য়ে আছে মাত্র। যেমন সন্ধ্যায় গঙ্গায় যতটুকু আলো পড়েছে ততটুকু দেখতে পাচ্ছি। বাকি সমস্তটা একটা আবছা অজানাতে ভরা—চির অজ্ঞাত, চির রহস্যময়, তাই ত' আমাদের এত আকুলতা তাঁকে জানতে, তাইত' তিনি চিরমধুর। ঋগ্বেদে পুরুষ সুক্তে আছে "ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"। শ্বেতাশ্বতরে আছে "ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্ যস্মিন্ দেবা অধি বিশ্বে নিষেদুঃ"।

৩৬। ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ একরকম, ব্রহ্মস্থ লক্ষণ আর একরকম। গঙ্গার ধার থেকে গঙ্গার একরকম শোভা, আবার গঙ্গার মাঝ থেকে আর একরকম শোভা।

৩৭। সর্ব্ব অবস্থায় সাধন করাই মহাসাধন। জপ ধ্যান অবস্থা বিশেষের ওপর নির্ভর ক'রলে ঠিক হয় না।

৩৮। যতক্ষণ শরীরের ক্ষমতা আছে তপস্যাটা রেখে যাবে, এই তপস্যাই আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে। ব'লতে পারবে ঠাকুর যখন শরীরের ক্ষমতা ছিল তখন তোমায় ডেকেছি, এখন পরিত্যাগ ক'রলে চলবে না। মুণ্ডকোপনিষদে আছে তপসা চীয়তে ব্রহ্ম। তপঃ প্রভাবাদ্দেব প্রসাদাচ্চ (শ্বেঃ)। তপসা ব্রহ্মবিজিজ্ঞাসস্ব (তৈত্তি)।

৩৯। ইংলণ্ডের মন্ত্রী কার্ডিনাল উলসে, রাজা হেনরী যা ব'লতেন তাই ক'রেছেন, অন্যায় অনেক ক'রেছেন, তারপরে তাঁকেই একদিন বের ক'রে দেওয়া হ'ল। তখন তিনি ব'ললেন, এতদিন তোমার যে দাসত্ব ক'রেছি সেই দাসত্ব

যদি ঠাকুরের জন্যে করতুম তাহ'লে এ দুর্দ্দশা হ'ত না। তাহ'লে বৃদ্ধ বয়সে আমায় তিনি পরিত্যাগ ক'রতেন না। আর কিছু নয়, আমাদেব সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে যা ক'রছি ঠাকুরের জন্যে ক'রছি। না হ'লে ঐ দশা হবে। কর্ম্মের ভেতর ইষ্ট নাম থাকা চাই, কর্ম্মের ভেতর ইষ্ট চিন্তা থাকা চাই। এখনি যদি মৃত্যু হয়, তখন কি হবে, তখন কি অন্ধকারে হাতড়াবো?' সর্ব্বদা চিন্তা রাখতে হবে যে, এই মুহূর্ত্তে যদি মরতে হয় ঠাকুরের কাছে চ'লে যাব। ঠাকুরের চরণাশ্রয় নিলে আখেরে ঠিক থাকে। জপের আনন্দ, ধ্যানের আনন্দ—ইষ্টকে নিয়ে আনন্দ। সংসার ত' আঘাত দেবেই কিন্তু ভগবানের আনন্দ পেলে আর কিছু গায়ে লাগে না। এই আনন্দটুকু পেলে আর আঘাত গায়ে লাগে না।

৮০। নিরন্তর ইষ্টমন্ত্র জপ ক'রে যাওয়াই ভক্তিপথে অজপা আর জ্ঞানীদের আছে অহং সঃ ইত্যাদির জপ। শ্রীঠাকুর ব'লেছেন, "জ্ঞানীরা সোঽহং জপ করেন"।

৪১। সবই আছে, মন্ত্র আছে, দেবতা আছে, সব আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস নেই। ক'রতে ক'রতে তবে বিশ্বাস হয়, যেমন মিছরি খেতে খেতে তার গুণ বোঝা যায়। তেমনি গুরুমন্ত্র জপ ক'রতে ক'রতে তবে তার শক্তি বোঝা যায়।

৪২। স্বামিজীর কথা "ঠাকুরের একটা বাণী থেকে ঝুড়ি ঝুড়ি গ্রন্থ লেখা যায়।" এও ঠিক, আবার আর একটা দিক আছে। দেখ, যে কোনও কথা থেকে অনেক তত্ত্ব হয়তো বের করা যেতে পারে, এমন কি পাগলের প্রলাপেও। তাই ব'লে তার কথা আর ঠাকুরের কথা কি এক? তা নয়। কথার ভেতর দুটো দিক আছে—একটা ব্যক্তিগত মূল্য আর একটা বস্তুগত মূল্য। যেমন একটা সোনা আর একটা কানাকড়ি। সোনার মূল্যটি তার বস্তুগত মূল্য। আর একটা পাগল তার কানাকড়িটিকে বেশ ক'রে একটি ভেলভেট মুড়ে সিন্দুকে রেখে ব'লতে লাগল, আমি কোটী টাকার অধিপতি। এখন কে তাকে বোঝাবে বল? কারণ কানাকড়ির মূল্য তার কাছে ব্যক্তিগত মূল্য। তেমনি পাগলের কথাকে নিয়ে একজন পণ্ডিত যদি ফেনিয়ে বাড়িয়ে নানা কথা বলে, সেটা ব্যক্তিগত মূল্য। কেননা তার মূল্য নির্দ্ধারিত হ'চ্ছে পণ্ডিতের বিচারের ওপর। কিন্তু ঠাকুরের বাণীর মাঝে তার একটি আত্যন্তিক দ্যোতনা আছে, শক্তি আছে, স্ফোট আছে। কোন পণ্ডিত যদি সে বাণী নিয়ে তার থেকে নানা তত্ত্বের প্রকাশ

করে তা সে পণ্ডিতের অহোভাগ্য। কিন্তু ঠাকুরের বাণীকে তার বিচারের ওপর নির্ভর ক'রতে হয় না। সে বাণীর শক্তিই আপনিই একদিন প্রকাশিত হবেই হবে। আর দেশে দেশে ত' ছড়িয়ে প'ড়ছেই। কেউ যদি না-ও নেয় জোর করে, অজ্ঞাতসারে তার তেতর সে বাণী কাজ করে যাবে। ঋষিদের বাণী, দ্রষ্টাদের বাণী, অবতারদের বাণীর বিষয় এটি খাটে।

৪৩। শ্রীরামানুজ বলেছেন, তিনি কল্যাণগুণের আকর,—জগতে অকল্যাণ গুণ থাকতে পারে না, সবই কম বেশী কল্যাণকর। যেমন অন্ধকার বলে কিছু নেই, সবই কম বেশী আলো। তবে কল্যাণের দিকে আছে, ব্যষ্টি ও সমষ্টি একে অন্যের পুষ্টি করে বা হানি করে। ব্যষ্টির কল্যাণ সমষ্টির কল্যাণ পুষ্ট করে বা হানি করে। কল্যাণ এও দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে, যেমন একজন খুব টাকা জমাচ্ছে, এতে সমষ্টির একদিকে কল্যাণ, বড়লোক সৃষ্টি হ'চ্ছে, আর একদিকে অন্য লোকেরা সেই টাকা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আবার কল্যাণের আরো দিক আছে; আধিভৌতিক, আধ্যাত্মিক, নৈতিক, পারমার্থিক। এক প্রকার কল্যাণ অন্য প্রকার কল্যাণকর সসীম দৃষ্টিতে নাও হ'তে পারে। ভূমাদৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত তাই অকল্যাণ আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে। তবে ভূমাদৃষ্টি হ'লে সবই কল্যাণকর মনে হয়। তখন কম বেশী আর মনে হয় না—পাওহারী বাবার কাছে চোর গেছে চুরি ক'রতে, পাওহারী বাবা তার পিছনে ছুটে তাকে সব দিয়ে এলেন; এই চোর পরে সাধু হ'য়ে যায়।

৪৪। সবেরি ছন্দ আছে। ব্রহ্মের আনন্দ ছন্দে এই সৃষ্টি। তাই অছন্দ ব'লে কিছু নেই। কিন্তু আমাদের ছন্দে মেলে না, তাই বেসুরো লাগে—যদি আমরা ভূমার ছন্দ সৃষ্টি ক'রতে পারি তবে সবই সুন্দর ও শিবম্ হ'য়ে যাবে। তবে মানুষের মন, আত্মা যখন খুব বেশী সক্রিয় হয়, তখন অন্য মনকে স্পর্শ করে বেশী। ধর, খুব দুঃখ পেয়েছ—ব্যথা পেয়েছ, তখন যে ছন্দের সৃষ্টি হবে তা সকলকে স্পর্শ ক'রবে। আবার অতি আনন্দের মাঝেও হয়। ঋষিরা সেই ভূমার আনন্দের মধ্যে যে সব মন্ত্র পেয়েছেন সে ছন্দ আজও অনুরণিত হচ্ছে। তাই ছন্দিত আত্মার ভূমা ছন্দে ছন্দিত হওয়া প্রয়োজন; তখনই কাজ ভাল হয়।

প্রসিদ্ধ দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক এডিংটন প্রভৃতি জগৎকে ঢেউএর রাজ্য ব'লেছেন।

৪৫। ধ্যান ক'রছ ; চঞ্চল মন এদিক সেদিক করতে করতে ক্রমে তার পরিধি কমে আসতে লাগল। যত ধ্যানাবগাহী মন হবে, বাসনা কমে আসবে, তত চঞ্চলতার পরিধি কমে আসতে লাগল। তত একটা শান্তির—আনন্দের ভিতর গিয়ে পড়তে লাগল। নানা বাসনা মনকে সংক্ষুব্ধ করেছে, এই অশান্তি একদিন আনন্দ দিয়েছে। কিন্তু এখন দিচ্ছে না, এখন তোমরা এই শান্তির রাজ্যে এসেছ। নেতির রাজ্যে পড়েছ ; যত বিষয়ানন্দ ছাড়তে লাগলে তত আর একটি আনন্দ আসতে লাগল। তখন একটি শান্ত নিস্তরঙ্গ রাজ্যে গিয়ে পড়লে। তখন সেখান থেকে নেমে আসতে ইচ্ছা হয় না। সেটিই ভাগবত আনন্দ। তখন বিষয়ের আনন্দ আলুনি লাগবে। ভোগের জিনিষ সামনে পড়লে মনে তখন যন্ত্রণা হবে। মনে হবে এই বুঝি আমার শান্তি ভঙ্গ করলে, তখন কেমন যেন জ্বালা সুরু হয়।

৪৬। উপনিষদে আছে, তিনি তপস্যা করেছিলেন 'স তপোঽতপ্যত, (তৈঃ)। তিনি কি আর নিজের গায়ে আগুন জেলে তপস্যা করবেন? তার তপস্যা এই চিন্তন, নিজের বিষয় আলোচনা—আমরা তাঁর ছেলে, তাই আমাদেরও এই তপস্যা উচিত। তবে তাঁর মুখী যেন হয়। ঠাকুর যেমন বলেছেন "চিল শকুনি অনেক উঁচুতে ওঠে কিন্তু নজর ভাগাড়ে"। তেমনি অনেকে পণ্ডিতি করে, কিন্তু কি ক'রে পি এইচ ডি পাবো, অর্থ পাবো, এই সব চিন্তা ; এমন করলে হবে না।

৪৭। ভুল "পাওয়ারের" চশমা যখন থাকে তখন আসল বস্তুকে চিনতে পারি না। যতক্ষণ না ঠাকুরের কৃপা আসছে, ঠিক চশমা না হচ্ছে ততক্ষণ কিছুতেই বুঝতে পারবে না। একবার তাঁর কৃপা পেলে সব সত্য, শিব, সুন্দর হয়ে যায়।

৪৮। স্বাধীন ইচ্ছার কথায় শ্রীঠাকুর খোঁটায় বাঁধা গরুর উপমা দিয়েছেন। ঠাকুরের এই গরু ও খুঁটির কথাটি খুব উঁচু কথা। তিনি যদি সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন তাহলে মুস্কিল হত। একটি গরুকে যদি খোঁটায় না বেঁধে রাখা হয় তাহলে এর খামারে ওর ক্ষেতে গিয়ে শস্য নষ্ট করবে। তাতে তারও ক্ষতি লোকেরও ক্ষতি। তাই আমাদের যে তিনি এই স্বাধীনতার একটা সীমা রেখেছেন, এতে আমাদেরও ভাল সকলেরও ভালো। তিনি বলেন যতক্ষণ না

তুমি ভাল হতে পারছো ততক্ষণ তোমায় ছেড়ে দেব না। যখন হবে তখন তোমায় ছেড়ে দিয়ে আমার নির্ভাবনা।

৪৯। ভক্তদের রস চাই, মাধুর্য্য চাই। আনন্দ চাই। অবশ্য এসবই দিব্য।

৫০। তিনি যে রসময়—রসো বৈ সঃ। ব্রহ্মের সমরসের বিচ্যুতিতে সৃষ্টি —ঠাকুর বাঁকা হ'য়ে সৃষ্টিতে রয়েছেন। সাইকোলজিতে আছে, যে জিনিষটি প'ড়লাম, সেটি সঙ্গে সঙ্গে ভুলে যাই পরে মনে পড়ে। জপ ক'রতে ক'রতে জপ হবে গোলমাল—আবার জপ ক'রতে যখন চাচ্ছি না তখন হয়তো জপ হচ্ছে। ধ্যানও তাই ; ঠাকুরকে যখন চাচ্ছি, তখন পাচ্ছি না, কিন্তু যখন বলছি—যাও চাই না, তখন হয়তো পাচ্ছি স্বপ্নে, ধ্যানে—নানাভাবে।

৫১। শেষের দিকে আর হাঁকপাঁক থাকে না। অনেকে প্রথমে কঠিন তপস্যা করবার চেষ্টা করে ; শেষে অনেক সময় সেটা থাকে না। বাইরের জাঁকজমক আড়ম্বর বেশী থাকে না। লোকশিক্ষার জন্য কিছু আড়ম্বর থাকে ; তবে সাধারণতঃ আড়ম্বর থাকে না। তখন মন ডাইলিউট হয়ে গেছে, তাই শরীরকে নিয়ে আর ছট ফট করে না।

৫২। জাগতিক কোন জিনিষেরই বেশী গভীরে প্রবেশ করা উচিত নয়। সব জিনিষ দূরে থেকেই ভালো। বেশি গভীরে গেলেই গোলমালে পড়তে হয়। একটু আলগা ভাবে থাকলে কোন গোলমালের ভয় থাকে না। শ্রীঠাকুরের কথা "মন একলা থাকলে ক্রমে শুষ্ক হয়ে যায়"।

৫৩। নিজের স্বভাবের বাইরে যাবার চেষ্টা দরকার। যদি লোক দেখলে বিরক্তি আসে তবে লোককে ভালবাসতে চেষ্টা ক'রতে হয়। যদি লোকসঙ্গ ভাল লাগে তবে মধ্যে মধ্যে নির্জনে থাকা উচিৎ। যে স্বভাব বন্ধনের সৃষ্টি করে এটি সেই স্বভাবের কথা।

৫৪। যার কোন সুখবোধ নাই তার কখনও দুঃখ হয় না। তাই সর্বাবস্থায় সুখের অন্বেষণ কোরো না—তা'হলে তোমার দুঃখও আসবে না।

৫৫। শাস্ত্র অর্থাৎ যা থেকে আমরা শাসিত হই। যে সব গ্রন্থের অনুশাসন দ্বারা কি ক'রে ভগবৎ লাভ হবে মুক্তি হবে, জানা যায় তাই হচ্ছে শাস্ত্র। সাধারণতঃ বেদাদি আঠারটি শাস্ত্র প্রসিদ্ধ। আবার শাস্ত্র ব'লতে প্রস্থানত্রয়—গীতা, উপনিষদ, ব্রহ্মসূত্র।

৫৬। শ্রদ্ধা মানে তিনি আছেন এই বিশ্বাস...উপনিষদে আছে 'শ্রদ্দধদেব মনুতে' (ছাঃ ৭।১৯।১)। তাঁতে বিশ্বাস আগে না হ'লে কিছুই দাঁড়ায় না। বৈষ্ণব শাস্ত্রে "বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। আর পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞান মতে Belief বলতে চিন্তার উপর (Cognitive side, চিন্তার দিক) জোর দেওয়া হয়—আর Faith বলতে ক্রিয়ার উপর (Conative side, ইচ্ছার দিক) জোর থাকে। (J. Ward.)

৫৭। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা কেন হয় জানো? তাঁরা তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁকে নিয়েই প'ড়ে আছেন। সাধুদের মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা অবিরত তাঁরই চিন্তায় রত, কাজেই তাঁদের কাছে গেলেই—তাঁদের সঙ্গ ক'রলেই সাধারণ লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জন্মে। সাধুরা হ'চ্ছেন বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতীক। তাঁদের তিনি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। যেমন একটি বিরাট আগুনের কাছে গেলেই আপনি আগুন জ্বলে যায়।

৫৮। আকুল হ'য়ে তাঁকে গান শোনাতে হয়। তিনি শোনেন। এই সুর উৰ্দ্ধ হ'তে ঊর্দ্ধলোকে তাঁর চরণে গিয়ে পৌছুচ্ছে। প্রত্যেকটি ভাইব্রেসন বা কম্পন ঊর্দ্ধলোকে গিয়ে আবার নেমে আসে, যার ফলে রেডিও চ'লছে। সেই রকম আমরা যদি তাঁর চরণে আমাদের ভজন নিবেদন করি তাহ'লে সেটা তাঁর কাছে গিয়ে আবার আমাদের কাছে তাঁর শক্তিতে শক্তিমান হ'য়ে ফিরে আসে। এতে আমাদের ভজনও ভাল হবে। তাঁর প্রীতিলাভও হবে। আবার তাঁর প্রীতিতে তাঁকে পাওয়া সুকর হবে।

৫৯। আত্মিক জ্যোতির সৃষ্টি ক'রতে হবে। জ্যোতিযুক্ত বিষয়ের চিন্তা ও ধ্যান ক'রতে হবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে জ্যোতিব্রহ্মের কথা আছে - তমসস্পরি জ্যোতিঃ পশ্যন্ত উত্তরং (অন্ধকারের অতীত যে আদিত্যস্থ শ্রেষ্ঠ জ্যোতি ৩।১৭।৭)। গীতাতেও রয়েছে 'যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্' (১০।৪১)। শ্রীভগবানের তেজের অংশ থেকে বিভূতিযুক্ত সব সৃষ্টি হ'য়েছে।

৬০। সৃষ্টির কোন কিছুকে জড়ের প্রকাশ বা জড় সত্ত্বা বলা মানেই নিজের চৈতন্য সত্ত্বাকে বঞ্চিত করা। সমস্ত জিনিষের পেছনে বা সমস্তের মধ্যে যত চৈতন্য সত্ত্বার প্রকাশ দেখতে পাবে, যত চেতন বলে বিশ্বাস করবে ততই নিজে চৈতন্য সত্ত্বায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

৬১। যে কিছুই মানবে না, সে কিছুই হ'তে পারবে না। উন্নতি ক'রতে গেলে, জ্ঞান লাভ ক'রতে গেলে বিশ্বাস চাই। পিতা মাতার প্রতি শ্রদ্ধা চাই। তেমনি সকলের যিনি পিতা বা মাতা তাঁকে মানা চাই। 'পিতা নোঽসি।' তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস থাকা চাই। মাষ্টার ব'ললে, বল অ, যদি বলি আগে অ কেন ব'লবো, আ কেন ব'লবো না ? তাহলে তো লেখাপড়াই শেখা হয় না। তেমনি কতকগুলি Axiomatic truth, স্বতঃসিদ্ধ কথা আছে—সেইগুলি মানতে হয়। ধর্ম্মরাজ্যেও এইসব স্বতঃসিদ্ধ কথাগুলির বিষয়ে প্রমাণ চাইলে হবে না।

৬২। সাধনা হবে মহাসাধনা যদি সর্বাবস্থায় সেটি বজায় রাখতে পার। কাজের ফাঁকে, অসুখে বিসুখে, চলতে ফিরতে তাঁর নাম জপ ধ্যান ইত্যাদি রাখতে পার তবেই সাধনা মহাসাধনায় পরিণত হবে।

৬৩। সর্ব বিষয়ে সহজ হবার চেষ্টা করা, কি চলায় ফেরায় কি খাওয়া দাওয়ায়, কি জপধ্যানে, কি কাজে, সব বিষয়ে সহজ হবার চেষ্টা করবে। সহজ না হলে, :সহজ সরল ঠাকুরকে পাওয়া যায় না। শ্রীঠাকুরের বাণী, সহজ না হ'লে সহজকে চেনা যায় না"।

৬৪। মৃত্যুকে সর্ব্বদা মনে রাখতে হবে। আর বিচার ক'রবে যদি এই মুহূর্ত্তেই মরে যাও তাহ'লে কি বাসনা-কামনা নিয়ে যাত্রা ক'রবে ? কিসের প্রতি এখনও আসক্তি আছে ? যদি ছ্যাখো যে কোন বাসনা আছে তো সেটাকে দূর ক'রবার চেষ্টা ক'রবে। ছোট খাট বাসনা মিটিয়ে নেবার মত হলে মিটিয়ে নেবে। কিন্তু বড় বড় বাসনা সব ঠাকুরের নাম করে তাড়াবার চেষ্টা করবে।

৬৫। নিজের সত্ত্বাকে মহাশূন্যে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা করতে হয়। তখন কিছুতেই কিছু আসবে যাবে না। কেউ ভালো বাসলো বা না বাসলো তাতে কোন কিছু মনেই উঠবে না। সুখ দুঃখ দ্বন্দ্ব সব মিলিয়ে যাবে।

৬৬। ছ্যাখো পৃথিবীর বুকে যদি ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হয় তাহলে সাধুদের খুব সাবধানে চলতে হবে। যা দিন কাল পড়েছে, সব যেন চলে যেতে বসেছে; অবিদ্যার প্রভাব এত বাড়ছে ও বাড়বে যে সাধুদের খুব বিচার করে, চলা ফেরার দিকে খুব নজর করে চলতে হবে। আর এই পৃথিবীর বুকে ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে সব সাধুদের একত্র হতে হবে। একা একা কাজ করলে হবে না। সব সাধু সম্প্রদায় এক জোট হয়ে ধর্ম্ম ও সমাজ রক্ষার্থে চেষ্টা করতে হবে।

৬৭। সর্ব্বদা সতর্ক থাকতে হবে মনের মধ্যে হীন কিছু না এসে পড়ে, চতুর্দ্দিকের অসৎ জিনিষ যাতে মনের মধ্যে না ঢুকে পড়ে। মনের মধ্যে একবার অসৎ ভাব ঢুকলেই তখন কোনদিক দিয়ে যে নেমে যাচ্ছ বুঝতে দেবে না। তাই বিপদের মাঝে যাবার আগে দেহের চারিদিকে নামের গণ্ডী দিতে হয়। খিড়কী দরজা যেমন বন্ধ রাখতে হয় তেমনি মনের হীন দিকগুলি খুলতে নাই।

৬৮। যজ্ঞ করা ভাল কিনা? দেখ চুপ করে থাকাই ভালো। কেন না দুদিক থেকেই বলার দিক আছে। আমাদের স্বামিজীর সময়ে একবার মাড়োয়ারীরা খুব যজ্ঞ করায় স্বামিজী বলেছিলেন, লোকের খাবার ঘিয়ে যত চর্ব্বি মেশায়—যজ্ঞে টিন টিন ঘি ঢাললে আর কি হবে? দেশের লোকে খেতে পাচ্ছে না; তার চেয়ে দেশের লোকের মুখে দেওয়া ভালো, হাসপাতালে টাকা দেওয়া ভালো, হোমে দেওয়ার থেকে। আর একটি বলার দিক আছে 'স্বকর্ম ফলভোগ পুমান্'। নিজের নিজের কর্ম্মফল ভোগ করুক। যত সব দেহমনে অন্যায় করছে, তাদের ভোগ উচিত। এই সব লোকেদের জন্য হাঁসপাতালে টাকা দেওয়া মানে তাদের অন্যায়ের দ্বার আরো খুলে দেওয়া। হয়তো তারা ভালো হ'য়ে আবার অন্যায় ক'রবে। এমনি ভুগ্‌লে হয়তো ভয় থাকতো। কাজেই সেই সব লোকেদের জন্য হাঁসপাতালে টাকা দিলে তাদের ভোগ কিছু নিতে হবে। ঠাকুরের কশায়ের গল্পে এটি বলা আছে। আবার যারা কোন দিনই হোম করে না হঠাৎ একদিন হোম ক'রলে বিশেষ কি কল্যাণ হবে? কিন্তু সাগ্নিক ব্রহ্মচারী, যদি ঠিক ঠিক লোক-কল্যাণ কল্লে হোম করে তাহ'লে হোমে ঘি ঢাললে হবে। আবার মনের আকাঙ্খা না রেখে লোক-কল্যাণ ক'রলেও কাজ হবে।

৬৯। নূতনত্ব সর্বত্র। আবার নূতনত্ব ব'লতে কিছুই নেই। সেই একই জিনিষ ঘুরে ঘুরে নানা ভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, নূতনের ন্যায় প্রতিভাত হ'চ্ছে। নূতন কি করে হবে? সেই ব্রহ্ম থেকেই তো জগৎ। তিনি ছাড়া নূতন Super Brahman তো হ'তে পারে না। তবে তাঁকে চির-নূতন বলা যেতে পারে। কারণ তিনি নানা ভাবে সৃষ্টির মধ্যে বিলসিত হ'চ্ছেন। পাশ্চাত্ত্য দর্শনে তাই তাঁকে Elan Vital ব'লেছে।

৭০। যা কিছু দূরে তাই সুন্দর। যা কিছু মানুষের নাগালের বাইরে তাই তার কাছে সুন্দর, মধুর, চির-আকাঙ্খিত ধন। অতীতের স্মৃতি তাই তার কাছে

অতি প্রিয়। তাই ঠাকুর আমাদের কাছ থেকে দূরে স'রে থাকেন চির-মোহনীয়া চির-অধরা রূপে। তিনি যদি ধূলার ধরণীতে নিত্য নিত্য থাকেন তাহ'লে আমরা তাঁর কোন মর্য্যাদা, কোন দামই দিতে পারবো না। তাই ভক্তের বুকে ঠাকুর চির-অধরা ধ্যানের ধন। ব্রহ্ম আমাদের বাক্য মনের অতীত, তাইতো আমরা তাঁর সম্বন্ধে এত বিচার, এত জানবার চেষ্টা করি।

৭১। জগৎটা আত্যন্তিকে শান্তি, কল্যাণেরই রাজ্য বটে। কিন্তু মানুষ তাঁকে অশান্তিতে ভ'রিয়ে তুলেছে, একটু যদি সব বুঝে স্থঝে চলে, ঠাকুরের নাম করে, সৎভাবে কাটিয়ে দেয় তাহ'লেই বুঝতে পারবে জগৎটা কতখানি শান্তি ও আনন্দের জায়গা। প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে দেখ, চারিদিকে কেমন একটা শান্তি, কল্যাণ বিরাজ ক'রছে। তিনি কেমন ক'রে পরের পর সব দিয়ে আমাদের স্থবিধা ক'রে দিচ্ছেন, তাঁর জগৎ সাজিয়ে রেখেছেন। তা না বুঝে আমরা নিজেদের মনের ময়লা, নিজেদের মনের হীনতা দিয়ে জগৎ দেখি, আর তাই নিয়ে গোলমাল ক'রে বলি জগৎটা অশান্তির জগৎ। কিন্তু তা নয়। এই জগৎ সেই মঙ্গলময়ের জগৎ। কাজেই আত্যন্তিকে এটা একটা শান্তি কল্যাণের রাজ্য।

৭২। লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ত্যাগ করা মানে বৃথা লজ্জা ঘৃণা ভয় ত্যাগ করা। যেখানে লজ্জা রাখা উচিৎ সেখানে লজ্জা ত্যাগ নয়। বৃথা লজ্জা ত্যাগ ক'রবে। যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অসৎ তাকে ঘৃণা ক'রবে। আর শাস্ত্র, গুরু, ইষ্ট এঁদের সম্বন্ধে ভয় রাখবে। শাস্ত্রের বাণী মেনে চ'লবে। গুরুকে ভক্তি ক'রবে। শ্রদ্ধা ক'রবে। আর ইষ্টের অকৃপা হয় এমন কোন কাজ করবে না। তাই ব'লে বৃথা ভয় রাখলে চ'লবে না। শাস্ত্র, গুরু, ইষ্ট সম্বন্ধে যদি ভয় না থাকে তা'হলে এগোতে পারা যায় না।

৭৩। সাধু ব্রহ্মচারীদের দিনের বেলায় ঘুমোনো উচিৎ নয়। মনুর স্মৃতিতে আছে 'মা দিবা স্বাপ্সি'। ৪ ঘণ্টার বেশী রাত্রিতে ঘুমানো উচিৎ নয়। ঘুম মানেই তমোগুণ। পাশ্চাত্য মনোবিজ্ঞানবিৎ ফ্রয়েড প্রভৃতির মতে ঘুমের মধ্যে আমাদের মনের প্রহরী বা Censor নিদ্রিত হ'য়ে পড়ে, তাই অবচেতন মন স্থবিধা পায়। তমোগুণে বিনাশ আনে। কাজেই ধর্ম্মরাজ্যে বিনাশ এনে দেবে এই ঘুম—এই আলোস্য। গীতায় আছে—

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত।' ১৪।৮
শ্রীঠাকুরও ব'লেছেন,—'তমোগুণে সংহার।'

৭৪। সর্ব্বদা মনে ক'রবে আমরা রামকৃষ্ণলোকের অধিবাসী। সেখান থেকে এসেছি এই জগৎটিতে দু'চার দিনের জন্য। দু'দিন পরে ফিরে যাবো আবার সেই আনন্দধামে ঠাকুরের কাছে। জগৎটাকে মনে ক'রবে বিদেশ, মনে ক'রবে আমরা প্রবাসী। তাহলে এই জগৎটার প্রতি আর মায়া থাকবে না। দু'চার দিন একটু আনন্দ ক'রে ··আবার ফিরে যাবে সেই আনন্দধাম রামকৃষ্ণলোকে·

৭৫। দেখ truth হ'চ্ছে এমন জিনিষ, যার সঙ্গে কখনও, কোন কালে, কারো সংঘর্ষ হয় না। সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে সত্য অবাধ থাকে। যা সত্য তার সঙ্গে কিছুর বিরোধ হয় না। আমাদের বুঝবার ভুল। দেখনা শঙ্কর প্রমুখ দার্শনিকেরা ব'লেছেন ব্রহ্ম অচল, অটল, সুমেরুবৎ। তাঁদের মতে সব কিছুর পেছনে আছে অচঞ্চলতা, অপরিবর্ত্তন। কিন্তু পরবর্ত্তীকালে বৌদ্ধগণ, পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক হোয়াইটহেড প্রভৃতি ব'লেছেন চঞ্চলতাই প্রধান জিনিষ। সব কিছুর পেছনে আছে চঞ্চলতা, পরিবর্ত্তন। আমরা ভাবি, বুঝি শঙ্করের মত খণ্ডিত হ'ল। ওটি আমাদের বুঝবার ভুল। ওর মধ্যে আছে মিল। শ্রীঠাকুর ব'লেছেন "যার অটল আছে তার টলও আছে"। সেই অচিন্ত্য অসীম সত্তার এক এক দিক মাত্রই প্রকাশিত হ'য়েছে, হ'চ্ছে বা হবে।

৭৬। পড়াশুনা, কাজ, সবই করতে হয়, কিন্তু সবের পেছনে নামটাকে গেঁথে নিতে হবে, অজপা জপ করবার চেষ্টা ক'রতে হবে। মনের মধ্যে যাতে নামটি অনবরত চলে সেই দিকে নজর রাখবে। যেই নাম বন্ধ হ'য়ে যাবে অমনি তা জোর ক'রে চালাবার চেষ্টা ক'রবে। এইত সময়—উঠে প'ড়ে লেগে যাও। বুড়ো বয়েসে বিশেষ কিছু হবে না।

৭৭। নিয়মিত জপ ধ্যান ক'রতে হয়। ঠাকুরকে ডেকে যেতে হয়; সব হ'য়ে যাবে। বুকভাঙ্গা আকুলতা নিয়ে তাঁকে ডাকো। আকুলতার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা কর। ব্যাকুলতার সাধন কর—তবে তো এগোতে পারবে, তবে তো তাঁকে লাভ করতে পারবে। সুখ-দুঃখ কান্না-হাসি সবের পারে জ্যোতির্ময় লোকে চির-শিশুরূপে থাকতে পারবে।

৭৮। বাইরে মলিনতা দূর ক'রতে গিয়ে যেন অন্তরের মলিনতা না এসে পড়ে।

৭৯। প্রত্যেকে যদি নিজের দোষ দেখতে পায় তাহ'লে অনেক গোলমাল চুকে যায়। সব দিক দিয়ে সুবিধা হয়। সর্ব্ব বিষয়ে উন্নতি করা যায়। জগৎটা শান্তির রাজ্যে পরিণত হয়।

৮০। গীতার সাধন প্রধানতঃ চতুরঙ্গ সাধন। ভগবানে ভক্তিও ক'রতে হবে, যোগও করতে হবে—জ্ঞানীও হ'তে হবে, আবার নিষ্কাম কর্মও ক'রতে হবে। অবশ্য গীতায় অনন্ত বিষয় র'য়েছে, ভগবদ্‌বাণীর সীমা করা যায় না।

৮১। কৃপাবাদ ও স্বাধীন ইচ্ছাবাদ আত্যন্তিকে একই। আমাদের মধ্যে তিনিই আছেন। তাঁর ইচ্ছাতেই সব হ'চ্ছে। উপর দিক থেকে দেখলে পুরুষোত্তমের কৃপা, আর নীচের দিক থেকে দেখলে অহং সত্তার স্ফুরণ। গীতায় বলেছেন, "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" তাঁরই অংশ আমাদের ভিতর থেকে অহং-এর খেলা ক'রছে।

৮২। আগে পাপ যায়? না আগে ধর্ম্ম লাভ হয়? দুটি পরস্পরাপেক্ষিক। এর মধ্যে একটি অদ্ভুদ রহস্য আছে, আমরা বুঝতে পারি না। আমাদের চিৎকণ সত্ত্বা, জীবভূত সনাতন যত এগিয়ে যাবে—তাঁর চিৎঘন সত্ত্বা তত এগিয়ে আসবেন আমাদের দিকে। যত এগিয়ে যাবে তত পাপমুক্ত হবে। কিন্তু কখন যে পাপ একেবারে স'রে যাবে আর ঠাকুর কৃপা ক'রে, দয়া করে প্রকাশিত হবেন তা বলা যায় না, সেটি অচিন্ত্য। শ্রীঠাকুরের কথা, "আমরা যত কাশীর দিকে এগিয়ে যাবো ততই ক'লকাতা পেছনে প'ড়ে থাক্‌বে।"

৮৩। আমরা দেশকালের মধ্যে আছি কিন্তু অনেক সময়ে ভবিষ্যতের কথা জানতে পারি। তবে কি দেশ কাল মিথ্যা? ছাখো, দেশকালের মধ্যে থেকে দেশকালকে মিথ্যা বলার যো নাই। মাছ যদি জলে থেকে জলকে মিথ্যা বলে তা হ'তে পারে না। দেশ কাল আছে আর আমরা এই দেশকালের মধ্যে আছি। তবে আমাদের মধ্যে দুটি সত্ত্বাই আছে। গীতামতে পুরুষোত্তম এক অংশে জীবভূত সনাতনরূপে আমাদের মধ্যে সুখে দুখে জড়িত হ'য়ে রয়েছেন, আর একটি সত্ত্বায় দ্রষ্টা অনুমন্তা রূপে কালাতীত হ'য়ে আমাদের দেহের মধ্যে আছেন। কাজেই আমরা সেই কালাতীত সত্ত্বা সহায়ে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের পারে যেতে

পারি। গীতায় ভগবান এই ভাবে পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কান্টের বহু উর্দ্ধে চ'লে গেছেন। ফেনোমেনান ও ন্যুমেনান রাজ্যের ভেদ ভেঙ্গে দিয়েছেন।

৮৪। এই মনে ব্রহ্মানুভূতি হয় কিনা? ঠাকুর ব'লেছেন, "তিনি শুদ্ধ মনের গোচর।" কাজেই আমরা শুদ্ধ মনের দ্বারাই ব্রহ্মানুভূতি লাভ করি। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক কান্ট, এই সসীম মনের দ্বারা অসীমকে জানা যায় না ব'লেছেন—তবে তিনি ব'লেছেন মানুষ উভয় জগতেরই অধিবাসী—শুদ্ধ-প্রজ্ঞা হিসাবে পারমার্থিক জগতে তার স্থান—সংবেদন দেহেন্দ্রিয় নিয়ে সে অবভাসিক জগতে (Phenomenal) বাস ক'রছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের দ্বারা পারমার্থিক বস্তু জানা যায় না। তবে নৈতিক জীবনের জন্যে পারমার্থিককে মানতে হবেই।

৮৫। দেখ, দেহ মন শুদ্ধ না হ'লে, ঠিক না হ'লে শুদ্ধ সঙ্গীত হয় না। যেমন একটি বেসুরো ভাঙ্গা যন্ত্র থেকে শুদ্ধ সুর বেরোয় না তেমনি আমাদের দেহ মন শুদ্ধ না হ'লে ঠিক ঠিক দিব্য শুদ্ধ সঙ্গীত কি ক'রে হবে? অবশ্য Science এর দিক থেকে হয়তো শুদ্ধ হবে। কিন্তু আত্যন্তিকে সঙ্গীত শুদ্ধ হবে না—যতক্ষণ না দেহ মন ভগবৎ নামে, সাধনায়, ভগবৎ কৃপায় শুদ্ধ হ'চ্ছে। অবশ্য দুটি হ'লেই সব থেকে সুবিধা।

৮৬। আমাদের মনটাকে বিরাট করবার চেষ্টা করা উচিৎ। বাসনা কামনা আমাদের মন থেকে সরিয়ে দিলে মনটা বিরাটত্ব ভূমাত্ব লাভ করে, তখন তাতে বিরাটের ছায়া পড়ে। আকাশের ছায়া একটা পাত্রে পড়ে, আবার সমুদ্রের ওপরেও পড়ে। কিন্তু পাত্রে পড়ে ক্ষুদ্র হ'য়ে, সমুদ্রের ওপর পড়ে - বিরাট হ'য়ে। তেমনি আমাদের মন যত কামনা বাসনায় সঙ্কুচিত হ'য়ে যায় বিরাটের ছায়াপাত ততই খণ্ডিত হয়।

৮৭। একটা পদ্ধতি আছে—মনটাকে সহজাত প্রবৃত্তি বা Instinct থেকে প্রজ্ঞা Intitution-এ নিয়ে যাওয়া। পশুদের Instinct আমাদের মনেও আছে, সেইটাকে আমাদের Institutionএ পরিণত করতে হ'বে। প্রজ্ঞাঘন ব্রহ্ম তো বিরাট Institution, কাজেই আমাদের একটু ক'রে চেষ্টা করা উচিৎ Higher Institution-এ মনকে নিয়ে যাওয়া। জোর ক'রে ফুলের প্রতি ভালবাসা, প্রেয় ছেড়ে শ্রেয়কে ভালবাসা, সৎকথা সচ্চিন্তার চেষ্টা করা উচিৎ।

৮৮। প্রত্যেক মানুষের ঠিকমত চ'লতে চ'লতে বেচাল চ'লতে ইচ্ছে করে। পশুদের দেখা যায় হঠাৎ একদিকে দৌড় দেয়। বিচারশীলতা নিয়ে মন ঠিক

চ'লছে হঠাৎ চঞ্চলতা নিয়ে এক দৌড় দেয়। এই হচ্ছে Erraticism of soul. ব্রহ্মও একদিন সমরসে থাকতে থাকতে এমনি বিসম হ'য়ে গেলেন। খুব নিয়মে চ'লেও হঠাৎ ইচ্ছা করে বেনিয়মে চলবার। আবার আমরা বহু জন্ম পশু ছিলাম। কাজেই পশুত্বের Erratic nature—বিচারহীনতা—হঠাৎ জেগে ওঠে। সেই Erratic ভাবগুলোকে অবশ্য দমন করা উচিৎ। দার্শনিক কান্ট তাই "Moral ought" উচিত-বোধকে বড় করে স্থান দিয়েছেন।

৮৯। যত আমরা এগিয়ে যাব তত আমাদের অহং ক'মে যাবে। ঘুম, ক্রোধ, লোভ এই সব ক'মে যাবে। ভগবৎ-তত্ত্বের কাছে যত যাব, ততই অহং-তত্ত্ব ক'মে যাবে। তখন দীন হীন শরণাগত হয়ে যাবে। মাথা নীচু হয়ে যাবে। এটি অবশ্য ভক্তের। আবার জ্ঞানীদের প্রথম দিকে মাথা উঁচু থাকে, অহং থাকে। কিন্তু পরে অহং-তত্ত্বের সমরসে প্রতিষ্ঠা। একেবারে যাঁরা প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছেন তাঁদের অহং আকাশের মত উঁচু হ'তে পারে, আবার ধূলির ধূলিও হতে পারেন। সবই এক হ'য়ে যায় কিনা! ত্রৈলঙ্গস্বামী এই আকাশমুখী ব'সে আছেন, কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ নাই—আবার যে যা অত্যাচার ক'রতে চায় ক'রে যাচ্ছে।

৯০। সাধকেরা চক্র একটা কাছে রাখলে ভাল হয়। আসনে রাখলে তাতে জপটা গেথে যাবে। অষ্টধাতুর হ'লে ভাল হয়। এটা নিজের যত না কাজে লাগবে ভবিষ্যতের লোকেদের কাজে লাগবে। ত্রৈলঙ্গস্বামীর সাধনার চক্রগুলির কাছে বসলে জপের সুবিধা হয়, এটি পরীক্ষিত সত্য। ওখানে সাধুদের জপের জায়গা হওয়া উচিত ছিল।

৯১। ভাষার দৈন্য হ'চ্ছে মনের দৈন্য। ভাষা মনের স্থূল প্রকাশ মাত্র। মনের প্রকাশ যেখানে স্বচ্ছ, সুন্দর, অনবদ্য, অমলিন, ভাষাও সেখানে আরো বেশী ক'রে তেমনি হবে। ভূমানন্দের কথা, ব্রহ্মানন্দের কথা, Cosmic consciousness-এর কথা মনেই ধরা যায় না···তাই ভাষায় আরো ধরা দেয় না।

৯১ ক। লেখকের ভাষা দেখে তার মনের গতি ধরা যায়। ভাষাও মনোবিজ্ঞানের একটি গবেষণার বিষয়।

৯২। (প্রত্যেকটি প্রাণী কীট পতঙ্গাদির মৃত্যুর পর তাদের আত্মা কি প্রেতদেহ প্রাপ্ত হয়?) গ্যাখো, প্রত্যেকটি ইউনিসেলুলার প্রোটজোয়ার বা এই

সমস্ত নানারকম পোকা মাকড় কীট পতঙ্গ এদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব প্রকাশ হয়নি। বলিষ্ঠ বক্তিত্ব গ'ড়ে না উঠলে মৃত্যুর পর তার আর অস্তিত্ব থাকে না। যে সব প্রাণী নিজের বিষয় সচেতন নয়, মৃত্যুর পর তাদের আর প্রেত-আত্মা ব'লতে কিছু থাকে না, সমষ্টি সত্তায় মিলিয়ে যায়। আর মানুষের individuality grow ক'রেছে, অহং-সত্তা গ'ড়ে উঠেছে; নিজের সম্বন্ধে সচেতন। কাজেই তাদের একটি সত্তা গ'ড়ে উঠেছে, যেটি মৃত্যুর পরও থাকে। মানুষের বোধ-শক্তি, অহং-সত্তা বেশী—কিন্তু একটা প্রোটজোয়ার সেই সত্তা গ'ড়ে ওঠেনি —তাই তাদের সত্তা বিরাট সত্তায় মিলিয়ে যায়। আর দেখ, সেই পৃথিবীর আদিযুগ থেকে প্রতিটি ইউনিসেলুলার পোকা পিঁপড়ে সবারই যদি মৃত্যুর পর অস্তিত্ব থাকে তাহ'লে পরলোকটা তো একটা গোলমালের জায়গা হ'য়ে ওঠে। যাদের অহং-সত্তা গ'ড়ে উঠেছে তাদেরি অস্তিত্ব থাকে।

৯৩। (আচ্ছা, এই যে ইউনিসেলুলার প্রোটজোয়ার শক্তি চ'লে যাচ্ছে, তাহ'লে এদের ক্রমবিবর্ত্তন হ'চ্ছে কেমন ক'রে?) ক্রমবিবর্ত্তন হ'চ্ছে বংশ পরম্পরায় দৈহিক পরিবর্ত্তন—প্রোটজোয়ার বাচ্চা, তার বাচ্চা—এমনি করতে করতে বিবর্ত্তন হ'চ্ছে। যেমন mastodon নামে বড় হাতী, তাদের বাচ্চা কিছু হ'ল; তাদের বাচ্চা আরোও ছোট—এমনি ক'রে ছোট হ'তে হ'তে বর্ত্তমান হাতীর আকারে দাঁড়িয়েছে। অবশ্য মানসশক্তির সবটাই নষ্ট হ'য়ে যায়, মিশিয়ে যায়—তা নয়। খানিক এনারজি বা শক্তি তার পুত্রাদির মধ্যে থেকে যায়ই। সেই সিমপ্লেক্স চৈতন্য-সত্তা যুগ যুগ ধ'রে পুত্র পৌত্রাদির মধ্যে দিয়ে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে ক্রমবিবর্ত্তনের ধারায় ইনডিভিজুয়েশন বা বলিষ্ঠ ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য গঠন ক'রেছেন, বর্ত্তমান মানুষের কমপ্লেক্স সত্তায় পরিণত হ'য়েছেন।

৯৪। এই যে সব খুন হয়, তাদের আত্মা খুনীকে ভূত হ'য়ে এসে ভয় দেখায় না কেন?

মরবার আগে আত্মা খুব ভয় পেয়ে যায়। সেই ভয় পেয়ে যাবার সময় আত্মা ভয় নিয়েই যাত্রা করে—কাজেই মৃত্যুর পর সেই ভীতিটাই থেকে যায়। কাজেই মৃত আত্মা আর ভয় দেখাতে বা প্রতিশোধ নিতে পারে না। যেমন মিশরে কোন রাজার মৃত্যু হ'লে তার প্রিয় চাকরকে কষ্ট দিয়ে, ভয় দেখিয়ে, আত্মাকে সম্মোহিত ক'রে মেরে ফেলত—যার জন্যে মৃত্যুর পরও সেই আত্মা প্রভুর কাছে কাছে থাকত। অবশ্য শক্তিমান, সৎ আত্মা হ'লে প্রতিশোধ নিতে

পারে। দাক্ষিণাত্যের এক মন্দিরে তিনজন সাধুকে একজন হত্যা করে। পরে সে রোজ রাত্রে দেখতো, সাধু তিনটি এসে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে আর বলে, কোর্টে দোষ স্বীকার করো। সে যতই উড়িয়ে দেবার চেষ্টা ক'রত ততই প্রত্যেক দিন রাত্রিতে আসত—আর সেই রকম ক'রে তাকিয়ে তাকে দোষ স্বীকার ক'রতে ব'লতো। শেষে সে কোর্টে গিয়ে দোষ স্বীকার করে, আর শাস্তি নিলে।

৯৫। দু'নৌকা ক'রলে চ'লবে না। দু'টি রাখলে চ'লবে না। হয় গুরু-নিষ্ঠা রাখতে হবে—নয় শাস্ত্র-নিষ্ঠা রাখতে হবে। গুরুর অসন্তোষজনক কাজে শাস্ত্র-বিচার ক'রলে চ'লবে না। ঠাকুর ব'লেছেন শাস্ত্র গুরুমুখে শুনে নিতে হয়। সৎগুরু যা ক'রবেন তাতে শিষ্যের কল্যাণ নিশ্চয় হবে। ইষ্ট, গুরু, শিষ্য ও শাস্ত্র একমুখী হওয়া চাই। বিমুখ শিষ্যকে গুরু সুবিধা মত ঘুরিয়ে নিয়ে যান। যেমন গিরীশ ঘোষকে ঠাকুর ব'ললেন "আচ্ছা তোমাকে কিছু ক'রতে হবে না। বকলমা দাও।" এখন 'বকলমা' বা শরণাগতিই তার পক্ষে তপস্যা। গুরু-কৃপা লাভ ক'রতে হলে তাঁর মতানুসারে চ'লতে হবে। আর সৎগুরুর বাণী শাস্ত্রের সঙ্গে মিলবেই। যদি মনে হয় মিলছে না, সেটি আমাদের অহং-প্রসূত ভ্রান্তি মাত্র।

৯৬। সৎ-গুরুর নির্দ্দেশ মত চ'ললে ইষ্ট ও মহাপুরুষদের কৃপালাভ সহজ হয়।

৯৭। সর্ব্বদা নাম হবার উপায় হচ্ছে, কিছুটা সময় নামকে মুখস্থ করতে হয়। আমরা ধারাপাতের নামতা যেমন মুখস্থ ক'রতুম। বেশ কিছুদিন ধ'রে মুখস্থ করার ফলে আজও বহুদিন পরে ৫ × ৭ ব'লতে চট ক'রেই মনে ৩৫ ওঠে, হিসেব করতে হয় না। তেমনি জপকেও মুখস্থ ক'রতে হয়। রাত্রি জাগবে। রাত্রি জেগে জপ অভ্যাস ক'রলে খুব ভাল জপ হয়।

৯৮। ব্যাকুলতা প্রয়োজন। সেইজন্য ব্যাকুলতা আনতে হয়; জোর ক'রে তাঁর জন্য ব্যাকুল হ'তে হয়। ধর, শরীরে অসুস্থতার জন্য কষ্ট হ'চ্ছে, সেই কষ্টকে ঠাকুরের দিকে মোড় ফিরিয়ে দেবে। আর তীব্রভাবে জপ ক'রে আকুলতাটি ঠাকুরের জন্য মনে ক'রবে। কিংবা ইচ্ছা করে শরীরকে কষ্ট দিয়ে ব্যথার সৃষ্টি ক'রে ধ্যান ক'রতে ব'সে মনে ক'রবে—ঠাকুরের জন্য সেই ব্যথা। এমনি ভাবে ক'রতে ক'রতে দেখবে অনেক কাজ হবে।

৯৯। ধ্যাথ স্থূল থেকে ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হবার চেষ্টা ক'রবে। অতিরিক্ত জপ সহায়ে এইটি চেষ্টা ক'রতে হবে। শরীরের উর্দ্ধতম চক্রে মনকে 'ভাইব্রেট' ক'রবে বেশী ক'রে। মনকে এমন ক'রতে হবে যাতে তুমি হার্টের বা ব্রেণের প্রতিটি স্পন্দন গুণতে পারো।

১০০। লোকের কথায় কাণ না দিয়ে ঠিক ঠিক চলবার চেষ্টা ক'রবে। দেখবে অন্তে ঠিক সেই জ্যোতির্ম্ময়ধাম রামকৃষ্ণলোক মিলে যাবে।

১০১। যেসব কামনা দেহ-মনের বিশেষ ক্ষতিকর সেগুলি ত্যাগ ক'রবে।

১০২। শ্রীঠাকুর কেবল ১লা জানুয়ারী গুটি-কয়েক ভক্তের, চৈতন্য হোক, ব'লে কল্পতরু হ'য়েছিলেন তা নয়। তিনি সবসময়ে সকলেরই মনোবাসনা পূরণ ক'রছেন।

১০৩। দেখ, সারাদিন চব্বিশ ঘণ্টা হোম, নাম, পাঠ—এগুলি উন্নতি করবার এক-একটি পেগ বা খুঁটি। যেমন খুঁটি পুঁতে পুঁতে ওপরে ওঠে তেমনি এক-একটা বিশিষ্ট দিনে বা কোন এক-একটা রাত্রি জেগে জপ করা—এসব হ'চ্ছে একটা একটা পেগ। যত পেগ পুঁততে পারবে তত আধ্যাত্মিক রাজ্যে পড়বার ভয় ক'মে যাবে।

১০৪। সর্ব্ব দ্বার রক্ষা ক'রবে। যেন কোন দিক দিয়ে অকল্যাণজনক কিছু না প্রবেশ ক'রতে পারে আমাদের মনে।

১০৫। সৃষ্টিটি একটি বিরাট অরকেষ্ট্রা—এর ভেতর নানা যন্ত্র বাজছে, কিন্তু সবার ভেতর একটা সংগতি বা মিল আছে। আর এটি পরিচালনা ক'রছেন সৃষ্টি কর্ত্তা স্বয়ং। আমরা প্রত্যেকেই এই অরকেষ্ট্রাতে যোগ দিচ্ছি। তবে যারা লোকোত্তর পুরুষ তাঁদের যন্ত্র ভাল সিম্ফনির সৃষ্টি করে। ইতর সাধারণের যন্ত্র কিছু বেসুরো বাজছে। সার্ব্বজনীন প্রী'তি, পবিত্রতা এই-সব সুরে আমাদের যন্ত্র বাঁধতে হবে।

১০৬। বিলেতে একবার আত্মিক বিষয়ে এক বিতর্ক হয়। এর মধ্যে **Sir A. Keith** নামে একজন নাস্তিক ডাক্তার ছিলেন। **Sir Keith** বলেন—দেহকে নানাভাবে দেখেছেন, তাতে আত্মার অস্তিত্ব বিষয়ে কোন প্রমাণ তাঁরা পান না। মৃত্যুতে মানুষ ধীরে ধীরে মরে, তার দেহের কোষগুলির একসঙ্গে মৃত্যু হয় না; যদি আত্মা এক হয় তবে মৃত্যু একেবারেই হবে।

এর উত্তরে বলা যায় যে, ক্রমবিকাশের মতে প্রথমে এককোষ-বিশিষ্ট প্রাণীর উদ্ভব হয় (Protozoan) আর তার থেকে দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে হ'য়ে ক্রমে বহু কোষযুক্ত মানুষের সৃষ্টি হয়েছে। এখন Protozoan এর যে চৈতন্য সেটি, আর বহু-কোষের চৈতন্যসমষ্টি নিয়ে যে এক জটিল চৈতন্যযুক্ত মানুষ হ'য়েছে, এরা এক নয়। এখন এই জটিল চৈতন্যযুক্ত মানুষের মৃত্যুর আগে ব্যষ্টি চৈতন্যযুক্ত কোষগুলির মৃত্যু হ'তে থাকে আর যখন সমষ্টি চৈতন্য সত্তার আর থাকার সম্ভাবনা থাকে না তখনই সমষ্টি চৈতন্য:দেহ পরিত্যাগ করে। কাজেই সমষ্টির মৃত্যুর আগে ব্যষ্টি চৈতন্যযুক্ত কোষগুলির মৃত্যু ত হবেই। শরীর-তত্ত্ববিদ্‌দের কাছে ব্যষ্টি চৈতন্যের মৃত্যু অর্থাৎ কোষগুলির একে একে মৃত্যুই দৃষ্টিতে পড়ে। এতে বহু আত্মার কথা প্রমাণিত হয় না; জটিল আত্মারই প্রমাণ হয়। আমাদের দেহমন একটি জটিল সত্ত্বা organic whole.

১০৭। সমস্ত কাজের প্রেরণা আমরা পাই কোথা থেকে? এটি জটিল তত্ত্ব। এর কিছুটা আসে পারিপার্শ্বিক থেকে। আর কিছুটা আসে আমাদের মনের সংস্কার থেকে। আসে হৃদিস্থিত হৃষীকেশের কাছ থেকে—কিন্তু এসবই আসে সমস্তের পারে যিনি আছেন তাঁর কাছ থেকে।

পারিপার্শ্বিক ব'লতে, সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড থেকে যে প্রেরণা আমরা পাই।

সংস্কার ব'লতে সমস্ত অন্তঃপ্রকৃতি বোঝায়। এটি কতকটা ফ্রয়েডের অবচেতন, Jung-এর জাতির সংস্কার। গীতাতে এই সমস্তটিকেই প্রকৃতি বলেছেন, "প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।" (৩।২৭)

১০৮। সৎ হবার মূলে থাকা দরকার WILL TO BE GOOD, ভাল হবার এক বলিষ্ঠ ইচ্ছা—একটা বিরাট Dynamicism. বুদ্ধদেবের মতন বলা চাই—

"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরম্
ত্বগস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু।
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্পদুর্লভাং
নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে॥"

আত্মিক চুম্বক

দেহ মন হবে আকর্ষণী যন্ত্র······

যা কিছু সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ—

তাই-থেকে······

শক্তি বিভূতি······

স্বভাবতঃ······

আহৃত হবে······

পাশ্চাত্ত্য দর্শনে Animal magnetism বলে একটা কথা আছে—দেহের চৌম্বক শক্তি। এমন এক এক জন লোক আছে যাদের কথা সহজে না শুনে পারা যায় না। নেপোলিয়ান দাঁড়ালে যুদ্ধের গতি ফিরে যেত। স্বামিজীর বক্তৃতার পর লোকে খানিকক্ষণ অবশ হ'য়ে ব'সে থাকত। এঁদের আত্মার চৌম্বক শক্তি প্রকাশিত হয়েছিল।

আমাদের উন্নতি ক'রতে হ'লে জাগতে যা কিছুতে সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপের প্রকাশ, তার থেকে ঠাকুরের শক্তি, বিভূতি, শান্তি ও প্রীতি আকর্ষণ ক'রে নিতে হবে। প্রাণায়াম, ইষ্টমন্ত্র, দৃঢ়ইচ্ছা প্রভৃতি এর সহায় হবে। এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠা হ'লে আমাদের দেহ মন চুম্বকের মতন ঐ সব সত্ত্বা আকর্ষণ করে নেবে পারিপার্শ্বিক থেকে, বিনা চেষ্টায়।

—শ্রীরামকৃষ্ণার্পণ

বেদছন্দা

(পঞ্চম পর্ব্ব)

বেদছন্দা

নাম ও কম্পন

সবই ব্রহ্মের প্রকাশ
বিবর্ত্ত ।
ব্রাহ্মী বিবর্ত্তনে
ঈপ্সিত পরিবর্ত্তনের প্রবর্ত্তনা ।
সাধনাকে করে
সহজ ও সুগম
এরই প্রবর্ত্তনে
বর্ত্তমান বিজ্ঞান ব্রতী......
দেহ ও মস্তিষ্কের কোষমধ্যে
যে সংস্কার আছে জমে...
তারই পরিবর্ত্তন মুখে......
বহুল সুবিধা দেয় দেখা
সাধকের জীবনে
তার ক্রম উন্নয়নে ।
পরীক্ষিত পথে
মনের নিরোধে
সাইক্লোট্রন (অনুবিধ্বংসী) যন্ত্রের মত
নাম কম্পনে......
দেহ ও মস্তিষ্কের সংস্কার সাধন
আশু উপকারী
সাধকের সহজ পথ ।

সম্যগ্‌দর্শনযোগ

এখান থেকেই সব। (শ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)
তাই সব ধরেই
এবং সবেতেই
পাওয়া যাবে তাঁকে······
ব্রাহ্মী সিসৃক্ষায়
ব্রহ্ম মণ্ডলে
ব্রহ্মেরই প্রকাশমুখে
যা হচ্ছে—
একের এই বহুলতা—বহুর এই ঐক্য
সাধক দেখবেন
ইষ্টরূপে
ইষ্টমন্ত্রে—এক স্বরূপে......
ইষ্টের এই সম্যগ্‌দর্শনে—
চিত্তের এই সম্প্রসারণে
নিষ্পেষণের আশঙ্কা কম
আর তা······
মনের বৃত্তির, ধর্ম্মের, স্বভাবের
অনুগ........

শক্তিযোগ

জড় ও চৈতন্য……

দুই নয়……

এক।

এক চৈতন্য………চিৎশক্তি
এই জীব জগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত)
তাইতো চৈতন্যের সাধনে
জড়ের ব্যবহার সম্ভব।
যন্ত্রযুগে যন্ত্রের অবদান
ধর্ম্মের ক্ষেত্রেও আমাদের নিতে হবে।
আন্তর শক্তির সঙ্গে
যুক্ত হবে জড়শক্তি
মহাশক্তির কৃপায়……
আর এই শক্তিই সাধককে নিয়ে যাবে
মহাশক্তির পার।

চল অচল ধ্যান

"যার অচল আছে তার চলও আছে"
(শ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ)

তাই তাকে চল ও অচল এই দুই
বিভাগেই ধ্যান করতে হয়।
চলকে ধরে অচলে বা
অচলকে ধরে চলে চলে যেয়ে
দুই ভাবেই যুগপৎ ধ্যানই শ্রেয়—
রূপ ও নাম হবে সহায়—
গতি চির মিলনই ব্রাহ্মী স্থিতি
যন্ত্রীর হাতের যন্ত্র!

সুরমিলন

সৃজনের প্রথম সুর
অনাহত ধ্বনি—
ব্রহ্ম থেকে উঠেছে—
আজো বাজছে —
তাকে হারিয়ে.......
আমাদের এই ব্যথার জগৎ......
সেই অসীম সুরকে চিনতে পারলে .....
আমরা সুরময়ের সঙ্গে যুক্ত হই
একে চিনতে চাওয়ায়
আমাদের এই নিত্যকার ব্যাকুলতা—
এই ব্যাকুলতা বাড়িয়ে তুলতে হ'বে
নিত্যকার চেষ্টায়
অসীম করে তুলতে হবে
সীমার সুরকে
তবেই পাবে
সেই সুরময়কে।

গতিযোগ

গতির সঙ্গে সঙ্গে
দেশ কালের
মাপ যায় কমে
আপেক্ষিকতায়।
এই সূত্র ধরেই
জপের সহায়ে
নামের গতিবেগে……
মনের অসীম গতিপথে……
দেশ কাল যাবে মুছে……
বন্ধনের হবে মুক্তি……
গতি পাবে স্থিতি
ব্রহ্ম স্বরূপে।

জপচক্র

চক্রগতিতে সৃষ্টির বিকাশ……
তাই জপের গতি
চক্রাকারে চললে
বিশ্বচক্রের সাথে
হবে তার মিতালী
গতি হবে সহজ।
ইষ্টকে ঘিরে চলবে এই চক্র……
আর তাঁরই কৃপায়
বাসনা যাবে দূরে……ভবচক্র হবে লুপ্ত
জপচক্র হবে মুক্তিচক্র
থাকবে শুধু গতি
মুক্তির অবাধ অসীম অনন্ত স্ফূর্তি।

নবগতিযোগ

নব্য জড়বিজ্ঞানে যে অদৃষ্ট বা অনির্দ্দেশ্যবাদ
"চেতনরাজ্যে" তাই কৃপাবাদ।
অদৃষ্টবাদে যে হঠাৎ গতি……
চেতনরাজ্যেও তেমনি ঘটে—
কৃপায় নবগতি ……
আবার নবগতিতে কৃপা……
তাই নবগতি সাধকের প্রয়োজন—
"কৃপা বাতাস" ধরতে।

মহাজাগতিক (Cosmic) জপ

সমস্ত সৃষ্টিই জপময়,……প্রকাশের
তারতম্যে, নাম বৈচিত্র্যে।
……ইষ্টকেন্দ্রে নাম করতে হবে ….দুর্নিবার
বেগে……সারা বিশ্ব হবে নামচক্র।
সাধকের মন, দেহ সূত্র করে এই বিশ্বনাম
চক্র তাকে করবে বিশ্বাতীত।

কম্পন বিজ্ঞান

কম্পনেই জগৎ—সৃষ্টি……
ব্রহ্মের কম্পন……চেতন কম্পন।
কম্পনে……
AFFINITY সারূপ্য-সাদৃশ্য পাওয়াই
জ্ঞান……জগৎ……জ্ঞান।
নামরূপে এরই প্রকাশ ও পরিচিতি।
এই কম্পনকে……কম্পন বিশেষকে
নিয়ে যেতে হবে
নামরূপের পারে……
নামরূপ কম্পনকে……
অসম কম্পনকে……
জপ ধ্যানের কম্পন সহায়ে
চেতন চেষ্টায়—
গুরু আশ্রয়ে
পরিণত করতে হবে
সমকম্পনে……কম্পন সামান্যে
বিরাট …কম্পন সত্তায়

পরাপেক্ষিকবাদ
(Ultra-Relativity)

চিদ্বিদ্যুতিন দিয়ে মন ও জগৎ তৈরী……
সংস্কারকেন্দ্রে এর নানারূপ - স্থূলসূক্ষ্ম ভেদে
সৎসংস্কারে সৎবস্তু, ইষ্ট জ্যোতি এই সবের প্রকাশ
সকল সংস্কাররাহিত্যে—চিৎব্রহ্মেরই প্রকাশ।

নাম-পরব্রহ্ম

নামই পুরুষোত্তম......
নাম নির্গুণে ও সগুণে......
সাকারে –নিরাকারে বিভাবিত......
নামই স্ফোট—নামই অনাহতনাদ—
নামেই পুরুষ-প্রকৃতিযোগ......
নামই বিশ্বাত্মিক, নামই বিশ্বাতীত—
সবেই নাম ····· নামেই সব——
"Transcendent and Immanent
Pantheistic and Panentheistic."

ভুমার সাধনা

চিৎ সীমাকে (Margin of consciousness)
সৎ সত্তারূপে বাড়িয়ে যেতে
হবে............
এই পরিধি যত বাড়বে –
ততই ভূমার প্রকাশ হবে ·····
এই ভূমাটিতেই ব্রহ্ম—
'প্রকাশিত হন।

স্বপ্ন-সাধন

একটি দেশকালে স্বপ্ন ও বাস্তব অভেদ......
অন্য দেশকালে তার মিথ্যা স্বরূপ প্রকাশিত হয়।
এই স্বপ্নকে করতে হবে ব্যাপক –
দেশকাল সবি যে নিয়ে—ভগবৎমুখী মন নিয়ে
...অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিনকালই স্বপ্ন-
স্বরূপ হয়ে যাবে।

সাক্ষী-শান্তি

ক্ষণব্রহ্মই সৃষ্টি . ....
ক্ষণব্রহ্মই প্রলয় .....
দুটিই ছেড়ে দিতে হবে .....
দ্রষ্টাব্রহ্মভাবে।
জীব ব্রহ্মের কাছে......
দু'টিই হবে মিথ্যা ....
থাকবে মাত্র
সাক্ষী—শান্তি......

অচপলতার সাধন

অচপলতাই দিব্যতা......
ব্যবহারিক মনোবিজ্ঞানের পরীক্ষিত......
সত্যে– পশুর ইন্দ্রিয় চপলতা......
শিশুদের চেয়ে বেশী... ..
মানবের ইন্দ্রিয় চপলতা......
বুদ্ধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমতে দেখা যায়—
দেবত্বের প্রতিষ্ঠায় সব ইন্দ্রিয়......
সুখেই চপলতা যাবে কমে......
উদ্বোধক সত্ত্বেও।.. ...

সহজাত প্রজ্ঞাযোগ

(Instinctive Intuition)

সহজাত প্রবৃত্তি বুদ্ধিতে পরিণত......
বুদ্ধি প্রজ্ঞায় রূপায়িত .....
প্রজ্ঞাই দেবত্ব......
প্রজ্ঞাকে সহজ করতে হ'লে......
মনকে শ্রেয়-প্রেয়র মাঝে রেখে......
সূক্ষ্ম ও স্থূলের মাঝে রেখে......
শিব-অশিবের মাঝে রেখে......
শিবমের দিকে
সহজ গতি সৃষ্টি কর্‌তে হবে।

RELIGIOUS COMPRESSION

Compress করিলে সত্ত্বা সূক্ষ্ম হয়, শক্তিমান হয়—
আধ্যাত্মিক রাজ্যে জপ, ধ্যান, সুর বা ছন্দ ব্রহ্মকে
এইভাবে সূক্ষ্ম করিলে, শক্তিমান করিলে
ইষ্টগতি সহজ হয় .... ।

অবচেতনে দেহের প্রভাব

অশ্রেয় চিন্তা, ইচ্ছা, ভাবের দমনে (Repression)
মানস জটিলতার সৃষ্টি......
অযথা দৈহিক দমনেও তেমনি......
মানস জটিলতার সৃষ্টি হয়......
দেহ মন এক ভাগবৎ সত্ত্বারি প্রকাশ।

মহাপ্রকৃতি

প্রকৃতিই মহাকালী—ভোগাপবর্গদা ...
ভোগের মধ্য দিয়ে মুক্তির দিশারী।
তাই সাধকের ভোগকে করতে হবে
ত্যাগের উপায় · বিচার পথে।
পাশ্চাত্ত্যের মনোবিজ্ঞানে বলে—
Resistance and participation
in the environment. (W-O-W)

ব্যাকুলতার মোড় ফিরান

ভাবগুলির মোড় ফিরান যায়......
মনোবিজ্ঞানের মতে Transference of feeling......
তাই ঐহিক ব্যাকুলতাকে, স্পষ্ট অস্পষ্ট দুই,
ভগবৎ ব্যাকুলতায় পরিণত করা যায়......
সাধন সহায়ে......

প্রকৃতিযোগ

তিনিই .....প্রকৃতি (শ্রীশ্রীঠাকুর)
তাই প্রকৃতি জড় নন......অন্তঃসংজ্ঞাযুক্তা ;
অন্তঃসংজ্ঞা (unconscious) অসীম শক্তির আধার
প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত হতে হলে অন্তঃসংজ্ঞা
জাগ্রত করতে হবে, প্রবল করতে হবে......
প্রজ্ঞাময় হতে হবে......সাধন সহায়ে।

প্রকৃতি জড় নন। গীতায় বলেছেন তিনি পরা-অপরা রূপে বিরাজ করছেন। দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর বলেছেন, তিনিই পুরুষ, তিনিই প্রকৃতি। বৃক্ষলতাদি অন্তঃসংজ্ঞাযুক্ত। যেটুকু আমাদের প্রকাশ চৈতন্যের অন্তর্গত তার চেয়ে অপ্রকাশ চেতন আরও গভীর আরও ব্যাপক আরও শক্তিসম্পন্ন। একথা স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী অভেদানন্দ বলে গিয়েছেন। আমরা নিজেরা যদি এই অপ্রকাশ চৈতন্যকে সাধনসহায়ে প্রজ্ঞাময়রূপে পেতে পারি তবে বৃক্ষাদির চৈতন্যের সঙ্গে আমরা যোগসূত্র পেতে পারি।

সাপেক্ষ-নিরপেক্ষ সত্ত্বা

ব্যষ্টি-সমষ্টি সাপেক্ষ নিরপেক্ষ সত্ত্বা......
জীবও সাপেক্ষ নিরপেক্ষিক......
তার প্রতীতিরও ঐ দুই রূপ।

জীবই ব্রহ্ম—কাজেই তার ভিতর relative ও absolute দুই তত্ত্বই আছে। তার absolute স্বরূপে যে সব প্রতীতি হয় সে সব absolute তত্ত্বই। কাজেই জীবতত্ত্বে যে কেবল relative বিষয় আছে তা নয়, এর ভিতর absolute তত্ত্বও পূর্ণভাবে আছে। তাই জীবের দেশ কাল এখন Kant প্রভৃতির ভাবধারার অনুযায়ী relative মাত্র নহে।

চৈতন্য-প্রাণায়াম

চৈতন্যই ব্রহ্ম......
তিনি সর্ব শরীরে আছেন......শক্তিরূপে—
জ্ঞান, বোধ ও ক্রিয়ারূপে (Thinking, Feeling, Willing)
......স্মৃতি ও সংস্কাররূপে......
এর প্রধান স্থান সহস্রারে......
এই স্থানে একে কেন্দ্রিত করতে হয় শ্বাস-প্রশ্বাসাদি নিরপেক্ষ।

দ্রষ্টার জ্ঞান

ব্রহ্মজ্ঞ স্বরূপ ......
এটি দ্রষ্টার জ্ঞান, সাক্ষীর জ্ঞান......
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান . .
জীবচৈতন্যে......
এই জ্ঞানানুসরণই শ্রেষ্ঠ . ...

দৃষ্টি-সৃষ্টিসাধন

ব্রহ্ম দৃষ্টিতে অখণ্ড সৃষ্টি ……

খণ্ডের দৃষ্টিতে খণ্ড সৃষ্টি …..

খণ্ড অখণ্ড অভেদ……

তাই খণ্ডের দৃষ্টিতে অখণ্ডকে, ইষ্টকে
প্রতিষ্ঠিত করতে হয়।

বেদান্তের দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদে ব্রহ্মের দৃষ্টিতে সমস্ত সৃষ্টি। আমরা খণ্ডিত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দৃষ্টির ব্যবস্থা করি। এই দৃষ্টিকে ভূমাতে প্রতিষ্ঠিত করলে সেখানে ভূমা বা ইষ্ট প্রতিষ্ঠিত হবেন। তখন সমস্তই ইষ্ট হয়ে যাবেন।

অনিতি

তিনি জড় দৃষ্টিতে জড়া……

চেতন দৃষ্টিতে তিনি চৈতন্যময়ী…

আরও প্রসারিত দৃষ্টিতে তিনি আরো কত কি

"ইতি করিস না" ……(শ্রীশ্রীঠাকুর)

কেবলাদ্বৈতে তিনি নিগুর্ণ; বিশিষ্টাদ্বৈতে তিনি সগুণ; বৌদ্ধদের তিনি শূন্য, Russel এর কাছে তিনি Neutral Staff, বার্গশর মতে Elan vital, ঠাকুর বললেন, তাঁর ইতি করিস না। সব হয়েও আরো কত কি।

সদসদ্ব্রহ্ম

সৎ ব্রহ্ম হতেই প্রকাশ ও অস্তিত্ব, সবেরি……

অসৎ ব্রহ্ম নিরপেক্ষিক, সবেরি লয় স্থান……

এই দুই বিভাবের সাধনই ব্রহ্ম সাধন……

অসৎ ও অশুভের লয় সাধন আর শুভ ও সৎবস্তুর স্থিতি সাধনই প্রকৃত ব্রহ্ম সাধন। শ্রীশ্রীঠাকুর বলেছেন "তিনি ভাবমুখ চৈতন্য ও অভাবমুখ চৈতন্য"।

লীলা স্থূল-সূক্ষ্ম

ভক্ত ভগবানে সাধন লীলা স্থূল..... সূক্ষ্ম...... ।
স্থূল লীলায় তাঁকে পেতে হলে স্থূল সাধনার প্রয়োজন
সূক্ষ্মে পেতে হলে সূক্ষ্ম সাধনার প্রয়োজন।
(ভজন ..... পূজাদি স্থূল সাধনা, ধ্যানাদি সূক্ষ্ম সাধনা)

নিবেদনযোগ

ইন্দ্রিয়-মন-বুদ্ধি-অহং-এর প্রতীতি তাতে নিবেদিত হচ্ছে অজ্ঞাতে···
সজ্ঞানে—এদের তার চরণে নিবেদনই নিবেদনযোগ।

সুখ-দুখ, ভাল-মন্দ, সব তাঁর পূজার ফুল এইভাবে তাঁকেই নিবেদন করে দিতে হবে যাতে এরা আমাদের বন্ধনের সৃষ্টি না করে।

প্রকৃতির সাধন

প্রকৃতির দুই রূপ—রৌদ্ররূপ আর সৌম্য......
সাধনের প্রথমে রৌদ্ররূপের প্রকাশ······
অপ্রসারিত সাধনে তিনি সৌম্যাৎ সৌম্যতরা .....

শ্রীশ্রীঠাকুর দেখেছেন......মার দুই রূপ···সন্তান প্রসব ক'রে আবার তা'কে খেয়ে ফেলছেন—যতক্ষণ না এগিয়ে যাচ্ছি ততক্ষণ যুদ্ধ চলবে—কিন্তু কিছু তৈরী হলে শক্তিলাভ করলে আমরা তখন সৌম্যরূপের শান্তরূপের বরণ করতে পারি। পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানের মতে প্রকৃতি মানুষকে পরিবর্ত্তিত করে আবার মানুষ প্রকৃতিকে করে পরিবর্ত্তিত (W-O-W) অর্থাৎ প্রথমে প্রকৃতি রৌদ্ররূপে বড় হয়ে প্রকাশ পায়; আর সাধক বড় হ'লে প্রকৃতি ছোট বা সৌম্যরূপে প্রতিভাত হয়।

নির্ব্বাধ ইষ্ট

ব্রহ্ম নির্ব্বাধ......
তাই........
ইষ্ট ও জীব-চৈতন্যের মধ্যে
কোন বাধা থাকবে না........
মন, বুদ্ধি অহং-এর সূক্ষ্ম বাধা........
স্থূল জগতের স্থূল বাধা থাকবে না।

যেমন ভগবৎ বিগ্রহের দর্শনে যদি স্থূল কোন বাধা থাকে তবে তাকে সরাতে হয়—তেমনি মনের বাসনাদি, বুদ্ধির নিশ্চয়াত্মিকা শক্তি এবং অহং-এর সংকল্প ও বিকল্প সরাতে হবে।

বিষয়-বিষয়ী

বিষয়-বিষয়ী সাপেক্ষ সত্তা ......
বিষয়ী শুদ্ধ হলে সূক্ষ্ম হলে বিষয়ও
শুদ্ধ, সূক্ষ্ম হয় ....

ইন্দ্রিয় সূক্ষ্ম হ'লে সেই ইন্দ্রিয় স্থূল বিষয় গ্রহণ করতে পারে না। শ্রীঠাকুরের ভাবাবসানে স্থূল জগতের জিনিষে—যেমন Microscope দেখা ইত্যাদি বিষয়ে মন দিতে পারতেন না।

অবতার তত্ত্ব

একদেশ—কালে......
ধর্ম্মরাজ্যে........
এক একজন পরম পুরুষের, শ্রেষ্ঠ পুরুষের হয় আবির্ভাব
সেই দেশ—কালেই তিনিই অবতার
সাম্প্রতিক বিশ্ব সৃষ্টিতে
ধর্ম্মরাজ্যে শ্রীরামকৃষ্ণই
অদ্বিতীয় পুরুষ ....
প্রাণপুরুষ।........

শিল্পী মন

শিল্পী মনে তাঁর প্রকাশ বেশী। ....
তিনিই আদি ও আদর্শ শিল্পী—সত্য শিব সুন্দর .
সৃষ্টিতে তাই সবাই শিল্পধর্ম্মী ....
তাই আদর্শ শিল্পী মন দিয়ে তাঁকে
যাবে পাওয়া আপনরূপে—

প্রেরয়িতা

ঈশ্বরই কর্ম্ম প্রেরয়িতা.......
তাঁর থেকেই প্রকৃতি.......
ইনিই পরা ও অপরা... ...
পরা প্রকৃতি জীবচৈতন্য (Organism)—
অপরা প্রকৃতি—ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ,
ব্যোম, মন, বুদ্ধি, অহংকার........

পাশ্চাত্ত্য দর্শনের Environment, Instinct, Race-instinct, Motive, Unconscious, চরক-সংহিতার প্রাণৈষণা, বিত্তৈষণা, প্রেত্যৈষণা :—এই তিনটি প্রেরয়িতা—বৈশেষিকের সুখদুঃখ সংস্পর্শ, ন্যায় মঞ্জুরী মোহ রাগ দ্বেষ। যোগদর্শনের (১) অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ, অভিনিবেশ, (২) মোক্ষ, গীতার প্রকৃতির অন্তর্গত।

ব্রহ্মাবর্ত্তন

ব্রহ্ম আবর্ত্তিত হলেন........তাতেই সৃষ্টি—
সৃষ্টিও আবর্ত্তিত......চন্দ্র, সূর্য্য,
অণু, পরমাণু—মন-বুদ্ধি-অহং সবই আবর্ত্তিত হচ্ছে।

বর্ত্তমান বিজ্ঞানেও দেখি সমস্তই ঘুরছে। প্রথমে Cosmic gas ঘুরতে সুরু করাতেই সৃষ্টির বিলাস। আর তাই অণু-পরমাণু থেকে গ্রহ-নক্ষত্র "নেবুলা"

পর্য্যন্ত সবই ঘূর্ণ্যমান। মন ও সংস্কারকে ঘেরে ঘুরছে। অর্থনৈতিক জগতে Trade Cycle প্রভৃতি আছে, রাজনৈতিক জগতেও Cycle আছে—কোন রাষ্ট্রের পর কিরূপ রাষ্ট্রনীতির প্রাধান্য হবে। সমাজ তত্ত্বেও Death cycle প্রভৃতি আছে। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও রোগের আবর্ত্তন আছে।

আকর্ষণ ব্রহ্ম

কার্য্যব্রহ্মের আকর্ষণ একটি বিভাব—
তাই সৃষ্টিতে আকর্ষণীশক্তি আছে—
যেখানে সৎ সেখানে সৎএর আকর্ষণ সংঘটন······
তাই সৎসংস্কার—সৎ-আকর্ষণ সৃষ্টি করতে হয়······
দেহে মনে—পারিপার্শ্বিকে —।

পদার্থ বিজ্ঞানে Electrīc Magnetic, Electro-Magnetic Force, এসব বিশেষ আকর্ষণ শক্তি। Gravitationও সেইরূপ। দর্শনে "Prehension" তত্ত্ব এনেছেন Prof. Whitehead, মনোবিজ্ঞানে Group Cohesion. Mass Consciousness তত্ত্ব, Gregarious Instinct (Mag Dougal) আছে। এসবই আকর্ষণ-ব্রহ্মের বিলাস মাত্র।

বাসনাব্রহ্ম

বাসনাব্রহ্মই সৃষ্টি··· ··
সীমা, ভূমা বাসনার এই দুইরূপ······
ভূমা বাসনাই সীমা বাসনাতে পরিণত—
সীমা বাসনাকে ভূমা বাসনাতে পরিণত
করতে হবে।

বুদ্ধদেবের মতে বাসনাই জন্মের মূল, উপনিষদের সৃষ্টির মূল ব্রহ্ম-কামনা সোঽকাময়ত —।

এই কামনা একেবারে যায় না—ভগবান রামকৃষ্ণের এই মত। তাঁর মতে ক্ষুদ্র বাসনাকে ঈশ্বর-বিষয়ক বাসনায় মোড় ফিরাতে হবে। গীতার নিষ্কাম কর্ম্মেরও এ নীতি।

লীলা নিত্য

নিত্য লীলা আছে—নিত্যবৃন্দাবনে—
এই বৃন্দাবন লীলার সহায়ে নিত্যলীলায়
প্রবেশ করা যায়—

Relative চিন্তা যেমন Absolute-এ পৌঁছবার সোপান তেমনি এখানে অবতারদের লীলা স্মরণাদি সহায়ে নিত্যলীলা দর্শনাদি হয়। নিত্যলীলার ধাম বৃন্দাবন বা যে নামই দিই-না কেন, সেখানে পৌঁছানো যায়।

সংস্থান ব্রহ্ম

কোন কিছু, তার স্থানেই সত্য—
স্থান বিচ্যুতিতে ইহার পরিবর্ত্তন।

সুখ, দুঃখ, সৎ, অসৎ, ভালমন্দ, স্থূল, সূক্ষ্ম—সবই স্থান পরিবর্ত্তনে পরিবর্ত্তিত হয়—।

নিরোধ ব্রহ্ম

প্রকৃতিই কর্ম্মপ্রেরক.......
হীন প্রকৃতিগুলিকে সর্ব্বদা মনে রেখে
নিরোধ সম্বন্ধে কর্ম্ম করাই শ্রেয়।

কর্ম্মপ্রেরক হচ্ছে গীতামতে প্রকৃতি, পাশ্চাত্ত্য মতে Passion ও Propension (Martineau), Unconscious (Freud), Drive (Woodworth), Incentive (Thomas)—সর্ব্বদা এগুলি মনে রেখে নিরোধ করবার ইচ্ছা রেখে কাজ করলে হীনতা উঠতে পারে না সহজে।

গীতকম্পন

যথার্থ গানে প্রাণের সূক্ষ্মতম কম্পন সৃষ্টি হয়
সূক্ষ্ম কম্পনই সূক্ষ্মলোকে প্রবেশক্ষম।

Radio পদার্থবিজ্ঞানে Short Wave এর গতি বহুদূর। Ionosphere-এ গিয়ে শব্দ কিছুটা প্রতিসরণ আর কিছুটা প্রতিফলন হয়ে ফিরে আসে। আবার আরো ক্ষুদ্র Micro-wave Ionosphereকেও ভেদ করে। প্রাণের কম্পন আরো সূক্ষ্ম।

আবার সূর্য্যাস্তের পর D স্তর নামে Ionosphere-এর স্তর মিলিয়ে যায়। তাই Radio সংবাদ ভাল শুনা যায়। তেমনি সন্ধ্যায় ও ভোরে প্রাণের কম্পন রামকৃষ্ণলোকে ভালভাবে পৌছান সম্ভব।

অতিমানব সত্ত্বার দেশ কাল

বর্তমান বিজ্ঞানে বস্তুর অবস্থিতিতে দেশকালের অত্যুন্নতি আসে। বস্তুর স্বরূপ কতকগুলি বৈদ্যুতিক স্পন্দন। মানুষের চিন্তা ছাড়া বৈদ্যুতিক স্পন্দনের (Electric vibration) কোন অস্তিত্ব নাই। মানুষের দেহে মনেও ঐ স্পন্দন। অতি-মানুষদের দেহে মনে স্পন্দন খুব বেশী। কাজেই দেশকালের অত্যুন্নতি অতিমানবের অবস্থিতিতেও সম্ভব।

'Theory of Relativity' অনুযায়ী বস্তুর অবস্থিতির সান্নিধ্যে দেশকাল একটি ক্ষুদ্র টিলার আকার ধারণ করে। (ABC of Relativity by Russel —P. 127)

দিব্য দেশ-কাল বস্তু

জড় ও মন এক······
বস্তুর চারপাশে—দেশকালে এক পরিস্থিতি
এটি অন্যবস্তুর আবর্ত্তনের কারণ······
আমাদের মনের গতি এইভাবে দেশকাল
বস্তুর দ্বারা নিয়মিত হয় ·····
বস্তুকে দিব্য ক'রে নিলে এই আবর্ত্তন
দিব্য হয়ে যায়—
মুক্তির কারণ হয়ে যায়।

দ্বৈত ব্রহ্ম

দ্বৈতের বাধাই সগুণ ব্রহ্ম······
ইনিই মায়া······
দ্বৈত চেতনাই সৃজনের ইচ্ছা······
এই বিলাসই ঈশ্বর।······
এঁর অপ্রকাশই নির্গুণ-ব্রহ্ম

পাশ্চাত্ত্য মনোবিজ্ঞানে relativity of consciousness আছে। সমস্ত চেতনার মূল এই দ্বৈত তত্ত্ব। জগৎ বিলাসের মূল এই দ্বৈত তত্ত্ব। ভক্তি ও ভক্তের মূল এই দ্বৈত তত্ত্ব। ন্যায়াদি দর্শনে তাই আত্মাকে মূলত অজ্ঞান বলেছে।

পরাজয়ের মূল্য

অর্থনীতিতে Demand and Supply-এ অর্থ নিরূপণ হয়। Supply কমে গেলে মূল্য বেশী হয়।

ধার্ম্মিকের মূল্য পেতে হ'লে তাদের সংখ্যা কম হতে হবে। তাই ধার্ম্মিকদের নিত্য নিত্য বহু পরীক্ষার মুখে সংখ্যার ন্যূনতা।

বাসনার স্পর্শক্রামতা

বাসনার ছোঁয়াচে স্বভাব……

একটা বাসনা আর একটা বাসনার উদ্রেক করে। উদ্রিক্ত বাসনা সমধর্ম্মী বা পরধর্ম্মী হয়।

…যেমন একটি রসগোল্লা খেতে খেতে আর একটি সন্দেশের ক্ষুধা জাগে। আবার একটি সন্দেশের স্পর্শে মন চঞ্চল হ'য়ে অন্য বাসনার ক্ষুধা জাগায়।……

ব্যাকুলতার মোড় ফিরান

ব্যাকুলতার জৈবগতি আছে
এটি শক্তিরই প্রকাশ
শক্তি প্রয়োগে একে উর্দ্ধগতিতে
পরিণত করা সম্ভব।
উপবাস, প্রাণায়াম, জপ, নাম ও ধ্যান
সহায়ে গুরুনির্দ্দিষ্ট এই পথ।

বিঃ দ্রঃ—সময়ে সময়ে মানুষের এক এক বিষয়ে বিশেষ ব্যাকুলতা জন্মে। সেই সেই দিক থেকে মনকে ভগবৎ পথে আনতে হ'লে উপরে যে পথ বলা হ'ল সেই পথের আশ্রয়ে মোড় ফেরান সম্ভব।

বস্তু-তত্ত্ব

ঈশ্বরই বস্তু……শ্রীশ্রীঠাকুর।
বস্তুই দেশ-কালের বক্রতার কারণ……
ঈশ্বরই দেশ-কালের বক্রতার কারণ …

Einstein এর মতে Time-space-continuum-এর curvature-এর কারণ হচ্ছে matter এখানে আমরা দেখছি যে, আদি বক্রতার কারণ হচ্ছেন ঈশ্বর। এতে materialism বা জড়বাদের সঙ্গে Idealism বা ভাববাদের দ্বন্দ্ব নিরস্ত হয়—মনে রাখতে হবে দেশ-কালই নির্গুণ সত্ত্বা (Jeans: New Back-

ground of Universe, P. 146). এই দেশ-কালে ঈশ্বর নাই। ঈশ্বর প্রকাশ হলেই দেশ-কালে সৃষ্টি সম্ভব হয়। বস্তুযুক্ত দেশ-কাল হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টিতে Expanding Universe. আর সগুণ-ব্রহ্মই বৃংহিত হন। দেশ-কালকে বেদে ও উপনিষদে ব্রহ্ম বলেছেন (অথর্ব্ব বেদ ১৯।৩৫, ছান্দ—৮।১৮।১)। এতে বৈজ্ঞানিক সাধনার সঙ্গে আমাদের ঋষিদের উপলব্ধির কিছু ঐক্য দেখান হ'ল। আবার নির্গুণ ব্রহ্মই সগুণ হন। আবার 'ঈশ্বরই বস্তু'—কাজেই দেশ-কালই ঈশ্বর। এদিকে বৈজ্ঞানিকের মতে দেশ-কাল mental construct of a superior consciousness. বিরাট এক চেতন সত্বার মনের কল্পনা (Jeans : Physics and Philosophy, P. 172)।

কাজেই জড় ও চেতনের পার্থক্য সরে যায়।

শ্রীশ্রীঠাকুরের সাধনার সম্ভাবনা

ব্রহ্মের তপস্যায় বিশ্বসৃষ্টি......
বিরাট তপস্যায় বিরাট সৃষ্টি......
ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের তপস্যাও বিরাট
তাঁর সৃষ্টিও তেমনি বিরাট সম্ভাবনাপূর্ণ।

উপনিষদে আছে 'স তপোঽতপ্যত' এতেই বিরাট সৃষ্টি। শ্রীঠাকুর প্রধান প্রধান ধর্ম্মমত, আর হিন্দুধর্ম্মের প্রায় সব মতের সাধনা করেছেন। এ বিশ্বব্যাপী বিরাট তপস্যার ফল আজো শেষ হয় নি। বহু আশাপূর্ণ এর পরিণাম।

গাণিতিক জপ

বিক্ষিপ্ত মনে গাণিতিক জপের প্রয়োজন......
এই জপের বিলাস ইষ্ট কেন্দ্রিক।
মনের অভ্যন্তরতায় এই জপ প্রকারান্তরিক করা উচিৎ।

মন কয়েক মুহূর্ত্তমাত্র এক বিষয়ে থাকতে পারে। কাজেই কিছুক্ষণ ধরে ইষ্টে সংযুক্ত রাখতে গিয়ে বিক্ষেপ আসে ও এই বিক্ষেপ কোন্ মুহূর্ত্তে এসে পড়ে তার ঠিকানা পাওয়া যায় গাণিতিক জপে। মানস সংখ্যা রেখে এই জপ করা উচিৎ ইষ্টকে কেন্দ্র করে।

শক্তির সংরক্ষণতা

মনের চিন্তাসমষ্টি বিসর্পিত হয়ে যায় না,......
কোন শক্তিই নষ্ট হয় না......
মনের শক্তিও নয় ......
আমাদের মনন শক্তি এক জায়গায় গিয়ে দানা বাঁধে।......
আবার সেখান থেকে ফিরে আসে।

D. Sitter প্রভৃতির মতের সঙ্গে এর মিল পাই। এদের মতবাদ, সমস্ত Radiation এক জায়গায় গিয়ে দানা বাঁধছে, সেখান থেকে আবার নূতন সৃষ্টি হবে।

সারদা তত্ত্ব

মাতৃতন্ত্রই (Matriarchy) আদি তন্ত্র।
মাতৃপূজা তাই প্রথম পূজা সমাজ তত্ত্ব হিসাবে।
আদ্যাশক্তি বা Energyই বৈজ্ঞানিকভাবে আদি তত্ত্ব।
এই Energy তত্ত্বই একদিকে মন ও আর এক দিকে পদার্থ হয়েছে।
এই আদ্যাশক্তি বা মাতৃশক্তিই আজ বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে সারদা তত্ত্বরূপে।

IRRELEVANCY

পরম তত্ত্ব হচ্ছে, Highest Irrelevancy. সেজন্য আমাদের Irrelevant চিন্তা বা কাজ অনেক সময় এসে যায়।

Art-Irrelevancy একটা মস্ত বড় creation. যুক্তিবিহীন গান, কবিতা লেখা অনেক সময় মানুষের বেশী মনোরঞ্জন করে।

পশুদের ভেতরেও অনেক চাল-চলন যুক্তিসঙ্গত নয়।

GREATER THAN RELATIONSHIP

আঙ্কিক পদ্ধতিতে আমরা পাই Let 'a' and 'b' be any two real numbers. Then 'a' is greater than 'b', if and only if a—b is a positive number. নৈতিক জীবনে মনুষ্যত্ব ও সত্য-শিব-সুন্দরের প্রতি আকর্ষণ এই দুটির মিলিত ভাব থেকে আমরা যদি মনুষ্যত্বকে বাদ দি, তা'হলে একটি Positive সংখ্যা পাওয়া যায়। অতএব আগেরটি পরেরটি থেকে বড়। এখানে সমস্তটা একটা Horizontal Line যেখানে a, b প্রভৃতি নৈতিক পূর্ণতার দিকে পর পর ছড়িয়ে আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, মনুষ্যত্বে যতই গুণাবলী যুক্ত হবে ততই আমরা বড় হব। আর এর থেকে যত সরে যাবো ততই আমরা ক্ষুদ্র হয়ে যাবো। Geometry-র যে horizontal line আমরা ধরছি তার মাঝখানটা 0, ডানদিকটা Positive, বাঁ-দিকটা Negative, সেক্ষেত্রে যদি সত -শিব-সুন্দরকে ডানদিকে দেওয়া যায়, তা হ'লে আমাদের মতবাদ ঠিক হয়। আর যদি সত্য-শিব-সুন্দরকে বাঁ-দিকে দেওয়া যায়, তা হ'লে আমাদের মতবাদটি ভ্রান্ত হ'য়ে পড়ে। কিন্তু আমরা যদি সমস্ত জগতের দৃষ্টিভঙ্গী নি, তা হ'লে দেখবো যে, সত্য-শিব-সুন্দর সর্ব্বদাই, ডানদিকে আছে ও থাকবে।

সত্য এক

সত্য এক—ব্রহ্মস্বরূপে বা লীলার রূপে।
তাই দ্বন্দ্ব থেকে যা কিছু উদিত হয় তাই মিথ্যা।
পাপ-পুণ্য, সুখ-দুঃখ, ভাব-অভাব—সব মিথ্যা।
অসীম সত্তায় সমস্ত এক.......
এবং ভগবৎ চরণে সবই লীলা হয়ে যায়।

এগিয়ে পড়

শ্রীঠাকুরের এই বাণী—জগতের উন্নতি পর্ব্বে বিরাট সম্ভাবনা নিয়ে আছে। ভোগের পথে এই বাণী আমাদের অভ্যুদয়ের পৈঠা। আবার যারা ত্যাগপন্থী তাদেরও এই বাণী একস্থানে স্থিতির বিরোধী।

যারা ভোগৈকপ্রসক্ত পথে এগিয়ে পড়ে তারাও কালে শ্রীঠাকুরের বলা সেই রজ সত্বের শক্তিতে ধর্মের পথে এগিয়ে পড়তে পারে। ধর্মের পরিভাষা দিতে গিয়ে মহর্ষি জৈমিনি বলেছেন, যতো অভ্যুদয়ঃ নিশ্রেয়সঃ লাভঃ—এর একটি অর্থ জাগতিক অভ্যুদয় লাভ করতে করতে আমাদের—পারমার্থিক উন্নতি ঘটতে পারে। জড়স্থ হওয়া কোন পর্ব্বেই উচিৎ নয়। বেদেও 'চরৈবেতি' ঋকে এই কথাই বলা হয়েছে।

মহামায়ার রচনা

Einstein এর Relativity-তে Time-Space Curvature আছে; এতেই জগতের বস্তুনিচয় ঘুরে চল্‌ছে। কোন জাগতিক force act করছে না। আমাদের শরীর-মনও জড় বস্তু—তারাও তেমনি curvature এর দরুণ ঘুরছে। এই Time-space Curvature হচ্ছে বিরাট মহামায়ার রচনা। উর্ণনাভের জালের মত মন, বুদ্ধি এই বক্রতাতেই চল্‌ছে জন্ম-জন্মান্তর ঘুরে। যন্ত্র-যন্ত্রী ধারণাও এতে বেশ সমর্থিত হয়।

শনৈরুপরমেৎ

গীতামতে সহসা মনকে দমন করা ঠিক নয়।

ধর্ম্মরাজ্যে reaction অথবা Freudian repression এর ভয় আছে।

হঠাৎ কোন বাসনাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করায় বিপরীত ফল হতে পারে।

আরো, যদি সমাজ-ভয়ে বা সাময়িক কোন লাভের জন্যে কিছু করা যায় তাতে ঐ ত্রুটি আসতে পারে।

তবে আমাদের যদি sincerity of purpose থাকে, যদি ইষ্টকৃপা আমরা চাই আর গুরুকৃপা যদি হয়, তবে ভয়ের তত কারণ থাকে না।

হঠাৎ কেউ যদি জপ ধ্যান বেশী করে, তবে তারপরে তার জপধ্যানের সে উচ্চতা লাভ হয়েছিল সে উচ্চতা আগের চেয়ে অনেক নেমে যেতে পারে এমন দেখা গেছে।

গেষ্টাল্ট-নৈতিকতা

নৈতিক জীবনের একটা Gestalt আছে।

যে পরিস্থিতিতে আমরা স্থমিত জীবন পেতে পারি—

সেই পরিস্থিতি আমাদের কল্যাণতম

সেই পরিস্থিতি আমাদের সৃষ্টি করতে হবে,

সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারে—

জীবনটাকে ক'রে তুলতে হবে

সত্য-শিব-সুন্দর স্বরূপ।

অসরলতার বিবৃদ্ধি

একটা মানুষ আর একটা পৃথিবী—

এই নিয়ে যে সমাজ—সে সমাজে দ্বন্দ্ব সংঘাত—সে সমাজে জীবনায়ন সরল।

সমাজে যত জীব বাড়বে তত সমাজের পারস্পরিক সম্বন্ধে বি-সমতা বাড়বে—অসরলতা ঘটবে।

সেই সঙ্গে জড় ও জীবের, পারস্পরিক সম্বন্ধেও বি-সমতা, অসরলতা বাড়বে।

কালের প্রবাহে এই বিরাট বিশ্ব বেড়ে চলেছে আর তার সমাজ-রহস্যও অসরল হ'তে আরো অসরলত্বের দিকে যাচ্ছে—

মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে।

দেশ-কালের অবস্থিতি কোথায়

ব্রহ্মা, জগৎ ঈশ্বর হলেন......

তখন নেমে আসা হয় না......

কারণ, সৃষ্টি ও Relativity তখন সৃষ্ট হয় নি......

কেবলাদ্বৈতবাদে Cosmic mind

এর বিশেষ অবস্থান বলা যায় না—

কারণ, তখন তিনিই একমাত্র আছেন অস্তি ইতি উপলব্ধব্য—

জড় আনন্দ হ'তে বিচ্ছিন্ন হ'লে—আনন্দাদ্ধেব খলু

ইমানি ভূতানি, ইত্যাদিতে আনন্দেই এক ওতপ্রোত হয়ে আছে।

এই উপনিষদের বাণী সত্য হয় কেমন করে।

অবস্থিত হলেই তাকে Time Space-এ অবস্থিত বলতে হয়...

কার Time Space ... ?

চণ্ডীর পরমা প্রকৃতি = গীতার মহৎব্রহ্ম = স্বমায়া।

অশিবের সাধন—

ব্রহ্ম শিব ও অশিব দুই-ই—
তাই সুন্দরের সাধনের পর—
অসুন্দরের সাধনও প্রয়োজন—।
যা কিছু অশিব অসুন্দর অসত্য
তার মাঝেও দেখতে হবে—
ভগবৎ প্রকাশ—।
তবে এর মধ্যে স্থিতি হবে না—
একে ছাড়িয়ে যেতে হবে—
সর্ব্ব দ্বন্দ্ব নির্ম্মুক্ত—
তবেই হবে—
ব্রাহ্মী-স্থিতি।

TRANSCENDENCE AND IMMANENCE OF JAPAM AND MEDITATION

Super-self is Transcendent and Immanent......
He is doing Japam and Dhyanam both ways .....
This twin way simultaneous process done in
Ourselves fits well with Reality.

PRACTICAL IDEALISM

Put Istam—
Sākāra or Nirākāra-—
As the sense datum......
Pantheistically Istam is all......
He is the idea behind all ideation......

CONCRETE IDEALISM

Idealism and Realism are contrary......
Human nature requires realism......
Make ideas concrete by realising the "Ideal".

* * *

These two theories of Philosophy are contrary in nature. Human nature cannot be satisfied with ideas. It requires concrete food for their satisfaction.

Hence realistic school is so popular. Now if we can make God real by realising Him, our ideas become real. For God is the source of all ideas. Sree Ramkrisna did make this.

THE MOVEMENT OF MIND—A NEW THEORY

Our Soul with Mind reaches matter like pencil of rays ; (Vedantic Britti) Rays move like waves. So mental movement is wavy.

Mind and matter are losing their distinction (Russel). So what is true of matter is true of mind. According to the latest theory light travels through space in the form of waves (*Cf.* Jeans : New Background of Science, P. 166). Now when light reaches our brain it comes as waves and there it creates a wavy vibration which stirs our thought about the object. So the thought-vibration is wave-like. So both Eastern and Western thought corroborate this.

HIGHEST VALUE—THE GOD

There are social values, economic values. But all these are gross values. There are subtler and higher values. These are ethical and religious values belonging to God.

* * *

Our gross body with sense-organs is hungry for the gross values but our soul which is everlasting has a hunger for those higher subtler values. Gross values cannot satisfy our soul.

ETHICAL ABSOLUTISM

Ethical relativism is a moral principle. But relativism logically and dialectically suggests Absolutism. The Absolute is the receptacle of all moral values.

* * *

Cultural relativism asserts that there is no universally valid moral standard. Moral values depend on specific culture ; what particular motives are praised or blamed varies with different cultures. Benedic defends this theory. (Phil. Prob., P. 341, Maurice Mandelbaum and others.) Terms are logically classified as absolute and relative. So we are bound to accept them both.

There is universal likeness in moral principles. These are sponsored by Kroeber and Kluckholm of the University of California and of Harvard (*Ibid*, P. 348). This ethical absolutism may be likened to all weighing standards which are with the President of our Union Government. So all moral values are with God. Ramanuja likewise thinks that all noble qualities and noble qualities alone are with God.

COSMIC MEMORY

Individual memory depends on the path made in the brain. (W. James : Psychology, P. 659)

Learning depends on this.

Those superior minds who are one with God make path ways in the cosmic mind.

Religious learning in the individual is made easier by that.

* * *

Sree Ramkrisna's Leela with Gopalji made easy for ordinary people to have beatific experience of Gopalji's Leela as is happening with many devotees. Sree Gouranga's kirtan-leela did spread like wild-fire all around after his tour through India. This enables such people to remember their part.

Bomberding the Uranium atom is very difficult at first. But once it is done there ensures a chain reaction in which the broken parts break up the other molecules automatically. Great souls become the path finder by their strenuous efifort which the other people follow easily.

MOTHER CULT

Mother cult is the highest cult......
Psychologically it is the strongest drive,
Sociologically it is the first evolute in affection,
Ethically it is the purest feeling of God,
Scientifically it is the cosmic kinetic energy.

* * *

Prof. Warden found experimentally maternal drive to be at the head of the following drives : Maternal thirst, hunger, sex, and exploratory drives. [The Basic Teachings etc. etc.— S. Stansefield Sargent, P. 112]. Struch rated this as the second strongest motive among hunger, love of offspring, health, sex, ambition, pleasure, body comfort, possession and approval of men. According to Sargent, human relationship is stronger than the financial incentive. In evolution matriarchy is the first social group of man. Ethically it is the purest feeling of God as given by Sree Ramkrishna in the Kathamrita. It is the first curvature in the continuum according to the Relativity theory of Einstein.

GOOD AND BEAUTY

Good and Beauty are identical in transcendence.
Moral good and beauty in language can go together.
Poetry and religion are identical for some. (Santayana)
Religious language is noumenous for some. (Urban)
Good and beauty in the language are also reciprocal
each influencing the other both individually and socially.
They require invocation.

* * *

Good is beauty and beauty is good.

BRAHMAN IN THE RECIPROCITY OF MIND AND MATTER

Whilst part of what we perceive comes through our sense from the objects before us, another part (and it may be the larger part) comes out of our own mind which has recorded past experiences. Again these experiences in return fill up the store-houses of our memory.

This reciprocity of mind and matter makes us grow to fulness which is ever in progress.

This growing is Brahman.

LIFE AND DEATH

Life and death are sound waves.[1]

Now sound waves travel in a speed depending on their wave-lengths.[2]

Roughly speaking speed gives us the span, a particle can go from inertia.

So a man's life-span depends on the wave length it gets in the beginning from God.

1. Sayings of Sree Ramkrishna.
2. *Physics and Philosophy* (P. 166)—Sir James Jeans

জীবন গড়ো

ভূমিকা

শিশু শিক্ষায় দু' একটি কথা

দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুর শিশুদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "শিশু নারায়ণ"। আর বেথেলহেমের ঠাকুর যীশুখৃষ্ট, বলেছেন, "শিশুদের আমার কাছে আসতে দাও, কারণ স্বর্গরাজ্য তাদের।" এই শিশুদের শিক্ষা দিতে গিয়ে আমাদের শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ধৈর্য্য নিয়ে নিজেদের তৈরী হয়ে দাঁড়াতে হবে। প্রথমেই মনে রাখতে হবে, ছেলেরা যে সংস্কার নিয়ে এসেছে সে সংস্কার পূর্বজন্মেরই হোক—কি পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষ বা সমাজ জীবনেরই (Race instinct) হোক—তা বদলান যায় না। তারপর শিক্ষকদের মনে রাখতে হবে এই শিশুদের জগৎ ও আমাদের জগৎ আলাদা। (Kffoka—The growth of the mind) তারা যে চক্ষে জগৎ দেখে আমরা সে চক্ষে জগৎ দেখি না। তাই শিশুদের শিক্ষা দিতে হ'লে আমাদের শিশুরাজ্যে প্রবেশ করতে হবে—তা'দের চোখ দিয়ে জগৎটাকে দেখতে শিখতে হবে, বুঝতে হবে।

ছেলেদের প্রথম শিক্ষা হয় তা'দের হাত, পা ছোঁড়ার মধ্য দিয়ে। কাজেই যখন মায়ের কোলে তারা হাত, পা ছুঁড়তে শেখে তখন আমাদের বৃথা বাধা সৃষ্টি করা উচিত নয় ; বরং নানাভাবে তা'র সাহায্য করা উচিত। দ্বিতীয় পর্ব্ব সুরু হয় যখন ছেলেরা খেলা করতে পারে। এই সময় ঠিকমত খেলার জিনিষ পাওয়া দরকার। এ সব যদি তারা কিছু ভেঙ্গেও ফেলে তবু তখন তা'দের সাজা দেওয়া সব সময় উচিত নয়, কারণ এই ভাবেই তা'রা নূতন কিছু গড়নের অভিজ্ঞতা পায়।

এর পর আসে অভিনয়ের বয়স। এ সময় তা'রা Symbolic playতে অভ্যস্ত হয়। এ সময় তা'রা বাবার মত' মার' মত বড় হতে চায়, আর সেই ভাবে অভিনয়ও করে। এর উদ্দেশ্য হ'চ্ছে বৃহত্তর জগতের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। কাজেই যখন ছেলেরা বড়দের অনুকরণ করে তখন তাদের বুঝতে চেষ্টা করতে হবে। তারপর আসে তাদের সামাজিক জীবনের আস্বাদ নিয়ে খেলা (Social play)। প্রথমে মায়ের সঙ্গে, পরে ভাইবোন, শেষে ইস্কুলের ছেলেদের সঙ্গে খেলাধূলার মধ্যে দিয়ে, সে নিজেকে সামাজিক জীবনের উপযুক্ত ক'রে তোলে।

ভালবাসা, ঝগড়া, প্রতিযোগিতা এ সবই তা'র জীবন গড়ে তোলে, পূর্ণতর করে তোলে।

শিশু শিক্ষার সময় আমাদের আরও মনে রাখতে হবে ছেলেদের নানারকম থাক্ আছে। একদল দেখা যায় –তা'রা বহির্মুখী কর্ম্মী (Extrovert), আর একরকম আছে অন্তর্মুখী-ভাবুক (Introvert)। অবশ্য বেশীর ভাগ ছেলেকেই দেখা যায় যে, এই দুই-এর সংমিশ্রণ (Ambivert), কখন কর্ম্মী কখন ভাবুক। এই সব ছেলেদের পড়াতে হলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর বিশিষ্টতা থাকা উচিত (Woodworth—Pshychology)।

শিশুদের প্রথম এবং প্রধান শিক্ষক হচ্ছে তাঁদের মা ও বাবা। এঁদের জীবন আদর্শ ছেলেদের ওপর অনেক কিছুর ছাপ এনে দেয়। তাই ভাল ছেলে মেয়ে গ'ড়ে তুলতে হ'লে বাবা ও মাকে ভাল হতে হবে। শিক্ষকদের বেলাও সেই কথা। অতি আদরে ছেলেরা দুর্বল, পর-বশ হয়ে সারা জীবন কষ্ট পায়। আবার অনাদরে ছেলেরা ভীতু, অক্ষম, সাহসহীন, হতাশ-ভাবসম্পন্ন হয়ে পড়ে। রাশিয়ার Social Welfare Organisation এর অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বেকারদের মধ্যে শতকরা পঞ্চাশজনেরও অধিক পিতৃমাতৃহীন হ'য়েছিল ছেলেবেলায়।

শরীরের সঙ্গে মনের যোগ শৈশবে বেশী। তাই ছেলেদের অনেক উপদ্রব তাদের জন্য হয়ে পড়ে। অনেক সময় ছেলেদের দোষ তাদের পারিপার্শ্বিকের জন্য হয়। যেমন ছেলেবেলায় অনেকে চুরি শেখে, সামান্য ছোট ছোট জিনিষ না পেয়ে—আচার, কি দুটো পয়সা। ছেলেবেলায় ভূতের ভয় পাইয়ে দেওয়া অনেক সময় বড়দের স্বভাব। অন্ধকারে ভূতের ভয়, আওয়াজ করে ভয় দেখান হয়। এর জন্য সারা জীবন হয়ত ছেলেরা ভীতু হয়ে পড়ে। আবার অনেক সময় ছেলেদের Superiority Complex আমরা তৈরী করে দিই—বিশেষ বিশেষ পোষাক দিয়ে বা ব্যবহার অভ্যাস করিয়ে, এতে তা'দের সারা জীবনে গোলমাল এনে দেয়। আবার Inferiority Complexও আমরাই সৃষ্টি করি —হয়ত কাউকে বোকা ব'লে বা তা'র শরীরের হীনতার কথা বার বার ব'লে। এমনি ভাবে তাদের মনকে দুর্ব্বল ক'রে ফেলি এবং এটি বড় হ'য়ে স্থায়ী হ'য়ে যেতে পারে। অনেক সময়, আবার আমরা ছেলেদের কাছে তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু আশা করি। তার ফলে তাদের ওপর নির্য্যাতন চলে, সেটিও অনুচিত। ছেলেরা রাত্রে শয্যা নষ্ট করে বা নখ কামড়ায়—এগুলি শুধু শাস্তি দিয়ে ঠিক করা

যায় না। আবার ছেলেদের উপদ্রব অনেক সময় তাদের শক্তিরই পরিচায়ক। যে সব ছেলে ভবিষ্যতে কোন বিষয়ে নেতৃত্ব ক'রবে তাদের ছোট বয়সেই সেগুলির পরিচয় কিছু পাওয়া যায়। এদের মোড় ফেরাতে পারাই প্রকৃত শিক্ষকের কাজ। অনেক সময় ছেলেদের অলসতার ভিতরে বড় হবার বীজ লুকিয়ে থাকে। Darwin এমনি একটি ছেলে ছিলেন।

ধর্ম্ম ও নৈতিকতাই জগতের ভিত্তি। বৈদিক যুগে এই ধর্ম্মকে আদর্শ করে আমাদের এই অমর ভারত গ'ড়ে উঠেছে, যার ফলে বহু মহামানবের সৃষ্টি হয়েছে ও আজও হচ্ছে। বর্তমান ছেলেরা শুধু বাংলার নয় সারা জগতের সঙ্গে যোগসূত্র অনুভব ক'রছে। তাই এই মহাপুরুষের আদর্শ বিশ্বজনীন।

শেষে আর একটু কথা, স্মৃতিশক্তির চর্চ্চা ছেলেদের প্রথম থেকেই প্রয়োজন। (All learning depend upon memory, Koffka -- The growth of mind)। তাই শিশুদের উপযোগী কয়েকটী ছড়া ও শিশুনাটিকা "জীবন গড়ো" বইটিতে দেওয়া হয়েছে।

জীবনের প্রথম স্বপ্ন

অবুঝ শিশু স্বপ্ন দেখে
জীবনের প্রথম স্বপ্ন
ভাল হব, বড় হব, সারা বছর—
তবে কি সে ভাল হবে না ?

এমনি স্বপ্ন যদি সবাই দেখে,
এমনি স্বপ্ন যদি সফল হয়—
তাই নিয়ে কি আঁধার ধরায়
আলোর স্বর্গ নেমে আসবে না ?

ঘরে ঘরে এমনি যদি জ্বলে
ছোট সোনার প্রদীপ
সেই দীপের মুখে যদি থাকে
স্বপ্নের নন্দন-বন জ্যোৎস্না
তবে কি এই মলিন ধুলা
সোনায় সোনা হয়ে যাবে না ?

মানুষ হবার মন্ত্রটী

রথতলা নাম শুনেছ তো গোসাঁইদের ঠাঁই
সেথায় বারেক জমা হলাম ছেলেরা একজাই।
দেখেই বলে কোল্‌কেতারই ছেলে তুমি বড়
এসো আজি লড়বে দেখি সাহস কত দড়।
অনেক কসরৎ করেই সব এক মিনিটে হারে
সবাই বলে সাবাস ভাই চলো নদীর পাড়ে।
অজয় তীরে ব্রিজের উপর এসেই বলে—নাও
লাফিয়ে এবার পড় দেখি সাবাস নিয়ে যাও।
লাফিয়ে পড়ি রাখতে মান সেই সে উপর হ'তে
উবুড় হয়ে নরম বালি আঁকড়ে কোন মতে।
অজয়া নদী পার হ'তে যে ডুবেই গেছি যবে
সাহস ক'রে চ'লেই জেনো মরণও ভয় পাবে।
বীর স্বামীপাদ বলেই দেছেন সাহস যেন রেখো
মানুষ হবার মন্ত্রটী তাঁর বুকের কোণে এঁকো।

বড় হবার মন্ত্র তোমার বুকেই আছে গাঁথা

রঙ্গীন একটি প্রজাপতি ফুলেরে কয় খুঁজি
কি করবে বড় হয়ে বল দেখি বুঝি।
রঙ্গীন হব, ফুটব আমি ছড়িয়ে দেব সুধা
ভরিয়ে দেব সবার মনের আকুল যত ক্ষুধা।
গিরি চুড়ে ঝিরিঝিরি ছোট্ট এক নদী—
মরু শুধায়—কি করবে, বলতে কিবা ক্ষতি।
কলকলি ছোট্ট নদী হেসেই তারে কয়
বড় হব, স্নিগ্ধ নীরে ভরব সব হৃদয়।
ছোট্ট শিশু, শুধাই তোমায়—জানো কি সে কথা
বড় হবার মন্ত্র তোমার বুকেই আছে গাঁথা।

জীবন গড়ো

ধুলো বালি চাওনা তো কেউ
থাকলে তা রে দাও ছি—
তেমনি মনে ময়লা মাটি—
জমাই কেউ চাও কি?
জলে যদি ময়লা পড়ে—
সে জল না খাওয়াই ভালো
মনটা যাতে খারাপ করে
সে সব জিনিষ ফেলাই ভালো

ভালো কথা শুনবে আর
ভালো বই পড়বে ভাই—
ভয় আর আঁধার টারে
নিত্য দিনই জানবে ছাই!
বড় হ'ল ধরায় যাঁরা—
ধরণীরে করলো বড়ো
তাঁদের কথা পড়ে সবে
আপনাদের জীবন গড়ো।

এগিয়ে পড়ো

(গল্পে ছড়া)

ঠাকুরের এক গল্প শোনো—
কাঠুরে কাঠ কাটে বনে
হঠাৎ দেখে ব্রহ্মচারী—
ডেকেই তিনি বলেন ওরে—
এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো॥

বাড়ী এসে ভাবছে ব'সে—
ব্রহ্মচারী কেনই বনে
এগিয়ে যেতে ব'লল এমন?
ভাবনা মনে কতই জড়ো
এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো—

এমনি কিছুদিন ত' যায়—
একদিন সে বসেই ভাবে
এগিয়ে যাবো দেখি কি হয়—
সাধুর কথা সত্যি বড়ো—
এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো ॥
বনে গিয়ে এগিয়ে গেলে—
দেখেই যত চন্দন গাছ—
সারি সারি কতই ত গো—
বেচেই হ'ল লোক যে বড়ো
এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো ॥
এগিয়ে গিয়ে নদীর ধারে
দেখেই সে এক রূপার খনি
আণ্ডিল টাকা করলো জড়ো
এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো ॥

যায় কিছুদিন ভাবছে বসে—
সাধু আমায় বলেননি ত,
রূপার খনি শেষের কথা—
এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো ॥
এগিয়ে নদীর ধারে গিয়ে
সোনার খনি পেলই বড়ো
এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো ॥

এগিয়ে পড়ো এগিয়ে পড়ো
সে আরো কিছু দিনের পরে—
আরো এগিয়ে নদীর ধারে
দেখে খনির হীরে মানিক
নিয়ে ধন কুবের হল—
তাই ত বলি এগিয়ে পড়ো ॥

ভাল যা তা সবাই চায়

মাখিয়ে কালি ফুলগুলিরে
তুলে নিতে পারবে কি ?
পূজার দিনে সজ্জা ক'রে
ধূলার হার পরবে কি ?
ঘেয়ো কুকুর পথেই ঘোরে
তারে কভু চাওতো না।
সাজানো বাগ ছেড়ে দিয়ে
কাঁটার বনে যাও তো না ?

আদর হাসি ফেলে দিয়ে
দূর-ছাই আর চায় বা কে ?
ভাল তোমার লাগে না তো
ময়লা কাল চা'র পাশে।
ভাল যা' তা সবাই তো চায়
ভাল কিছুই ছাড়া নয়—
জগৎখানা ভালই হবে
সবাই যদি ভালই হয়।

নূতন জুতো না পুরোনো ?

পাদুকা যে রাজ্য চালায়
সেকথা আজ গেছি ভুলে...
বনবাসের কালে 'ভরত'
রামের জুতো নিলেন তুলে।
জুতোর কথা অনেক জানো—
'বিদ্যাসাগরী' চটী খানও
লাটসাহেবের বাড়ী যেতে
বাড়ালো যে মোদের মান।
স্যার আশুতোষ রেলগাড়ীতে
সাহেব দিল জুতো ফেলে—
• সাহেবের এক কূর্ত্তা ছিল
আশুতোষও দিলেন ফেলে।
সাহেব বলে কুর্ত্তা কোথায়—
জানিস যদি দেরে বলে
•আশুতোষের একটি কথা—
জুতো আনতে গেছে চলে।
আর বারের কথা শোনো—
অর্দ্ধেন্দুর পালা সে যে—
নীলকরের সাহেব হ'য়ে
থিয়েটারটা করেন নিজে।
এমন পালা কেউ দেখেনি
সত্যি বলে হয় যে ভুল,
চটি ছুঁড়ে মারেন 'সাগর'
আসল নকল—নাই যে ভুল।
মাথায় তুলে নিলেন নিজে
এযে পরম স্নেহের দান,
মহৎ জনের আদর এযে
রাখাই হলো মহৎ মান।

হিমালয়ের কথা শোনো
মাথা উঁচু তার যে বটে
তারো চেয়ে উঁচু মাথা
আরেকজনের ছিল ঘটে।
বরিশালের দত্তমশায
অশ্বিনী যাঁর নাম
দার্জ্জিলিং এসেই সেবার
হাওয়া খেতেই যান।
হঠাৎ দেখেন আসছে কেও
আগুনেরই ঘোড সওয়ার
পিছে পিছে আসে ছুটে
শিষ্য যত সাহেব আর।
অবাক হয়ে দেখেন তিনি
নেমেই আপন ঘোড়া থেকে
বুট জুতোটি বাড়িয়ে দিলেন
সাহেবরা যায় খুলে নিতে।
দত্তমশাই ভাবেন হায়
জুতার বাড়ি মারে যারা
তারাই জুতা খুলছে আজ।
কেবা ইনিই, এরাই কারা,
কাছে গিয়ে দেখেন এযে
চেনা মুখ-এ নরেন স্বামী।
পরমহংসের অগ্নিশিখায়
বিশ্বে আগুন দিলেন হানি।
পূজার দিনে নূতন জুতা
জানিনাগো কেমন ক'রে
নিয়ে ছিলেন এঁরা সবাই
বগলে না মাথায় ধরে।

তবু তাদের জুতার মানে
বড় বলে আমরা জানি—
এমন জুতায় প্রণাম জানাই
তোমাদেরও সেথায় টানি।

মনের ভেজাল রেখ না

চারিদিকে ভেজাল দেখো
জাল পাতা সব ঠাঁই,
খাদ্যে ভেজাল, জলে ভেজাল
মুক্ত হাওয়াও নাই।
মনের মাঝে ভেজাল কিছু
রাখোই যদি তবে,
জীবন নিয়ে বাঁচা তোমার
মরার মতই হবে।
সৎ ছেলে হবেই হবে
মরণ জয়ী বীর,
স্বামিজীকে সামনে রেখে
উঁচু রাখো শির॥

ছোট্ট কথা

বড় কথা বলতে যে চাই
ছোট্ট কথায় যত
জীবনটাকে ক'রে তোলো
গোলাপ ফুলের মত।
ভয় পেয়োনা কোন কালে
অভয় মন্ত্র নিও
দেবার হ'লে দিয়ে দিও
নেবার টুকু নিও।
সত্যি কথা বলতে গিয়ে
হয়ত পাবে কষ্ট
তবু যেন সত্যি কথা
বলেই ফেলো স্পষ্ট।
ভয় পাবেনা কাজ করতে
মরচে ধরা প্রাণ
মাঠে মাঠে ফল ফল্‌বে
জীবন ভরা গান।
উঁচু করে রাখবে মাথা
টলুক না হয় পৃথ্বী
সাগর জলের গভীরতা
অচলতায় স্তব্ধী।
সরল হবে সহজ হবে
যেথায় যেমন বুঝে
নয়ন দুটি মেলে ধরে
তাঁকেই পাবে খুঁজে।
দিনের শেষে মায়ের বুকে
ছেলে যেমন ঘুমে
তাঁরি কোলে পড়বে ঢলে
তাঁরি স্নেহের চুমে।

চন্দ্রামণির কোলে

ঠাকুর তুমি মোদের ঠাকুর
আমরা তোমার দলে।
ছুটি, ছুটি, ছুটি দিনের—
চাঁদ আকাশের তলে॥
পড়া খেলায় আমরা থাকি—
আদুল ধূলা গায়ে॥
তুমি ঠাকুর তখন যেন
এসো নোটোন পায়ে॥
কামারপুকুর কামারপুকুর
তোমায় নমস্কার।
•চাঁদের মত অমনি একটি
দিওগো আবার॥
আমরা তখন হাতে ধ'রে
•বলবো তোরে ভাই।
লাহাবাবুর পাঠশালাতে
চলো এবার যাই॥

পড়ি লেখি কি করে আর—
নাচন তুলে পায়ে,
মানিকরাজার আমের বনে
খেলবো সকল ভায়ে॥
শিবরাত্রির যাত্রার আসর
দেখনা মোদের ডাকে,
তেমনি ক'রে আয়না ও ভাই
শিব সাজাবো তোকে॥
চন্দামায়ের ভাঙ্গা ঘরে,
পিদ্দিমেরই আলো।
সন্ধ্যাবেলায় মায়ের কাছে
শুনবো ছড়া ভালো॥
খড়েছাওয়া ছোট্টঘরে
মায়ের চুমা চোখে—
সবভুলিবার মন্ত্র নিয়ে
থাকবে: মায়ের বুকে॥

সারদা কমল

সাতটি চাঁদের কুঁড়ি
চরকা কাটে বুড়ি।
চরকা সুতো ছিঁড়ে
ধরায় এলো ঘিরে।
ছড়িয়ে পড়ে দল
সারদা কমল।

জোছনা জমা কুটীরে
দেবতা এল জুটিরে—
ঘাসের শিশির টুলটুলে
তাতেই এল পথ ভুলে।
চরণ ভরা আলপনা
জয় গাঁয়েরই চন্দনা

অষ্ট সখী সঙ্গিনী
রামের সে যে নন্দিনী॥

প্রথম প্রভাতে

জননী—

প্রথম প্রভাতে এই হোম শিখা সম
কর অমলিন মম ধরা মনোরম।
থাক্ সুখ, থাক্ দুখ থাক শত বাধা
তোমার বাঁশীর সুর হয় যেন সাধা।
সুরধুনী ধারা সম ব'য়ে যাক্ প্রাণ
শত দোলা মাঝে নাহি হই শত খান।
দেবতা ভিখারী দ্বারে ভুলিতে না চাই
সবার তিয়াসা যেন পায় বুকে ঠাঁই।
মরণ অমৃত দিও চরণ নিকষে
করুণা নয়নে মা গো রেখো চির
দাসে।

সোনার পুঁথি

সুন্দর জীবন ব'লে পেলে যেই পুঁথি
কালিমাখা ছেঁড়া পাতা করা নয় ভাল—
সোনার কালিতে তার সব পাতাগুলি
ঝক্‌ঝকে লেখা দিয়ে ক'রে তোলো
আলো।
প্রতিদিন ভাল কথা ভাল ব্যবহারে
হাসি আর ফুল সম সুন্দর ভাবনা
পাতাগুলি ভ'রে দিক চুপে ধীরে
ধীরে
স্বর্গের আলো আর নন্দের নন্দনা।
জীবনের শেষদিনে বইখানি নিয়ে
যখন দাঁড়াবে তুমি নম্রনত শিরে
প্রভুর হাতেতে সেই পুঁথিখানি দিয়ে,
গৌরবে ভরিও বুক অলকার তীরে।

দুটি কথা

আমি যেন ছোট্ট একটি ছেলে হ'য়ে গেছি
ধর যেন পঞ্চাশ ষাট বছর সরে গেছে
কি যে চাওয়া ছিল আমার
ব'লতে যদি পারো—
ব'লেই না হয় দি'!
বছরের গোড়ার দিকে
লিখেই দিতাম বইএ শেষের পাতায়
একটি দুটি লাইন…
ভালো ছেলে হ'য়ে
যেন থাকতে আমি পারি।

দশমীর দিন নতুন কাপড় জামা জুতো নিয়ে
আনন্দ ত' ছিল পূজা দেখার পথে,
আরো ছিল
বইখানি উল্টে-পাল্টে শেষের দিকে দেখা
সারা বছর ভাল ছেলে ছিলাম কিনা আমি।
তোমরা যদি প্রথম দিকে
এমনি কোন ক্ষণে
লিখেই রাখো শেষের পাতায়
'ভাল ছেলে হবো'
আশা করি ঘাটের কোঠা পেরিয়ে
যেদিন যাবে
এমনি ক'রে হাসি মুখে
পিছন ফিরে চেয়ে
ফুলের মতন একটি জীবন
ধরে দিয়েই যাবে।

ভয় পাওয়া আর ভয় দেখানো

ছোট্ট ছেলে দুধ খেতে তা'র
দুষ্টুমি না কত।
বুড়ী যে এক তাইতো তা'রে
ভয় দেখাত যত॥
ছ'কড়া আর ন' কড়া
আয়রে তোরা ছুটে —
খায়না দুধ এই ছেলেটা
ধর না চুলের মুঠে—
হয়ত আঁধার তুলিয়ে যেত
গাছের কালো শিরে
ভয়ের কথা বাঁধত বাসা
সাঁঝের আকাশ ঘিরে।

বড় হ'য়ে সেই সে ছেলে
ভূত সেজে এক কোণে.
দাঁড়িয়ে আছে কালি মাখা
কাপড় মাথায় টেনে।
গাছের ডালে কালো সুতা
বেঁধে দিত ঝাঁকি
অফুট সুরে কইত কথা
কত নাকি নাকি।
ছোট বেলায় ভয় পেয়ে সেই
ভয় ছিল যে জমা
বড় হ'য়ে হ'ত না তাই
ভয় দেখানো মানা।

ভয় পাওয়া আর ভয় দেখানো
একেরি দুই দিক—
দু'টি থেকেই থাকবে স'রে
এইটি জেনো ঠিক।

উপনিষদের কথা

অনেক দিনের কথা—তখন বেদ তুলেছে মাথা,
ঋষিদের বুকে জাগা শোন দু'টি কথা।
বলেন ঋষি -- গুরু শিষ্যের যশের কথা সমান হোক
ব্রহ্মতেজে দু'জনেরি সমানরূপে হোকনা যোগ
সত্য কথা বলতে হবে, পডবে এবং পড়াবে,
সংযমেরি জীবন নেবে, অতিথিদেয় খাওয়াবে।
ভূলের পথে পা দিওনা—পিতৃ আর দেবব্রতী,
অনিন্দিত কর্ম করো, আচার্য্যদের দিও নতি,
শ্রেষ্ঠজনে সম্মান ও দানের কথা নিও সবে,
ঈশ্বরেরি আদেশ ভেবে ভাল এসব ক'রেই যাবে।

ছোট্ট ছেলে কালিপ্রসাদ

মার্কিনের নাম শুনেছ
বড় দেশই সে তো,
সেথায় যেতে তোমরাও
তৈরী হয়ে থেকো।

ছোট্ট ছেলে কালীপ্রসাদ
সেই দেশেতে গিয়ে
কত কাজ করল সেথা
পঁচিশ বছর নিয়ে।

মস্ত বড় পণ্ডিত আর
সেথায় তার বাসা
চার ঘণ্টা তর্ক ক'রে
জিন্‌লো তারে খাসা।

আবার শোনো 'লুসিটেনি'
জাহাজ বড়ই হয়—
পিছন থেকে বাধা দিল
টিকিট কেনা নয়…

ঐ জাহাজই ডুবে গেলে
মধ্য সাগরে—
বল দেখি বারণ তারে
ক'রল বা সে কে ?

ঠাকুর যিনি—গুরু যিনি
তিনিই থাকেন পিছে
সেই কথাটি ভুললে পরে
সবই হবে মিছে॥

সব পাওয়ার মজা

সকাল বেলা বসেই ভাবি কত যে চাই চাই,
মনের মাঝে খুঁজে সেটা পেয়েও নাই পাই।
মনে ভাবি যদি পাই সব সন্দেশগুলি,
দু' হাত ভরে নিতে পারি কেক, বিস্কুট তুলি।
জুতো জামা ছাতা কাপড় যেথায় যা বা আছে
সবগুলি, সব যদি আমার পাই গো হাতের কাছে।
কলম, পেন আর ভাল ঘড়ি সবই যদি মেলে,
সব পাওয়ার কি যে মজা ভাবি পড়া ফেলে।
ব্যাটবল আর ক্যারামগুলি যদি রে পাই সবে
ছবি ছড়া গল্প গাথা···কি যে মজা হবে।
···পেয়ে পেয়ে তবু দেখি ছুটে যায় যে মন.
ছুটে বেড়ায় দেশ বিদেশে চঞ্চল চরণ।
ছুটতে পেলে ছুটে চলাই মনের মাঝে রয়,
এ ধরা বাঁধন ছাড়িয়ে গেলেও শান্তি না'ত হয়।
পড়ার পুঁথি 'পরেই তখন বসিয়ে আমি মন
ছুটোছুটির মাঝে দেখি হাঁপাই সারাক্ষণ।

হল্লা ক'রে চল

তোমরা ছোট ছেলের দল, হল্লা ক'রে চলো
মনের জোরের কথা এটা, পৃথ্বী পায়ে দলো।
কিন্তু জেনো সীমারেখা একটু টানা চাই
কোনটা ভাল কোনটা মন্দ ভুলোনাকো তাই।
ছোট ছেলে আগুন দেখে হাত বাড়িয়ে ধরে
শেষটা তাতেই হাতের জ্বালায়, জানোই তো গো মরে
বড় হওয়ার মন্ত্র নিয়ে ভবিষ্যতের দিকে
লক্ষ্য যেন থাকে ও ভাই—এইটি নিও শিখে।

নতুন ছড়া

ঠাকুর যাবেন শ্বশুর বাড়ী
রাঙা জামা গায়ে মুড়ি
পালকি এসে দাঁড়ায় দ্বারে
রূপের কথায় সবাই হারে ॥
সবাই এসে দাঁড়িয়ে আছে
টুকটুক রূপ হারায় পাছে
গাঁয়ের মেয়ে ঘোমটা ফাঁকে
এসেই দাঁড়ায় কলসী কাঁখে ॥

হাজার লোকের জড়ো দেখে
ঠাকুর বলেন লজ্জা মেখে
ওরে হৃদু, কিসের মেলা
দাঁড়িয়ে কেন এই অবেলা ?
হৃদয় বলে, সাজলে ভালো
রাঙ্গা ঠোঁটে হাসি ঢালো
ঠাকুর বলেন, লাগছে লাজ
কোথাও আমি যাবো না-গো আজ ॥

HOPE OF A CHILD

Do you ask what I hope in future show ?
I want to be great, a child although
I would like to ride a sputnik in the sky
Like a merry bird over to the moon though not high
I want to be brave and fight for the Mother land
Heaven above and earth beneath—so grand.

প্রার্থনা

আমরা যেন ভাল হ'য়ে চলতে পারি,
তোমার চরণে যেন ফুলের মত ফুটে থাকতে পারি,
ঠিক ঠিক তোমার ছেলেমেয়ে হ'তে পারি।
আর আমাদের কল্যাণ কর,
আমাদের গৃহের কল্যাণ কর,
দেশের কল্যাণ কর - জগতের কল্যাণ কর।

প্রার্থনা

তোমার জন্মদিনে
একটা কথাই নিও।
ফুলের মত চরণ তলে
থাকতে আমায় দিও।

প্রার্থনা সংগীত

ভোরের আলো চোখ জুড়ালো
জাগে জয় বাণী
এমনি ক'রে অমল করো
তোমার পরশ দানি।
সারাদিন আর সারা বেলা
যখন করি পড়া খেলা
তোমায় ভুলে, ভুলো দোষে
দোষ ধরো না ঠাকুর।
ওগো অন্তর্য্যামী।
ফুলের মত পুণ্য করে
রাঙিয়ে তোলো নিত্যি ভোরে
পাখীর মত জাগিয়ে তোলো
রামকৃষ্ণ কথাখানি।

আশীর্ব্বাণী

প্রথম জাগা আলোর মত
তোমরা হও শুভ্র
মায়ের আশিস্ মাথায় নিয়ে
তোমরা নও ক্ষুদ্র।

"আশীর্ব্বাণী"

ছোট্ট তোমরা ফুলের কুঁড়ি
দেবের আশিস্ মাথে
সপ্তলোকের স্বর্ণ কিরণ
ছড়িয়ে আঁখির পাতে ॥

আশীর্ব্বাণী

কুঁড়ির মাঝেই রয় যে জড়ো
ফোটা ফুলের গন্ধ
বীজের মাঝে বনস্পতি
বসেই থাকে অন্ধ।
প্রহ্লাদেরই ছোট্ট বুকে
বিরাট জেগে থাকে
তোমাদেরই ক্ষুদ্র কাজে
"সেই" ত প্রকাশ মাগে।

শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্ব্বাণী

মা বলেছেন মনের কথা
শুনবে প্রথমটাই
ঐ কথাটি জেনেই নিয়ো
হরির কথাই তাই
অভেদ স্বামীর কথা শোন
স্কুলেই একদা
প্রথম কথা শুনলো কেমন
শোনাই সে কথা
ড্রইং ক্লাশের ভালো ছেলে
আঁক্‌ছে বসে বেশ
বেঞ্চি ঠেলে উঠেই বলে
এই হল মোর শেষ
মাষ্টার মশায় শুধায় ওহে
কি হয়েছে বলো

কালীপ্রসাদ বলেই স্যার
আঁকাই শেষ হলো
দর্শনের ছাত্র হবো
সেইতো বড় কথা
এখন তবে তুলেই রাখি
আঁকার বই খাতা
মাষ্টার বলেন সুন্দরের
এই তো পূজা বড়
ছাত্র বলেন বাইরের রূপ
বড় যে করে জড়ো
অন্তরের কথা নিয়েই
দর্শনের দৃষ্টি
সত্য-শিব-সুন্দরের
মোহন সেই সৃষ্টি

দিশাহারা শিক্ষক তো
ম্লান মুখে বলে
না হয় নিলে দুটো দিকই
দুটো নিলেও চলে
চরম কথা চিরন্তনী
কালী ধীরে কয়
দুটি প্রভুর রাজ্যকরা
একের সাধ্য নয়।

অভেদ স্বামীর দেশপ্রীতি

অভেদ স্বামীর অনন্য জীবনের জাতপত্রের একটি কথা আজ বড় হয়েই থাকবে। যেদিন হোয়াইট মাউনটেনে পাহাড়িয়া বেশে স্বামিপাদ এসে দাঁড়িয়েছেন, সঙ্গে নানান দেশের লোক—তারমধ্যে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পার্কার এঁরাও ছিলেন।···সুন্দর পর্বত—সুদূরপ্রসারী তার তুষার স্তব্ধতা।··· সকলেই উৎসুক ভারতবাসী স্বামিপাদ কি বলেন শুনি, জিজ্ঞেস করেন —কেমন লাগে আমাদের এই পর্ব্বতের দৃশ্য···ভারতের হিমালয়ে কি এমনটি আছে? চকিতে স্বামিপাদের চোখে ভেসে ওঠে অতীত দিনের তুষার স্বপ্ন · বদরী কেদারের শৈলভঙ্গী—বলে ওঠেন দেব-আত্মা হিমবানের সানুলগ্ন হলে এই হোয়াইট মাউন্টেন কে আর খুঁজেই যাবে না পাওয়া—ভারতের গৌরব শির সেদিন স্বর্ণ করোজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল অভেদপাদের করে।

জগৎ কত সুন্দর

এই পৃথিবীটা যে কত সুন্দর, স্পুটনিকে করে ঘুরে এলে দেখতে পাবে। যারা ঘুরে আসে তারা বলে একটি অতল অন্ধকারের মধ্যে নীলকান্ত মনি। তোমার ছেলেরা যদি জীবনটাকে এমনি সুন্দর করে তুলতে পার অন্য দেশের লোকেরা অবাক হয়ে যাবে।

আমাদের বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, দর্শন আজ অন্যদেশের লোকেরা অবাক হয়ে পড়ছে। আজও আমাদের ছেলেরা, রবীন্দ্রনাথ, স্বামিজী, গান্ধীজী, নেতাজী দেশ বিদেশের কত সম্মান পেয়ে আসছেন। আমরা যদি বঁড় হবার মন্ত্র নি, যদি মানুষ হবার মন্ত্র নি, তাহলে নীলকান্ত মনির এই পৃথিবী আরও সুন্দর হয়ে উঠবে। কবিকথা·সার্থক হবে :—

আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা
মানুষ আমরা নহি তো মেষ
দেবী আমার সাধনা আমার
স্বর্গ আমার আমার দেশ।

'বড় হবার স্বপ্ন দেখ'

EDISON কে তোমরা জান। ইনি নূতন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেছেন ১০৩৩টির মত। তাঁর একটি কথা ছিল—বেশীর ভাগ খেটে গেলেই

তোমরা বড় হতে পারবে। আর দেখবে যারা বড় হয়েছে, ছোটথেকে তারা বড় হবার স্বপ্ন দেখে আর সঙ্গে থাকে খেটে যাওয়া।

কেমন করে বড় হওয়া যায়

একবার লিড্‌স্‌ ইউনিভারসিটির ভাইস্‌চ্যান্সেলার ছেলেদের সমাবর্ত্তন উৎসবে বেশ একটি বড় কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, "আমি তোমাদের চলার পথে সহায় হবে বলে কতকগুলি টাইপ দিলাম। বড় হতে হলে এর যে কোন একটা ধরে তোমাদের জীবন গড়ে তুলবে।" এখানে টাইপ বলতে একটা আদর্শ জীবন। সেদিন সাধনানন্দ জয়ফলক দেওয়ার যে উৎসব গেল তাতে ছেলেরা একটা প্রশ্ন করেছিল, জানতে চেয়েছিল স্বামিজীর জীবনবেদ, স্বামিজীর জীবন জগতের কাছে একটা বরেণ্য টাইপ। স্বামিজী ছাত্র হিসাবে খুব ভাল ছাত্র ছিলেন স্কটিশের বা জেনারেল অ্যাসেমব্লির ছাত্রাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্যের আদর্শ তাঁর কাছে প্রধান ছিল। তাঁর জীবনের আদর্শ ছিল মহাবীর। ব্রহ্মচর্য্যবান, ভক্ত ও বীর হিসাবে স্বামিজী তাঁকে বরাবরই বড় বলে মনে করতেন। বলতেন—মহাবীরের পূজা ঘরে ঘরে হোক। তিনি ছাত্রাবস্থা থেকেই, সমবয়সীদের নিয়ে গঙ্গাপূজা করতে যাওয়া, ধ্যান করা প্রভৃতি ভালবাসতেন। ছেলেদের সৎ পবিত্র জীবন, ধ্যান ও পূজা করা প্রয়োজন বলে মনে করতেন। দ্বিতীয়তঃ দেখি, তিনি ব্যায়াম চর্চ্চা করতে ভালবাসিতেন। এটাও ছেলেদের প্রয়োজন। তৃতীয়তঃ পড়ার বিষয়ে তিনি খুব দৃঢ়তার সঙ্গে পড়াশুনা করতেন। ক্লাশে মেধাবী ছাত্র ছিলেন। একবার আই, এ, পরীক্ষার আগে ইংলণ্ডের ইতিহাস তৈরী না হওয়ায় তিনি দরজা বন্ধ করে পড়েছিলেন, যতক্ষণ না মুখস্থ হয়েছিল। গৌরমোহন মুখার্জী লেনে একটি উপরের ঘরকে তিনি টং বলে নাম দিয়েছিলেন, যেখানে এটি ঘটে। তিনি অবশ্য শুধু পড়া নিয়ে থাকতেন না। বাইরের বই যথেষ্ট পড়তেন। এই জন্য তাঁর সাধারণ জ্ঞান যথেষ্ট ছিল। তিনি হার্বার্ট স্পেন্‌সার প্রভৃতি বড় বড় লেখকদের লেখার সমালোচনা করে বিলাতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ও তাঁদের প্রশংসাও পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বন্ধু বয়স্য সকলের সঙ্গে বসতে, গান করতে ভালবাসতেন। আর তাঁর ছেলেবেলার দুটি কথা—

তিনি দানশীল ছিলেন ও গুরুজনদের [অধ্যাপক প্রভৃতিকে] সম্মান দিতে পিছপা হতেন না। সেই জন্য সকলের আদরের ছেলে ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। আর সব শেষে জীবনে ভয় কাকে বলে জানতেন না। ভুতের ভয়, গোরা পল্টনের

ভয় কিছুই তাঁর ছিল না। ভূতের ভয় বা ব্রহ্মদৈত্যের ভয় দেখালে তিনি খোঁজ করে তাঁর সত্যতা জানতে চাইতেন। এমন জীবন না হলে সব দিক দিয়ে তাঁর মত বড় মানুষ হওয়া যায় না।

তোমরা কি হতে পারো

ওদেশের ছাত্রদের কে কি হতে পার তার পরীক্ষা আছে। তোমরা ছাত্র হিসাবে কি পথে যেতে পার, তার কিছু আভাস পাওয়া যায়। তবে ঠিকঠাক কিছু বলা যায় না। শ্রীঠাকুর বলতেন—মায়ার রাজ্যে অনেক গোল।

সঙ্গীত :—গানের তাল বুঝতে পার কিনা। তালের গোলমাল বুঝতে পার কিনা। গান হ'লেই তাল দাও কিনা। কোনস্বর শুনলেই মনে পড়ে কিনা। কেউ কোন গান ভুল সুরে গাইলে বুঝতে পার কিনা। গানের সা-রে-গা-মা পর্দা শুনে বুঝতে পার কিনা বা বড় গাইয়ের নাম জান কি? পাশ্চাত্য দেশে Pitch Intensity এই সব পরীক্ষা করবার জন্যে ছয়টি গ্রামোফোন রেকর্ডের ব্যবস্থা রেখেছেন। ছেলেরা এইসব শুনে তারতম্য ইত্যাদি বুঝতে পারে কিনা দেখার জন্যেই এই ব্যবস্থা।

কলাবিদ্যা :—প্রকৃতির নানারূপ দেখেই থমকে দাঁড়াও কিনা,—যেমন বর্ষার মেঘ, বর্ষার নদী, শরতের মেঘ, কোন সুন্দর দৃশ্যের ছবি দেখে কিছুক্ষণ চেয়ে থাক কিনা। যদি মানুষের কোন ছবিতে ভুল থাকে ধরতে পার কিনা। মাটির পুতুল গড়তে ভাল লাগে কিনা? ছবি দেখতে ভাল লাগে কিনা? ছবি Copy করতে ইচ্ছা হয় কিনা? ছবি সংগ্রহ কর কিনা? বড় বড় আঁকিয়েদের নাম মনে থাকে কি?

ওদেশে C. Merrier ও Sea Shore একশো চব্বিশ পাতার একটি বইতে বড় বড আঁকিয়েদের ছবি দিয়ে দেন, আর সঙ্গে থাকে সেই ছবির ভুল আছে এমন ছবি, ছাত্রদের দেখতে বলা হয়—ভুল কি কি?

কেরাণীগিরি :—কোন জিনিষ চট করে দেখে নিতে পার কিনা আর ঠিক দেখে নিতে পার কিনা, কোন জিনিষের সার চট করে বুঝে নিতে পার কি না, তার থেকে কি বার করা উচিত তা তাড়াতাড়ি ঠিক করতে পার কিনা, টাইপ-রাইটার চালাতে ইচ্ছা করে কিনা, বানান ঠিক হয় কিনা, ভুল ছাপা ধরতে পার কিনা, অধ্যাপক Paterson দু'টি করে ২০০ নাম সংখ্যা লিখে দেন। নাম দুটি হয় এক না হয় সামান্য বানানের তফাৎ দেওয়া; সংখ্যাতেও তাই। এতে

ছাত্রদের যে নাম বা সংখ্যা এক, তাতে দাগ দিতে হয়। এর ফলে কেরাণীগিরিতে সফলতা জানা যায়, যে ছাত্রের বেশীর ভাগ উত্তর ঠিক হয়।

আইন ব্যবসা ঃ—ন্যায় শাস্ত্রে দখল থাকা দরকার—নানা প্রশ্নে হয় কে নয় করা নির্দ্দিষ্ট সময়ে।

স্কুল মাষ্টারী ঃ—স্কুল মাষ্টারের দরকার, সাধারণ জ্ঞান। ছোটবেলায় মাষ্টার মাষ্টার খেলা থাকা।

ডাক্তার ঃ—কারো অসুখ দেখলে অসোয়াস্তি হয় কিনা। কাঁটা তোলা, ফোড়া ঠিক ক'রে দেওয়া, ওষুধ সংগ্রহ, অসুস্থ সেবা কর কিনা।

অধ্যাপক Moss কাগজ পেন্সিল দিয়ে চারটা পরীক্ষা বের করেছেন—মানে বুঝা ও মনে রাখা, শুধু দেখেই মনে রাখা, যুক্তিসঙ্গত চিন্তা, বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক শব্দ মনে রাখা আর ছাপা বিষয়ে বুঝতে পার কিনা।

যন্ত্রবিৎ ঃ—যারা হাতের কাজ, ছোট ছোট যন্ত্র তৈরী করতে পারে,বিদ্যুতের বাতি দিয়ে কিছু করতে অভ্যস্ত, যন্ত্র সারান কাজের অভ্যাস, কল কারখানা দেখায় যাদের মন পড়ে থাকে,—তারা এই সব কাজের যোগ্য। বড় বড় যন্ত্রবিৎদের জীবনী ও নাম জানা থাকলে এই বথা বুঝতে হবে। O' Connor একটি পরীক্ষা বের করেছেন, একে বলে Wiggly Block test. এতে ছাত্রদের টুকরো টুকরো কাঠ ঠিক করে সাজাতে দেওয়া হয়। ঠিকমত সাজাতে পারলে ছাত্রদের যোগ্যতা বুঝা যায়।

মধুসূদন দাদা

১ম দৃশ্য

স্থান—দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের ঘর

(শ্রীঠাকুর ভক্তসঙ্গে বসিয়া আছেন)

শ্রীঠাকুর—আন্তরিক যে ঈশ্বরকে জানতে চাইবে তারই হবে, হবেই হবে। যে ব্যাকুল. ঈশ্বর বই আর কিছু চায় না, তারই হবে। ঝাঁপ দিলে হবেই হবে। অনুরাগ হলে ঈশ্বর লাভ হয়। খুব ব্যাকুলতা চাই। খুব ব্যাকুলতা হলে সমস্ত মন তাঁতে গত হয়—ব্যাকুলতা হলে অরুণোদয় হয়। তখন পূর্ব্বদিক লাল হয়। তখন বোঝা যায় যে, সূর্য্যোদয়ের আর দেরী নাই। সেইরূপ যদি ঈশ্বরের জন্য কারও প্রাণ ব্যাকুল হয়েছে দেখা যায়, তখন বেশ বোঝা যায় যে, এর ঈশ্বর লাভের আর দেরী নাই। এই ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। কথাটা এই তাঁকে ভালবাসতে হবে।

জটিল বালক রোজ বনের পথ দিয়ে একলা পাঠশালায় যেতে বড় ভয় পেত। মাকে ভয়ের কথা বলতে মা বল্লে ভয় কি? তুই মধুসূদনকে ডাকবি। বালকটি নির্জ্জন পথে যেতে যেতে যেই ভয় পেয়েছে অমনি মার কথা মনে করে 'দাদা মধুসূদন' বলে ডাকতে লাগলো—কাঁদতে লাগলো। তখন ঠাকুর আর থাকতে পারলেন না—এসে বললেন—এই যে আমি—তোমার ভয় কি?

এই বালকের বিশ্বাস—এই ব্যাকুলতা।

২য় দৃশ্য

জটিলদের গৃহ। প্রভাত।

জটিলের প্রবেশ—জোড় হাতে বসিয়া গাহিতেছে।

রামকৃষ্ণ রাখো শরণ
রাখো জীবন হমারে।
রাখো বিনতি মোরী
রাখো চরণ তোরী
রাখো প্রীত প্যারে।
রাখো আঁখোকে নীর
রাখো খেল অধীর,
রাখো অপনে পাসমে
সমহারে॥

জটিলের মা—বাবা, তোমার পাঠশালা যাবার সময় হয়েছে, চল কিছু খেয়ে পুঁথি পত্তর নিয়ে যাবে।

জ—মা, আমার বড় ভয় করে সেই গহিন বনের মধ্যে যাবার সময়। না মা আমি রোজ রোজ একা যেতে পারবো না।

(মুখ নামাইল)

জ-মা—বাবা! আমাদের আর কে আছে যে তোর সঙ্গে দেবো। তবে অসহায়ের সহায় ঠাকুর আছেন, তিনি তোমায় রক্ষা করবেন। ভয় পেলে তাঁকে ডাকবে।

জ—তিনি কে মা?

জ-মা— তিনি তোমার মধুসূদনে দাদা, তাঁকেই আমাদের একমাত্র সহায় জেনো। তিনি অশরণের শরণ। চল এখন পাঠশালা যাবার সময় হয়েছে।

(প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য

বনস্থলী। প্রভাত।

জটিলের ভয়ে ভয়ে প্রবেশ। হাঁটু গাড়িয়া বসিল।

গীত

ব্যথা আমার অথৈ হ'লো,
ঠাকুর তুমি কৈ?
একলা বনে একলা মনে,
পথ চেয়ে যে রই।
চরণ পুলক উঠবে হেসে,
সকল আঁধার যাবে ভেসে,
চোখের জলে উছল হয়ে,
তাই তো বসে রই॥

জ—ও মধুসূদন দাদা! মধুসূদন দাদা! কোথায় তুমি? আমার যে বড় ভয় করছে। এই গহন বন; কেমন করে পার হ'বো? শিগগির এস, মা বলে দিয়েছে, তুমি আমার দাদা হও। আমাদের আর কেউ নেই। আমরা যে বড় গরীব, মা বলেছে, যার কেউ নেই, তুমি তার বড় আপন। দয়াল ঠাকুর! তোমায় যে ডাকে তাকে তুমি কোলে নাও, তার সব দুঃখ দূর

করো। আমায় যদি দেখা না দাও; তবে কেমন করে পাঠশালায় যাব। কই ঠাকুর! এখনো এলেনা; (ক্রন্দন) মা আমার মিছে কথা বলে না; ঠাকুর ঠাকুর! দয়াল ঠাকুর! এস; এস, আমি মরে যাব। ওমা, মাগো! ঠাকুর! ঠাকুর। দেখা দাও। (ক্রন্দন ও পতিত হইল)

(মধুসূদন দাদার প্রবেশ)

মধুসূদন দাদা—ও ভাই, তুই কাঁদছিস, এই দেখ আমি এসেছি। ছিঃ! ভয় কি? এই দেখ আমি তোর জন্য কি এনেছি। (ফল দিলেন) আয় চোখের জল মুছেদি, আর ভয় কি—রোজ তোকে আমি এই বন পার করে দেব। খাইয়ে যাব। আমায় 'মধুসূদন দাদা' বলে যখনই ডাক্‌বি, আমি ছুটে আস্‌বো। আমি যে তোকে বড় ভালবাসি।

জ—ঠাকুর! ঠাকুর! এত সুন্দর তুমি! ঠাকুর ঠাকুর! এমন মিষ্টি ফল তুমি কোথায় পেলে? এমন সুন্দর চূড়া তোমায় কে পরিয়ে দিলে? ঠাকুর তুমি ভাই বড নিষ্ঠুর! আমায় কত কাঁদিয়েছ বলতো? এতদিন কেন এসোনি। কত কাঁদালে বলোতো?

ঠাকুর—তুই চূড়া পরবি? এই নে! (চূড়া খুলিয়া দিলেন) এতদিন তোর সঙ্গেই তো ছিলাম।

জ—ঠাকুর তুমি বাঁশী বাজাতে পার? বাজাও না। আমি গান করে নাচি, আমার ভারি ভাল লাগছে। মাকে গিয়ে বলবো, আমার শ্যামল দাদা কত ভালো, কেমন বাঁশী, কেমন চূড়ো (হাতে হাত দিয়া) আমায় আর ফেলে যাবে না বলো, সত্যি করে বলো?

ঠাকুর—হ্যাঁ ভাই তোদের ছেড়ে থাক্‌তে আমার বুকেও ব্যথা লাগে। তুই গান গা, আমি শুনি।

গীত

ব্যথার রঙে রাঙ্গাব আজ
প্রাণের ঠাকুরে॥

দিব অশ্রুমোতির সাতনরী হার।
অঝোরে ঝুরে॥

আমার এই বেদন বীণে
তাহারে লবে জিনে
দিয়ে এই সুরের রাখী
বাঁধিব সেই অচিনে
রয় যে দূরে দূরে ।।
নিয়ে এই দহন জ্বালা
আঁধার হবে আলা
ফাগুনের এই রঙের মেলায়
মিলবে সুরে সুরে ।

৪র্থ দৃশ্য

পাঠশালা

(জটিলের প্রবেশ)

জ—আয় ভাই এখনো পণ্ডিত মশায় আসেননি, আমরা গান করি ।

গীত

রামকৃষ্ণ নামের মালা
আমরা গাঁথি সারা বেলা ।
রামকৃষ্ণ নাম নিয়ে,
আমরা খেলি খেলার খেলা ।
নদীর কলকলে,
মোদের খুসীর জোয়ার চলে,
ভোরের আলোর ঝলমলে
আমরা গড়ি রাঙ্গা ভেলা ।
রাম ধনুকের নিশান ধরি
সাদা মেঘের খেয়া গড়ি
ঐ নামটি ধরি ।
নাইকো মোদের কান্না হাসির পালা ।।

প্রথম বালক—ভাই জটিল ! তুই এত গান কোথায় শিখ্‌লি, রোজ রোজ নতুন গান কোথায় পাস্‌ ভাই ?

জ—আমার দাদা আমায় কত গান শেখায়। জানিস্ ভাই, আমার শ্যামল কেমন বাঁশী বাজায়। কত খেলা জানে, আমার সঙ্গে কত খেলা করে, ভারি ভালো লাগে।

প্রথম বালক—আমাদের একদিন নিয়ে যাবি ভাই? তোর দাদার কাছে? আমরা খেল্‌বো তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলা।

জ—তা চ'না আজই—ছুটীর পর তোদের সঙ্গে করে নিয়ে য্যবো। সবাই গেলে বেশ মজা হবে। দেখ্‌বি আমার ঠাকুর কত ভালো, তাকে দেখ্‌লে আমার সব ভুল হয়ে যায়, আর কান্না পায়, তাকে দেখেও কাঁদি আর যখন ছেড়ে আসি তখনও কাঁদতে কাঁদতে আসি। ঐরে পণ্ডিত মশায় আস্‌ছেন, ব'স ভাই সকলে বসে পড়, পড়া করি।

"সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি"

পণ্ডিত মশায়—এই অনড্বান্‌রা! এতক্ষণ কি হচ্ছিল? বলি পড়াশুনা ক'রে এসেছিস্ না এমনি এসেছিস্। নিয়ে আয় বই, এই জটিল! উঠে দাঁড়া (প্রথম বালককে) এই অনড্বান্! মাথায় কোদাল চালাচ্ছিস্ কেন? চুপ করে বস্। বল্—মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না, বলি মা বাপ কি দিয়ে মানুষ করেছে? আজ বাড়ী থেকে লাউ এনেছিস্? শুধু হাতে পাঠশালা আসতে হয় বুঝি? (বেত্রাঘাত, দ্বিতীয় বালকের প্রতি) এই অনড্বান্! হাঁ ক'রে চেয়ে আছিস্ কেন্? বল্ নামতা বল্। পাঠশালায় হাসি কিসের? একি যাত্রার দল পেয়েছিস্? আমি ভীষ্মলোচন শর্মা! আমার গোয়ালে কিনা হাস্য···হনুমৎ দেব...আজ আমার একদিন কি তোদেরি একদিন (বেত্রাঘাত) বল্ নামতা বল্ (ছেলেরা নামতা বলিতে লাগিল ক্রমশঃ নাসিকা গর্জ্জন। ছেলেরা সব বেত লুকাইল, একটু পরে) তা দেখ আজ আমার রাজবাড়ীতে নেমন্তন্ন আছে, আজ আর পড়তে হবে না। সব বাড়ী যা, এই জটিল, তবু বসে আছিস্ যে? (বেত্রাঘাত) যা সব বাড়ীতে যা কাল আবার আসিস্।

(জটিলের কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান, সকলের প্রস্থান।)

৫ম দৃশ্য

বনস্থল। জটিল ও অন্যান্য সকলের প্রবেশ।

জটিলের গীত—

খেল খেলো, খেল খেলো, খেল খেলো
খেল খেলো রামকৃষণীয়া
মৈঁ আঁখমিচৌলি খেলুঙ্গী।
নাচ নাচো, নাচ নাচো, নাচ নাচো,
নাচ নাচো নও নটবরিয়া
মৈঁ ঝুরমুট মেঁ নাচুঙ্গী॥
আঁখো মেঁ আঁখোঁ ডাল দো,
পঁচ রঙ্গ সে অঙ্গ মোড় লো
তুঝে প্রেম সে দিল মেঁ লে লুঙ্গী।
আরে প্যারে দিবা না,
তেরে পায়ল কী গীত
কোই ন জানা
কুছ আঁসু কুছ গানা
তুঝ্ সে হিল মিল মিলুঙ্গী।

জটিল—দেখ্ ভাই ঐ শ্যামল বনে আমার শ্যামল ঠাকুর থাকে। এখুনি বাঁশীতে হাসি ঢালা সুর বাজিয়ে সে আস্‌বে। তার নূপুরের আওয়াজ শুন্‌তে পাচ্ছিস্? ঐ শোন্, ঐ গাছের দিকে, চল ঐ দিকে।

ঠাকুর—টু—(একদিকে পলায়ন।)

প্রথম বালক—ভাই ঐ দিকে।

ঠাকুর—টু—এই তো (পলায়ন)

জ—ওরে তোরা এই দিকে আয়। ঠাকুর এদিকে।

ঠাকুর—টু-উ—কানামাছি ছোঁওয়া, চোখে দেখে ধোঁয়া।

প্রথম বালক—না ভাই তোর ঠাকুরকে আমরা পারবো না, আমরা বাড়ী যাই।

ঠাকুর—কই ধর্‌না? (লুকানো)

প্রথম বালক—জটিল ভাই আমরা চল্‌লাম তোমার ঠাকুর হেরে গেল। কে ভাই এই অবেলায় অত ঘুরে ম'রবে! আমার ভাই বড খিদে পেয়েছে।

জ—ও ঠাকুর! আমরা হার মানছি তুমি এস! শিগ্‌গীর করে এস, দেখ আমাদের কত খিদে পেয়েছে। এরা সবাই আজ তোমাকে দেখবে, তোমার সঙ্গে খেল্‌বে। তুমি না এলে, এরা সব কাঁদ্‌বে যে! তোরা ভাই সব কাঁদ।

প্রথম বালক—ভাই আমার কান্না পাচ্ছে না।

দ্বিতীয় বালক—ভাই পণ্ডিত মশায় এলে ভালো হ'তো, সবাইকে কাঁদিয়ে দিতো।

ঠাকুর—টু—এই তো আমি। (অন্তরাল হ'তে)

জ—কই ঠাকুর তুমি? ঐ দেখ্‌ নূপুর শুন্‌ছিস্‌ ঐ দিকে চ'ল্‌ চ'ল্‌ ধরি

(কিছুদূর গিয়া পড়িয়া গেল।)

(ঠাকুরের প্রবেশ)

ঠাকুর—ওঠ ভাই ওঠ বড় লেগেছে না? আহা দেখি দেখি?

জ—না ঠাকুর আর তোমায় দেখ্‌তে হবে না, তুমি খালি কাঁদাও। আমি কত বলে এদের আনলুম, তোমায় দেখাতে, আর তুমি পালিয়ে বেড়াচ্ছ কোথায় লুকিয়ে ছিলে বলতো'

ঠাকুর—কেন তোরা তো লুকোচুরি খেলতে এসেছিলি, কই? আমার সঙ্গে পারলি?

জ—তোমার সঙ্গে কি আমরা পারি? আর লুকোচুরি খেল্‌বো না। আমরা একটা গান করি। ঠাকুর তুমি বাঁশী বাজাও, আমরা তোমায় ঘিরে ঘিরে নাচবো। আয় ভাই নাচি—

গীত

রামকৃষ্ণ বনের আমরা ছোট বুলবুলি
নামের মধু খেয়ে মোরা
কাটাই মোদের দিনগুলি॥
এই বনেতে বেতস বাঁশী
মোদের তালে
দেয় যে তাল
নামের নেশায় বিভোর হয়ে
কাটাই মোরা সাঁঝ সকাল॥

ডানার হাওয়ায় ফুটে ওঠে
অফুট আলোর ফুলগুলি
প্রজাপতি রাঙায় সে নাম
ধরে অচিন রং তুলি ॥
ভ্রমর সেথায় গুনগুনিয়ে
দেয় যে সুরের অঞ্জলি
দিনের শেষে তারি পায়ে
ঢালি মোদের ভুলগুলি ॥

৬ষ্ঠ দৃশ্য

পাঠশালা

জ—ও ভাই আয়, এখনো পণ্ডিত মশায় আসেননি, আয় আমরা সকলে গান করি। ভাই ঠাকুরকে ডাক্‌তে আমার বড় ভাল লাগে। আয় আমরা নেচে নেচে গান কারি। জানিস্‌ ভাই মা বলেন ঠাকুর আমাদের বড় ভালবাসেন। আমরা তাঁকে ডাক্‌লে তিনি না এসে থাক্‌তে পারেন না।

১ম বালক—ভাই ঠাকুরকে তুই রোজ দেখিস্‌?

জ—হ্যাঁ ভাই আমি তাঁর সঙ্গে রোজই খেলা করি, গান করি, আমার শ্যামল ঠাকুর বড়ো ভালো ভাই, আমায় বড় ভালবাসে। তোরাও গান কর্‌, দেখ না, তিনি নেচে নেচে আসবেন। রোজ পাঠশালায় আসবার সময় আমি মধুসূদন দাদার সঙ্গে কত খেলা করি, গান করি, নাচি। আমার ঠাকুর কত সুন্দর।

গীত

ফুল করে নাও চরণ তলে
বুক ভরেছি নয়ন জলে ॥
দীন আমার আয়োজন
কি-বা দিব পূজার ছলে ॥
শূন্য আমার বাহুর মুঠী
মালার মত পড়বে লুটি
নয়ন প্রদীপ আছে ফুটি
আমার জীবন দেউল তলে।

শ্যামল তোমার চরণ লুটে
এই ধরণীর আঁধার টুটে
তাই তো ধরা এত মিঠে
ফুটে আছে শতদলে ॥
(পণ্ডিত মশায়ের প্রবেশ।)

পণ্ডিত মশায়—চুপ্ চুপ্ মেরে হাড় ভেঙ্গে দেবো—এই এই দেখেছিস্ বেত! সব জলবিছুটী দেব, যত সব অনড্বান্ জুটেছে, অকাল কুষ্মাণ্ড। নে সব বস্, বই বার কর্ দেখি। এই জটিল! বসে বসে কি ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে আছিস্? মাইনে এনেছিস্?

জ—(ভয়ে ভয়ে) না পণ্ডিত মশায়। মা দেয়নি!

পণ্ডিত—আরে অনড্বান্। মা দেয়নি, শুনবো না, পিঠের ছাল তুল্‌বো, আয়!

জ—(ভয়ে ভয়ে) কাল ঠিক্ আন্‌বো, পণ্ডিত মশায়। মা দিতে পারে না, মা যে বড় গরীব।

পণ্ডিত—দেখ্, ভাল কথা মনে পড়েছে কাল আমার পিতৃশ্রাদ্ধ, তোরা সব আস্‌বি। কে কি আন্‌তে পারবি বল্ দেখি?

১ম ছাত্র—আমি চাল দেব পণ্ডিত মশায়।

২য় ছাত্র—আমি আলু আনবো।

৩য় ছাত্র—আমাদের ঘরে দুধ আছে, আমি মা'র কাছে চেয়ে দুধ আন্‌বো।

৪র্থ ছাত্র—আমাদের ঘরে একটা লাউ আছে, আমি আন্‌বো পণ্ডিত মশায়।

পণ্ডিত—জটিল! তুই কিছু বল্‌ছিস্ না যে? কি আন্‌বি? তোকে দই আন্‌তে হবে—বেশী ক'রে আনিস্।

জ—আমি মা'কে বল্‌বো পণ্ডিত মশায়।

পণ্ডিত—আচ্ছা যা সব আজকে। কাল কিন্তু ঠিক সকাল বেলা আস্‌বি, সব জিনিষ ঠিক্ ঠিক্ আন্‌বি, বেশী বেশী ক'রে আন্‌বি, না হ'লে এই বেত দেখেছিস্? (টিকি নাচাইতে নাচাইতে প্রস্থান)।

৭ম দৃশ্য

জটিলদের বাড়ী।

জ—মা মা কোথায় আছিস্ গো শুনে যা—

মা—কি বাবা? কি হয়েছে?

জ—পণ্ডিত মশায় আমায় বকেছেন, বলেছেন, কাল তাঁর পিতৃশ্রাদ্ধ। আমায় দই নিয়ে যেতে হবে, খুব বেশী করে।

মা—বাবা আমরা তো বড় গরীব দই কোথায় পাবো, (চিন্তা করিয়া) তবে তুই এক কাজ করিস্ বাবা। তোর দাদাকে বল্‌বি, পণ্ডিত মশায়ের কথা, তিনি আমাদের বড় ভালবাসেন।

জ—মা, আমাদের শ্যামল ঠাকুর বড় ভালো। আমার সঙ্গে কত খেলা করে, গান করে।

মা—(স্বগতঃ) ছেলেমানুষ। যাই হোক্ ভুলে থাকুক, ঠাকুর দয়া করে বাঁচিয়ে রাখো, চরণে রেখো। (প্রকাশ্যে) বাব কাল তোমার মধুসূদন দাদার কাছে দই চেয়ে নিও।

জ—আচ্ছা মা? আমায় খেতে দে, এখন বড় খিদে পেয়েছে।

মা—আয় বাবা আয়। (প্রস্থান)

৮ম দৃশ্য

বনস্থলী

(জটিলের গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

গীত

রূপ ঢেকে কি এলে হরি, রামকৃষ্ণ রূপ ধরি।
একি ঢল ঢল রূপের লীলা, মরি গো মরি।
আমার দুখ দেখে কি বুক ভরেছ,
মলিন হ'তে তাই চেয়েছ,
ঐ অরূপ রূপ লহরী, ঢাকা যায় কি হে হরি।
শত চাঁদের সোহাগ নিঙরে ধরে,
তোমায় কে গ'ড়েছে এমন ক'রে।
তোমায় কে এনেছে ধরার ধুলায়,
ভুলায়ে এমন করি ॥

ঠাকুর ! ঠাকুর ! এখনও আস্ছোনা কেন ? ও ঠাকুর। ঠাকুর। আমার যে বড় কান্না পাচ্ছে, আর দেরী কোরোনা, দেখ ! কত দেরী হয়ে যাচ্ছে।

ঠাকুর—এই যে ভাই আমি এসেছি, এই নে ফলটি খা, ভাই দেখ্ কেমন মিষ্টি। আহা মুখ শুকিয়ে গেছে, আয় এই ছায়ায় একটু বসি। আমি একটু হাওয়া করি।

জ—না ভাই আজ বসবো না, পণ্ডিত মশায় মেরে ফেলবেন। আচ্ছা ঠাকুর, তুমি এত সুন্দর দেখ্তে কেমন ক'রে হ'লে ? আমার সারাদিন তোমার কথাই মনে হয়, আর কান্না পায়। বল ঠাকুর তোমার আমায় মনে পড়ে ? আমি সারা দিন রাত যদি তোমার কাছে থাকতে পাই তো কাউকে চাই না, কাউকেও চাই না। ঠাকুর, তুমি রোজ আমায় খাওয়াও, আমি একদিন তোমায় খাওয়াব, খাবে তো ? আমরা কিন্তু বড় গরীব, কি দেব তোমায় ?

ঠাকুর—আমায় তোমার কিছু খাওয়াতে হবে না। ভাই, আমি যে তোমার দাদা হই। আমি তোকে রোজ খাইয়ে যাব। আয় আমার বুকের কাছে আয়। বড় ঘেমে উঠেছিস্ ? একটু হাওয়া করি কেমন ?

জ—না ঠাকুর, তুমি চুপ ক'রে বসে থাক আমি দেখি। ঠাকুর, এই বনে কোথায় থাকো ? হঁ্যা ভাই তোমার কে আছে ?

ঠাকুর—আমার অনেক ছেলে, মেয়ে, ভাই, বোন আছে, এই তোমার মত।

জ—তুমি তাদের সঙ্গেও খেল ?

ঠাকুর—তা না হ লে তারা রাগ ক'রবে যে !

জ—তবে ঠাকুর তোমায় আমি চাই না, তোমার এত লোক আছে ! তুমি তাদের সঙ্গেই খেল, আড়ি ভাই তোমার সঙ্গে।

ঠাকুর—না ভাই রাগ ক'রিসনি, আমি তোর সঙ্গেও খেলব, তাদের সঙ্গেও খেলব। রাগ ক'রতে নেই। সবাই তো আমার আপনার।

জ—যাও ! আমি চল্লাম, (কিছু দূর গিয়া) না তোমার উপর রাগ ক'রলে আমি মরে যাব। (কান্না)

ঠাকুর—জটিল, লক্ষ্মী ভাই, কেঁদনা। আমি তো তোমারই। এখানে তো আর কেউ নেই।

জ—তুমি আমার একার ঠাকুর। তুমি আমার একলার ঠাকুর, আমি তোমার একার।

ঠাকুর—জটিল, আজ তোদের পাঠশালায় কি হবে ভাই।

জ—ওই যাঃ, ভুলেই গিয়েছিলাম (একটু ইতস্ততঃ করিয়া) দাদা! আজ একটা কথা মা বলেছে তোমায় বল্‌তে। পণ্ডিত মশায় বলেছেন আজ তাঁর দই চাই, আমায় দিতে হবে, তাঁর বাবার ছাদ্দ কি না তাই। মা তো বড় গরীব, তুমি দাও, না হ'লে পণ্ডিত মশায় আমায় মেরে ফেলবেন।

(মুখ ঢাকিল)

ঠাকুর—আচ্ছা তার আর ভাবনা কি? আগে বল্‌তে হয় ভাইটি, আচ্ছা বসো, আমি আস্‌ছি।

(নূপুরের শব্দ করিতে করিতে প্রস্থান)

জটিল গাহিতেছে

গীত

ঠুমক্ ঠুমক্ চলে গোঠ গোপাল
পঞ্চ বটকে আনন্দ গোপাল।
চাঁদকে চৈনা নৈনাকে কোণা
অমৃত ছলকত হসকে টোনা
ধরতী ন ধরে চরণকে তাল ।।
জামন মেঁ আয়ে আসমানকে তারে
মিঠি হুয়ে মিট্টিকে প্যারে
ছাতিপে ধরতে ফিরদৌসীকে লাল ।।

ঠাকুর—এই এসেছি, এই নাও, এই দইএর ভাঁড় তোমার পণ্ডিত মশায়কে দিও।

জ—(দই লইয়া) তবে আমি আবার কাল এমনি সময় আসবো, থেকো কিন্তু, বল থাকবে?

ঠাকুর—হ্যাঁ গো থাক্‌বো।

জ—তবে যাই (কিছুদূর গিয়া) ঠাকুর তুমি একটা গান কর, আমি শুন্‌তে শুন্‌তে যাই।

ঠাকুর গাহিতেছেন

গীত

আমি বিকাশি মাধুরী জীবনে,
আমি বিকাশি মাধুরী মরনে
বিকশিত করি জীবন পদ্ম
হৃদয়ে হৃদয় হরণে।
ফুটি শতদলে ব্যথার অতলে,
আলো ছায়া দোলা,
মাধুরী রচিব নয়নে।

৯ম দৃশ্য

পাঠশালা

ছাত্ররা সব দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছে, জটিল ও ছেলেরা গান গাহিতেছে।

গীত

দাও দেখা দাও, কও কথা কও,
প্রাণের ঠাকুর কেন রও দূরে রও।
ব্যথার বেশে দাঁড়াবে এসে,
তাই তো ব্যথায় রই গো বসে,
বুকের আসন রেখেছি পেতে,
লও, তুলে লও, লও তুলে লও।
দুখের ঠাকুর বুকের ঠাকুর
গোপন প্রাণে নহ যে দূর।
বাঁশীতে ডেকে, হাসিটি এঁকে
সাথের সাথী হও ওগো হও॥

পণ্ডিত মশায়—এই অনড্বান রা। এত দেরী কেন করেছিস ? আমার পিতৃদায়, আর তোরা মজা ক'রে বেড়াচ্ছিস্ (বেত আস্ফালন) নিয়ে আয় দেখি কে কি এনেছিস্।

১ম বালক—পণ্ডিত মশায় ! আমি এক কাঠা চাল এনেছি।

পণ্ডিত—বেশ্ বেশ্ ঐ ঘরে রাখ্ গিয়ে। ওরে জটিল ! তুই কি এনেছিস্, দেখি ?

জটিল—(দই ভাণ্ড লইয়া) এই দই এনেছি।

১০ম দৃশ্য

জটিলের গীত গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

"দাও দেখা দাও কও কথা কও"

জ—এই বনে, এইখানে আমার ঠাকুর থাকেন। আপনি ডাকুন, আমিও ডাকি, তিনি রুণু রুণু ক'রে এখুনি দেখা দেবেন।

পণ্ডিত—বেশ। ডাকি, দেখি তোর ঠাকুর কেমন। ওগো তুমি এসো দেখি, তুমি কে বট হে? আস্‌ছে কই? আমার সঙ্গে ঠাট্টা কর'ছিস্—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেবো।

জ—পণ্ডিত মশায়! আমি তো রোজ এই জায়গায় এই সময় ঠাকুরকে দেখতে পাই। সে আমায় নিয়ে খেলা করে, আমায় ফল খেতে দেয়, কত কথা বলে, খেলা হয়। তবে কেন আজ দেখ্‌ছি না? বোধহয় আপনাকে দেখে ভয় পেয়েছে, এস ঠাকুর এস! পণ্ডিত মশায়কে দেখা দাও, নইলে আজ আমায় মেরে ফেলবেন। এস ঠাকুর, তুমি নিজেই বলেছ, ডাকলেই আসবে। (একটু পরে) ওই যে শুনতে পাচ্ছেন? নূপুরের রুণু রুনু শুনতে পাচ্ছেন, ঐ ঐ বুঝি সে আসছে। তার গায়ের গন্ধ পাচ্ছেন না?

পণ্ডিত—কই বাবা জটিল। কিছুই তো পাচ্ছি না।

জ—এস ঠাকুর। এস—এস। আর দেরী করো না, কেন আমায় ঠকালে? গরীবের ঠাকুর তুমি, কেন আস্‌বে বলে আজ আস্‌ছো না। (এদিক, ওদিক তাকাইয়া,কই কোথাও তো নেই? এখনও কি তোমার দয়া হ'লো না? বেশ! আমি তবে ঐ পুকুরের, জলে, ডুববো। তুমি বড় ব্যথা দাও। ঠাকুর, কত ব্যথায় তোমায় পাওয়া, আরো ব্যথা ভুলে যাওয়া ...ব্যথাহারী ঠাকুর তুমি—শুনেছি মায়ের কাছে, তবে কেন আমায় ঠকালে? (ক্রন্দন রত) তবে যাই পুকুরের জলে আজ নিজেই ডুবে মরবো। তোমার বেশ ভাল লাগবে। রোজ রোজ আসতে যদি ব্যথা পাও, তবে আর এস না, আমি তো প্রাণ রাখবো না—(জলে ঝাঁপ দিতে উদ্যত)

দৈববাণী—ভাই, পণ্ডিত মশায়ের এখনও আমার দেখা পাবার সময় হয় নি। সে তা তোমার মত নয়। সে এখন কাঁদুক, এরপর আমার দেখা পাবে।

পণ্ডিত—(ব্যাকুল হইয়া ধরিতে যাইতেছেন, ঠাকুরও আগে আগে চলিয়াছেন, নূপুরের শব্দ করিতে করিতে) এই তো শুন্‌ছি ঐ দিকে, না এদিকে,

পণ্ডিত—(ক্রোধে) আরে অনড্বান্ ! আজ তোর একদিন কি আমার একদিন। এক সরা দই এনেছিস্ কি করতে ? এত লোক খাবে। দাঁড়াতো তোকে দেখাচ্ছি—দূর তোর দই।

(জটিলের ক্রন্দন, ভাঁড়টা পড়িয়া গেল। হঠাৎ দইএর ভাঁড় তুলিয়া পণ্ডিত মশায় হতবুদ্ধি)

পণ্ডিত—একি ! দই যে ভরাট হ'য়ে র'য়েছে, না দেখি আবার ঢেলে ফেলে দেখি, ভরাট থাকে কিনা ? (ঢালিয়া দেখিয়া) নাঃ—এ যে দেখছি অফুরন্ত ভাণ্ডার, একি অক্ষয় ভাণ্ডার ? (জটিলের প্রতি) হ্যাঁ রে এ দই কোথায় পেলি বল ?

জ—আমার দাদা দিয়েছে।

পণ্ডিত—কে সে ?

জ—আমার দাদা ! ঐ গহিন বনে থাকে, মাথায় তার সাতশো তারার মালা, লায় বনমালা, পায়ে তার বাজে নূপুরের বোল।

পণ্ডিত—মেরে হাড় গুঁড়িয়ে দেব, তুই এ জিনিষ কোথায় পেলি বল ?

জ—আমার দাদা দিয়েছে। আমরা বড় গরীব তাই মা বলে দিয়েছিল দাদাকে বল্‌তে। সে যে বড় দয়াল ঠাকুর, সেই তো দিল, আমায় নিজের হাতে।

পণ্ডিত—কে সে ঠাকুর বল্ ?

জ—সেই সুন্দর ছেলেটি। সেই তো আমার ঠাকুর। রোজ আমায় সঙ্গে করে বনটি পার ক'রে দেয়। ফল খাওয়ায়, তাকে আপনি দেখেন নি ? হাতে বাঁশী, হাসি ঢালা দুটি বাঁকা চোখ, বাঁকা শিথিল মুকুট। কেমন সুন্দর নবীন নীলমোহন ? তাঁকে কখনও দেখেন নি !

পণ্ডিত—না তো, সেদিকে আমার চোখ পড়েনি। সে থাকে কোথায় ? কোথাকার পড়ুয়া ?

জ—ভাল ক'রে দেখেছি, ঐ গহন বনে দাদা থাকে।

পণ্ডিত—গহন বনে ? দেখাতে পারবি ? নইলে মেরে ফেল্‌বো। চল্ দেখাবি ?

(সকলের প্রস্থান)

উহু ঐ দিকে (শেষে বসিয়া পড়িলেন ও ক্রন্দন) আমার কপাল অতি মন্দ। ঠাকুর, যদি জানালে তবে কেন তোমার ভুবনমোহন রূপে একবার দাঁড়ালে না। কেন দেখা দিলে না? জটিল ধন্য তুই। ধন্য তোর মা, তুই যাকে দাদা বলিস্, সে স্বয়ং ভগবান। তুই তোর ঠাকুরকে দেখা বাবা? আমি গুরু হয়ে তোর পায়ে ধরছি। (জটিলের পায়ে পড়িল)

জ—একি পণ্ডিত মশায়। পায়ে ধরছেন কেন? দাদাকে ভগবান বলছেন কেন? সে যে আমার দাদা। আমায় বড ভালবাসে। আপনি বড় মারেন কিনা, তাই দাদাকে দেখ্‌তে পেলেন না। সে যে বড় ভালো. তাকে দেখলে আর ভোলা যায় না। সে যে ব্যথাহারী।

পণ্ডিত—তোরা সবাই ঠাকুরকে ডাক, তোদের ডাকে তিনি না এসে পারবেন না, আমার ভাগ্যে যদি সেই প্রেমের ঠাকুরকে দেখা ঘটে, তবে সে তোদের ডাকাতেই হবে। ডাক ডাক, নেচে নেচে ডাক, আমিও ডাকি। (পণ্ডিত মশায় চুপ করিয়া বসিলেন।)

জ—পণ্ডিত মশায়। আপনি চোখ বুজে ঠাকুরকে ডাকুন, দেখতে পাবেন। আয় ভাই, আমরা ঠাকুরকে নেচে নেচে ডাকি—সে যে আমাদের প্রাণের ঠাকুর, শ্যামল ঠাকুর. বড় আপনার ঠাকুর।

(সকলে গান গাহিতে লাগিল)

গীত

ম্যয় হরিকে গীত গাউঙ্গী
মন বৃন্দাবন যাউঙ্গী।
নয়া জমানা নৈ বহার
প্রেম যমুনা বহে দু'ধার
যব হরিকে নাচ নাচুঙ্গী।
চাঁদকী রাত আওয়ে
যব হরিকে সাথ পাওয়ে
প্রেমী জন সে তনমন ছাউঙ্গী।
মন মন্দরকে দ্বার
সাজে সোলহ সিঙ্গার
জীবনকে গুলজার মে
নামকে কাছনী কাছুঙ্গী॥

(ঠাকুরের প্রকাশ)

সমাপ্ত

তুলসীদাস

প্রথম দৃশ্য

সময়—গভীর রাত্রি

স্থান—তুলসী দাসের আশ্রম

['সীতা-রাম' বিগ্রহ রহিয়াছেন]।

[তুলসীদাস জপমালা হস্তে বসিয়া ভজন করিতেছেন
প্রদীপ জ্বলিতেছে। পূজার উপকরণ রহিয়াছে।]

ভজন

তুলসী—

তু দয়াল দীন হোঁ, তু দানি, হোঁ ভিখারী।
হোঁ প্রসিদ্ধ পাতকী ; তু পাপপুঞ্জহারী॥
নাথ তু অনাথকো, অনাথ কৌন মো-সো।
মো সমান আরত নহি, আরতি হর তো-সো॥
তোহি মোহি নাতে অনেক, মানিয়ে জো ভাবৈ
জ্যোঁ ত্যোঁ তুলসী কৃপালু চরণ সরণ পাবৈ॥

তুলসী—প্রভুজী! আর কতদিন দাসকে ভুলে থাকবে : দিনের পর দিন চলে যাচ্ছে তবু ঠাকুরজীর দর্শন আর হ'ল না। যুগে যুগে ভক্তকে কষ্ট দেওয়াই, তোমার কাজ। রাম অবতারে বাপ, মা, কেঁদে কেঁদে মরেছে। কৃষ্ণ অবতারে শ্রীমতীকে কাঁদিয়েছ, হে নিষ্ঠুর, তখন আমাদের মত অভাগাদের আর উপায় কি! (তন্দ্রানত হইয়া) নাঃ—রাত্রে যে একটু বেশী জপ ক'রবো, তারও উপায় নেই, মোহকরী নিদ্রার কি প্রভাব! যাই কিছুক্ষণ বিশ্রাম করি। প্রত্যূষে আবার উঠতে হবে। জয় সীতাপতি সুন্দর। (প্রণাম) সীতারাম—সীতারাম—জয় জয় সীতারাম।

[চোরের প্রবেশ]

চোর—ঠাকুরজী তো সরেছে দেখছি। যাই একবার দেখি। বাবাজীর আস্তানায় বড় বড় লোক আসে, এবার মারি তো হাতী, লুটি তো ভাণ্ডার।

(দূরে ধনুর্ধারী শ্রীরামের প্রবেশ)

আরে বাপ, ও আবার কে। আরে, তীর উঁচিয়ে আসে যে! সরে পড়ি বাবা। (কিছু পরে আবার আসিয়া) আরে ঠাকুরজী তো বড় ওস্তাদ ছোকরাকে পাহারায় রেখেছে। আরে, আবার আসে যে। এইবার সেরেছে। (পলায়ন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

সময়—**সকাল বেলা**

স্থান—**তুলসী দাসের আশ্রম**

[তুলসীদাস জপমালা হস্তে মন্দির চত্বরে বসিয়া আছেন। চোর এদিক ওদিক চাহিতে চাহিতে ভয়ে ভয়ে প্রবেশ করিল।]

চোর—[এদিক ওদিক ভাল ক'রে দেখে] কই সে মূর্ত্তিকে তো দেখতে পাচ্ছি না [আবার দেখিয়া] গাটা ছম ছম ক'রছে। কাল যা দেখেছি তাতে বিশ্বাস নেই। ওঃ। চোখ দুটো যেন ভাঁটা। এই মারে তো সেই মারে। বোধহয় সারারাত জেগে এখন লম্বা হয়েছেন। [এগিয়ে গিয়ে] দণ্ডবৎ বাবা!

তুলসী—এই যে বাবা এস, (কিছুক্ষণ মালা ঘুরাইয়া) এমন শুকনো শুকনো দেখচি কেন,—কি হয়েছে।

চোর—[স্বগতঃ] এইরে সব ফাঁস করেছে ;—না বাবা, গরীব মানুষ ভয়ে ভয়ে থাকি—

তুলসী—[প্রসাদ বাহির করিয়া] এই নাও প্রসাদ নাও। খেয়ে ঐ পুকুরে হাত মুখ ধুয়ে একটু বিশ্রাম কর।

চোর—[পুকুর হইতে ফিরিয়া] বাবা, বাবা—আপনার কাছে এলে জীউ ঠাণ্ডা হয়। আহা কি ঠাকুরবাড়ী। তবে—

তুলসী—তবে কি—

চোর—এ-না—কিছু না—তবে কিনা --

তুলসী—আমার কাছে ভয় কি —?

চোর—এই এই আপনার।

তুলসী—কি আমার—

চোর—এই বল্‌ছি যে আপনার ঐ পাহারাদার—

তুলসী—সে কি! এখানে তো কেউ থাকে না আমি ছাড়া!

চোর—সে কি বাবা! তিনি বেশ ভাল লোক। সারারাত কেমন হুঁশিয়ার হয়ে পাহারা দেয়

তুলসী—সে কি! কে পাহারা দেয়—? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। সে দেখতে কেমন?

চোর—বেশ জোয়ান ছোকরা—চিকন তার গায়ের রঙ—হাতে ইয়া ধনুক—জবর পাহারাদার বাবা তোমার।

তুলসী তুমি কখন দেখলে—সব আমায় বল।

চোর (চুপ করিয়া রহিল)

তুলসী—বল, কোন ভয় নেই।

চোর—বাবা। আমি আপনার সন্তান।

তুলসী—ভয় নেই, বল কাকে দেখেছো ?

চোর—(দণ্ডবৎ করিয়া) বাবা রাত্রে এই—এই কাল রাত্রে এই গাঁজার পয়সা--

তুলসী—নির্ভয়ে বল।

চোর—এই গাঁজার পয়সা কম পড়ায় আপনার সন্ধানে এসেছিলুম। রাত তখন দোপর। এসে দেখি, এক ছোকরা তীর ধনুক নিয়ে পাহারা দিচ্ছে।

তুলসী - কি রকম দেখতে…? বল……বল ‥ ‥শীঘ্র বল……

চোর—কালো রঙ কিন্তু রূপ যেন ঠিকরে পড়ছে। মাথায় একটা কি পরেছে যেন, আগুনের মত জ্বলছে।

তুলসী—(জোড় হাতে) কে তুমি—?

চোর - (ভয়ে) আমি এক অধম চোর।

তুলসী—(নমস্কার করিয়া) না—না, তুমি আমার চোখ ফুটিয়ে দিয়েছো। হে ভাগ্যবান, কাল যাকে দেখেছো সে আর কেউ নয়—সে আমার স্বয়ং রামজী‥ …

চোর—সে কি !

তুলসী—হায় প্রভু ! আমি কি মূঢ় ! অর্থ অনর্থ জেনেও, সে সব সঞ্চয় করে শ্রীঠাকুরের বিশ্রামের বিঘ্ন উৎপাদন করেছি।

(চোরকে) হে সুভগ। আপনি একটু অপেক্ষা করুন, আমার সমস্ত আপনাকে দিচ্ছি।

চোর—(স্বগতঃ) এ কি। যাকে যোগী ঋষিরা সারা জীবন খুঁজে পায় না, আর তাকেই আমি চুরি করতে এসে দেখতে পেয়েছি ! আর ভুলিসনে মন, এবার বড় চুরি করতে হবে, এমন চুরি করবো যেন আর কখন চুরি করতে না হয়। (প্রকাশ্যে)—প্রভু ! এসব আপনারই খেলা। অধমকে দয়া করুন। (পদ ধারণ)

তুলসী—বৎস। স্বয়ং রামজী যাকে কৃপা করেছেন তার আর কি কিছু বাকী আছে! তোমার কর্ম্ম শেষ হয়েছে। এস, সেই হৃদয় চোরার আশ্রয় গ্রহণ করবে।

ভজন

রাতমে মোরি ধনুক ধারী
জাগত সকল যাম
দিন ভর ওহি সুতল রহি
গোপন সোহি রাম ॥
চোর নিশাচর হোয়ত গোচর
যো যায় পিছে উস্‌সে না পুছে
হোয় মুঝে বাম
হো হো মোরি রাম ॥
নিপট নিঠুর শাঁওর সুন্দর
তুলসী রোয়ত হোয়ত গোচর
প্রকট নলীন ঠাম ॥

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—অযোধ্যার বহির্ভাগ

(বৃক্ষের পাদদেশ। তুলসী দাস একটি বৃক্ষে জল ঢালিতেছেন, এমন সময় একটি প্রেতাত্মার আবির্ভাব।)

ভজন

তুলসী—

হরিকে হিম্মৎ করলে ঔর
রামকৃষ্ণকে নাম
জগৎ হাটমে করলে সৌদে
জ্যাদা করনা কাম ॥
খিলাড়ি খেলজা এহি খেল
ঔর করনী ভরনী মরনেকো শেল
তুম জৈসা রাম পর
তুমপর বৈসা রাম।

অন্ধা না মানো উজিয়ারা
রাহ ন জানো চলো মাতোয়ারা
যো চলনা হো শান
তো হোশমে রাখনা রাম ॥

(প্রেতাত্মার আবির্ভাব)

তুলসী—সচকিতে একি ? কে আপনি ?

প্রেত—জোড়হাতে প্রভু, আমি এই বৃক্ষের আশ্রয়কারী প্রেত।

তুলসী—কেন আপনি প্রেতদেহ ধারণ করেছেন ?

প্রেত—প্রভু, পূর্ব্ব দেহে অনেক অনাচার, অত্যাচার করেছি, পরের অর্থ আত্মসাৎ করেছি। সেই সকলের ফলে যন্ত্রণাময় এই প্রেতদেহ হয়েছিল। কিন্তু আজ মহাত্মা তুলসীদাসের পূত বারিস্পর্শে আমার মুক্তি হয়েছে। এখন দাসকে আদেশ করুন যদি কিছু আমার দ্বারা সম্ভব হয়, দাস প্রস্তুত রয়েছে।

তুলসী—আমার রামজী ছাড়া তো অন্য কামনা নেই। যদি তাঁকে পাবার উপায় বলতে পারো তবে আমি তোমার দাস হয়ে থাকবো।

প্রেত—প্রভু, শ্রীরামচন্দ্রের খবর তো আমি দিতে অক্ষম। তবে অযোধ্যায় যে স্থানে রোজ শ্রীমদ্ ভাগবত পাঠ হয়, সেখানে একবার যাবেন। রোজ পাঠ শেষ হলে একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে সকলের শেষে আসতে দেখবেন। তিনি আর কেউ নন, স্বয়ং হনুমানজী। তাঁর পা জড়িয়ে ধরবেন, তিনিই উপায় বলবেন।

তুলসী—ধন্য আমি। আমি আজই যাত্রা করবো।

প্রেত—প্রভু। তবে আমি বিদায় হই। (প্রণাম)

চতুর্থ দৃশ্য

(তুলসীদাস ভজন করিতেছেন এমন সময় এক বৃদ্ধের প্রবেশ)

ভজন

তুলসী—

মৈ হরি পতিত পাবন সুনে
মৈ পতিত, তুম পতিত পাবন
দৌ বানক বনে ॥

জানি নাম অজানি লীন্হেঁ, নরক জমপুর মনে
দাস তুলসী সরণ আয়ো রাখিয়ে অপনে ।।

তুলসী—প্রভু, দাসকে কৃপা করুন। (দণ্ডবৎ প্রণাম)

বৃদ্ধ—কে তুমি !

তুলসী—কৃপাপ্রার্থী কোন ব্রাহ্মণ।

বৃদ্ধ—কি চাই বৎস। আমি একজন দীন বিপ্র, আমি কি করতে পারি ?

তুলসী—প্রভু, আপনি ভক্তরাজ মহাবীর। কেমন করে রামচন্দ্রকে পাবো দয়া ক'রে বলে দিন।

বৃদ্ধ—আমি কি করে জানবো বল ? দেখছো তো আমি সামান্য একজন ব্রাহ্মণ।

তুলসী—না প্রভু। না বললে ছাড়বো না। (পদ ধারণ)

বৃদ্ধ—বৎস তুলসী। হয়েছে হয়েছে ছাড়ো। রামজী তোমার মতন ভক্তকে ছেড়ে থাকতে নিজেই কষ্ট পাচ্ছেন। অচিরে তাঁর দর্শন পাবে। তবে একটু সাবধানে থেকো। সে বড় মায়াধারী।

তুলসী—প্রভু ! আপনার শ্রীমুখে আশার কথা শুনে নবজীবন পেলাম। কোথায় কি ভাবে দর্শন পাবো শুনলে দাস কৃতার্থ হত।

বৃদ্ধ—বৎস। সেকথা এখন বলতে পারবো না। যা হোক এখন আমায় যেতে দাও। (তুলসী প্রণত হইল)। বৎস ! রামের মহিমা প্রচার তোমার সফল হোক।

(তুলসী ভজন করিতে লাগিলেন)

ভজন

দুখ হর রামকৃষ্ণ
পুকারি তেরো নাম
দীন দয়াল, মৈ দীন দাস
বুলাও প্রভু তেরো পাস
পরদেস পর ভৈ উদাস
মিলাও রামকৃষ্ণ ধাম ।।
তুহুঁ পিতা মাতা তুঁহি
হমারি সব কুছ তেরো হমভি
ঘটখটমে প্রভু বিরাজকারী
প্রগটো মোহন ঠাম ।।

পঞ্চম দৃশ্য

(তুলসী ও ব্রাহ্মণের প্রবেশ)

তুলসী—বৎস, আমার কথা শোন,— একবার রাম নামেই তোমার সমস্ত পাপ খণ্ডন হয়েছে। রাম নামের মহিমায় অবিশ্বাস করো না।—

ব্রাহ্মণ-- প্রভু! আমি মহাপাপী। বিশ্বাস হচ্ছে না। যার তুষানলে প্রাণ ত্যাগ ব্যবস্থা সেখানে শুধু রাম নামে কি হবে?

তুলসী—বৎস! আমার কথায় বিশ্বাস করো। যাঁরা তোমার তুষানল ব্যবস্থা করেছেন, তাঁদের যেয়ে বলোগে যে, আমি নিষ্পাপ হয়েছি। তাঁরা যে প্রমাণ চাইবেন তুমি তাইতে স্বীকৃত হবে।

ব্রাহ্মণ—তবে তাই হোক। দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন।

[পরদৃশ্য]

জনৈক—তুমি নিষ্পাপ হয়েছো তার প্রমাণ দেবে। আচ্ছা যদি তোমার হাতের ফলমূল ঐ বিশ্বেশ্বরের প্রস্তর নির্ম্মিত ষণ্ড গ্রহণ করে তবেই জানবো তোমার কথা সত্য।

ব্রাহ্মণ—বেশ তাই হোক। হে বৃষরাজ, আমার প্রদত্ত বলি গ্রহণ করুন। (ফল প্রদান)

[বৃষ জীবিতবৎ গ্রহণ করিল]

সকলে—ধন্য রাম নামের মহিমা। ধন্য আমরা……আর ধন্য তুলসীদাস।

ভজন

কলি নাম কামতরু রামকো
দলন নিহার দারিদ দুকাল দুখ,
দোষ ঘোর ঘন ঘামকো ॥
নাম লেত দাহিনো হোত মন,
বাম বিধাতা বামকো
কহত মুনীস মহেস মহাতম,
উলটে শুধে নামকো
ভলো লোক পরলোক তাসু জাকো বল ললিত ললামকো
তুলসী জগ জানিয়ত নামতে সোচ ন কুচ মুকামকো ॥

ষষ্ঠদৃশ্য

স্থান—সরযূর-তীর

(তুলসীদাস চন্দন ঘষিতেছেন। পূজার উপকরণ সব সজ্জিত। এমন সময় দুইটি সুন্দর নবজলধরকায় বালকের প্রবেশ।)

তুলসী— ভজন

রামকৃষ্ণ রসিয়া
যো নহি হুয়া
সো ক্যা রে
রামকৃষ্ণ হুঁসিয়ার
রামকৃষ্ণ পিয়ার
রামকৃষ্ণ রাখোয়ার
যো নহি কিয়া
সো ক্যা রে ৷৷
রামকৃষ্ণ দুনিয়া
রামকৃষ্ণ দুখিয়া
যো নহি হুয়া
সো ক্যা রে ॥

১ম বালক—সাধু বাবা। আমাদের চন্দন পরিয়ে দাও না।

তুলসী—(মুখ তুলিয়া) কে এই সুঠাম বালক দুটি। (প্রকাশ্যে) আরে মেরে দুলার, এ যে রামজীর জন্যে ঘষ্‌ছি।

১ম বালক—না সাধুবাবা, রামজীকে তো রোজ তিলক দাও, আজ আমাদের পরিয়ে দাও। দেখনা কেমন সেজেছি।

তুলসী—বাবারা একটু থাম। আগে পূজো হোক।

১ম বালক - দেবে না, তবে আমরা চলে যাবো, আর আসবো না।

তুলসী—একটু বিরক্ত হইলেন। কাজেই রামের মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তাহাদের চিনিতে পারিলেন না। (স্বগতঃ) এ বালকের দৃষ্টি যখন পড়েছে তখন এ চন্দন ওদেরই দিয়ে দি। (প্রকাশ্যে) আচ্ছা—আও লালজি! বেশ ভাল করে চন্দন পরিয়ে দি। (স্বগতঃ) বাঃ কি নবজলধর শ্যাম—কে এ বালক দুটি? বোধ হয় বাবু কুঁমার সিংএর বাড়ীর ছেলে। প্রকাশ্যে বাবা তুমার বাড়ী কোথায়?

১ম বালক - বারে—তুমি আমায় চেন না ?—ঐ তো আমাদের বাড়ী।
তুলসী—বাবা, রোজ রোজ তুমি এসো।
১ম বালক— আমায় কি দেবে ? লাডডু দেবে বল ?
তুলসী - হ্যাঁ দেবো।
২য় বালক—খুব বড বড লাডডু দিতে হবে।—দুহাতে দুটো রামদানাকি লাডডু।
তুলসী—হ্যাঁ তাই দেবো।
১ম বালক—তা হ'লে তোমার ঠাকুর কি খাবে ?
তুলসী—সেও খাবে—তোমরাও প্রসাদ পাবে।
১ম বালক—না—আমি কারও প্রসাদ খাই না। আগে যদি আমায় দাও তবেই আসবো নইলে আড়ি। (গমনোন্তত)
তুলসী—এ লালজি ! শোন শোন ! উত্তর না পাইয়া একি গ্রহের ফের। হায় প্রভু। এস--এস। এসব মায়া মোহের হাত হতে রক্ষা কর। তোমার ভক্তের কথা মিথ্যা করো না।
•দৈববাণী—নেপথ্যে বৎস। আমায় তুমি চিনতে পারলে না—
তুলসী—একি !!
দৈববাণী—বৎস ভক্তরাজ মহাবীরের কথা স্মরণ কর। তোমার রাম নাম সিদ্ধ হয়েছে। আমি আর লছমন তোমার হাতে তিলক পরেছি। এখন আর আক্ষেপ করো না। সময়ে আবার আমার দেখা পাবে। আর তুমি আমার লীলামৃত রচনা কর। ত্রিতাপদগ্ধ লোক সেই অমৃত পান করে জীবন জুড়াবে। আজ হতে তুমি আমার চিহ্নিত ভক্ত।
তুলসী—ধন্য আমি। ধন্য আমার দোঁহাবলী। প্রভুজী ! দাস আজ হতে আপনার লীলামৃত প্রকাশ করবে।

(দণ্ডবৎ পতিত হইলেন ও পরে ভজন গাহিতে লাগিলেন)

ভজন

ঠুমকী চলত রামচন্দ্র বাজত পৈঁজনিয়া
তিলকী তিলকী উঠত ধায়
গিরত ভূমি লটপটায়
ধায়ী মাতু গোদ লেত দশরথকী রাণীয়া।।
অঞ্চল রজ অঙ্গঝারি বিবিধ ভাঁতি সো দুলারী
তনমনধন বারি বারি কহত মৃদু বচনিয়া।।
বিদ্রুমসে অরুণ অধর বোলত মুখ মধুর মধুর
সুভগ নাসিকামে চারু লটপট লটকনিয়া।।
তুলসী দাস অতি আনন্দ দেখত মুখারবিন্দ
রঘুবর ছবিকে সমান রঘুবর ছবি বনিয়া।।

সমাপ্ত

রবিন হুড

দৃশ্য :—রবিনহুডের প্রাসাদ

[চারিদিকে গোলমাল, শত্রুরা চারিদিকে ঘিরে ফেলেছে—দু'চারটে বন্দুকের আওয়াজ হ'চ্ছে। রবিন ও তার ভাই উইল ছুটে প্রসাদ থেকে বেরিয়ে এল।]

রবিন—চল্ ভাই পালাই, দেখছিস না, চারিদিকে শত্রুরা আমাদের ঘিরে ফেলেছে, বন্দুকের আওয়াজ হ'চ্ছে—ওঃ আমার যদি একটা বন্দুক থাকতো তা' হলে দেখতুম !

[ভাই এর হাত ধরে জঙ্গলের মধ্যে চলে গেলো]

দৃশ্য :—রবিনহুডের ভস্মীভূত প্রাসাদ

সময়—সন্ধ্যা [ভাইএর হাত ধরে রবিনের প্রবেশ]

রবিন—হায় হায় ! উইল দেখছিস—আমাদের বাড়ীটা সব পুড়িয়ে দিয়েছে, আমরা কেমন ক'রে থাকবো ?

উইল—(কাঁদ কাঁদ হ'য়ে) আমরা কোথায় থাকবো দাদা ?

রবিন—(আকাশের দিকে তাকিয়ে) ঐ আকাশ সাক্ষী, এর প্রতিশোধ আমাদের নিতে হবে। আর এখানে থাকা সম্ভব নয়, চল্ আমরা শেরউড জঙ্গলে চলে যাই—সেখানে আমি কতদিন শিকার ক'রে ফিরেছি।

[দুই ভাই শেরউড জঙ্গলে এল—শেখানে রবিনের আরও অনেক সঙ্গী]

রবিন—দেখ ভাই, এই জঙ্গল আমাদের রাজ্য। এই রাস্তা দিয়ে আমরা কোন বড়লোককে ছেড়ে দেবো না।—ওরা গরীবদের মারে, ওরা অত্যাচারী—নিজের সুখের জন্য টাকা জমায়। আমরা ওদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে গরীবদের দেবো—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা। ওপরে ওই বিরাট নীল আকাশের দিকে দেখো…কত বিরাট—কত উদার—কত পবিত্র। আমাদের চোখের দিকে তাকাও, দেখ সে চোখও আকাশের মত নীল—প্রতিজ্ঞা কর, সেও হবে অমনি আকাশের মত উদার—পবিত্র। সবাই তোমরা হাত তুলে বল—এই আমাদের প্রতিজ্ঞা—G.P.S. (হুইসেলের শব্দ করিল)।

সকলে—(হাত তুলে) G.P.S.—আমরা প্রতিজ্ঞা ক'রছি, আমরা হব দরিদ্রের বন্ধু, ধনীর শত্রু, আমরা হব পবিত্র, উদার—God. purity service এই হোক আমাদের war cry—G,P.S. [সকলের প্রস্থান]

লিট্‌ল্ জনের প্রবেশ :

লিট্‌ল্ জন—শুনছি একজন এক ছোকরা নাকি রাজা হয়েছে। সবাই

রাজা হ'লে প্রজা হবে কে? তার সঙ্গে একবার দেখা হ'লে দেখতাম, তার মুরদ কত –আমি একাই একশো।

রবিনের প্রবেশ:

রবিন – কে হে তুমি?

লিট্‌ল্‌—তুমি কে হে? রাস্তা ছাড়ো।

রবিন –হিম্মৎ থাকে তো ছাড়িয়ে নাও—এ রাজ্য আমার।

লিট্‌ল্‌—ও! তুমিই রবিনহুড।

(দুইজনে মল্লযুদ্ধ –লিট্‌ল্‌ জন রবিনহুডকে একধারে ছুঁড়ে দিলে—রবিন হুইস্‌ল বাজিয়ে দিল, অমনি সঙ্গীরা এসে লিট্‌ল্‌ জনকে রবিনের মত ছুঁড়ে দিলে)।

লিট্‌ল্‌—(উঠে দাঁড়িয়ে) দশজনে মিলে একজনকে ফেলে দেবে, সে আর কি বড় কথা - মুরদ থাকে তো একা এগিয়ে এস।

রবিন—দেখো, এক বনে দুই 'শের' থাকতে পারে না। তুমি কেন আমাদের দলে এসে যোগ দাওনা, তোমাকে আমি লেফ্‌ট্‌ন্যাণ্ট ক'রে দেবো।

লিট্‌ল্‌ মন্দ নয়, মিথ্যে মিথ্যে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ক'রে লাভ নাই। এস আমরা হাত মেলাই –শেরউড ফরেষ্টের আমরা দুই ভাই—ধর্মের নামে আমরা বড় লোকদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা ক'রলাম ...

দুজনে—G.P.S.!

সকলে—G.P.S.!

[সকলের শ্লোগান দিতে দিতে প্রস্থান]

বেশ সাজগোজ করা একটি যুবকের প্রবেশ, নাম - এ্যালেন-এ-ডেন।

এ্যালেন—আমার জীবনটা যে নষ্ট ক রলে সে বুড়োটাকে এক হাত দেখে নিতে হবে। আমার বিয়ে সব ঠিকঠাক –আর সে কিনা পাদ্রীকে ঘুঁস দিয়ে আমার বিয়েটা ভেস্তে দিলে। এই পিস্তল ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা ক'রছি—এক হাত দেখে নেবো সেই বুড়োকে।

[হুইসেলের শব্দ –রবিনের দলবলসহ প্রবেশ]

এ্যালেন—(পিস্তল উঁচিয়ে) কে তোমরা? সাবধান, যদি হিম্মৎ থেকে এস —আমার এই ঠাণ্ডা নল তোমাদের জন্য প্রস্তুত।

রবিন –কে তুমি! আমাদের এই ধারালো তীর আছে। কি চাও তুমি?

—জানো এই শেরউড জঙ্গল আমাদের রাজ্য, আর আমি তার রাজা। আমার নাম শুনেছ বোধ হয়, আমার ভয়ে কোন বড়লোকের এই বনপথ দিয়ে যাবার সাহস নাই—আমি ধনীদের জাহান্নাম।

এ্যালেন—(পিস্তল পকেটে রেখে) এসো ভাই—হাতে হাত মেলাচ্ছি। আমিও তোমার দলের, শোন আমার দুখের কথা—আমার জীবনটাকে নষ্ট ক'রে দিচ্ছে এক বড়লোক বুড়ো—আমি তাকে ধ্বংস না ক'রে বাঁচতে চাইনা, আমি তোমার সাহায্য চাই।

সকলে—হুররে রবিনহুডের জয় হোক। শেরউড জঙ্গলের জয় হোক G.P.S.

(হুইস্‌ল্ দিয়ে সকলের প্রস্থান)

দৃশ্য :—শেরউড জঙ্গলের পথ :

রবিন—এই বুড়ো, কি আছে বের কর্।

সকলে—এই বুড়ো তোর ঝুলিতে কি আছে বের কর, চালাকি ক'রে বুড়ো সাজা হ'য়েছে।

বুড়ো—না ববো, আমার কাছে কিছুই নাই। বুড়ো আস্রামকে (Osram) তোমার বাবাও চিনত, আমায় ছেড়ে দাও বাবা।

রবিন—দে বুড়োকে ছেড়ে দে. আর এই টাকাগুলো দিয়ে দে বুড়োকে। যা চলে যা, এই জঙ্গলের ভিতর যতক্ষণ আছিস কোন ভয় নাই। [বুড়ো চলে গেল. রবিনের দলও শ্লোগান দিতে দিতে চলে গেল। এক বৃদ্ধ বরবেশে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে চ'লছে—পিছনে মোরিয়াম।]

হঠাৎ হুইস্‌ল্ পড়ল—রবিনের দলের প্রবেশ—সঙ্গে এ্যালেন—সকলে বুড়োকে ঘিরে ফেলল—

রবিন—এই বুড়ো—কে তুই? কোথায় থাকিস? (বুড়ো ভয়ে প'ড়ে গেলো)।

এ্যালেন—এই সেই বুড়ো—যে আমার জীবনটাকে ব্যর্থ ক'রে দিতে দিতে বসেছে টাকার জোরে।

রবিন—(বুড়োর কলার ধ'রে উঠিয়ে)—এই বুড়ো, ঈশ্বরের নাম কোনদিন ক'রেছিস? না টাকার নাম ক'রেছিস। (তার ঘাড়ে হাত দিলে)।

বুড়ো—না বাবা. আমার কিছু নাই. আমি গরীব—আমি বিয়ে ক'রতে যাচ্ছি!

রবিন -এই ! সকলে এর যা আছে কেড়ে নিয়ে ঐ গাছে টাঙ্গিয়ে দে, আজ একটা বড় শিকার পাওয়া গেছে !

(রবিনের সঙ্গীরা বুড়োটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেলো. এ্যালেন হাততালি দিতে লাগলো)

রবিন - দেখো ভাই ! আজ তোমার পথ কণ্টকমুক্ত। কিন্তু তুমি আমার দল ছাড়তে পারবে না। বিয়ে-থা ক'রে এস—আমরা আমাদের বোনকে পাবো।

[হুইস্‌ল্‌ দিন সঙ্গীদের গান গাইতে গাইতে প্রবেশ]

গান :— শেরউডের জঙ্গী জোয়ান
টহল দিয়ে ফিরি—
ভয় ক'রি না আমরা কারেও
মৃত্যুরে লই ফিরি ॥ (শ্লোগান দিল) G.P.S.
রবিন মোদের রাজা
ইঁদুর ছুঁচোর মত
কালো বাজার নিই কাড়ি ॥ শ্লোগান দিল) G.P.S.
ফূর্ত্তি ভরা প্রাণ
জানিনে ভয়, মানিনে দুখ
নদী আর পাখীর মত
গানে কণ্ঠ ভরি ॥ (শ্লোগান দিল) G.P.S

রবিন—(যুবকের প্রতি) যাও ভাই—আবার আমাদের বোনটিকে নিয়ে আসবে, সে আমাদের সঙ্গেই থাকবে, আর গান গাইবে পাখীর সুরে সুর মিলিয়ে।

(এদিক দিয়ে এ্যালেন ও মেরিয়ম ও অপর দিক দিয়ে রবিন সঙ্গীসহ গান গাইতে গাইতে চলে গেলো)।

[রাজা রিচার্ডের প্রবেশ]

রিচার্ড—এতদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে আমার রাজ্যে আবার বিশৃঙ্খলা এসে গেছে। শুনেছি, এই শেরউড জঙ্গলে রবিনহুড নামে এক দস্যু এসে রাজত্ব করছে। তাই আজ একাই এসেছি জঙ্গলের পথে, ছদ্মবেশে তার সঙ্গে মোকাবিলা ক'রতে। এই জঙ্গল আমাকে পরিষ্কার ক'রতেই হবে।

[হুইস্‌লের শব্দ—রবিনের সঙ্গীদল সহ প্রবেশ]

রবিন—কে যায়—

রিচার্ড—(যেন ভয়ে কাঁপছে) বাবা আমি গরীব মানুষ, কিছু জানিনা বাবা, এই রাস্তা দিয়ে এসে পড়েছি—ধোরোনা বাবা—দোহাই তোমাদের, তোমরা আমার চোদ্দপুরুষ বাবা, ছেড়ে দাও বাবা—

রবিন—এই পথে অনেকেই গরীব সাজে, এই—সব খানাতল্লাসী কর্, দেখ্ কিছু পাস কিনা—সত্যিই গরীব কিনা দেখ্। গরীব হ'লে কিছু বলবি না—আর যদি তা না হয়, যদি কিছু পাস—তো ঐ গাছ, আর লম্বা দড়ি—

সবাই—হুর্‌রে আজ একটা শিকার পাওয়া গেছে। (সবাই রিচার্ডকে ধরতে গেলো—রিচার্ড সকলকে দূরে ছিটকে ফেলে দিলে)

রবিন—আরে লোকটা কে হে—সব কটাকে এক ঝটকায় ফেলে দিলে—এমন কি লিট্‌ল্ জনও গড়াগড়ি দিচ্ছে। (রবিন এগিয়ে তার হাত ধ'রে) এবার এসো তো যাদু, তোমায় ঐ গাছের ডগায় কেমন ক'রে টাঙ্গাতে হয় দেখছি—(সহসা রিচার্ড এক ধাক্কায় রবিনকে ফেলে দিল, রবিন গড়াগড়ি দিতে দিতে) রবিনহুডকে গড়াগড়ি দেওয়াতে পারে ইংলণ্ডে এমন একটি মাত্র পুরুষই আছে, সে হ'চ্ছে—রাজা রিচার্ড···দেখি মহাশয়টিকে—? (উঠে দাঁড়িয়ে কাছে গেল।] আপনার গায়ে জোর আছে দেখছি। মহাশয়ের পরিচয় ?

[রিচার্ড সহসা নিজের ক্লোক খুলিয়া ফেলিলেন ; ভিতরে রাজবেশ, [রবিন নতজানু হ'য়ে]—আমি রিচার্ড দি লায়নহার্টের শরণ নিচ্ছি। তাঁর রাজ্যে তাঁর অনুপস্থিতিতে ধনীদের অত্যাচার বেড়ে উঠেছিল বলে এই ক্ষুদ্র জঙ্গলে আমি তাঁরই কাজ করার চেষ্টা করছি। আমি তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা ক'রছি।

[রিচার্ড রবিনকে আলিঙ্গন ক'রে বুকে জড়িয়ে নিলেন]

রিচার্ড—বীর পুরুষকে আমি সব সময়ে ভালবাসি রবিনহুড ! শেরউড জঙ্গলে তুমি নির্ভয়ে থাকবে। পাখীর মত নদীর কলতানে তোমার সুর মিশবে। অসতের বিরুদ্ধে সর্ব্বদাই দাঁড়াবে—তবে আমার অধীনে। বিচারের ভার আমার।

সকলে—মহারাজ রিচার্ডের জয় হোক।

[সকলে নতজানু হয়ে রাজাকে সম্মান দেখালো—পরে একটা গাছের ডালের তৈরী সিংহাসনে তাঁকে বসিয়ে গান ধরল]

গান :— রিচার্ড মোদের রাজার রাজা
শেরউডের জঙ্গী জোয়ান
আমরা তাঁর প্রজা ॥

যত দুঃখী মোদের ভাই
লুটেরাদের যেথায় পাই
সেথাই দিই সাজা।

G P.S. শ্লোগান দিয়ে সকলের প্রস্থান

[দুজন পাদ্রী ও Sister ক্লারার প্রবেশ।]

বড় পাদ্রী—দেখ, ঐ একটি ছোঁড়া হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে শেরউডের জঙ্গলে। ওকে নিয়ে তো আর পারা যায় না, কোথায় ওদিক সেদিক থেকে দু পয়সা উপায় ক'রে খাচ্ছিলুম—তা সব ভেস্তে দিচ্ছে।

Sister nun— বলে কিনা গরীবের উপকার ক'রছি! যেন দুনিয়ার ভগবান হ'য়েছে, আমাদের আর এক পয়সা রোজগার-পাতি হচ্ছে না - আর কেউ ভয়ে দিতেও চায় না।

বড় পাদ্রী—আচ্ছা ক্লারা, ও যখন তোমার ভাই, তখন ওকে সরিয়ে ফেল না। ভগবানেরই কাজ হবে। শুনেছি ওর জ্বর হ'য়েছে—সারাবার নামে ওর হাতের একটা শিরা কেটে দাও, এবার করতো—কত গরীবের উপকার করতে পার।

ছোট পাদ্রী—এই ভগ্নীকে নিয়ে কাজ সারা যাবে।

Sister—পাদ্রীদের বিরুদ্ধে যে ভাই দাঁড়ায় - সে ভাই আমার ভাই-ই নয়। তা আমি কালই যাত্রা ক'রবো শেরউড্ ফরেষ্টে [সকলে আনন্দ করতে করতে চলে গেল]

[রবিনের প্রবেশ, ক্লান্তিতে তীর ধনুক পাশে রেখে শুয়ে পড়ল—লিট্‌ল জন এসে তার জ্বর দেখলো]

লিট্‌ল—ভাই মনে হ'চ্ছে তোমার একটু জ্বর হ'য়েছে, চিকিৎসককে ডেকে পাঠাবো?

রবিন—না, কিছু দরকার হবে না। একটু উপবাস ক'রলেই সেরে যাবে।

[ক্লারা ছুটতে ছুটতে এল।]

ক্লারা—রব—রব—তোমার এ দুর্দ্দশা কে করল? দেখি দেখি (লিট্‌লের দিকে ফিরে) আপনারা এখন একটু যান—আমি আমার ভাই এর চিকিৎসা ক'রবো।

ক্লারা—দেখ রব, তোমাররক্তটা একটু বেশী হ'য়েছে। আমি তোমার

শিরাটা কেটে একটু রক্ত বের ক'রছি—এতে তাড়াতাড়ি সেরে উঠবে, গরীবের কাজ করবে। শিরা কাটিয়া দিল।

(রবিনকে) Good night রব।

রবিন—Good night ক্লারা।

[ক্লারা যাইতে যাইতে স্বগতঃ] আমি শিরাটা কেটে দিলুম, বেঁধে দিলুম না। আর তোমায় বাঁচতে হবে না। (প্রস্থান সঙ্গীদের প্রবেশ)

লিট্‌ল—হায়, হায়—একি রক্তে যে ভেসে যাচ্ছে রবিন—রবিন তোমার ভগ্নী একি ক'রে গেল।

রবিন—ভগবানকে ধন্যবাদ দাও—রবিন হুড কোন দিন মরতে ভয় পায়নি, সে চিরদিন ভগবানের কাজ করেছে। শোননি বাইবেলের কথা :—যেহেতু তুমি আমার অতি দীন সন্তানদের দান করেছো সেই হেতু সেই টাকা তুমি আমাকেই দিয়েছো। সবাই প্রার্থনা কর আর শেষবার আমার তীর ধনুকটা এনে দাও দেখি কতদূর ছুঁড়তে পারি, তীর ধনুকটা বুকে চেপে ধরে আমার বিশ্বস্ত তীর, একটা শেষ চেষ্টা ক'রে দেখি কতদূর যায়। ভগবানের নামে শপথ করে এই তীর ছুঁড়লাম, তীর ছুঁড়িল সামান্য গেল। ওঃ ভগবান। নাঃ আমি ক্লান্ত—আমায় ঘুমুতে দাও। (ঢলিয়া পড়িল)

সকলে—রবিন, রবিন হায় হায় একি হলো। একটা মহৎ প্রাণ এই ভাবে শেষ হ'য়ে যাবে। [দ্রুত সকলে রবিনের কাছে বসিল]

ড্রপসিন